# পূর্বভারতীয় সংস্কৃতির রূপরেখা

[ আলোচনাচক্রে পঠিত প্রবন্ধাবলীর সংকলন ]

প্রথম খণ্ড

তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

প্রথম প্রকাশ
এপ্রিল, ১৯৭৭

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের
তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ
কর্তৃক প্রকাশিত

সম্পাদনা ঃ
শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
মানিক সরকার

সম্পাদনায় সহযোগিতা ঃ
অপূর্বকুমার সাহা

প্রচ্ছদ ঃ তারা দাস

মুদ্রক ঃ
শ্রীশংকর প্রেস
কলিকাতা-১২

প্রাপ্তিস্থান ঃ

বিতরণ শাখা,
তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ
২৩ আর এন-মুখার্জী রোড, কলিকাতা-১

পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মুদ্রণ
৩৮ গোপালনগর রোড, আলিপুর, কলিকাতা-২৭

প্রকাশন বিক্রয়কেন্দ্র ; নিউ সেক্রেটারিয়েট
১ কিরণশঙ্কর রায় রোড, কলিকাতা ১

# যাত্রাপথ শুভ হয়ে উঠুক

শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায়

ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী,

তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ,

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

পূর্বভারত সাংস্কৃতিক সম্মেলনের আজ সমাপ্তি দিবস। এবারের মতো এই সমাপ্তির মধ্য দিয়েই সাংস্কৃতিক জাগরণের নতুন পর্ব সূচিত হল। এই সূচনাকে আমরা সবাই স্বাগত জানাই।

২৩ ডিসেম্বর পূর্বভারত সাংস্কৃতিক সম্মেলনের উদ্বোধন হয়। বাইশ দিন ধরে সম্মেলনের কাজ চলে। আলোচনাচক্র, চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, নৃত্য-সঙ্গীত ও নাটকের অনুষ্ঠান এবং প্রদর্শনীতে হাজার হাজার নরনারী অংশ গ্রহণ করেন। পূর্বভারতের অঙ্গরাজ্যগুলির বিভিন্ন ভাষাভাষী নরনারীর আগমনে এ সম্মেলন প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। এই প্রথম একটি পবিত্র প্রাঙ্গণে ভারতবর্ষ, বিশেষ করে পূর্বভারতের সাংস্কৃতিক অখণ্ডতাকে তুলে ধরা হল। ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ঐক্যই তার জাতীয় ঐক্যের প্রধানতম স্তম্ভ। সেই ঐক্য-বোধকেই এখানে মূর্ত করে তোলা হয়। প্রতিদিনের প্রতিটি অনুষ্ঠান আমাদের দেশের ভাবগত ঐক্যের প্রাণসত্তাকে বস্তুগত সত্যে রূপায়িত করেছে। অগণিত সাধারণ মানুষ প্রতিদিন সম্মেলনে এসে তা উপলব্ধি করেছেন। এই সম্মেলন প্রমাণ করেছে ভারতবর্ষের অঙ্গরাজ্যগুলির বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগণ মহত্তর জীবনের সাধনায় এক এবং অভিন্ন।

সম্মেলনে আসাম, বিহার, ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, মনিপুর, মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাভূমি ও অরুণাচল যোগদান করেছিলেন। 'রামমোহন মঞ্চে' সাংস্কৃতিক আলোচনায় পূর্বভারতের বিভিন্ন রাজ্যের বিশেষজ্ঞগণ তাঁদের অভিমত প্রকাশ করেছেন। নাটক, কথা-সাহিত্য, চলচ্চিত্র, ভাষা ইত্যাদি পনেরটি বিষয়ের আলোচনায় আমরা লক্ষ্য করেছি; মতপার্থক্যের চেয়ে মত-ঐক্যের স্থান অনেক প্রশস্ত। তাঁরা সকলেই কৃত্রিম ভেদ-চিন্তাকে পরাস্ত করে আমাদের মধ্যেকার সুদীর্ঘ কালের ঐক্যকে শক্তিশালী করবার আবেদন জানিয়েছেন। একটি মঞ্চে বিভিন্ন রাজ্যের সুধিজনদের সমবেত করে সাংস্কৃতিক বিষয়ক খোলাখুলি মূল্যবান আলোচনায় ও মত

বিনিময়ের মাধ্যমে অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যেকার নৈকট্যকে আরও দৃঢ় করেছে, একে অপরকে জানবার ও জানাবার সুযোগ পেয়েছেন। প্রায় সকলেই আন্তঃরাজ্য সাংস্কৃতিক বিনিময়ের সুপারিশ জোরের সঙ্গে উপস্থিত করেছেন। এই সুপারিশকে বাস্তবায়িত করবার বিষয়টি আমরা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করছি।

শুধুমাত্র আলোচনা সভায় নয় 'রবীন্দ্র-মঞ্চে' সংগীত, নৃত্য ও নাট্যানুষ্ঠানেও সেই মহান ঐক্যের বাণী প্রতিনিয়ত প্রতিধ্বনিত হয়েছে। অঙ্গরাজ্যগুলি তাঁদের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নিজ নিজ ঐতিহ্যকে তুলে ধরেছেন। একটি মঞ্চে সকলকে তুলে ধরার মধ্য দিয়ে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের মহান বাণীই ফুটে উঠেছে। বিহারের 'বিদ্যাপতি' নাটকের নাট্যানুষ্ঠান, মনিপুরের রাসনৃত্য, পশ্চিমবঙ্গের নটী-বিনোদিনী রসাস্বাদনে স্বতন্ত্র হলেও ঐতিহ্যে অভিন্ন। এই যে বৈচিত্র্য, এ নিয়েই ভারতবর্ষ, আর এ সব নিয়েই আমরা ঐক্যবদ্ধ।

ভারতবর্ষের ভৌগোলিক অখণ্ডতা, জাতীয় সংহতি ও সম্প্রীতির ঐতিহ্যময় পটভূমিতেই এই সম্মেলন আরম্ভ হয়েছিল। ভারতবর্ষ বিশেষ করে পূর্ব-ভারতের সকল ভাষাভাষী জনগণের ঐক্য ও সংহতিকে শক্তিশালী করবার অলঙ্ঘনীয় আদর্শকে সামনে রেখেই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার এই সম্মেলন আহ্বান করেছিলেন। এই আদর্শ এবং লক্ষ্যকে রূপায়িত করবার জন্য আমরা সর্বত্রই সচেষ্ট ছিলাম। হাজার হাজার নরনারীর উপস্থিতি আমাদের সেই প্রয়াসকে সার্থক করেছে। পূর্বভারত সাংস্কৃতিক সম্মেলনের উদ্যোক্তা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ। এই মহৎ প্রয়াস এখন আর একটি বিভাগের মধ্যে নেই—সমগ্র পূর্বভারতের হয়ে পড়েছে। তাই আমরা কামনা করি এই সম্মেলন প্রতি বৎসরে পর্যায়ক্রমে প্রতিটি রাজ্যে অনুষ্ঠিত হোক, এবং ক্রমে ক্রমে আরও সুন্দর হয়ে উঠুক, পূর্ণাঙ্গতা লাভ করুক।

এই সম্মেলনে যাঁরা যোগদান করেছিলেন তাঁদের সকলকেই আমি অভিনন্দন জানাই। সম্মেলনকে সার্থক করে তুলবার জন্য ভ্রাতৃপ্রতিম অঙ্গরাজ্যগুলির প্রতি আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমরা আন্তরিকভাবেই স্বীকার করছি তাঁদের সকলের সহযোগিতা ভিন্ন

এত বড় একটি সম্মেলন সফল হতে পারত না। এই প্রসঙ্গে সময়ের অভাবের জন্য যদি কোন অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি ঘটে থাকে তার জন্য আমি মার্জনা চাইছি। পরিশেষে আমি আমার বিভাগের সকল কর্মীকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমবেত কাজের মাধ্যমে তাঁরা এক অসাধ্য সাধন করেছেন। এই কাজের মধ্য দিয়ে সমগ্র রাজ্যের সুনামকে তাঁরা বৃদ্ধি করেছেন, রাজ্য সরকারের ভূমিকাকে উজ্জ্বল করেছেন। এই সমাপ্তি অনুষ্ঠানে আমাদের যাত্রার শুরু। আমাদের সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণের জন্য আগামী দিনগুলিতে সাংস্কৃতিক সংহতির যাত্রাপথ শুভ হয়ে উঠুক।

[ সমাপ্তি ভাষণ ]

# সূচীপত্র

# পূর্বভারতের সাংস্কৃতিক সংহতি

**ডক্টর মহেশ্বর নেওগ**

জওহরলাল নেহরু অধ্যাপক, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়

ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যসমূহের মধ্যে একটি সহজ স্বাভাবিক ও ঐতিহাসিক ঐক্য রয়েছে। এতদঞ্চলের জনসমষ্টির দিকে তাকালেই কথাটা বুঝতে পারি। ভারতেতিহাসের আদিকাল থেকে, সম্ভবত খ্রীস্টপূর্ব হাজার দুয়েক বছরের শেষ শতকগুলি থেকেই, এই এলাকা এমন এক জনসমষ্টির বাসস্থান ছিল যাঁরা সংস্কৃত সাহিত্যে বহু শতাব্দী ধরে কিরাত নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং আজ আমরা তাঁদেরকেই মঙ্গোলীয় হিসেবে জানি। খুব সম্ভব এঁরাই পূর্বাঞ্চলের আদি পার্বত্যনিবাসী, অন্তত সাহিত্যগত উৎস থেকে লক্ষ্য করলে এবং বিভিন্ন পাহাড়-পর্বতে আবিষ্কৃত নব্য প্রস্তর যুগীয় সাজসরঞ্জামের কথা বিস্মৃত হলে তো তাই মনে হয়। এ ছাড়া অস্ট্রিক পরিবারের মন-খমের গোষ্ঠীর খাসি ভাষা এবং মঙ্গোলীয় বংশোদ্ভূত জনগণ কর্তৃক কথিত ভাষার দিকে তাকালেও একই কথা মনে হবে। এই জনসমষ্টি এখনও নাগাল্যাণ্ড, অরুণাচল, মেঘালয়, মিজোরাম, আসামের পাহাড়ী এলাকা অধিকার করে আছে এবং আসাম, পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের সমভূমিতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। দেশের অন্যান্য অংশের ন্যায় এই পূর্বাঞ্চলেও ভারতের ইতিহাসের গোড়ার দিকেই বিভিন্ন জাতির মিশ্রণ পর্ব শুরু হয়ে যায়। এবং এই মিশ্রণ পর্বের চূড়ান্ত ফলশ্রুতি ভারতীয় হিসেবে পরিচয়, যে পরিচয়ে বিধৃত বিচিত্র সংস্কৃতির কলতানে সৃষ্ট এক অনন্য ঐকতান।

সংস্কৃত ভাষা এবং সংস্কৃত ভাষার বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে উদ্ভূত ও আদিবাসীদের ভাষাসমূহ থেকে প্রয়োজনীয় উপাদানে সমৃদ্ধ

ভাষাসমূহ এতদঞ্চলের নিজস্ব সংস্কৃতির শ্রীবৃদ্ধি সাধনে সবিশেষ প্রেরণা ও পুষ্টি যুগিয়েছে। পূর্বাঞ্চলের সংস্কৃতজাত ভাষাগুলি—যেমন, অসমীয়া, বাংলা, ওড়িয়া, মৈথিলী প্রভৃতি—এক ঐক্য সূত্রে গ্রথিত এবং তার কারণ বোধ করি এই ভাষাগুলি মাগধী প্রাকৃত থেকে উদ্ভূত বলেই। লিপির ব্যাপারেও এই সব ভাষা একই উৎস থেকে আসায় অন্যান্য সর্বভারতীয় কিংবা নিখিল বৃহত্তর ভারতীয় ব্রাহ্মী লিপি থেকে স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত। পরবর্তী পর্যায়ে অবশ্য এসব ভাষা নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে ভূষিত হয়েছে। ওড়িয়া লিপি দেবনাগরী অক্ষর বর্জন করে তেলেগু ও মৈথিলী লিপির কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করেছে।

ভারতীয়করণের ব্যাপারটায় হিন্দুয়ানীর উপাদান ছিল। অর্থাৎ, গোটা অঞ্চলের মঙ্গোলীয় ও প্রোটো অস্ট্রেলীয় জনসমষ্টির সর্বভারতীয় জীবনধারায়—ব্যক্তিক ও সামাজিক উভয় ক্ষেত্রেই—পর্যবসিত হওয়ার বিষয়টা উপস্থিত ছিল। হিন্দুয়ানী বলতে এখানে বেদ রচয়িতা মানবগোষ্ঠীর একান্ত সৃষ্টি বা অসপত্ন অধিকারের কথা বোঝানো হচ্ছেনা, যা কিনা অন্যান্য মানবগোষ্ঠীর উপর চাপানো হয়েছিল। আদপেই তা নয়। বস্তুত, প্রোটো-অস্ট্রেলীয়, দ্রাবিড়ী ও আর্য প্রভৃতি বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর ক্রমে ক্রমে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়েই গড়ে উঠেছে ভারতীয় জাতি এবং হিন্দুয়ানীর ধ্যানধারণা। এমন কি হিন্দু আচার অনুষ্ঠান নামে যা ব্যাপক ভাবে প্রচলিত তাও খ্রীস্টপূর্ব যুগে বৈদিক আর্যদের চিন্তাভাবনার অনুরূপ নয়। ষষ্ঠ শতকের শেষ ভাগে আসামে রচিত 'যোগিনী তন্ত্র' নামে একটি সংস্কৃত রচনায় স্পষ্টভাবেই স্বীকার করা হয়েছে, যোগিনী বিদ্যার আধ্যাত্মিক এলাকা কামাখ্যার ধর্ম কিরাত থেকেই উদ্ভূত। কাছাড়ের ডিমাচা কাছাড়ীদের মধ্যে লোক কাহিনী প্রচলিত আছে যে কামাখ্যা মন্দিরের পীঠস্থান নীলাচল থেকেই এই জনগোষ্ঠীর আগমন ঘটেছে। জনৈক পণ্ডিত ব্যক্তি এমন কথাও

বলেছেন যে, 'কামাখ্যা' কথাটার শব্দপ্রকরণের উদ্ভব খাসি উৎস থেকে, আবার ভাষাতত্ত্ববিদ ডঃ বাণীকান্ত কাকতির মতে বিভিন্ন অস্ট্রিক শব্দ গঠনের মধ্যেই এর রহস্য নিহিত। এই সমস্ত কিছু বিবেচনা করে দেখলে মনে হয় এখানকার জনসাধারণের মধ্যে শুধু শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানই ছিল না, ঐতিহাসিক ধারায় চমৎকার পারস্পরিক আদান প্রদানও ছিল। একেই গুরুদেব বলেছেন, "দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে।" এবং এভাবেই ভারতীয় সংস্কৃতি তথা সব সংস্কৃতিই বিকাশলাভ করেছে।

পূর্বাঞ্চল ছাড়া ভারতের অপর কোনও অংশেরই কিরাত বা মঙ্গোলীয় জনসমষ্টিকে আপনার করে পাবার সৌভাগ্য হয় নি। ভারতের দুই বিরাট মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারতের আয়তন বৃদ্ধির সাথে সাথে আর্যাবর্ত বা উত্তর ভারতের মানুষ কিরাতদের গুরুত্ব সম্পর্কে ক্রমেই সচেতন হতে লাগলেন, কারণ ওই দুই মহাকাব্যে কিরাতদের কথা উত্তরোত্তর অধিকতর বর্নিত হতে থাকল। তাঁরা দেখলেন মঙ্গোলীয়দের গায়ের রঙ মনোরম হলুদ রঙের—সোনারঙা হলুদ (কাঞ্চন দ্রুম সন্নিভ) কিংবা হলুদ রঙা কর্ণিকারা ফুলের তুল্য—শ্বেতাঙ্গ আর্য অথবা কৃষ্ণাঙ্গ দ্রাবিড় ও প্রোটো-অস্ট্রেলীয় উপজাতিদের মত আদৌ নয়। এই মঙ্গোলীয়রা ছিল বলিষ্ঠ ও সাহসী মানুষ, অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারে কুশলী এবং নির্মম। ভেষজ গাছগাছড়ার ব্যবহার এঁদের জানা ছিল। বন সম্পদ এবং সোনা ও রূপার ন্যায় খনিজ সম্পদের সন্ধান এঁরা করেছেন। সুতো কাটা ও বোনার কাজ এঁরা জানতেন। এবং সুতো, সিল্ক ও তন্তু সবরকমের বস্ত্রই এঁরা তৈরী করতেন। মহাভারতে বর্ণিত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে প্রাগজ্যোতিষপুরের ম্লেচ্ছরাজ ভগদত্ত যোগ দেন এবং তিনি ছিলেন সমুদ্রতীরবাসী কিরাত, চীনা ও অন্যান্য সৈনিক সজ্জিত এক বিরাট বাহিনীর (অক্ষৌহিণী) পুরোধা। বিষ্ণু পুরাণে উল্লিখিত আছে, কিরাতগণ সুদূর পশ্চিমে দশার্ণ (অধুনা যা ওড়িশা নামে

পরিচিত) অধিকার করেন। এমন কি অদ্যাবধি মঙ্গোলীয় জাতির বিভিন্ন উপজাতি নাগাল্যাণ্ড, অরুণাচল, মণিপুর, মেঘালয়, আসাম ও পশ্চিমবঙ্গ (উত্তরবঙ্গ) প্রভৃতি পূর্বাঞ্চলীর রাজ্যগুলির সংহত এলাকায় বাস করেন। এর দ্বারাই প্রমাণ হয় পূর্বাঞ্চলীয় জনগনের মধ্যে একটা একতার ভাব ছিল।

এই জনগনের কিছু অংশ হিন্দুধর্মের বিভিন্ন মতাবলম্বী। উদাহরণত মণিপুরী সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও অপরাপর হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন মিলেমিশে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মকে অবলম্বন করেছেন; গড়ে উঠেছে চমৎকার এক ঐতিহ্য, যাতে স্পর্শ করা হয়েছে মরমী, শৈল্পিক ও গীতিকবিতার অত্যুচ্চ চূড়া।

বৈষ্ণববাদ, তা সে গৌড়ীয় হোক বা অসমীয়া হোক, জনগণের সামনে তুলে ধরে মানবতাবাদ ও মানুষের মূল্যবোধের এক মহান বাণী। এই মতবাদের সার্বজনীন প্রভাব এই মতাবলম্বীদের মধ্যে ধর্ম বা সামাজিক গোত্র নির্বিশেষে শিক্ষাদান করে সাম্য ও মৈত্রীর ভাবাদর্শ। অবশ্য চৈতন্যদেব শংকরদেবের পক্ষেও জাতিভেদ প্রথার প্রাচীর লঙ্ঘন করা সম্ভবপর হয়নি। তবে তাঁরা এই কুপ্রথার ধার অনেকটাই ভোঁতা করে দিতে পেরেছিলেন। আসামের শংকরদেব তাঁর ধর্মমতের আওতায় উপজাতিদেরও নিয়ে আসতে পেরেছিলেন যাঁদের মধ্যে ছিলেন গারো, ভোট, যবন (মুসলমান), অসম (আহোম), খিরি (বা মিশিং) ও কাছাড়ি উপজাতি। এবং এঁদের কথাই তাঁর এক ঘনিষ্ঠ সমসাময়িক ব্যক্তি উল্লেখ করে গেছেন।

আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও ওড়িশা রাজ্যগুলিতে বৈষ্ণববাদ সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারে পরিণত হয়েছে। বৈষ্ণবকাব্য এই অঞ্চলের অধিবাসীদের হৃদয়কে স্বর্গীয় প্রেমাদর্শের প্রতি আকৃষ্ট করেছে। দিব্য প্রেমানুভূতির বন্দনায় মুখর হয়েছেন মিথিলার বিদ্যাপতি, আসামের শংকরদেব ও মাধবদেব, বাংলার চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস ও অন্যান্য কবি এবং ওড়িশার রায় রামানন্দ। এই কাব্যান্দোলনে

নেতৃত্ব দিয়েছে নিঃসন্দেহেই মিথিলা এবং ব্রজবুলির মাধমে বাংলা, আসাম ও ওড়িশাকে এক ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করেছে। মিথিলাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছেন পূর্বাঞ্চলীয় কবিকুল। এবং তাঁদের হাতেই সযত্নে লালিত হয়েছে বৈষ্ণব কবিতা।

ওড়িশার নীলাচলে জগন্নাথদেবের অপূর্ব মন্দির আর আসামের নীলাচলে কালীমাতা কামাখ্যার মন্দির এই দুটি পুণ্য তীর্থস্থান পূর্বাঞ্চল তথা সারা ভারতের যথাক্রমে বৈষ্ণব ও শাক্ত মতাবলম্বীদের কাছে বিশেষ আকর্ষণীয়। সুদূর অরুণাচলের পরশুরাম কুণ্ড ভারতের নানা স্থানের পুণ্যার্থীদের আকর্ষণ করে, বিশেষ করে শীতকালে।

পূর্বাঞ্চলে একতার আহ্বান গৌতম বুদ্ধের বাণীতেও বিধৃত। এখানে বৌদ্ধধর্মের দুটি ধারা বর্তমান। প্রথম, থিরাড়ে বা হীনযান। এই হীনযান পন্থীদের মধ্যে আছে খামতি, ফাকিয়াল, দাওয়ানিয়া, নর বা খামিয়াং, তুরুং ও ঐতানিয়ার ন্যায় বেশ কিছু আসাম ও অরুণাচলবাসী উপজাতি এবং মেঘালয়, আসাম ও বাংলার বেশ কিছু লোক যাঁরা আদিতে চট্টগ্রামবাসী ছিলেন। দ্বিতীয়, লামাবাদ। এই মতাবলম্বী হলেন অরুণাচল নিবাসী উপজাতি মোনপা, মেম্বা, খাম্বা এবং ভূটানের ও সন্নিকটবর্তী অঞ্চলের অধিবাসী। থেরাবড় আসলে ব্রহ্মদেশ ও পরে সিংহল থেকে আবার এদেশেই এসেছে। এই মতাবলম্বীগণ সারা আসাম বৌদ্ধ সমিতির পতাকাতলে সমবেত হয়েছেন। এবং এঁদেরই এক অধিবেশনে আমার সভাপতিত্ব করার সৌভাগ্য হয়েছিল। এতদঞ্চল এবং তিব্বত ও সুদূর লাদাখ পর্যন্ত এলাকার লামা বৌদ্ধগণ হয়গ্রীব-মাধব মন্দিরে তীর্থ করতে আসেন। এই মন্দির গৌহাটি থেকে পঁচিশ কিলোমিটার দূরে হাজোতে অবস্থিত। এই মন্দিরে অধিষ্ঠিত মাধবের মূর্তিকে এঁরা মহামুনি বা বুদ্ধেরই প্রতিমূর্তি বলে মনে করেন এবং ওই স্থানটিকে মনে করেন মহামুনির মহাপরিনির্বাণের স্থল। এই সব অদ্ভুত ধারণার ব্যাখ্যা খোঁজবার

আমাদের এখানে কোনও দরকার নেই। এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, লামাবাদ বা তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্ম পূর্বাঞ্চলের এক বিরাট জনসমষ্টির কাছে ঐক্যবিধানের আশীর্বাদ নিয়ে আসে।

ইংরেজ রাজত্বের সুত্রেই পৃথিবীর এই অংশে বিশ্বের অন্যতম প্রধান ধর্ম খ্রীস্টধর্মের আগমন। কেরি, মার্শম্যান ও ওয়ার্ড প্রমুখ ইংরেজ ধর্মযাজকগণ, আমরা জানি, ভারতীয়দের খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত করতে কলকাতায় এসেছিলেন, কিন্তু দেশবাসীর ধর্মে নাক না গলানোর ব্রিটিশ নীতির দরুন এঁদের ওলন্দাজ কবলিত শ্রীরামপুরে আশ্রয় নিতে হয়। এবং ওই একই নীতির কারণে আসামের কমিশনার জেনারেল ফ্রান্সিস জেনকিন্স আসামে আমন্ত্রণ জানালেন ডঃ মিলেস ব্রনসন, ডঃ নাথান ব্রাউন প্রমুখ মার্কিনী যাজকদের, যাতে তাঁরা উত্তর-পূর্ব পার্বত্য উপজাতিদের মধ্যে ধর্মান্তরকরণের কাজ করতে পারেন। কিন্তু এসব দুর্দান্ত উপজাতিদের মধ্যে পরিস্থিতি প্রতিকূল বিবেচনায় এই সব ধর্মযাজক ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় নেমে আসেন। কিন্তু উপত্যকার মানুষ তাঁদের হিন্দু ঐতিহ্যের গৌরবে গর্বিত ছিলেন, এবং খ্রীস্টধর্ম গ্রহণের প্রয়োজন বোধ করলেন না। অগত্যা সেই ধর্মযাজকদের আবার এই পাহাড়ী এলাকার দিকেই নজর ফেরাতে হয়। এঁরা এবং ওয়েলশ মিশন জাতীয় অন্যান্য খ্রীস্টধর্ম সম্প্রদায় পাহাড়ী ও উপত্যকাবাসী সরল প্রকৃতির উপজাতিদের খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত করতে ও তা সুরক্ষিত রাখতে সমর্থ হলেন। এখানকার উপজাতিরা খৃস্টধর্মে খুঁজে পেলেন পরমার্থের সন্ধান। অতীতে আমেরিকা, ইংলণ্ড ও অপরাপর ইউরোপীয় দেশের ধর্মীয় নেতৃত্বাধীনে পৃথকভাবে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় সক্রিয় থাকলেও ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরে বিদেশী প্রায় সমস্ত ধর্মপ্রচারক ভারত ত্যাগ করেন এবং বিভিন্ন খ্রীস্ট্রধর্ম সম্প্রদায় ভারতীয় খ্রীষ্টীয় নেতাদের সহযোগিতায় পরস্পরের সঙ্গে একযোগে কাজ করতে সচেষ্ট হয়েছেন। এর দ্বারা পূর্বাঞ্চলের সমস্ত খ্রীস্টানদের মধ্যে ভাবগত সংহতি সাধনে সহায়তা হওয়া সম্ভবপর। কেননা একই ঈশ্বরপুত্রের

প্রতি সকলের ভালবাসা নিবেদিত। এবং সে কারণেই অন্যান্য মানুষের সঙ্গেও সংহতি সাধিত হওয়া সম্ভব।

বিভিন্ন ধর্মমতের প্রতি আনুগত্য কখনো কখনো সমাজের পক্ষে ঐক্যবিধায়ক না হয়ে বিপরীতটাই হয়ে থাকে। তবে এটা অস্বাভাবিক ব্যাপার, স্বাভাবিক মোটেই নয়। এরই মধ্যে অন্য চিত্রও খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন, শ্রীহট্ট ও অন্যান্য স্থানের মুসলমান কবিদের বিশুদ্ধ বৈষ্ণব বিষয়ে কাব্য রচনা দেখতে পাই। আসামে দেখি শংকরদেবের মুসলমান শিষ্য চাঁদ সাই ( চাঁদ খান ? ) কিছু সুন্দর নীতি কবিতা রচনা করেছেন। এছাড়া, বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন পীর আজান ফকির তাঁর জাকির ও জারি রচনার মধ্য দিয়ে বৈষ্ণব শংকরদেব ও মহাদেবকে উচ্চ মর্যাদার আসনে বসিয়েছেন। আসামে অন্তত হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ও বোঝাপড়ার নিরবচ্ছিন্ন ঐতিহ্য রয়েছে। বাংলাদেশের অভ্যুদয় প্রমাণ করেছে ধর্ম বিষয়ে সাম্প্রদায়িক হানা-হানির চাইতে সাংস্কৃতিক বন্ধন অনেক গভীরের ব্যাপার।

জাতির জীবনে সাহিত্যিক ও শৈল্পিক ঐতিহ্য সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে মিলনের সেতু রচনা করে। গোটা পূর্বাঞ্চল ভারতীয় সাহিত্যের অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। সমগ্র ভারত সম্পর্কে প্রযোজ্য এমন কিছু বিষয় ছাড়াও সাহিত্যের কতিপয় এহেন উপাদান ও বস্তু আছে যা পূর্বাঞ্চলেরই নিজস্ব সম্পদ। মরমী চর্যাগীতি, যা আন্দাজ ৮৪ জন সহজায়ন ও বজ্রায়ন সিদ্ধ পুরুষের রচনা, আসাম, বাংলা, ওড়িশা, মৈথিলী এবং হিন্দীর সাহিত্যপ্রেমীরা নিজেদের বলে দাবি করেন। **পদ্ম-পুরাণ** নামক রচনায় কবি নারায়ণদেব রচিত মানসকাহিনীমূলক পাঁচালী গান আসাম এবং প্রাচীন বাংলা উভয়েরই সমবেত সঙ্গীত-শিল্পীদের সম্পদে পরিণত হয়েছে। বাংলা এবং পশ্চিম আসামের বৈশিষ্ট্য এই মনসাদেবী পূজা। ধর্মদেবের বিস্তারিত পূজার্চনা পশ্চিম-বঙ্গেরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, তবে এর প্রভাব বিশেষ করে আসামের মঙ্গলদই মহকুমায় লক্ষণীয়। একসময় নাথমতবাদ ও নাথ গুরু

সম্প্রদায় বাংলা এবং আসামের সুদূর পশ্চিম ভাগে দারুণভাবে ছড়িয়ে পড়ে। কোনও কোনও কবি সম্পর্কে—যেমন **নারদীয় কথামৃত** রচয়িতা ভুবনেশ্বর বাচস্পতি, **হরিবংশ** রচয়িতা ভবানন্দ, চন্দ্রচূড় আদিত্য, অদ্ভুত আচার্য প্রমুখ কবিদের সম্পর্কে বাংলা তথা আসামের দাবীর মীমাংসা না হলেও, আমি অন্তত এই মতবাদে বিশ্বাসী নই যে বড়ু চণ্ডীদাসকৃত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' এবং রামাই পণ্ডিতের 'শূন্য পুরাণ' অসমীয়া রচনা। বিশিষ্ট পণ্ডিত ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের সঙ্গেও আমি এ ব্যাপারে একমত নই যে কামরূপের কবি পীতাম্বর বাঙ্গালী ছিলেন, যদিও একটি কি দুটি ছাড়া কবির কাব্যগ্রন্থ একমাত্র কোচবিহারেই প্রাপ্তব্য, এবং তার একটি মাত্র গ্রন্থ ( 'ঊষা-পরিণয়' ) আসামে বেশ কয়েকবার সম্পাদিত ও মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। আমি আবারো বলছি, এসব বিরোধ অসমীয়া ও বাঙ্গালীর মধ্যে পার্থক্য নয়, বরং ঐক্যের প্রতিই অঙ্গুলি নির্দেশ করে। এটা খুবই আনন্দের ব্যাপার হবে যদি পশ্চিমবঙ্গ সরকার, যাঁরা এই সম্মেলনের আয়োজনের জন্য বিশেষ কৃতিত্বের দাবি করতে পারেন, কোচবিহারের দরবার গ্রন্থাগারে একদা সংরক্ষিত পীতাম্বর কবি ( চণ্ডী, ভাগবত ১ ও ১০ ) এবং অন্যান্য কবির কাব্যকৃতি প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করেন কিংবা আমাদের গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুমতি দান করেন যাতে আমরা কোচবিহারের ওই পাণ্ডুলিপি ঋণ পেতে পারি এবং সম্পাদনা ও প্রকাশ করতে পারি। এটা যেমন সদিচ্ছার পরিচায়ক হবে, তেমনি পারস্পরিক বোঝাপড়ার ক্ষেত্রেও সহায়ক হবে। একাজ আমাদের সাহিত্যিক ঐতিহ্যের অঙ্গ হিসেবেই গণ্য হবে।

পূর্বাঞ্চলের মানুষদের মধ্যে সাংস্কৃতিক ঐক্য বিষয়ে আমি কয়েকটি কথা বলেছি মাত্র। সন্দেহ নেই, এ বিষয়ে আরো অনেক কথা বলবার আছে। এই সব 'আরো কথা'র দিকে যদি আমরা দৃষ্টি দিই তবে দেখব, আমাদের মধ্যে সংহতির কারণগুলিই জোরদার হচ্ছে এবং বিবাদ-বিসম্বাদের কিছুমাত্র অবকাশ নেই।

বঙ্গানুবাদ : **কমল গুপ্ত**

# সাংস্কৃতিক অগ্রগতি

## চিন্মোহন সেহানবীশ

আমাদের আলোচ্য বিষয় 'স্বাধীনতার পরবর্তীকালে পূর্বভারতের বিভিন্ন রাজ্যের সাংস্কৃতিক অগ্রগতি'। ইংরেজী বিজ্ঞপ্তিপত্রে কিন্তু বিষয়ের নামকরণ দেখলাম—'Cultural development of different states of Eastern India since Independence.'

গোড়াতেই বলে রাখি এক্ষেত্রে সগুণ 'অগ্রগতির' চাইতে আপেক্ষিক ভাবে নির্গুণ development শব্দটিই আমার বেশি উপযোগী মনে হয়েছে। তার কারণ এই নয় যে আমি মনে করি স্বাধীনতার পরবর্তী-কালে সংস্কৃতি ক্ষেত্রে কিছু অগ্রগতি ঘটেনি, যদিও বাজারের নিত্য চড়তি দর আর চারিদিকে নানা ঝামেলা ও অনাচারের খবরে ধৈর্যহারা অনেকেই হয়তো সে ব্যাপারেও যথেষ্ট সংশয় পোষণ করেন মনে মনে। আমার কিন্তু মনে হয় স্বাধীনতার পরের বছরগুলিতে বাঞ্ছনীয় কিছুই হয়নি বললে খাটো করা হয় স্বাধীনতা সংগ্রামের শক্তিকেই। সাফল্য নিশ্চয়ই কিছুটা অর্জন করা গেছে—অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো সংস্কৃতি ক্ষেত্রেও। বিশদ বিবরণের মধ্যে না গিয়ে তার উল্লেখ যথাস্থানেই কিছুটা করা যাবে।

তবু অগ্রগতির চাইতে 'development' শব্দটি এখানে বেছে নেওয়ার কারণ আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রবল শক্তির মতোই অনস্বীকার্য তার গুরুতর সীমাবদ্ধতা, এমন কি বহুবিধ মারাত্মক দুর্বলতাও যার মোটা মাশুল আমাদের অবিশ্রাম গুনতে হচ্ছে স্বাধীনতা লাভের প্রায় তিন দশক পরেও। অবস্থা ঘোরালো হয়ে এখন এক্ষেত্রে প্রায় একটা সংকটে পৌঁছচে যার কারণ অবশ্য শুধু সাংস্কৃতিকই নয়।

"সভ্যতার পিলসুজ' এই ব্যঞ্জনামণ্ডিত কথাটি দ্বারা রবীন্দ্রনাথ একদা সমাজের যে মৌলিক বিভেদ সমস্যার ইঙ্গিত করেছিলেন, আমরা

জানি যে এ দেশে তার কোনো 'গোড়া ঘেঁষে সমাধানের' চেষ্টা হয়নি। সেই সীমাবদ্ধতা ছাড়া আরো একটি গুরুতর দুর্বলতার কথা রবীন্দ্রনাথ এক সময়ে বলেছিলেন এইভাবে……'আমি মনে করি, দেশকে যদি স্বরাজ সাধনায় সত্যভাবে দীক্ষিত করতে চাই তা হলে সেই স্বরাজের সমগ্র মূর্তি প্রত্যক্ষ গোচর করে তোলবার চেষ্টা করতে হবে। অল্পকালেই সে মূর্তির আয়তন যে খুব বড় হবে, একথা বলিনে, কিন্তু তা সম্পূর্ণ হবে, সত্য হবে, এ দাবি করা চাই। প্রাণ বিশিষ্ট জিনিসের পরিণতি প্রথম থেকেই সমগ্রতার পথ ধরে চলে। তা যদি না হত তা হলে শিশু প্রথমে কেবল পায়ের বুড়ো আঙুল হয়ে জন্মাত, তারপর সেটা ধীরে ধীরে হত হাঁটু পর্যন্ত পা, তার পরে ১৫।২০ বছরে সমগ্র মানব দেহটা দেখা দিত। শিশুর মধ্যে সমগ্রতার আদর্শ প্রথম থেকেই আছে, তাই তার মধ্যে আমরা এত আনন্দ পাই।'

এক দিক থেকে ধরতে গেলে সেই গোড়ার গলদ শুধরে সমগ্রতার পক্ষ ধরার জন্যই আমরা স্বাধীনতার পরে পরিকল্পনার নীতি গ্রহণ করেছি। কারণ খণ্ডিত পরিকল্পনা পরিকল্পনাই নয় আসলে পরিকল্পনা মানেই সামগ্রিক পরিকল্পনা। পরিকল্পনা চালু করার সময়ে আমরা সঠিকতাকেই জোর দিয়েছিলাম দেশের দ্রুত বৈষয়িক উন্নয়নের উপরে, কারণ দেশের কোটি কোটি মানুষের খাওয়া, পরা, মাথা গোঁজার ঠাঁই জোগাড় প্রভৃতি একান্ত প্রাথমিক চাহিদা পূরণের অগ্রাধিকার নিশ্চয়ই সর্বপ্রথম। তা ছাড়া দেশের বৈষয়িক উন্নতিই তার আর সব কিছু উন্নতির ভিত্তি। কিন্তু এও তো ঠিক যে বৈষয়িক উন্নয়ন প্রয়াসের সাফল্যও বহুলাংশে নির্ভর করে সমান্তরাল সাংস্কৃতিক অগ্রগতির উপরে। কারণ সমাজ কাঠামোর রূপান্তর না ঘটতে থাকলে বৈষয়িক উন্নয়ন প্রয়াসও পদে পদে বিড়ম্বিত হতে থাকে আর সেই রূপান্তর সাধনের এক মস্ত হাতিয়ার হল নতুন সংস্কৃতি।

এখানে প্রশ্ন এই যে বৈষয়িক উন্নয়ন প্রয়াসের সঙ্গে তাল রেখে সমান্তরাল সাংস্কৃতিক উন্নয়নের কতটা ব্যবস্থা হয়েছে আমাদের

পরিকল্পনায়। আমরা কি তার জন্য কোন স্পষ্ট, সুস্থ, জাতীয় সাংস্কৃতিক কর্মনীতি গ্রহণ করেছি এই দেশে?

গত বছর সিমলায় 'Indian Institute of Advance Study' একটি আলোচনাচক্রের আয়োজন করেছিলেন যার উদ্দেশ্য ছিল ঐ রকম একটি কর্মনীতির মূল রূপরেখা নির্দেশ। আলোচনার শেষে তাঁরা যে ঘোষণা করেন তাতে বলা হয়েছে যে সেই কর্মনীতির মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত '.........to release the democratic initiative of the people. It should aim at promoting self-reliance, egalitarianism, national integration, and a humanism based on a synthesis of the vital elements of our traditions and of modern science and technology. We rule out the inegalitarian, high consumption society as a model for us. Our resources have to be built into egalitarian social services and public facilities in the largest possible measure. This will be the key element in improving the cultural content and the quality of life in our society.'

ঐ লক্ষ্য সিদ্ধ করতে গেলে যে দায়গুলি আমাদের উপরে এসে পড়ে সেগুলি হল :

১। নিরক্ষরতা অপসারণ ও জনশিক্ষার ব্যাপক প্রসার,

২। সমাজ ব্যবস্থার মৌলিক রূপান্তরের লক্ষ্যের সঙ্গে শিক্ষা ব্যবস্থার সামঞ্জস্য সাধন,

৩। আমাদের ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পগুলির পরিস্ফুরণ,

৪। 'নতুন ভাবনা, নতুন মূল্যবোধ ও নতুন বিশ্বসৃষ্টি' গড়ে তোলার জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার পরিপোষণ,

আর

৫। এ সমস্ত প্রয়াসে mass media-র কার্যকর প্রয়োগ।

এবার পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে দেখা যেতে পারে স্বাধীনতার পরবর্তী বছরগুলিতে এই কাজ আমরা কতটা করতে পেরেছি বা করার চেষ্টা

করছি বিশেষ করে এর প্রথম তিনটির ক্ষেত্রে। বলা বাহুল্য এর দায়িত্ব যে শুধু সরকারের এ কথা আমি মনে করিনা।

প্রথমত, নিরক্ষরতার দূরীকরণের ক্ষেত্রে অক্ষরজ্ঞানের শতকরা হারের পরিমাপে আমরা এই বছরে ১৫-র থেকে প্রায় ৩০-এর কাছাকাছি পৌঁছেছি। কিন্তু জনসংখ্যাবৃদ্ধির হারের চেয়ে শিক্ষা প্রসারের হার এখনো পিছিয়ে থাকায় মোট নিরক্ষরের সংখ্যা কিন্তু বছর বছর বেড়েই চলেছে। আর এই বিপুল ও ক্রমবর্ধমান নিরক্ষর বা স্বল্পশিক্ষিত মানুষের সমাবেশে যে পরিবেশ গড়ে উঠেছে তা শুধু সাংস্কৃতিক নয়, বৈষয়িক বা যে কোন উন্নয়নের প্রয়াসের পক্ষেই হানিকর। যেহেতু এখনো এখানে প্রতি দশজনের মধ্যে সাতজনই নিরক্ষর আর বাকি তিন জনের মধ্যে দু'জনের শিক্ষার দৌড় অক্ষর পরিচয় অবধি বা বড়জোর তার কিছুটা ওপরে তাই অবস্থাটা দাঁড়িয়েছে এই রকম: প্রতি দশজনের ভিতর সাত জনের কাছেই সাহিত্য—অন্তত লিখিত সাহিত্যের কোন সরাসরি আবেদন নেই, আর অক্ষর জ্ঞান মারফৎ যে চিন্তা ভাবনা পৌঁছতে পারে তার পথও তাই অবরুদ্ধ তাদের কাছে। আরো দুজনের কাছে তার দরোজা সামান্য একটু খোলা।

এর ফলে নিরক্ষর ও স্বল্পশিক্ষিত ন'জন এবং শিক্ষিত এক জনের মধ্যে সামাজিক ও মানসিক ব্যবধান পাকাপোক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারতবর্ষের আরো বেশ কয়েকটি রাজ্যের মতো পশ্চিমবঙ্গের সাংস্কৃতিক তথা মানসিক প্রাণশক্তিকে বিড়ম্বিত করছে এই মৌল বিচ্ছিন্নতার গোড়ার গলদ।

সরকারী চেষ্টা এ-ক্ষেত্রে যে গতানুগতিক খাতে চলছিল তার সঙ্গে কিছুদিন থেকে যুক্ত হয়েছে নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতির মতো প্রতিষ্ঠানের প্রতি কিছুটা আনুকূল্য। ব্যাপারটা আদৌ যথেষ্ট নয়—সরকারের কাছে আমাদের প্রত্যাশা আরো অনেক বেশি। কিন্তু এই বিপুল দায়িত্ব কি কেবল সরকারের? আমাদের শিক্ষিত

ও বুদ্ধিজীবী সমাজ আমাদের ছাত্রসমাজ কতটা অগ্রসর হয়েছেন এ-ব্যাপারে? তবে শুধু হৃদয়াবেগ সম্বল করে বেশি দূর এগোনো যাবে না, ব্যাপারটার উপরে যে নির্ভর করছে সব কিছু—সেই স্পষ্ট বোধ ও চেতনা নিয়েই এগোতে হবে এই কাজে আর সেই সঙ্গে একটা প্রবল sense of urgency যেমন আমরা দেখেছি ভিয়েতনামের ক্ষেত্রে।*

সমাজ ব্যবস্থার মৌলিক রূপান্তরের লক্ষ্যের সঙ্গে শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গতি সাধনের প্রয়াস এখনো অবধি পরীক্ষা নিরীক্ষার স্তর পেরোতে

---

* ১৯৭০ সালে বার্লিনে অনুষ্ঠিত এক সেমিনারে ভিয়েতনামের এক বৃদ্ধ প্রতিনিধির মুখে এই আশ্চর্য বৃত্তান্তটি শুনেছিলাম :

১৯৪৫ সালের গোড়ার দিকে গভীর অরণ্যের মধ্যে এক রাত্রে ভিয়েতনামের মুক্তি যোদ্ধাদের এক সভা বসেছে। শত্রু বিমানের ভয়ে কোন দীপ জ্বালানো হয় নি। উপস্থিতদের মধ্যে রয়েছেন হো চি মিন সমেত বহু রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃবৃন্দ। সভার সূচনায় হো চি মিন বলেন—কেউ কেউ মনে করছেন যুদ্ধ শেষ হয়ে আসছে। কয়েক বছর আগে আমরা লড়তাম ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। এখন লড়ছি জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। আবার আগামীকাল হয় তো আমাদের লড়তে হবে ফরাসী বা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে, কাজেই শেষ হচ্ছে যুদ্ধ নয়, যুদ্ধের এই পর্বটি। তা ছাড়া শুধু সাম্রাজ্যবাদ নয়, আমাদের লড়তে হচ্ছে এবং আগামী দিনেও লড়তে হবে আরো দুই প্রবল শত্রুর বিরুদ্ধে দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতা। কেউ কেউ ভাবতে পারেন এই তিন শত্রুর মধ্যে যেহেতু সাম্রাজ্যবাদই প্রবলতম তাই আমাদের উচিত তারই বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ করা আর সে শত্রুকে পরাস্ত করার পর আমরা শুরু করব অন্য দুই শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই। আমরা যদি ঐ পথ ধরি তা হলে বিপর্যস্ত হবে আমাদের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামও। তিন শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদের যুগপৎ লড়াই চালাতে হবে—এতে কোন লড়াইয়েরই অগ্রাধিকার নেই।

কাজটা কঠিন কিন্তু যুদ্ধজয়ের এই হল একমাত্র পথ। —লেখক

পারেনি। এখানে প্রবল বাধা আসছে যাঁরা রাজনৈতিক ভাবে ঐ লক্ষ্যের বিরোধী শুধু তাঁদের তরফ থেকেই নয়, গতানুগতিক পদ্ধতিতে অভ্যস্ত শিক্ষাবিদ, অভিভাবক, পাঠ্যপুস্তক রচয়িতা ও প্রকাশক মহল থেকেও। লক্ষণ দেখে মনে হচ্ছে সরকার বহুলাংশে নতিস্বীকার করছেন এঁদের চাপের কাছে। এর পাল্টা তেমন কোন অভিযান চালানো হচ্ছে না—না সরকারের পক্ষ থেকে, না শুভবুদ্ধিসম্পন্ন বুদ্ধিজীবী বা শিক্ষাবিদদের তরফ থেকে। সম্প্রতি দু'চারটি Seminar হচ্ছে কিন্তু Seminar-এর বক্তব্য দূরে থাক, সরকারী উদ্যোগে গঠিত পরিকল্পনা সংস্থার এ-সম্পর্কিত সুপারিশগুলি পর্যন্ত এখনো অবধি উপেক্ষা করে চলেছেন শিক্ষা কর্তৃপক্ষ।

আমাদের ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পগুলির ক্ষেত্রে অবস্থা এই রকম: প্রথমত ব্যাপক নিরক্ষরতার কারণে আমাদের বাংলা ভাষায় বইয়ের বাজার খুবই সংকীর্ণ, দেশবিভাগের ফলে সে বাজারেরও যে নিদারুণ সংকোচন ঘটেছে বাংলাদেশের উদ্ভবের পরেও তার থেকে আমরা ঠিক মতো উদ্ধার পাইনি। ব্যাপারটা ঠিক কোনখানে ঠেকে আছে তাও আমাদের কাছে আবছায়া। স্বভাবতই এখানে প্রধান উদ্যোগ দু'পক্ষের সরকারের।

দ্বিতীয়ত, এখনো আমাদের শিক্ষাদীক্ষা, সরকারী প্রশাসন ব্যবস্থা, আদালত কাছারী, শিল্প-বাণিজ্য চাকুরি, রাজনীতি চর্চা, দৈনন্দিন চলাফেরা কথাবার্তায় অর্থাৎ মানসিকতায় তথা সমগ্র সমাজজীবনে ইংরেজী শিক্ষিতদের প্রাধান্য বহুলাংশেই অক্ষুণ্ণ। অন্যদিকে যাঁরা ইংরেজী শিক্ষার তেমন সুযোগ পাননি তাঁদের মধ্যে রয়েছে বেশ কিছুটা হীনমন্যতা। এই অস্বাভাবিক পরিবেশ যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের স্বাস্থ্য ও অগ্রগতির অনুকূল নয় তা বলাই বাহুল্য।

এ-কথা ঠিক যে শিক্ষার ক্ষেত্রে বাহন রূপে এখন বাংলাভাষা আগের চাইতে অনেক বেশি চালু হয়েছে। কিন্তু সেটা পরিকল্পনা অনুযায়ী এক ব্যবস্থার বদলে আর এক ব্যবস্থার প্রবর্তন হিসেবে

ঘটেনি—আসলে যা হয়েছে তা হল একটি ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে আর অগত্যা তার জায়গায় চলছে এক ধরনের অব্যবস্থা। গত কয়েক বছর ধরে সরকারী দপ্তরে বাংলা ভাষা ব্যবহারের চেষ্টাও অনেকটা এগিয়ে বারবার ঠেকে যাচ্ছে কর্তাদের মজ্জাগত ইংরেজীয়ানার চড়ায়। মনে হচ্ছে ব্যাপরটা মনপ্রাণ দিয়ে কেউই গ্রহণ করেননি —না সরকার, না দেশের শিক্ষিত সমাজ।

তৃতীয়ত, সর্বভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারী ব্যবস্থায় উগ্র হিন্দীয়ানার দাপটে সন্ত্রস্ত এবং অন্যান্য ভাষার তুলনায় হিন্দী ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি সরকারের কিছুটা একচক্ষু দাক্ষিণ্যে ও হতাশ হয়ে বাঙালি বুদ্ধিজীবী মহলের একাংশে নতুন করে একটা ঝোঁক দেখা যাচ্ছে ইংরেজী ভাষাকে আঁকড়ে ধরার। সব মিলিয়ে এ রাজ্যের সমগ্র জীবনে বাংলাভাষাকে সুপ্রতিষ্ঠ করার সুস্থ স্বাভাবিক ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন পদে পদে ব্যাহত হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কিছু কিছু দুর্বল ও বিক্ষিপ্ত পাল্টা প্রয়াস সত্ত্বেও।

সাহিত্যের দিক থেকে এখানো প্রতি দশজন বাঙালির মধ্যে দু'জনের—বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের স্বল্পশিক্ষিতদের মনের খোরাক অনেকটাই জোগায় বটতলা। চিৎপুরের গলির মধ্যে সেকেলে ছাপাখানায় সস্তা কাগছে ছাপা সস্তাদরের ঐ সব বই আজো হাটেবাজারে, মেলায়, গঞ্জে, বন্দরে লটের দরে বিক্রি হয়ে থাকে হাজারে হাজারে। তারমধ্যে রামায়ণ, মহাভারত, কারবালা যুদ্ধ এবং হিন্দু মুসলমান পুরাণ-কাহিনী, লক্ষ্মী ও সত্যপীরের পাঁচালি, যাত্রা ও পালাগান, আরব্য উপন্যাস হারুণ-অল-রশিদ, হাতেমতাই বা লায়লামজনুর কিস্‌সা, ব্রতকথা, সামাজিক ক্রিয়াকর্মের নিদান, পাঁজি, লতাপাতার গুণাগুণ, বশীকরণ, যাদুবিদ্যা, নানা তুকতাক—সব কিছুরই সন্ধান পাওয়া যাবে। আবার কালের গতির সঙ্গে তাল রেখে কিছুটা আধুনিক ছাঁদে 'বিবি বউ' বা 'মডেল প্রেমে'র মতো চটকদার শিরোনামার বইও পাওয়া যায় বটতলায় বা তারই আধুনিক সংস্করণে।

· তবে গ্রাম বাংলাতেও মধ্যযুগ আজ আর অচল অনড় হয়ে নেই। সেখানেও কিছুটা পৌঁছেচে নতুন কালের আলো। খবরের কাগজ, সাময়িক পত্র তো আছেই। তার উপরে রেডিও, ফিল্ম, আধুনিক থিয়েটারের দৌড় এখন মফঃস্বলেও বহু দূর বিস্তৃত। আর আমাদের মতো নিরক্ষর ও স্বল্পশিক্ষিতের দেশে দশজনের মধ্যে ৭।৮ জনের কাছেই সাহিত্যের আবেদন যে সরাসরির চাইতে তার ঐ রকম ফলিতরূপেই বেশি কার্যকর হবে—এতো স্বাভাবিক। এ সবের মিলিত অভিযানের মুখে 'সেই সনাতন ভারতবর্ষের ট্রাডিশন' এখন বেশ কিছুটা বিপর্যস্ত। আর যেহেতু এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ বরাবরই এত রঙ্গে ভরা তাই বাঙালির মন এ-সব দিকে চট করে সাড়া দেয়। কিন্তু তার ঐ সহজাত আনুকূল্যের উপরে নির্ভর করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যদি অতি দ্রুত আমাদের এই সংস্কৃতি তৃষ্ণার্ত রাজ্যে নির্মল পানীয় জলের ব্যবস্থা না করেন তা হলে গ্রামের মধ্যে কৃষকের নবশিক্ষিত সন্তানেরা যে পানীয় হাতের কাছে পাবেন তার দিকেই ঝুঁকবেন—এ আশঙ্কা রয়েছে। জনসাধারণের কাছে নতুন ধরনের জাতীয় গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি পৌঁছনোর পক্ষে অবস্থা এখনো অনুকূল। কিন্তু সে দিক থেকে সুসংগঠিত চেষ্টার অভাবে নতুনের আবির্ভাব সেখানে যে ভাবে হচ্ছে তাতে তার রূপ ও চরিত্র জনসাধারণের কাছে নির্দিষ্ট ও স্পষ্ট হয়ে উঠছে না। মানুষের মনে ছায়াপাত করলেও তার প্রভাব তাই এখনো অবধি গভীর বা দৃঢ়মূল নয়। বরং এসবের ফলে উদ্রেক হয়েছে কিছুটা বিভ্রান্তি, অস্থিরতা ও আধুনিকতার বহিরঙ্গ-চর্চা বা নকলনবিসি।

# পূর্বভারতীয় রাজ্যসমূহের সাংস্কৃতিক ঐক্য

গোপাল হালদার

**মূল সমস্যা ঃ** মূল সমস্যাটা কি? সমস্যাটা হচ্ছে বিকাশমুখী ভারতীয় রাষ্ট্রজীবনের সমস্যা (a crisis of growth)। ভারত বহু জাতি, উপজাতি ও জাতিসত্তার (nationalities) সমাবেশে গঠিত একটা উপমহাদেশ। ব্রিটিশ শাসনাধীনে তা শাসন সূত্রে একত্রে গ্রথিত হয়েছিল। এখন স্বাধীনতার যুগে সেই সকল জাতিকে নিয়ে, এক স্বাধীন রাষ্ট্রীয় মহাজাতি বিকশিত হতে চলেছে। এই বিবর্তন কালে প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র জাতি-উপজাতি তার 'স্বজাতি-সত্তা' (identity) যেমন সুরক্ষিত করতে চায়, তেমনি আবার তা সুদ্ধই প্রত্যেকেই তারা হতে চায় এক ভারতীয় মহাজাতিতে একত্রিত। একই কালে ঐক্যমুখী ও বিচ্ছিন্নতা-মুখী দুই শক্তিই এখনো সক্রিয়। সমস্যার তাই রূপটি কী? তা বিচ্ছিন্ন স্বাজাত্য হতে সংঘবদ্ধ স্বাজাত্যে উত্তরণের সমস্যা (from identity in isolation to identity in integration)—বিছিন্ন স্বজাতির মধ্যে মহাজাতিকে ও মহাজাতির মধ্যে স্বজাতিকে উপলব্ধি এই তার লক্ষ্য। পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলির সমস্যাও এই ভারতীয় মূল সমস্যারই একটি খণ্ডরূপ—পৃথক কিছু নয়।

**নীতি ও পথ ঃ** ভূগোলের নিয়মে পূর্ব ভারতে আমরা প্রতিবেশী ও পরস্পরের পাশাপাশি বাস করতে বাধ্য—ইতিহাস এই আদেশকে এখনো সম্পূর্ণ করে তুলতে পারেনি—কিন্তু দু' হাজার বৎসর ধরে তার নীতি ও পথ নির্দেশ করে গিয়েছে। সে নীতি ও পথ হচ্ছে—ঐক্যের মধ্যে বিচিত্রের স্বীকৃতি (unity in diversity)। এই নীতিকে গড়ে তুলতে হবে সংস্কৃতির পথে, সামাজিক-অর্থনৈতিক পথে, সংবিধানিক পথে। ছোট বড় সকল রাজ্যের সমতা ও

সমাধিকার এই মহাজাতিক সংহতির ভিত্তি লক্ষণীয় — মূলতঃ আমাদের সংবিধানেও সেই spirit বা নীতিতেই প্রণীত, কিন্তু প্রয়োগে দেখা দিয়েছে সমস্যার ব্যবহারিক রূপ — নীতি তাই যথাযথ প্রযুক্ত হচ্ছে না।

**রাজ্য সমূহের ভুমিকা :** (ক) **রাজ্যাভ্যন্তরে**—সংখ্যালঘু জাতি বা গোষ্ঠী সমূহের স্বকীয় সত্তা (identity) ও সংখ্যাধিক জাতি বা গোষ্ঠীসমূহের সত্তার সঙ্গে সমাধিকারের ভিত্তিতে সুসম্বদ্ধ করা। (খ) **আন্তর রাজ্যিক ক্ষেত্রে** (১) প্রতিবেশী রাজ্যসমূহের সঙ্গে সমাধিকার ও সমদায়িত্বের ভিত্তিতে সাযুজ্য সৃষ্টি সর্ব ভারতীয় ক্ষেত্রে প্রতিবেশী রাজ্যদের সহযোগে ভারতীয় মহাজাতিক সংহতি বৃদ্ধি। অর্থাৎ পূর্বাঞ্চলিক সাযুজ্যের সঙ্গে চাই ভারতীয় মহাজাতিক সংহতি।

**ভারতীয় সংস্কৃতির স্বরূপ :** সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার তার স্বরূপ কী : (ক) সম্মেলিত (composite) সংস্কৃতি (খ) গতিশীল (dynamic) বা পরিবর্তমান ও বিবর্ধমান সংস্কৃতি এই তার স্বাধীন কথা।

(গ) প্রকাশ মাধ্যম—প্রধানত 'ভাষা' ( তারপর সঙ্গীত, চারুকলা-কারুকলা, নৃত্য-নাট্য কলা প্রভৃতি ) ভাষা সম্পর্কিত সমস্যা - মূলতঃ প্রতি ভাষার বিকাশের সমস্যা : (১) ভাষা-বৈচিত্র্য প্রতিটি ভাষাই 'বিশিষ্ট', কিন্তু নিঃসম্পর্কিত' নয় ('distinct' but not 'different')। (২) সংখ্যায় ছোট বা বড় যা'ই হোক, সকল ভাষাই **সমান** ; ৩। এক ভাষার ওপর অন্য ভাষার 'আধিপত্য' (imposition) লাভের চেষ্টা অন্যায় ও অসঙ্গত। অন্যান্য শিল্প-মাধ্যম সম্পর্কেও এই নীতি-পদ্ধতিই স্বীকার্য )।

(ঘ) সাহিত্য সম্পর্কিত সমস্যা— মূলতঃ সেই বিকাশের সমস্যা। ভারতীয় ( শিষ্ট বা লিখিত ) সকল সাহিত্যের, ( বাঙলা, অসমিয়া, ওড়িয়া প্রভৃতির ) সাদৃশ্য লক্ষণীয় (১) একই ভারতীয় নিসর্গ বাহ্য-প্রকৃতি (আকাশ-বাতাস, জীব-বৃক্ষ, flora and fauna) যদিও ঐশ্বর্যে

বিচিত্র। (২) একই মানবীয় চিন্তা-জগৎ (world of thoughts and ideals) এবং একই (৩) সম্মেলিত সৃষ্টির ঐতিহ্য ( যথা, সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্য ; পরে ফার্সি-আরবী সাহিত্য, বর্তমানে ইংরেজী ও পাশ্চাত্য-সাহিত্যের দ্বারা প্রতিটি ভারতীয় বর্তমান সাহিত্য পুষ্ট। (৪) আধুনিক সাহিত্যাদর্শের একই রূপ সাধনা—(পূর্ব ঐতিহ্যের আধুনিকতা সাধন ) বিকাশের প্রয়াস। (৫) বিবিধ লোক-সাহিত্যেরও একই সাধনা।

(ঙ) সঙ্গীত-নৃত্য প্রভৃতি শিল্পও শিষ্টধারা ও লোক-ধারা সম্পর্ক ও সমস্যা মূলতঃ সাহিত্যের মতই উক্তরূপ।

(চ) লোক-সংস্কৃতির বিশেষ গুরুত্ব স্মরণীয়। লোক-শিল্পের **ব্যাপকতা** আছে, ( প্রায় সর্বজনীনতা), কিন্তু লোক-শিল্পের আপেক্ষিক স্থাণুত্বও (relative statism) আছে। যন্ত্র যুগের সঙ্গে মানিয়ে উঠ্‌বার মত' তার শক্তি অল্প। (উপজাতি সংস্কৃতিরও এই সমস্যা প্রতিবেশী অগ্রসর সস্কৃতির সম্বন্ধে তার আশঙ্কা। উপজাতি সংস্কৃতি চায় আত্মরক্ষা এবং নবায়মানতায় আত্মপ্রকাশ— সেই যুগোচিত বিকাশের সমস্যা )

**বিকাশের সমস্যা** ঃ বিকাশের মূলসূত্র ঃ (ক) সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয় বিন্যাস—পূর্বযুগের স্বয়ংসম্পূর্ণ পল্লীসমাজের (self-sufficient village economy) জীবনযাত্রাকে আধুনিক যন্ত্রযুগের শিল্পোন্নত ও কারুবিজ্ঞানোন্নত সমাজ-জীবনে পুনর্গঠিত করা, প্রধান সমস্যা। (খ) ইংরেজ আমলের ঔপনিবেশিক সংস্কৃতিকে ( শিষ্ট সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতিকে ) স্বাধীন, গণতান্ত্রিক, সর্বাঙ্গীণ (all round) ও সর্বজনীন (universal) সংস্কৃতিতে পরিণত করা ; ( সর্বাঙ্গীণতা'র মেরুদণ্ড হবে বৈজ্ঞানিক প্রয়াস ; এবং 'সর্বজনীনতা'র লক্ষ্য সর্ব-মানবিকতা ) অর্থাৎ 'scientific humanism বা বৈজ্ঞানিক মানবিকতা' হবে বিকাশের উদ্দেশ্য। (গ) প্রগতি-বিরোধী ও মিলন বিরোধী (centrifugal) শক্তিগুলির দূরীকরণ—(১) অতীতের

আবর্জনা—'কাষ্ট' (cast), ধর্ম-নামীয় আচার, (২) সাম্রাজ্যবাদের পরিপুষ্ট সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা প্রভৃতি বিভেদ-কৌশল (divide et impera), (৩) স্বাধীনতা পরবর্তী অনিশ্চয়তা ও উৎকণ্ঠা—প্রত্যেকের নিজের ভাষা নিজের সংস্কৃতি রক্ষার নামে প্রতিবেশী ভাষা, প্রতিবেশী সংস্কৃতির প্রতি বিদ্বেষ, সংকীর্ণ 'রাজ্য'-সর্বস্বতা parochialism, chauvanism প্রভৃতির ফলে দাঙ্গা। মূলে আছে মুষ্টিমেয় শিক্ষিতের স্বার্থান্বেষণ, নানা দেশীয়-বিদেশীয় শক্তির প্ররোচনা কিন্তু সাধারণ মানুষেরও নিজ নিজ ভাষা, সংস্কৃতি প্রভৃতির জন্য উৎকণ্ঠা ও ভীতি আছে। ব্রিটিশ আমলে ইংরেজি এই সকল ভাষার বিকাশ অবরুদ্ধ করেছে। আজও তাদের সেরূপ আশঙ্কা - শক্তিমান প্রতিবেশীকে। ভীতিবশেই তারা সংকীর্ণতাবাদী, এমন কি, নিজেরাও উগ্রতাবাদী। স্বার্থান্বেষীদের প্ররোচনায় আত্মবিস্মৃত হয়—দাঙ্গায়ও প্রবৃত্ত হয়। এই সব বিভেদী প্রয়াসের রূপগুলি লক্ষণীয়: (১) রাজনৈতিক parochialism, রাজ্যসীমানার দ্বন্দ্ব ( পূর্ব ভারতেও অনুপস্থিত নয় ) তথাকথিত গণতন্ত্রের অপব্যবহারও দেখা যায়। (২) অর্থনৈতিক—সকল রাজ্য ও গোষ্ঠীর বিকাশ সমতালে হয় নি, সে বৈষম্যে জন্ম দিয়েছে ছোট-বড়'র বিকৃতবোধ (inferiority-superiority complex) (৩) মধ্যবিত্ত অর্ধশিক্ষিত ও শিক্ষিত বেকারের বৃদ্ধি ও লোকসংখ্যার অতিবৃদ্ধি। (৪) 'ছাত্র' ও 'যুব'দের মাত্রাবোধহীন ক্ষমতা-চেতনা। (৫) দুর্নীতি-পুষ্ট ( শাসক ও অ-শাসক ) নেতৃ-গোষ্ঠীর দুরভিসন্ধি নিঃস্ব (have-nots) বঞ্চিতদের প্রগতিমুখী আন্দোলন থেকে বিপথে পরিচালনা করে শোষণধর্মীদের স্বার্থ সংরক্ষণ।

**সমাধানের পথ:** মূল নীতি—সংস্কৃতির রূপান্তর—সর্বাঙ্গীণ ও সর্বজনীন সংস্কৃতি সৃষ্টি। সেজন্য কয়েকটি প্রস্তাব:

(ক) সাংস্কৃতিক—(১) নিরক্ষরতা-দূরীকরণ, (২) বাধ্যতামূলক সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ও প্রারম্ভিক টেক্‌নিকাল ট্রেনিং, (৩) পশ্চাৎ-

পদ গোষ্ঠীদের বিশেষ সহায়তা-দান, (৪) লোক-সংস্কৃতির পরিপোষণ ( উৎসব, আদান-প্রদান প্রভৃতির ব্যবস্থা ) ; (৫) পশ্চাৎপদ গোষ্ঠীর প্রত্যেকের জন্য সাংস্কৃতিক institute গঠন ( ইট-কাঠের শ্রাদ্ধ বা ঠিকাদারের লুঠের ব্যবস্থা নয়—বরং গান্ধীবাদী সারল্যে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গড়া উচিত ) ।

(খ) সামাজিক-রাজনৈতিক (১) অর্থনীতি ও রাজনীতিকে শতকরা ৮০ জনের স্বার্থে প্রয়োগ করা, (২) মাথাভারী প্রতিষ্ঠান না গড়ে নীচ থেকে গঠনের সূচনা (bottom to top) (৩) সংখ্যালঘুদের, বিশেষ করে পশ্চাদ্বর্তী উপজাতিদের, শাসন-কর্মে সুযোগ দান। (৪) কৃষি ও শিল্পে বৈজ্ঞানিক বিদ্যার প্রয়োগ ও বিপ্লব। (৫) পরিবার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যতঃ সার্থক করা। (৬) বেকারের জন্য কর্মসংস্থান। (৭) আঞ্চলিক ( যেমন, মহারাষ্ট্র, গুজরাতে অর্থনৈতিক পক্ষপাত ) ও গোষ্ঠীগত ( যেমন, টাটা, বিড়লা সিংহানিয়া প্রমুখ বিশ গোষ্ঠীর ), অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি সমস্ত বৈষম্য বন্ধ করা।

**উপসংহার :** 'সাংস্কৃতিক বিপ্লব' চাই—চীনা 'সাংস্কৃতিক বিপ্লবে'র মর্কটপনা নয়, যথার্থ সাংস্কৃতিক বিপ্লব চাই মহাজাতিক ভারতে, যার লক্ষ্য, নীতি ও পথ উপরে আলোচিত হয়েছে, যার আপাততঃ মূল ধ্বনি হবে—সর্বাঙ্গীণ ও সার্বজনীন সংস্কৃতি। জনগণের জন্য, জনগণের স্বার্থে, এবং মুখ্যতঃ জনগণের উদ্যোগে-প্রয়াসে গড়া জনতার সংস্কৃতি। পূর্বাঞ্চলের রাজ্যসমূহকে এই উদ্দেশ্যেই উদ্বুদ্ধ ও ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

# জাতীয় সংহতির নবদিগন্ত মিজোরাম

## অমিত সরকার

জাতির সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত সংজ্ঞা জানবার জন্য প্রায়ই আমি উৎসুক হয়ে উঠি। একটা নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে একত্রে বসবাসকারী, একই ঐতিহ্যমণ্ডিত, একই ভাষাভাষী বা ধর্মাবলম্বী বা একই নৃতাত্ত্বিক কুল থেকে উদ্ভূত জনসমষ্টিকে জাতি আখ্যা দেওয়া কি ঠিক হবে? জাতির এসব মান অনুযায়ী জার্মান, ইংরেজ ও ফরাসীদের জাতি বলা হয়ে থাকে। কিন্তু, এমনকি যুক্তরাজ্যেও, ওয়েলসবাসীরা স্বায়ত্তশাসন দাবি করেছেন। মার্কিন নিগ্রো ও শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে গায়ের রং ছাড়া, উপরোক্ত মাপকাঠির বেশির ভাগ অনুযায়ী, কোন পার্থক্য নেই। অথচ এটাই কিন্তু সত্য যে, এ দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনদিনই সংহতি গড়ে ওঠেনি।

ঐসব মাপকাঠির একটিরও বিচারে, ইতিহাসের কোন অধ্যায়েই, ভারতীয়রা জাতি হিসেবে সমপ্রকৃতিসম্পন্ন হতে পারেনি। এ দেশের বিপুল জনসমষ্টির মধ্যে পরিকীর্ণ ভাষা, বর্ণবৈশিষ্ট্য ও প্রথার বিরাট বৈচিত্র্য সত্ত্বেও কেবল একটি ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে সাধারণ মিল খুঁজে পাওয়া যায়; সেটি হল, হিন্দু রাজাদের যুগ থেকে ব্রিটিশ শাসন এবং তারপরও প্রজাতন্ত্রী ভারতের গণতান্ত্রিক সরকারের আমল পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রেই গোটা দেশবাসী একই প্রশাসনে শাসিত হয়ে আসছেন, আর এই একটিমাত্র প্রশাসনাধীন থাকাতেই বিবিধের মাঝে মিলনের তথাকথিত তত্ত্বটির সত্য নিহিত। মোগল রাজই হোন বা ব্রিটিশ শাসকই হোন, প্রত্যেকেই তাঁর নিজ নিজ ধাঁচের প্রশাসন জনগণের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন এবং আমাদের ইতিহাসের বিবরণী থেকে দেখা যায়, ভাষা, বর্ণ, ধর্ম নির্বিশেষে জনগণকে একই সঙ্গে

ঐ সব প্রশাসনের দমন-পীড়ন ও বদান্যতা ভোগ করতে হয়েছে। উৎপীড়ন ও শোষণই ভারতবাসীদের ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে একতাবদ্ধ করেছে এবং প্রতিবাদ জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে একই বিক্ষোভের বিভিন্ন তন্ত্রীর সুর তাঁরা পঞ্চমে চড়িয়ে নিয়ে তাঁদের জন্মগত অধিকার আত্মনিয়ন্ত্রণ অর্জনের সংগ্রামে একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন।

স্বাধীনতা আন্দোলন প্রতিরোধের প্রয়াসে ব্রিটিশ সরকার শাসিতদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করে শাসন করার তার পরীক্ষিত নীতি অনুসরণে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও শ্রেণীর মধ্যে ঘৃণা সঞ্চারে সাফল্য লাভ করে। বিভিন্ন বর্ণ, উপ-বর্ণ ও সম্প্রদায়ের অন্তর্নিহিত বিদ্বেষ দেশ-বিভাগ ত্বরান্বিত করে এবং স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে, দুই ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যেকার সম্পর্ক আরও তিক্ত করে তোলে।

স্বাধীনতার পর ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাবসংহতি সাধনের অপরিহার্যতা অন্যতম বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। ভয়ংকর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শান্তির পরিবেশ অপবিত্র করে ফেলে। মৈত্রী ও প্রগতির সম্ভাবনা কলুষিত করার পরিকল্পিত অপপ্রয়াসের কোন অভাব ছিল না। এহেন আবহাওয়ায় পারস্পরিক বোঝাপড়া ও মৈত্রী স্থাপনের আহ্বান অরণ্যে রোদনের মত শোনাল। তবে এটা অবশ্য নিঃসন্দেহে সত্য যে, যে অবস্থা থেকে আমাদের শুরু করতে হয়েছিল, আজকের পরিস্থিতি তা থেকে অনেক উন্নত। তথাপি জাতীয় সংহতির সমস্যা এখনও বিরাট আকার ধারণ করে রয়েছে। কু-সংস্কারের ভূত এখনও কিছু লোকের চেপে রয়েছে এবং বর্ণহিন্দু ও তপসিলী সম্প্রদায়ের বিবাদ মাঝে মাঝে পারস্পরিক নিগ্রহে পর্যবসিত হয়ে থাকে। প্রাগ্রসর সম্প্রদায়ের সমপর্যায়ে উন্নীত করার উদ্দেশ্যে পশ্চাৎপদ সম্প্রদায়ের উচ্চ হারে উন্নয়ন অথবা ভারতের সংবিধানে বর্ণিত ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিতে প্রত্যয় উৎপাদনের দ্বারাই কেবল এ পূর্ণাঙ্গ সমস্যার মোকাবিলা সম্ভব নয়।

তপসিলী জাতি ও আদিবাসীদের জন্য বৃত্তি ও চাকুরি সংরক্ষিত

রাখার নীতি সামাজিক দিক থেকে অভ্রান্ত হলেও, একথা কেউই অস্বীকার করতে পারবেন না যে, এ ব্যবস্থায় দেশের অবশিষ্ট অধিবাসী-দের থেকে তাঁদের প্রতি পৃথক আচরণ সম্পর্কে ঐ দুটি সম্প্রদায়কে সচেতন করে তোলে। সংবিধান-স্বীকৃত ধর্মনিরপেক্ষতা আপনা থেকেই ভাবসংহতি সাধনে উৎসাহিত করে না। ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ হল, ধর্মকর্ম নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের প্রতি সম ব্যবহার। নাগরিকদের ধর্মের ব্যাপারে রাষ্ট্রের কোন মাথাব্যথা নেই—ধর্ম-নিরপেক্ষতার এই মার্কিন সংজ্ঞা ভারতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিটি নাগরিককে তাঁর ধর্ম, এবং সেহেতু, তাঁর নিজ সম্প্রদায় সম্পর্কে সচেতন করে তোলে।

'ভারতীয়করণে'র মত কথাবার্তা জাতীয় সংহতির পক্ষে স্পষ্টই বিপজ্জনক। একের মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আত্মবিলুপ্তি অর্থে সংহতির সংজ্ঞা নির্ণীত হওয়া ঠিক নয়। অন্যদিকে সংহতির অর্থ দাঁড়াবে এই যে, সংহতি সাধনের পর পারস্পরিক বোঝাপড়ার বন্ধনে আবদ্ধ দেশবাসীর প্রতিটি অংশই নিজ নিজ সংস্কৃতি ভাষা ও ধর্ম ভিত্তিক পৃথক জনগোষ্ঠীরূপে চিহ্নিত হতে থাকবে; দেশপ্রেমের গর্ব ও অগ্রগতির সংকল্প যোগাবে তাঁদের মিলনের অনুপ্রেরণা। বিভিন্ন সংস্কৃতি, ভাষা ও জীবনধারার প্রতি পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং অবাধ ও উদার মেলামেশার মধ্য দিয়েই এমন আদর্শ সৌভ্রাতৃত্ব অর্জন সম্ভব। এই পরিপ্রেক্ষিতেই জাতীয় সংহতি বনাম মিজোদের প্রশ্ন পর্যালোচিত হতে পারে।

ব্রিটিশ শাসনের শুরু থেকেই প্রশাসন কৌশল হিসেবে পাহাড়ী অধিবাসীদের অবশিষ্ট দেশবাসী থেকে পৃথক করে রাখা হয়েছিল। একথা সবাই জানেন যে, এইসব উপজাতীয় সমাজ ভাষা, সংস্কৃতি ও জীবনধারার দিক থেকে সম্পূর্ণ পৃথক সত্তা বজায় রেখে চলেছেন। গ্রাম ভিত্তিক উপজাতীয় সমাজগুলো মানব সমাজের স্বয়ংসম্পূর্ণ শাখা হিসেবেই চিহ্নিত হয়ে আসছেন এবং জীবনধারণের অত্যন্ত দুরবস্থা

সত্ত্বেও, অধিবাসীরা তথাকথিত বড় বড় সভ্য সমাজ থেকে দূরে অবস্থান করেও জীবনের পূর্ণ স্বাদ উপভোগ করে আসছেন। এমন কি, স্বাধীনতার পরও, উপজাতীয় অধিবাসীদের, তাঁদের নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী নিজেদের উন্নতি সাধন করতে দেওয়ার নীতি অনুসৃত হয়ে আসছিল। এবং ষষ্ঠ তফসিলের সাংবিধানিক কাঠামোর চৌহদ্দির মধ্যে তাঁদের সীমিত স্বায়ত্ত শাসন দান করা হয়।

শিক্ষা ও সমাজ-সংস্কারের বর্তিকা নিয়ে খ্রীস্টান মিশনারীরা এই বিচ্ছিন্ন অঞ্চলে প্রবেশ করেন। সংস্কৃত ভাষার কোন প্রভাব এখানে লক্ষ্য করা যায় না। ফলে আজ আমরা এখানে যাঁদের দেখতে পাচ্ছি, তাঁরা পাশ্চাত্য ভাবধারা প্রভাবিত খ্রিস্টধর্মাবলম্বী এমন এক উপজাতি-গোষ্ঠী যাঁরা নিজস্ব বিশেষ জীবনধারায় স্বাধীনতা ও জীবনের পরিপূর্ণ স্বাদ উপভোগ করছেন। ইতিহাসের কোন এক অধ্যায়ে নরমুণ্ড-শিকারী সুদূর অঞ্চলের এই সম্প্রদায় বাসভূমির প্রচণ্ড রুক্ষতা এবং ১৯৬৬ সালের অভ্যুত্থানের সময়ে ও পরে নির্যাতন-জর্জরিত দুঃস্বপ্নময় দিনগুলি কাটান সত্ত্বেও আজ পুরোপুরি শ্রেণীহীন ও বর্ণভেদহীন এক প্রশংসা-ভাজন গোষ্ঠীর মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত। এই মিজোদের মধ্যেই কেবল "ত্‌ল্‌মন্‌গাইঃনা" নামে এক অনুপম প্রথা বর্তমান। এ প্রথার মর্ম—পরার্থে স্বার্থ বিসর্জন। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান বর্জিত এ ব্রত আত্মত্যাগের গৌরবে অনুপ্রাণিত। আত্মদানের গৌরব ও সন্তোষের প্রেরণায় প্রচলিত এ প্রথা সহযোগিতা ও সহানুভূতি থেকে অনেক উচ্চতর—জীবন-প্রাচুর্যের প্রথা বলে কীর্তিত।

নূতন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল রূপে মিজোরামের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বিচ্ছিন্নতার পর্দা আনুষ্ঠানিকভাবে অপসারিত হয়েছে বলা যেতে পারে এবং মিজো ও ভারতের অন্যান্য অধিবাসীর মধ্যে ভাব-সংহতি সাধনে উৎসাহদানের প্রচেষ্টা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারে সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত হওয়ার এটাই উপযুক্ত সময়। কিন্তু যে অর্থে ভারতীয়করণ বলা হয়ে থাকে, কোন অবস্থায়ই যেন সে অর্থে

তাঁদের 'ভারতীয় করণের' চেষ্টা যেন না করা হয়। মিজোরা নাগা বা অন্য যে কোন উপজাতীয় অধিবাসীদের মতই ভারতীয়। তাঁদের উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সামাজিক মূল্যবোধ বর্তমান। কাজেই হিন্দু বা মুসলমান মূল্যবোধ দূরের কথা, তাঁদের মধ্যে উৎকর্ষের মাত্রামাফিক কোন মূল্যবোধ প্রবর্তনের চেষ্টা করা ঠিক হবে না খ্রিস্টধর্ম মিজো মূল্যবোধকে গ্রাস করেছে কিনা, বা উভয়ের মিশ্রণে সংশ্লেষিত কোন মূল্যবোধ বর্তমান মিজো সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিনা, সে কথা বলাও শক্ত। ভারতের বহু বিরাট ও প্রাচীন সমাজের তুলনায় এ সমাজে অন্যায় আচরণের সংখ্যা খুবই কম।

নয়া ব্যবস্থায় অবশিষ্ট দেশবাসীর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত হয়ে সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যাভিমুখী নূতন কল্যাণ রাষ্ট্র গঠনের কাজে মিজোদের আত্মনিয়োগ করা বাঞ্ছনীয়। মিজো সমাজনীতিতে ঐতিহ্যগতভাবে জীবনের পরম কল্যাণরূপে অন্তর্নিহিত সমাজতন্ত্রের প্রতিও অন্যান্য ভারতীয়দের শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের শিক্ষা গ্রহণ করা কর্তব্য।

মিজোদের মধ্যে "বাই" বলে একটি কথা প্রচলিত আছে। কথাটির অর্থ হল, বহিরাগত বা মিজো নয় এমন ব্যক্তি। এ পর্যন্ত তিন রকম "বাই" এদেশে এসেছেন—এঁরা হলেন প্রশাসক, ব্যবসায়ী ও নিরাপত্তা বাহিনীর লোকজন। প্রশাসকদের অনেকেই আমলাতন্ত্র সুলভ তালিম নিয়ে এখানে এসেছেন, নিজ নিজ সুরক্ষিত নিবাসে বাস করেছেন ও প্রশাসনের নিত্যকর্ম বজায় রাখা ছাড়া কদাচিৎ কোন কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখতে সমর্থ হয়েছেন। নিছক বাণিজ্যস্বার্থপ্রণোদিত ব্যবসায়ীরা এখানে তাঁদের প্রতিটি মুহূর্ত ব্যয় করেছেন নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের প্রয়োজনে এবং বারে বারে শোষণ চালিয়েছেন সরল উপজাতি জনসাধারণের উপর। ১৯৬৬ সালের বিদ্রোহও পরবর্তী কালে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে নিরাপত্তা বাহিনীকে এই গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে পাঠান হয়। বলপ্রয়োগের বাড়াবাড়ির কথা ছেড়ে দিলেও, সুস্পষ্ট

কারণেই তাঁদের অবস্থিতি মিজোদের :কাছে সাধারণভাবে সুখকর নয়। মিজোরা "বাই"দের সন্দেহের চোখে দেখে থাকেন, এটাই সামগ্রিক চিত্র হলেও, যাঁরা মিজোদের জানেন, তাঁদের বেদনা ও আনন্দের যাঁরা শরিক, তাঁরা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে, মিজোরা ব্যক্তিমানুষ হিসেবে "বাইদের" তেমন ঘৃণা করেন না। অবশ্য অতীত অভিজ্ঞতার কালো ছায়া আজও মিজো মনের উপর বিরাট প্রভাব বিস্তার করে রয়েছে।

আসাম সরকারের প্রশাসন আমলে জাতীয় সংহতি সাধনের স্বার্থে যতটুকুই করা হয়েছে বা করার চেষ্টা হয়েছে, সেটুকু সবই হয় কৃত্রিম নয়তো হাঙ্গামা ও সন্দেহের পরিবেশে সে সময় তা জনমানস স্পর্শ করতে পারেনি। মিজো মাত্রই কৌতুকপ্রিয় ও বিশ্বাস-প্রবণ সরল জীবনযাত্রায় বিশ্বাসী। কোন "বাই" খোলা মন নিয়ে এঁদের অঙ্গনে প্রবেশ করতে পারলে, মিজো সমাজ স্বাভাবিকভাবেই তাঁকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবেন এবং আপন কৃষ্টি ও অনুভূতির সম্পদ তিনি তাঁর মিজো বন্ধুর সঙ্গে উপভোগ করবেন। এরূপ প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই ব্যক্তি ও সমষ্টিগত ভাবে এঁরা পরস্পারের ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে পারবেন। সাংস্কৃতিক বিনিময়ের মাধ্যমে একে অপরকে বুঝতে পারবেন এবং এভাবেই ভাব-সংহতির প্রক্রিয়া কার্যকর হবে। এ ধরনের দৃষ্টান্তের অভাব নেই এবং এরূপ দৃষ্টিভঙ্গিতে চালিত হলেই জাতীয় সংহতির যে কোন পরিকল্পনাই এখানে ফলপ্রসূ হবে। মিজোরা নাচ, গান প্রভৃতি আত্ম-প্রকাশ ও বিনিময়ের শৈল্পিক মাধ্যম ভালবাসে। ঐসব মাধ্যমভিত্তিক এক সুপরিকল্পিত কর্মসূচী অভাবনীয় সাফল্য লাভ করতে সক্ষম হবে এবং মিজো ও "বাইদের" মধ্যেকার কৃত্রিম ব্যবধান টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়বে।

দেশের অন্যান্য অংশের মত এখানেও দলবাজি সংহতির এক প্রত্যক্ষ বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। শত্রুতার আশঙ্কা তো রয়েছেই

এবং "বাই" বিরোধী মনোভাব রাজনৈতিক স্বার্থান্বেষীদের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়, তারা ঐ মনোভাবকে মূলধন করে জনগণকে বিপথে চালিত করে। মজার কথা হল, শিক্ষিত মিজোদের মধ্যে কেউ কেউ ভদ্রতার মুখোসের আড়ালে, এ ব্যাপারে সাধারণ মানুষের চেয়েও বেশী গূঢ়ৈষায় ভোগেন। শিক্ষা বা বৃত্তি-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানে "বাইদের" সঙ্গে কাজ করবার সময় তাঁদের প্রতি "বাই" সহকর্মীদের আচরণই হয়ত এর কারণ। তবে সেটাই সব নয়। বাইরের ও ভিতরের প্রতিক্রিয়াশীল দালালরা পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়েছে এবং এভাবেই ১৯৬১ সালে দুর্ভিক্ষত্রাণের উদ্দেশ্যে তৈরী মিজো জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে সাহসী হয়েছিল। উৎকট মতান্ধতা এমন এক অদ্ভুত বিশ্বাস পোষণে প্ররোচিত করেছে যে, শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরোধী যে কোন কাজই বীরোচিত এবং, এখনও, সমাজবিরোধীরা এহেন পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে থাকে।

"বাই-বিরোধী" মনোভাব গড়ে তোলার জন্য অনেকে খ্রিস্টান মিশনারীদের উপর সরাসরি দোষারোপ করেছেন। তবে সেটা হয়ত সর্বথা সত্য নয়। মিজোরা ছক-বাঁধা ও চাপিয়ে-দেওয়া ব্যবস্থা পছন্দ করেন না। তথাপি আপাতবিরোধী সত্য হল, এক শতাব্দীরও কম সময়ের মধ্যে মোট জনসংখ্যার প্রায় সবটাই খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছেন। মিজো চেতনা ও মানবতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল বলেই মিশনারীরা সমাদৃত হয়ে এসেছেন। এই মিশনারীদের প্রচেষ্টায়ই মিজোরা ৫০ শতাংশ সাক্ষরতা অর্জনে সক্ষম হয়েছেন এবং কেরলের পরই এ হারের স্থান। এত অল্প সময়ের মধ্যে একটি বিদেশী ধর্মে গণ-ধর্মান্তরিতকরণ সম্ভব হওয়ায় এটাই প্রমাণিত হয় যে কল্যাণ সম্পর্কে মিজোদের মনে বিশ্বাস উৎপাদন করাতে পারলে তাঁরা নূতন ভাবাদর্শ গ্রহণে ব্যগ্র হয়ে পড়েন। ভাব-সংহতির সঙ্গে "সংস্কৃত ভাষার প্রভাব বিস্তার বা ভারতীয়করণের" কোন সম্পর্ক নেই। আমার

নিশ্চিত ধারণা, ভারতীয়দের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা সম্পাদন ও সারা দেশের উন্নয়নে অত্যাবশ্যক বলে একবার মিজোদের মনে বিশ্বাস জন্মাতে পারলে, তাঁরা সে ভাবাদর্শ গ্রহণ করবেন। সর্বোপরি, এখানকার শিক্ষা পদ্ধতিতেই প্রভূত সম্ভাবনা বিদ্যমান। আসলে, একাজে খাঁটি ও অকপট বন্ধুত্বের আবহাওয়ায় পরস্পরের অভিমতের যথোচিত বিচার ও উপলব্ধি প্রয়োজন। মিজোদের এমন অনেক গুণ আছে যেগুলো দেশের অন্যান্য অংশের অধিবাসীরা গ্রহণ করে লাভবান হতে পারেন; তেমনি মিজোরা জীবনের নূতন দৃষ্টি-ভঙ্গি ও পরিপ্রেক্ষিতের উন্নতি সাধন করে "জোরাম"কে ভারতের এক অনুপম সৌন্দর্য ও প্রাচুর্যের ভূমি রূপে গড়ে তুলতে পারেন।

বঙ্গানুবাদ: ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত

# সংস্কৃতি ও সংহতি

দক্ষিণারঞ্জন বসু

কলকাতায় পূর্বভারত সাংস্কৃতিক সম্মেলন হলো, এ খুবই আনন্দের কথা। সংস্কৃতি বিষয়ে যত আলোচনা হয়, যত মেলা-মিলনের আয়োজন হয়, ততই ভালো, কারণ তাতে জন-সাধারণের মধ্যে সাংস্কৃতিক চেতনার প্রসার ঘটবে এমন আশা করা যায়।

এ ধরনের সম্মেলনের পক্ষে কলকাতা সর্বাধিক যোগ্যস্থান নিঃসন্দেহে। কারণ কলকাতা যে শুধুমাত্র পূর্ব-ভারতেরই প্রাণকেন্দ্র তা নয়, এ এক আন্তর্জাতিক মহানগরী। সংস্কৃতি বিষয়টিও মূলতঃ আন্তর্জাতিক, অখণ্ড মানব সংস্কৃতিরই উত্তরাধিকারী আমরা। রবীন্দ্রনাথ সেজন্যই হীরকদ্যুতির সঙ্গে সংস্কৃতির তুলনা করেছেন। বাস্তবিকই আলোর রূপ যেমন সর্বত্র সমান, সংস্কৃতিরও তেমনি।

তবু সংস্কৃতি কী এক কথায় তার উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ সংস্কৃতির স্বরূপের মতো তার সংজ্ঞাও খুব ব্যাপক। প্রাজ্ঞজনেরা নানাভাবে এর ব্যাখ্যা করেছেন। সংস্কৃতির আলোচনায় গ্যয়টে সংস্কৃতিবান মানুষ সম্বন্ধে বলেছেন, এসব লোক প্রাত্যহিকতায় হারিয়ে যান না—তাঁদের চাওয়া-পাওয়া কয়েকটি স্থূল জিনিসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। তাঁরা পড়তে চান, জানতে চান এবং ভাবতে চান। গ্যয়টে আরো ক'টি বিষয়ের কথা বলেছেন যেগুলো সংস্কৃতিবান মানুষের কাম্য হওয়া উচিত বলে তাঁর ধারণা। তিনি মনে করেন, সংস্কৃতিবান ব্যক্তিকে প্রতিদিন একটু গান শুনতে হবে, অন্ততঃ একখানা ভালো ছবি দেখতে হবে, একটি কবিতা পড়তে হবে এবং সম্ভবমত কিছু যুক্তির কথা বলতে হবে। অর্থাৎ প্রত্যেক সাংস্কৃতিকচেতনাসম্পন্ন ব্যক্তিই সঙ্গীত, চিত্রকলা, কাব্য-সাহিত্যের অনুরাগী হবেন এবং যুক্তিবাদী হবেন, গ্যয়টে এমনি আশাই পোষণ করতেন।

এমার্সনের [illegible] এর মতো। [illegible]
করছে যেমন ভাষা, জ্যোতিষীদের ও আকাশ-বিজ্ঞানীদের কাছে যেমন দূরবীণ, সংস্কৃতিবান মানুষের কাছে সংস্কৃতিও তাই। তাঁর মনের শক্তি এর মধ্যে দিয়ে পূর্ণতার সন্ধান করে। এই পূর্ণতা লাভ সম্ভব সংহতির মাধ্যমেই এবং এই সংহতি সাধনই সংস্কৃতির সবচেয়ে বড়ো কাজ। এই সংহতির দিকেই ইংগিত রয়েছে সংস্কৃতি বিষয়ে টি. এস. এলিয়টের মন্তব্যে। সংস্কৃতি বলতে এলিয়ট বোঝেন, সমাজের তথা মানবসমাজের সংস্কৃতি, ব্যক্তির নয়। ব্যক্তিকে নিয়েই সমাজ গড়ে ওঠে ঠিকই, তবু রবীন্দ্রনাথ বলতে শুধু বাঙলাদেশ বুঝতে তিনি গররাজী। কারণ সর্ব দিক থেকে যিনি সংস্কৃতির দ্যুতিতে আলোকিত সেই রবীন্দ্রনাথ বাঙালী বলে কেবলমাত্র বাঙলারই প্রতিনিধি হবেন—তা হতে পারে না, তাঁর মতো মানুষ বিশ্বসংস্কৃতির প্রতীক।

সংস্কৃতির প্রশ্ন সামনে রেখেই আমরা এ সংস্কৃতি সম্মেলনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা নিয়ে সফল আলোচনা করতে পারি। অস্বীকার করার উপায় নেই যে, কম-বেশি পার্থক্য আছে দেশে দেশে, মানুষে মানুষে, তাদের আচার আচরণে, বিশ্বাস এবং ধারণায়। তাকে সংস্কৃতির বৈচিত্র্য বলা চলে। এ বৈচিত্র্য থাকবেই যেমন থাকে ফুলে। সব ফুলই গাছের সংস্কৃতি, কিন্তু সব ফুল এক রকমের নয়। ফুলে ফুলে নানা বর্ণ, পৃথক পৃথক গন্ধ, নানা রকমের স্বাদ। তারই মধ্যে ঐক্যের তথা সংহতি ও সৌন্দর্যের সন্ধান পাই আমরা মনোরম এক একটি ফুল বাগানে। আমাদের এই পৃথিবীও তেমনি একটি সাংস্কৃতিক পুষ্পোদ্যান।

তবে যন্ত্রযুগের মহিমায় পৃথিবীর নানা প্রান্ত আজ আমাদের যত কাছে বলেই মনে হোক, এ বিশ্ব বিশাল। প্রকৃত সাংস্কৃতিক চেতনা থেকে যদিও ভারতীয় পূর্বাচার্যগণ 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' ঘোষণার মাধ্যমে আমাদের চিন্তায় বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ আরোপ করে গেছেন,

যদিও আমাদের সকল কাজকে 'জগদ্ধিতায়' বলে অর্পণের নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন, তবু স্বদেশের কথাই প্রথম ভাবতে হবে আমাদের, বিশেষ করে নিকট প্রতিবেশীদের সঙ্গে গভীরভাবে জানাজানি করে নিতে হবে। অনন্ত মনুষ্যসমুদ্রে সীমাহীন এই জীবনের কলসিকে কানায় কানায় সুন্দর করে ভরে তোলাই সংস্কৃতির কাজ। সে কাজ সমুদ্রের তীর থেকেই শুরু করতে হবে। সেদিক থেকে পূর্বভারতীয় এই সাংস্কৃতিক সম্মেলনের পরিকল্পনা সমর্থনীয় এবং সংশ্লিষ্ট সকল মহলের সহযোগিতায় এ সম্মেলন সার্থক হলে তার কিছু সুফল আশা করা যেতে পারে।

মানুষ সামাজিক জীব। তার ধ্যান-ধারণা যেমন সমাজ সংসর্গে গঠিত তেমনি সমাজের সে অন্যতম ক্রিয়াশীল শক্তি—পরিবর্তনের অন্যতম সিংহদ্বার। কোনো মতাদর্শ মানেই মানুষের যৌথ জীবনাচারের বিশ্বাস-বেদ। এর প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি কথা সমাজের ভাষা থেকেই আহরিত। কোনো মতাদর্শের পক্ষে যতখানি সমর্থন সমাজ-পরিবেশে পাওয়া যাবে, ততখানিই তার সাফল্যের সম্ভাবনা। এই পরিবেশ— এই মানসিক ভিত্তিভূমির অনেকখানিই ব্যক্তি-মানুষের রচনা। সে নিজে সমগ্রের সন্তান। কিন্তু সেই সমগ্রকে একক ভাবে প্রভাবিত করার শক্তি তেমন বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির মধ্যেই নিহিত। এমন ব্যক্তিগত কৃতিত্বের প্রতীক আমাদের দেশে রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ বা গান্ধীজীকে বলা চলে। সাংস্কৃতিক বোধ থেকেই এঁদের প্রত্যেকে আমাদের আহ্বান জানিয়েছেন সংস্কারমুক্ত হয়ে সংহতি ও সমন্বয়ের পথে অগ্রসর হতে।

সংস্কৃতির ইতিহাস দলবদ্ধ কৃতিত্বেরই ইতিহাস। ইয়োরোপের রেনেশাঁ থেকে শুরু করে আমাদের দেশে ঊনবিংশ শতকের নব-জাগরণ সেই কৃতিত্বেরই কাহিনী। যাদের আমরা বুদ্ধিজীবী বলি, সেই সংস্কৃতিমনা মানুষগুলিই আমাদের সাংস্কৃতিক জয়যাত্রায় এক-একজন রথী-সারথী। এমনি একজন মহারথীর সন্ধান পেয়েছিলাম

আমরা রাজা রামমোহনের মধ্যে যাঁর প্রবর্তিত ব্রাহ্মধর্ম একসময়ে গোটা পূর্ব ভারতকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। মুক্তবুদ্ধি রামমোহনের সতীদাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংস্কৃতিবোধজাত। কারণ এর পিছনে কাজ করেছে সাংস্কৃতিক যুক্তিবাদ ও ব্যক্তিমূল্যের স্বীকৃতি। ঈশ্বরচন্দ্রের বিধবা বিবাহ আন্দোলনের পিছনেও ঐ একই বিচারবোধ কাজ করেছিল।

সমগ্রভাবে মানব সমাজের সুন্দর সফল বিকাশ সাধনই সংস্কৃতির অন্তিম লক্ষ্য। কিন্তু সমগ্র সামাজিক চেতনা ভিন্ন সংস্কৃতির সম্যক স্ফূর্তি অসম্ভব। এই চেতনার পরশপাথর বুদ্ধিজীবীশ্রেণী যাদের ওপর দায়িত্ব রয়েছে শিল্প সাহিত্য রচনার, বিচার-বিবেচনার এবং তুলনা-আলোচনার। বুদ্ধিজীবী বা ইন্‌টেলেকচুয়াল কথাটার বিস্তৃতি ঘটেছে সোভিয়েত দেশ থেকে যেখানে নতুন সভ্যতার বিকাশে শিল্পী-সাহিত্যিক ও শ্রমিক সবার যোগ আছে। সাহিত্য চারুকলা দর্শন বিজ্ঞান সেখানে সমাজতন্ত্রের সেবায় নিযুক্ত। কোনো মতবাদ যদি গ্রহণ করতেই হয়, তবে তা হবে পূর্ণতর জীবনের মন্ত্র। সে মন্ত্র প্রকৃতপক্ষে সাংস্কৃতিক উপলব্ধির ওপর নির্ভরশীল।

অসুবিধা এই, কেউ কেউ মনে করেন সংস্কৃতি মানে বিদ্যা অর্থাৎ বিদ্বান ব্যক্তিমাত্রই সংস্কৃতিবান। আবার অনেকের মতে সংস্কৃতি মানে আভিজাত্য। সাধারণ অর্থে সংস্কৃতি বলতে বুঝায় শিল্প-সাহিত্য, আর একেবারে 'গণ' অর্থে সংস্কৃতির পরিচয় এসে দাঁড়িয়েছে শুধু নাচ-গানে। এই খণ্ডিত অনুভূতি ও আংশিক উপলব্ধির সঙ্গে কেবল-মাত্র বোধহয় 'অন্ধের হস্তীদর্শনে'র সঙ্গেই তুলনা চলতে পারে। শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীত-দর্শন ইত্যাদি সংস্কৃতির এক একটি লক্ষণ বা অংশমাত্র। হাতীর পা বা মাথাকে যেমন হাতী বললে ভুল করা হবে, ঠিক তেমনি সংস্কৃতির কোনো বিশেষ একটি লক্ষণ বা অংশকে সংস্কৃতি বলা হলে একই রকমের ভুল হবে।

সংস্কৃতির বিবিধ লক্ষণই সভ্যতার এক একটি বাহন। উপমা

হিসেবে বলা যায়, সংস্কৃতি হলো সূর্যের আলো, আর তারই দ্যুতিতে উজ্জ্বল গ্রহ-উপগ্রহের মতো চতুর্দিকে অবস্থিত রয়েছে সভ্যতার নানা বাহন—সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, চিত্রকলা, নৃত্য-গীত-অভিনয় এবং যাবতীয় চারু ও কারুশিল্প। অন্ধকার আকাশে চাঁদের আলোয় মুগ্ধ হয়ে আমরা যদি সকল আলোর আকর সূর্যকে ভুলে যাই, তাহলে যে-ভুল করা হবে ঠিক সেরূপ ভুলই আমরা করে থাকি নৃত্য-গীতাদির সরস ঔজ্জ্বল্যের বিভ্রান্তিতে সভ্যতার মূল উৎস সংস্কৃতিকে বিস্মৃত হয়ে। সংস্কৃতির বিকৃত অর্থের ব্যাপকতার ফলেই এ যুগে সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্কহীন অন্তঃসারশূন্য শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীত ইত্যাদি কলাবিস্তার দিগন্ত বিস্তৃত প্রসার সম্ভব হয়েছে।

অথচ সুস্থ শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীতাদি যুগ যুগ ধরে দেশে দেশে যোগাযোগ ও সমন্বয়ের কাজ করে চলেছে। সে জন্যেই অন্ধকার আফ্রিকায়ও 'কবিতার নন্দনকানন'-এর সন্ধান পাই আমরা, পল রবসনের মতো নিগ্রোদের গান আমাদের বিমোহিত করে, পিকাসো বা গঁগার চিত্রকলায় আমরা মুগ্ধ হই এবং যত পুরণো কালেরই হোক না কেন কালিদাস-সেকস্‌পীয়ার প্রমুখ মহাকবিদের সৃষ্টি বিশ্বের শাশ্বত সম্পদ আছে। এ ভাবেই বিশ্বসংস্কৃতির রূপ ক্রমশঃই বিশ্বমানবের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

সংস্কৃতি আসলে মানুষের নিঃস্বার্থ বিকাশোন্মুখতা। জৈবিক জীবনের উর্ধ্বে আরো একটি স্বতন্ত্র জীবন আছে, এ সত্য যেদিন মানুষ উপলব্ধি করেছে, সেইদিনই সংস্কৃতির অরুণোদয় ঘটেছে পৃথিবীতে। মানুষ যে ক্রমে ক্রমে বিকৃতির বিপদ অনুধাবন করে তার সমস্ত পশুবৃত্তিকে সংযত করে সত্যকারের 'মানুষ' হয়ে উঠছে, তা হচ্ছে তার সংস্কৃতিবোধের প্রেরণায়, তার সংস্কৃতি সাধনায়। মানুষের মনের সব অন্ধকার দূর হয়ে চলেছে ধীরে ধীরে সংস্কৃতির প্রোজ্জ্বল আলোয়।

তাইতো একালের মানুষ আবার প্রাচীন ভারত-ঋষির বাণী

'স্বদেশঃ ভুবনত্রয়ম্'-এর মতো এক বিশ্বের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে এবং সে পথে তার পদক্ষেপও লক্ষণীয়। আজকের রাষ্ট্রসঙ্ঘ সেই এক বিশ্বপরিবারের স্বপ্নেরই প্রতীক। এ স্বপ্ন সাংস্কৃতিক বোধজাত এবং যতদিন না এ স্বপ্ন সত্যে রূপায়িত হয়, ততদিন এ লক্ষ্য পূরণের চেষ্টা চলতেই থাকবে।

তা যদি সম্ভব হয়, তাহলে এক সুসংহত ভারতকে আমরা সম্ভব করে তুলবো না কেন? তারই আন্তরিক প্রয়াস লক্ষ্য করা যাচ্ছে পূর্ব ভারত সাংস্কৃতিক সম্মেলনে। পূবের সূর্যোদয়ের সঙ্গে এই সংহতি সমাবেশ তুলনীয়। এই সাংস্কৃতিক মিলন সারা ভারতকে সুসংহত হতে উদ্বুদ্ধ করবে।

একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, উত্তরে নগাধিরাজ হিমালয় ও দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর বেষ্টিত এবং মূলতঃ গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র বিধৌত বিহার-বঙ্গ-ওড়িশা-আসাম এলাকা শুধুমাত্র ভৌগোলিক নৈকট্যে নয়, ইতিহাস এবং সংস্কৃতির ভিত্তিতে এই অঞ্চলের রাজ্যগুলি অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠতায় আবদ্ধ। আমরা জানি, দুই মহান সংস্কৃতি-নায়ক বাঙলার চৈতন্য মহাপ্রভু ও আসামের শঙ্করদেব একই সময়ে প্রায় পাঁচ শ' বছর আগে প্রেমধর্মে মাতিয়ে তুলেছিলেন গোটা পূর্ব ভারতকে। মহাপ্রভু আবির্ভূত হয়েছিলেন বাঙলার নবদ্বীপে এবং তিনি লীন হয়েছিলেন ওড়িশার জগন্নাথধাম নীলাচলে, পূর্ব ভারতের এই দুই অংশকে প্রেম-বন্ধনে বিধৃত করে। মহাতীর্থ কামাখ্যা আসামে অবস্থিত হলেও বাঙালী পুণ্যার্থীদের ভীড়ই সেখানে বেশি, এবং সেখানকার পূজারীরাও সব বাঙালী। পরম বৈষ্ণব মণিপুরীদের কাছে নবদ্বীপের আকর্ষণ অপরিসীম। আমরা আরো জানি, আরেক মহান নায়ক যিনি জন্মেছিলেন আড়াই হাজার বছর আগে বিহার-প্রান্তে এবং যাঁর সাধন-সিদ্ধি ও অন্তঃলীলাস্থানও বিহার রাজ্যে, সেই গৌতম বুদ্ধের বহু শিষ্য শুধু বিহারেই নয়, বাঙলা, আসাম, ত্রিপুরা ও পূর্ব ভারতের অন্যান্য স্থানেও ছড়িয়ে রয়েছেন এবং বুদ্ধের 'সঙ্ঘং শরণম্ গচ্ছামি' মন্ত্র আজও

প্রচার করে চলেছেন। সঙ্ঘ মানেই সংহতি এবং সংস্কৃতির প্রকৃত বিকাশই সুস্থ সংহতির মধ্যে। পিতৃপুরুষের উদ্দেশে পিণ্ডদানে বিহারের গয়াতীর্থে সারা ভারতের মানুষ এসে থাকে, তাহলেও পূর্ব ভারতীয় রাজ্যগুলির লোক সমাগমই সেখানে ঘটে থাকে সর্বাধিক। সিদ্ধার্থের সিদ্ধিলাভ তথা বোধিলাভের স্থান বুদ্ধগয়া, বিহারের আরেকটি তীর্থক্ষেত্র যেখানে হিন্দু-বৌদ্ধ নির্বিশেষে সবাই আকৃষ্ট হয়ে থাকে। বাঙালী হয়েও মহাপণ্ডিত শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপঙ্কর বিক্রমশীলা মহা-বিহারের অধ্যক্ষপদে এবং পণ্ডিত শীলভদ্র নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হয়ে পূর্ব ভারতে তো বটেই সমগ্র ভারত ও ভারতের বাইরের বিদ্বৎসমাজকে বাঙালী মনীষার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলেন।

এ সব বহুকাল আগের কথা। পরবর্তী কালে একদা, সম্মিলিত বঙ্গ-বিহার-ওড়িশা শাসন কার্যের সুবিধার জন্যে পৃথক পৃথক প্রদেশ বা রাজ্যে রূপান্তরিত হলেও পারস্পরিক সহযোগিতার অসংখ্য স্মৃতি আমাদের মনোগত মূল ঐক্যকে স্মরণ করিয়ে দেয়। বেদে বাধা সমগ্র ভারত রামায়ণ-মহাভারত-গীতা ইত্যাদি পৌরাণিক গ্রন্থাদি থেকে সংস্কৃতির আলো আহরণ করে হাজার হাজার বছর ধরে এগিয়ে চলেছে। এককালে সংস্কৃত ভাষাই ছিল সারা দেশের প্রধান ঐক্যসূত্র। সে ভাষাতেই চলতো সমস্ত সাহিত্য সংস্কৃতির কর্মকাণ্ড। পরে ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় প্রাচীন রামায়ণ-মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ অনুদিত হতে থাকে এবং তার ফলে দেশের সর্বত্র জনসাধারণের মধ্যে সাংস্কৃতিক উচ্চাদর্শ সহজে ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ পায়। দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে প্রায় এক শতাব্দীর মধ্যেই তুলসীদাসের হিন্দী রামায়ণ রামচরিত মানস ও কৃত্তিবাসের বাংলা রামায়ণ এবং কাশীরাম দাসের বাংলা মহাভারত ও সারলা দাসের ওড়িয়া মহাভারত চারশ' থেকে পাঁচ শ' বছর আগে প্রকাশিত হয়েছিল বলেই এই দীর্ঘকাল ধরে পূর্বাঞ্চলের ঘরে ঘরে আমরা মাতৃভাষায় রামায়ণ-মহাভারতের পাঠ

শুনে এসেছি। বলরাম দাস কৃত ওড়িয়া ভাষার রামায়ণও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য।

বিংশ শতাব্দীতেও আমরা লক্ষ্য করেছি ত্রিপুরা রাজ্যের ত্রিপুরী মহারাজারা রবীন্দ্রনাথকে এবং তাঁর সাহিত্যের মাধ্যম বাংলা ভাষাকে সম্মানিত করে কীরূপ গৌরব অনুভব করতেন। ত্রিপুরার সরকারী ভাষাইতো বাংলা। অসমীয়া সাহিত্যের গৌরবময় 'জোনাকি' যুগের কুঁড়ি ফুটেছিল এই কলকাতায় এবং বাঙালী অন্নদাশঙ্কর রায় ও শরৎ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি ওড়িয়া ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি করে দুই প্রতিবেশী রাজ্যের মৈত্রী বন্ধনকে দৃঢ়তর করেছেন। দ্বারবঙ্গের মৈথিলী কবি বিদ্যাপতিকে তো আমরা বাঙালী কবি বলেই মনে করি। আরো বড়ো কথা, পৃথক পৃথক ভাষা গোষ্ঠী হলেও প্রায় প্রত্যেকের কাছেই পূর্বাঞ্চলীয় এক একটি ভাষা কমবেশি বোধগম্য। সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের পক্ষে এ খুবই সহায়ক।

মনোবিকারের ফলে দীর্ঘকাল আমরা কুসংস্কারের বেড়ি পরে দিনাতিপাত করেছি। বিদেশ যাত্রা নিষিদ্ধ ছিল আমাদের কাছে। মায়ের নিষেধের কাছে মাথা নুইয়েছিলেন মাতৃভক্ত স্যার আশুতোষ, তিনি বিলেত যান নি তখনকার ইংরেজ গভর্ণরের অনুরোধ সত্ত্বেও। এ মাতৃভক্তির যত বড় দৃষ্টান্তই হোক না কেন, আজ কোনো ভারতীয় মা ছেলের বিদেশযাত্রার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবেন, এ কি কল্পনা করা যায়? এমনি করেই সংস্কৃতি-বোধের চাপে একে একে অনেক বেড়া, অনেক বাধাকেই অপসারণ করে মিলনের ও মৈত্রীর পরিধিকে ক্রমশঃই আমরা বাড়িয়ে চলেছি। গোটা ভারত থেকে দৃষ্টান্তের উদ্ধৃতি না দিয়ে শুধু এই পূর্বাঞ্চলেরই দুটি চিত্র এখানে তুলে ধরা যেতে পারে। আসামের মহান কবি স্বর্গত বেজ বরুয়া জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির জামাতা হয়ে যেমন বাঙালী, অসমীয়া সম্পর্ককে মধুরতর করে তেমনি বঙ্গকন্যা কবি সুখলতাও ওড়িশার গৃহবধূ হয়ে পূর্বাঞ্চলে সংহতির ক্ষেত্রকে সম্প্রসারণের সুযোগ করে দিয়ে গেছেন।

এমনি করেই পূর্ব ভারতের সাংস্কৃতিক ঐক্যসূত্রের এবং সহ-যোগিতার অনেক বিষয়ই উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু এখানে আর বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ নেই। আমাদের বিবিধ লোক উৎসব, লোকশিল্প ও লোকসঙ্গীতের ধরনও প্রায় একই রকম। আদিবাসী উপজাতির লোকদের মতো সমস্ত বহিরাগত জাতি-ধর্মের মানুষরাও ভারতীয় মূল জনগোষ্ঠীর সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। 'শক-হূণ দল পাঠান-মোগল এক দেহে হলো লীন।' সাংস্কৃতিক সংহতির এইতো লক্ষণ। বিকৃতির ছোঁয়ায় মাঝে মাঝে সাময়িক বিরোধ আমাদের মধ্যে দেখা দিয়েছে সত্য, কিন্তু কোনো বিকৃতিই কোনোকালে সংস্কৃতির জয়যাত্রাকে স্তব্ধ করতে পারেনি, কোনো দিন পারবেও না। আমাদের কবি বলেছেন—

'নানা ভাষা নানা বেশ নানা পরিধান
বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান।'

সেই মিলনকেই পরিপূর্ণভাবে সার্থক করার জন্যে আমরা নতুন উদ্যোগ নিয়েছি। বিবাদ-বিসম্বাদের বিকৃতবোধ যেন আমাদের বৃহত্তর কর্মসাধনাকে ব্যর্থ করে দিতে না পারে। পূর্ব ভারতের সংহতি সমগ্র ভারতের সংহতির সহায়ক হোক এবং দেশকালের সঙ্কীর্ণ সীমা মুছে গিয়ে সমন্বিত বিশ্ব মানব সংস্কৃতির বিশাল সর্ব সুন্দর রূপ ফুটে উঠুক, এই কামনা।

# স্বাধীনতার পরবর্তী কালে মনিপুরের সাংস্কৃতিক অগ্রগতি

অধ্যাপক ই. নীলকান্ত সিং

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা দেশে নতুন প্রেরণা সঞ্চার করেছে এবং জনসাধারণের মনে নতুন আশা ও প্রত্যাশাকে জাগিয়ে তুলেছে। কিন্তু রাজতন্ত্র থেকে মুক্তি, 'গ' শ্রেণীর রাজ্য গঠন, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে ১৯৭২ সালের ২১ জানুয়ারি তারিখে পৃথক পরিপূর্ণ রাজ্যগঠন না হওয়া পর্যন্ত মনিপুরের জনগণকে এই স্বাধীনতা অর্জনের জন্য স্বাধীনতার পরেও বিভিন্ন পর্যায়ে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এটি আলোকের মধ্যে দীর্ঘ পরিক্রমা, তা সত্ত্বেও, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আলো এবং আরো আলোর জন্য জনগণের কণ্ঠ সোচ্চার হবার মতো বৈ কি।

মনিপুরী নাচ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছে। এই প্রসঙ্গে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের নাম আমরা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছি। রবীন্দ্রনাথ মণিপুরী নাচের সৌন্দর্য আর সুষমাকে আবিষ্কার করেছিলেন, পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়েছিলেন এই নাচের। এছাড়াও গুরুদেব মহাভারতের যে চিত্রাঙ্গদা আখ্যানটিকে তাঁর নৃত্যনাট্যের মধ্যে দিয়ে অমর করে গেছেন সেই চিত্রাঙ্গদার কাহিনীও মনিপুরের পটভূমিকাতেই রচিত এবং এর মধ্যে দিয়ে সম্পূর্ণ সত্যের সৌন্দর্যকেই তুলে ধরা হয়েছে। উনবিংশ শতকে ভাগ্যচন্দ্রের রাজত্বকালে বাংলার মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের বৈষ্ণবধর্মকে মনিপুরে রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করা হয় এবং আক্ষরিক অর্থে বলতে গেলে এই ধর্ম শিল্পের দেশ মনিপুরে নবজন্ম লাভ করে। দর্শন নন্দনতত্ত্বের সঙ্গে মিলে গিয়ে সংকীর্তন ও রামলীলা নামে পরিচিত গীতিমালা ও নৃত্যাবলীর মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায়। বৈষ্ণবধর্ম দৃশ্য কাব্যে

পরিণত হয়। স্বাধীনতার সূর্যোদয়ের সঙ্গে মনিপুরী নৃত্য ও সংগীত বিশেষ স্বীকৃতি লাভ করে এবং তার প্রসার ঘটে সারা পৃথিবীতে।

আমার মতে ভারতের স্বাধীনতা মনিপুরী জনগণের মনে দুটি প্রবণতা এনেছে, একটি হল নিজ নিজ সাংস্কৃতিক সত্তা সম্পর্কে চেতনা গড়ে তোলার বিষয়ে, দ্বিতীয়টি ভারতীয় সাংস্কৃতির মূল প্রবাহের সঙ্গে যোগদানে উদ্বুদ্ধ হওয়ার। এই প্রথম, মনিপুরের পর্বত ও উপত্যকার অধিবাসীরা তাঁদের সংস্কৃতির মূল সম্পর্কে সচেতন হন ও সাংস্কৃতিক ঐক্যের জন্য প্রাণপণ প্রয়াসী হন। তাঁরা ভারতীয় এবং মনিপুরী এই বোধকে ভালভাবে বিচার করতে সক্ষম হন এবং ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইন্দো-মঙ্গোলীয় সভ্যতার অবদান যে অনেকখানি এই সত্য তাঁদের কাছে উদ্ঘাটিত হয়। এ থেকেই কেন্দ্রাতিগ ও কেন্দ্রানুগ শক্তির প্রকাশ ঘটে এবং আমার আন্তরিক বিশ্বাস এই যে, এই ধরনের আন্দোলন ও প্রবণতাগুলি ভারতীয় সংস্কৃতির সমৃদ্ধির কাজে নিশ্চিত ভাবে সুফল এনে দেবে। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যকে খুঁজে পাবার এটি একটি প্রক্রিয়া বলে মনে করা যেতে পারে। শুধুমাত্র ভারতীয় হওয়াই যথেষ্ট নয়, তবে অসমীয়া ভারতীয়, বাঙালী ভারতীয় কিংবা বিহারী ভারতীয় ইত্যাদি ধরনে মনিপুরী ভারতীয় হতে গেলে সেটা আরো অর্থপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায় এবং এটা যে কোন মনিপুরীর কাছে নিশ্চিতভাবে এক নতুন মর্যাদা ও স্বীকৃতি এনে দিয়েছে।

বৈচিত্র সম্পন্ন ভারতীয় সংস্কৃতিতে মনিপুরের অবদান রয়েছে প্রচুর। কিন্তু দিল্লীর সঙ্গে মনিপুরের দূরত্ব প্রচুর থাকায় মনিপুরের শিল্পী ও বিদ্বৎসমাজ এই সময় থেকে অবিরত চেষ্টা করছেন ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে মনিপুরের সাংস্কৃতিক পরিচয় ঘটাতে এবং জাতীয় স্তরে এই সাংস্কৃতির স্বীকৃতি লাভের জন্য প্রচেষ্টা চালাতে। সৌভাগ্যক্রমে মনিপুর এই সাংস্কৃতিক প্রচার ও সংস্কৃতি সংরক্ষণের কাজে বেশ কিছু খ্যাতিমান সুহৃদকে সঙ্গে পেয়েছে। এঁদের মধ্যে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীমতী ঠাকুর, উদয়শংকর, জাভেরি ভগিনীগণ, বম্বের সবিতা মেহতা, ত্রিবেণী কলাসঙ্গমের শ্রীসুন্দরী শ্রীধরণী—এঁরা বিশ্বের বিভিন্নদেশে মনিপুরের সাংস্কৃতিক দূতের কাজ করেছেন। ভারত সরকারের উদ্যোগে বিদেশে যে সব সাংস্কৃতিক দল প্রেরিত হয়েছে এঁদের প্রচেষ্টাকে তার সংযোজন হিসেবে গণ্য করা যায়। বছর কয়েক যাবৎ ভারতের সাধারণতন্ত্র দিবসের লোক নৃত্যানুষ্ঠান, মনিপুরের খ্যাতনামা জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি ও শিল্পীদের জন্য সংগীত নাটক আকাদেমির পুরস্কার, মনিপুরী নৃত্যশিল্পী ও গুণীদের 'পদ্মশ্রী' প্রদান সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মণিপুরের স্বীকৃতিকে দ্রুত বাড়িয়ে চলেছে।

মণিপুরী থিয়েটরের ক্ষেত্রেও এই স্বীকৃতি অর্জন এমনি ভাবেই সম্ভব হয়েছে। ১৯৫৫ সালে নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত প্রথম জাতীয় নাট্যোৎসবে মনিপুরী থিয়েটার লোক সংস্কৃতি বিভাগে প্রথম পুরস্কার লাভের গৌরব অর্জন করে। ৬০ বৎসর আগে বঙ্গরঙ্গমঞ্চের ঐতিহ্যে পরিপুষ্ট হয়ে আধুনিক মনিপুরী থিয়েটার বর্তমানে সোভিয়েত নাট্যকার গ্রোবস্কি এবং পশ্চিমবঙ্গের বাদল সরকারের 'অ্যাবসার্ড' নাটক ও ইনটিমেট নাটকের মত নাটক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছেন। নাটক বিষয়ে এই সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিশ্চিতই এক মূল্যবান ঐতিহ্য বহন করে চলেছে এবং নিঃসন্দেহে তাকে যে কোন একটি মানের দ্বারা পরিচালিত এক জোরালো আন্দোলন বলা যেতে পারে।

সাহিত্য ও ভাষার ক্ষেত্রে জনগণ এখনও পর্যন্ত ভারতীয় সংবিধানের অষ্টম তফসিলে অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন। মনিপুরী ভাষা নয়াদিল্লীতে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর পাঠক্রমের একটি বিষয় হিসেবে গণ্য, ১৯৭২ সাল থেকে ইম্ফলে তার একটি কেন্দ্র পরিচালনা করছেন 'সাহিত্য আকাদেমি'-এছাড়াও মনিপুরী ভাষার স্বীকৃতিলাভ এক নতুন চ্যালেঞ্জকে ডেকে এনেছে। সানন্দে জানাই, এই সেদিন মনিপুরী

ভাষায় একখানি উপন্যাস রচনা ক'রে ১৯৭৩ সালের সাহিত্য আকাদেমির পুরস্কার লাভ করেছেন মনিপুরের এক তরুণ ঔপন্যাসিক। এই সুযোগে সাহিত্য আকাদেমির সভাপতি ডঃ এস. কে. চট্টোপাধ্যায়কে আমাদের তরফ থেকে কৃতজ্ঞতা জানাই যাঁর আনুকূল্যে এই সমৃদ্ধ ভাষা এবং সাহিত্যের পক্ষে প্রাপ্য সম্মান অর্জন করা সম্ভব হয়েছে।

ঘরোয়া পরিবেশের দিকে মনোনিবেশ করলে দেখা যাবে ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসে স্থাপিত মনিপুর রাজ্য কলা আকাদেমি সাংস্কৃতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক নতুন নজীর হিসেবে গড়ে উঠেছে। এই আকাদেমি নয়াদিল্লীর তিনটি জাতীয় আকাদেমি–সংগীত, নাটক, সাহিত্য ও ললিতকলা আকাদেমির এক মিশ্র আঞ্চলিক রূপ এবং পূর্বভারতে এ জাতীয় উদ্যোগ এই প্রথম। এটি প্রধানতঃ জনগণের সাংস্কৃতিক পরিচয় আবিষ্কার ও এই সঙ্গে দেশের সাংস্কৃতিক ঐক্যের বিকাশ ও উন্নতিসাধনের উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয়েছে। নিরবচ্ছিন্ন আলোচনাচক্র, সম্মেলন, নৃত্যনাট্য ও ব্যালে; থিয়েটার ওয়ার্কশপ ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে আকাদেমি যে ভূমিকা গ্রহণ করেছে তা জনগণের আগ্রহ ও সাংস্কৃতিক চেতনাকে জাগ্রত করেছে। বর্তমানে আকাদেমি মনিপুরের প্রায় একশো পঞ্জীভুক্ত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে নৃত্য, সংগীত, নাটক, যাত্রা, ললিতকলা ইত্যাদি বিষয়ে সহায়ক অনুদান দিচ্ছেন। জাতীয় আকাদেমি বিবিধ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অধিকতর শিক্ষণ ও গবেষণার জন্য রাজ্য আকাদেমির পুরস্কার, স্কলারশিপ, ফেলোশিপ ইত্যাদি বিভিন্ন পুরস্কারদানের ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে। ১৯৭৪-৭৫ সাল থেকে শিল্পীদের বার্ধক্য ভাতা দানের ব্যবস্থা হচ্ছে। ফিল্ম এবং টেপ-রেকর্ডার মারফৎ আকাদেমি দলিল এবং জরীপের কাজ যথেষ্ট আগ্রহ সহকারে হাতে নিয়েছে। বলা বাহুল্য যে এই সব পরিকল্পই মনিপুরের শিল্পী, এবং বিদ্বৎজনের সত্য ও সৌন্দর্যের সাধনায় বিরাট প্রেরণা জুগিয়েছে। এই প্রেরণার অর্থ এ নয় যে, জনগণ এতেই পরিতুষ্ট। এখনও

অলিভার টুইষ্টের মতো আরও দাবীর জন্য তাঁদের কণ্ঠ সোচ্চার। কিন্তু সাংস্কৃতিক স্বীকৃতি সম্পর্কে তাঁদের বোধ গড়ে তোলা ও বিদগ্ধ ব্যক্তি ও শিল্পীদের প্রয়োজনমত সাহায্য দান এই অবস্থার কিছুটা সুরাহা করতে পারে। দেশের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নবজাগরণের পরিপ্রেক্ষিতে একথাটির অর্থ আরো ব্যাপক।

এটা নিছক সাংস্কৃতির পুনরুত্থান নয়। বিদগ্ধজন ও শিল্পীরা চান তাঁদের গবেষণা ও আবিষ্কারের সঙ্গে নতুন কিছুর সমন্বয় ঘটাতে। সামাজিক পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে সমকালীন মূল্যবোধ ও তাৎপর্যকে যোগ করার প্রচেষ্টা অনিবার্যভাবে রয়েছে। রাত্রিব্যাপী' 'রাসলীলা' অনুষ্ঠান আমাদের ঐতিহ্য সম্মত কিন্তু মাত্র ৩০ মিনিটে মঞ্চে নিখুঁত-ভাবে তা পরিবেশন এক দুরূহ সমস্যা বিশেষ। যাত্রার ঐতিহ্য এখনও খুব বেশি কিন্তু সমকালীন থিয়েটারের ভাষায় লোক ঐতিহ্যের নতুন সৌন্দর্য খুঁজে পেতে হ'লে মনিপুরের নাট্যকার ও নাট্য পরিচালকদের প্রচেষ্টার দিকে চাইতে হয়। মনিপুরী ক্লাসিকাল নাচ ও গানকেও বাদ দিলে চলবে না। কিন্তু ক্লাসিকাল ধারার নির্ভেজাল প্রেরণাটি আবিষ্কার করতে হ'লে আমাদের এক্ষেত্রে বিভিন্ন পণ্ডিত ও মনীষীদের প্রচেষ্টার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

মনিপুর উপত্যকায় এই সম্মিলিত প্রচেষ্টা ছাড়াও এখানে পার্বত্যাধিবাসীরা নিজ নিজ ঐতিহ্যকে জানা ও জনজীবনের সৌন্দর্য অনুসন্ধান করার ক্ষেত্রে এগুলি নিঃসন্দেহে যে চমৎকার সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে উপস্থাপন করেছে মনিপুর তারই প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠেছে।

বঙ্গানুবাদ : সুতপা চক্রবর্তী

# স্বাধীনতার পরে পূর্বাঞ্চলের সাংস্কৃতিক অগ্রগতি

অধ্যাপক আই. বি. ছেত্রী

ভারত প্রকৃতপক্ষে এমনই এক দেশ যা বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যকে উপস্থাপন করেছে। নানা জাতি, নানা ভাষা, নানা মতের বর্ণালী ছবিকে তুলে ধরেছে এই দেশ। এই সব বৈচিত্র্যই একটি অখণ্ডতাকে রূপদানের প্রয়াস করেছে—সেই অখণ্ড সত্তার নামই ভারত।

ভারত নামটি নিছক একটি রাজনৈতিক কিংবা ভৌগোলিক সত্তাকে প্রকাশ করে না—এ নাম তার চেয়ে বেশি ব্যঞ্জনাময়। সহিষ্ণুতা, চিরায়ত সমতাবোধ ও সহযোগিতার ওপরেই এর শক্তি নিহিত। দেশের প্রকৃত ঐক্য ইতিমধ্যে অনেকটা স্থাপিত হয়েছে এবং তা আরো হবে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সহযোগিতার মধ্যে দিয়ে—কোন রকম অসহযোগ অথবা জোর করে ঐক্যবোধকে ঘাড়ে চাপিয়ে তা সম্ভব হবে না।

ঐক্য এইভাবেই চিরকাল সংস্থাপিত হয়েছে। আমাদের দেশের পূর্বাঞ্চল বিভিন্ন মানবতা, ভাষা ও ধর্মীয় গোষ্ঠীর বর্ণাঢ্য ছবিকে তুলে ধরেছে। বাংলার উত্তর অঞ্চল থেকে দেশের একেবারে উত্তর-পূর্বাঞ্চল পর্যন্ত পর্বতাঞ্চলের ও আদিবাসী জনগণের আশা-আকাঙ্খা দেশবাসীর কাছে কতটা শ্রদ্ধা অর্জন করেছিল তা আমরা দেখেছি। ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের পর এই সব দেশবাসীর প্রতিভা বিকাশের জন্য শুধু যে বড় রকম সুযোগই দেওয়া হয়েছে তা নয়, আধুনিককালে পূর্বাঞ্চলে এইসব অধিবাসীর জীবনের দ্রুত উন্নতি বিধানের উদ্দেশ্যে যে ছোট ছোট রাজ্য গঠিত হয়েছে তা এক বিশেষ

তাৎপর্য লাভ করেছে। এইগুলি আমাদের দেশের সংহতির স্থায়িত্ব রচনার পথ অনেকটা সুগম করবে। প্রকৃতপক্ষে জাতীয় সংহতির এটাই হ'ল মূল কথা।

সম্প্রতি আমরা দেশের স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী পালন করেছি। স্বাধীনতা লাভের আগেও এইসব বিভিন্ন মানব গোষ্ঠী অথবা বিভিন্ন ভাষাভাষী গোষ্ঠীকে অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখা হ'ত এবং কোন রকম হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকেই তারা নিজস্ব পরিবেশে বড় হ'য়ে উঠত। বিদেশী শাসকরা বিভিন্ন আদিবাসী ও শাখার মধ্যে পার্থক্যকে জোরদার করার জন্য বিভেদ নীতি অনুসরণ করেছিলেন। কিন্তু আমাদের মত স্বাধীন জাতির পক্ষে উচিত হল এইসব বিভিন্ন গোষ্ঠীকে উৎসাহিত করার জন্য একটি বিশেষ নীতি অনুসরণ করা। এটা আরো করা উচিত এই উদ্দেশ্য নিয়ে—আমাদের দেশ বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যকে সাধন করেছে—বিভিন্ন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর মধ্যে এমন একটি সহিষ্ণু মনোভাব ও প্রেরণা সঞ্চার করে ভারতীয় জাতীয় জীবনের মূল প্রবাহে তাদের নিয়ে আসতে হবে। আমাদের জাতীয় সংহতির এটি ভিত্তি হওয়া উচিত। এইটি আমাদের ধারা—আমাদের ইতিহাসের নির্যাসও এই। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন—

'হেথায় আর্য হেথা অনার্য হেথায় দ্রাবিড় চীন,
শক হুন দল পাঠান মোগল এক দেহে হলো লীন।'

রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষকে অনেক বেশি চিনেছিলেন। তিনি স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করেছিলেন ভারতীয় জাতির মূলপ্রবাহের মধ্যে নানা সংস্কৃতি, নানা জাতি, নানা ভাষা, নানা মতের অবদান রয়েছে। আমার মনে হয়না 'এক দেহে হলো লীন' এ কথায় তিনি এই অর্থ বোঝাতে চেয়েছেন যে ঐক্য গড়ে তোলার জন্যই এই ধরনের বিবিধের মিশ্রণ আবশ্যক। ভারত ঠিক একটি সুন্দর বাগিচার মতো যেখানে হরেক ফুল হরেক বর্ণের। এই সব ফুলই বাগিচাকে আরো সুন্দর এবং অসাধারণ করে তুলেছে।

ভারতের পূর্বাঞ্চলের অধিকাংশ অধিবাসীই আদিবাসী। এদের আছে নিজস্ব সংস্কৃতি, ভাষা, সাহিত্য—কিন্তু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসীদের তুলনায় তারা অনগ্রসর ও অনুন্নত। ভারতীয় জনজীবনের মূল প্রবাহের সঙ্গে দুর্বার গতিতে মিলবার আকাঙ্খা নিয়ে বৃহত্তর ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার দিকে তারা মুখ ফিরিয়েছে। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এক বিশেষ শ্রেণীর জনগণের দিকে আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই—যে জনগণ ছড়িয়ে আছেন দেশের উত্তর অঞ্চলে বিশেষত উত্তর পূর্ব অঞ্চলে অত্যন্ত নিবিড় হয়ে। এই অঞ্চলের জনগণের নিজস্ব ভাষা এবং সাহিত্য অতি উন্নত। এদের ভারতীয় নেপালী বলে অভিহিত করা হয়। ভারতীয় সংবিধানের অষ্টম অনুচ্ছেদে এঁদের ভাষাকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য দাবী তুলেছেন এঁরাও—সরকারও এবিষয়ে সহানুভূতিপূর্ণ বিবেচনার আশ্বাস দিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের পর্বতাঞ্চলে নেপালীভাষা ইতিমধ্যে সরকারী ভাষার মর্যাদা পেয়েছে।

আমাদের দেশের সমতল অঞ্চলের বাসিন্দারা সাধারণত নেপালীদের বিদেশী বলেই জানে—নেপাল আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র এটাই এর কারণ। কিন্তু একটু গভীরভাবে খুঁটিয়ে দেখা হলে আমরা দেখতে পাব ভারতীয় ঐতিহ্যের বাতায়নে নেপালীরা বেশ একটি স্বতন্ত্র সত্তা গড়ে তুলেছে। বেশ কয়েকপুরুষ যাবৎ ভারতীয় নেপালীরা এদেশে বসবাস করছেন। তাঁরা এদেশের অবশিষ্ট জনজীবনের সঙ্গে ওঠা বসার জন্য এখানে বসবাস করছেন। জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন। গান্ধিজীর তাঁরা অনুগামী ছিলেন এবং যে দেশজননীকে তাঁরা জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী এই জ্ঞানে নিরন্তর পূজা করেছেন - সে দেশ এই ভারতবর্ষ। এখানকার নেপালী জনগণ তাঁদের সমৃদ্ধ ভাষাতে যে সাহিত্য রচনা করেছেন তাতে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব লক্ষণীয়। দার্জিলিঙ এই সাংস্কৃতিক জীবনের কেন্দ্রভূমি হ'য়ে উঠেছে। যদিও তাঁদের

বহু লোকগীতি ও নৃত্যের উৎসভূমি নেপাল—তবু বর্তমানে সে সবের রূপ গেছে বদলে এর কারণ এই চর্চা হচ্ছে ভারতের মাটিতে। এই সব কিছুর মধ্যে ভারতীয় জীবনের মূল প্রবাহের ছাপ অতি স্পষ্ট। এই যে সংস্কৃত এর পরিকল্পনা ও চিন্তার পেছনে যে শক্তি কাজ করছে তা জাতীয় সংহতির অভিমুখী – আদৌ অনৈক্যাভিমুখী নয়। স্বাধীনতার পরবর্তী যুগে এই বিষয়টি আরো বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। নিঃসন্দেহে, নির্ভুলভাবে এই সাংস্কৃতিক জীবন ভারতীয় সংস্কৃতির মূল প্রবাহের দিকে এগিয়ে চলেছে।

বঙ্গানুবাদ : সুতপা চক্রবর্তী

# পূর্বভারতের আদিবাসী সংস্কৃতি ও তার সংরক্ষণ

ডঃ জলদবরণ গঙ্গোপাধ্যায়

ভারতের অধিবাসীদের মধ্যে আদিবাসী জনসাধারণের একটি বিশিষ্ট স্থান রয়েছে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময় দেশের জনজাতিগণের লোকসংখ্যা ছিল ২ কোটি ২০ লক্ষ বা মোট জনসংখ্যার ৬ শতাংশ। ১৯৭১ সনের আদমসুমারী অনুযায়ী ঐ লোকসংখ্যা বেড়ে ৩ কোটি ৮০ লক্ষে বা মোট জনসংখ্যার ৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

ভৌগোলিক অবস্থান থেকে বিচার করলে ভারতের জনজাতিগণকে তিনটি প্রধান বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা চলে, যথা : (১)

১। দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের পাহাড় ও 'ঘাট' অঞ্চলের জনজাতি সমূহ ;

২। উপদ্বীপ ভারত ও সিন্ধু-গাঙ্গেয় সমতল ভূমির মধ্যবর্তী প্রাচীন পাহাড় ও মালভূমি অঞ্চলের জনজাতি সমূহ ; এবং

৩। উত্তর ও উত্তর-পূর্ব ভারতের পর্বত ও উপত্যকা অঞ্চলের জনজাতি সমূহ।

ঐতিহাসিক কারণে আবার তৃতীয় বিভাগের অন্তর্ভুক্ত উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জনজাতিদের একটি স্বতন্ত্র বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা চলে। আসাম, মেঘালয়, নাগাল্যাণ্ড, মনিপুর, ত্রিপুরা, মিজোরাম ও অরুণাচল প্রভৃতি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল নিয়ে এ অঞ্চল গঠিত। (এখানকার মোট জনসংখ্যা ১৯৫ লক্ষ, তার মধ্যে ৪৩ লক্ষ বা ২২ শতাংশই জনজাতীয়।)

বর্তমান প্রবন্ধে এই উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জনজাতিগণের বিষয়েই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখা হবে।

ব্রিটিশ সরকারের সাধারণ জনজাতীয় নীতি অনুযায়ী বহুকাল

পর্যন্ত এসব অঞ্চলের আদিবাসীগণের সংগে সমতলবাসীদের যোগাযোগ খুবই সীমিত ছিল। অবশ্য ত্রিপুরা ও মনিপুর দেশীয় রাজ্য ছিল বলে আদিবাসীগণের সংগে সাধারণ অধিবাসীদের সম্পর্ক অনেকটা ঘনিষ্ঠ ছিল। আসামের রাজধানী খাসি পাহাড়ের শিলং—এ অবস্থিত ছিল বলে ও খাসিদের সংগে অন্যান্য জাতির লোকের সংযোগ পূর্বেই স্থাপিত হয়েছিল।

এ অঞ্চলের জনজাতিগণের মধ্যে অনেকেই বহুকাল সমতলের অধিবাসীদের থেকে নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন রাখতে সচেষ্ট ছিলেন, নিজস্ব কৃষ্টি, সমাজ ব্যবস্থা ও বাসভূমির অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য। ব্রিটিশ শাসনের পূর্ব থেকেই অবশ্য পাহাড়বাসীদের সংগে সমতলবাসীদের সংযোগ স্থাপিত হয়েছিল, যার প্রধান কারণ ছিল পরস্পরের উৎপাদিত পণ্য বিনিময় করা। এ সংযোগ সর্বদা শান্তিপূর্ণ ছিল না। বিভিন্ন সনয়ে পাহাড়বাসীগণ সমতলের গ্রাম আক্রমণ করে খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য ব্যবহারোপযোগী জিনিসপত্র, এমন কি নরনারীও ধরে নিয়ে গেছে ক্রীতদাস রূপে রাখার জন্য। আসামে অহোম শাসন কালে অহোম রাজাগণ ঐ সব সীমান্তবর্তী অঞ্চলের জনজাতিগণকে ঐরূপ হামলা থেকে নিবৃত্ত রাখার জন্য বার্ষিক 'পোসা' দেওয়ার প্রথা চালু করেছিলেন। তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, পাহাড়বাসীগণ সমতলের গ্রামের উপর হামলা করত সেসব পণ্য লুঠ করে নিয়ে যাওয়ার জন্য যেসব জিনিস সাধারণতঃ পাহাড়ে উৎপাদিত হয় না। কাজেই তাদের শান্ত রাখতে হলে সমতলের 'দুয়ার' অঞ্চলের উর্বরা জমিতে উৎপাদিত পণ্যাদির একটা অংশ পাহাড়বাসীদের পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা থাকা দরকার। এই উদ্দেশ্যেই 'পোসা' প্রথার প্রবর্তন করা হয়। অনুরূপ ভাবে নাগা জনজাতি সমূহের ক্ষেত্রে 'নাগা-খাট' প্রথা চালু করা হয়। এ ব্যবস্থায় রাজস্বমুক্ত জমি উৎপাদনের জন্য ও জলা মাছ ধরার জন্য মঞ্জুর করা হত।(২

ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকেই অর্থাৎ অহোম রাজত্বকাল থেকেই ঐসব পাহাড়াঞ্চল জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত হতে থাকে। যেমন, অহোম রাজাদের সৈন্যদলে বহু নাগা, মিরি ও অন্যান্য পাহাড়বাসী যোগদান করত। অহোম রাজাদের মোগল আক্রমণ প্রতিরোধে ঐসব পাহাড়বাসী সৈন্যদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল।(৩) অরুণাচলের মিসমীগণ সমতলের বাজারে প্রচুর পরিমাণে পাহাড়ে উৎপাদিত পণ্যাদি বিক্রী করত ও সমতল থেকে অনেক জিনিস ক্রয় করে নিয়ে যেত। অহোমগণ মিসমীদের এই ব্যবসা চালু রাখতে দিলেন তখনই যখন মিসমীগণ অহোম রাজাদের আধিপত্য স্বীকার করে নিল।(৪) ত্রিপুরা ও মনিপুরে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল বলে বহু পূর্ব থেকেই সেখানে জাতিভিত্তিক রাষ্ট্র ক্ষমতার বিকাশ ঘটেছিল।

পাহাড়াঞ্চলে জাতিভিত্তিক রাষ্ট্র ক্ষমতার প্রসার ব্রিটিশ শাসন-কালে আরও সুদৃঢ় ও বিস্তৃত হয়। কিন্তু স্বাধীনতা পাওয়ার পর এই গতির এক গুণগত পরিবর্তন সাধিত হয়। পূর্বে অহোম ও ব্রিটিশগণ পাহাড়াঞ্চলে তাদের ক্ষমতার যে প্রসার ঘটায় তাতে স্থানীয় জনজাতিগণের সহযোগিতা কম ছিল, প্রতিরোধই ছিল বেশী প্রবল। অবশ্য কোন কোন জনজাতির ক্ষেত্রে, যেমন নাগা, খাসি, মিজো, ইত্যাদি প্রাথমিক প্রতিরোধ ভেঙে পড়ার পর ব্রিটিশ শাসকগণ ঐসব অঞ্চলে খৃস্টান মিশনারীগণের কার্য কলাপে উৎসাহ দেওয়ায় ক্রমশঃ তারা পাশ্চাত্যের জীবনধারা গ্রহণ করতে শুরু করে। কিন্তু বিভিন্ন জনজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলের সাধারণ ও অর্থনৈতিক বিকাশের প্রতি ব্রিটিশ সরকার মোটেই গুরুত্ব দেয়নি, বরং অবহেলাই করেছে বলা চলে।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ঐসব জনজাতিগণ এক স্বাধীন দেশের পূর্ণ নাগরিক রূপে রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালনায় অংশ গ্রহণের অধিকারী হয়। ভারত সরকার ঐসব অঞ্চলের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও

অর্থনৈতিক বিকাশের উপরও বিশেষ নজর দেয়। তাদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার, রাস্তা-ঘাট ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, উন্নত কৌশলের উৎপাদন ব্যবস্থা প্রয়োগ ইত্যাদির জন্য বিশেষ কার্যক্রম গৃহীত ও রূপায়িত হচ্ছে। এসব পরিবর্তন সমূহকে 'আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়া' ( modernization process ) আখ্যা দেওয়া যায়। এই প্রক্রিয়ার ফলে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জনজাতিগণের ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও সমাজ ব্যবস্থারও পরিবর্তন ঘটছে। এই পরিবর্তন সর্বদা কাম্য দিকে ঘটছে না, ( ফলে কেউ কেউ জনজাতিগণের ঐতিহ্য ও কৃষ্টি লুপ্ত হওয়ার আশঙ্কা করছেন ) সেজন্যই আলোচনা করা প্রয়োজন কি করে জনজাতিক সংস্কৃতি ও সমাজ ব্যবস্থা মূলতঃ রক্ষা করে 'আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়া'র উর্ধগতি বজায় রাখা সম্ভব হয়। এখানে মনে রাখা দরকার, আমরা সমাজ ও সভ্যতাকে স্থিতিশীলরূপে না দেখে পরিবর্তনশীলরূপেই দেখব, কাজেই আমরা একথা বলব না যে, জনজাতিগণের কৃষ্টি ও সমাজ ব্যবস্থাকে অনড় রাখতে হবে, বরং আমরা বলব, তাদের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বিকাশ ঘটাতে হবে। শুধু খেয়াল রাখতে হবে এই বিকাশের ফলে তারা যেন তাদের সংস্কৃতির ও সমাজ ব্যবস্থার মৌলিক আদর্শ উপাদানগুলি হারিয়ে না ফেলে।

২

কি করে জনজাতিসমূহের কৃষ্টি ও সমাজ ব্যবস্থার মূল ভিত্তি না ভেঙে তার বিকাশ ঘটানো যায় তা বুঝতে হলে প্রথমে 'আধুনিকী-করণে'র মূল প্রেরণার উৎস সম্বন্ধে সঠিক ধারণা থাকা দরকার। ডঃ বি, কে, রায়বর্মণ তাঁর 'Modernization Process in the Hills of North-East India' শীর্ষক নিবন্ধে এ বিষয়ে এক বিজ্ঞান-ভিত্তিক পর্যালোচনা করেছেন। (৫) তাঁর মতে আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়ার প্রেরণা দ্বিবিধ : বহির্জনিষ্ণু (exogenous) এবং অন্তর্জনিষ্ণু (endogenous)। কোনও অঞ্চলের বা জনসমষ্টির ক্ষেত্রে বহির্জনিষ্ণু

ঘটনাগুলি হল, সাধারণতঃ, উন্নততর উৎপাদন কৌশল প্রয়োগ এবং জটিল রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন প্রবর্তন। অন্তর্জনিষ্ণু আধুনিকীকরণ আবার দুভাবে সংঘটিত হয়। এক, কোনও কৃষ্টির সৃজনশীল বিকাশ যা নিয়ত নিজস্ব বৈশিষ্ট্য (traits) ও বাস্তুসংস্থানের (ecology) পারস্পরিক সংঘাতের ফলে ক্রমাগত ঘটতে থাকে। দুই, বহির্জনিষ্ণু আধুনিকীকরণের ফলে উদ্ভূত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যেসব পরিবর্তন ঘটতে থাকে।

কাজেই জনজাতিক সংস্কৃতি বিকাশের নিয়ন্ত্রণ প্রসংগে বহির্জনিষ্ণু প্রেরণাগুলি আলোচনা করাই প্রাসংগিক হবে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জনজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে বহির্জনিষ্ণু ঘটনাগুলিকে ডঃ রায় বর্মণ ছয় ভাগে ভাগ করেছেন, যথা : (১) জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রক্ষমতার সুদৃঢ়করণ, (২) যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থার প্রসার, (৩) পৌর কেন্দ্র স্থাপন ('establishment of urban centres'), (৪) প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহারে উন্নত প্রণালীর প্রযুক্তি বিদ্যার প্রচলন, (৫) শিক্ষার প্রসার এবং (৬) আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা ও অন্যান্য সুখ-সুবিধার প্রসার।

আমাদের মনে হয়, উপরোক্ত ৬টি বিষয়ের সংগে আরও ২টির সংযোজন দরকার, যথা : হিন্দু ও খৃস্টান ধর্ম প্রবর্তন এবং অর্থনৈতিক সীমান্তের (economic horizon) প্রসার। এ অঞ্চলের জনজাতিদের মধ্যে কয়েকটি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী জনজাতি আছে, যথা, অরুণাচলের মোন্‌পা, শেরদুকপেন ও খামতী, ত্রিপুরার মগ, চাকমা ইত্যাদি। বাদবাকী জনজাতিদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মযাজকগণ বহুদিন থেকেই ধর্ম প্রচারে রত আছে। ব্রিটিশ আমলে অবশ্য খৃস্টান ধর্মযাজকগণ অনেকটা সুবিধাজনক অবস্থা ভোগ করেছে। তাদের প্রভাবে বিভিন্ন নাগা, খাসি, গাড়ো, মিজো প্রভৃতি জনজাতি আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা, পোষাক, আচার-ব্যবহার, নাচ-গান ইত্যাদি গ্রহণ করেছে। ত্রিপুরা, মনিপুর এবং আসামের মিরি উপজাতিদের

ক্ষেত্রে হিন্দু ধর্মের প্রভাবও অনুরূপ সংস্কৃতীকরণ (sanskritization) প্রক্রিয়া কার্যকরী করেছে।

অর্থনৈতিক সীমান্তের প্রসার বলতে বোঝাতে চাই, জনজাতিগণের স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতির বাজার-ভিত্তিক অর্থনীতিতে (market economy) রূপান্তর ও সে সংগে বিভিন্ন আধুনিক শিল্পজাত পণ্যের ভোগ বৃদ্ধি।

এসব আধুনিকীকরণ প্রবাহের তোড়ে জনজাতিগণের সমাজ ব্যবস্থার ও সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের যেসব পরিবর্তন ঘটছে তার সব কিছুকেই যথাযথ কাম্য বলা চলে না। একথা সত্য যে, বর্তমানে সমগ্র জনজাতীয় অঞ্চল জুড়েই সর্বদিকে বিকাশ লাভ করার এক অদম্য আগ্রহ দেখা দিয়েছে। বর্তমানে কোন জনজাতির সর্দার বা গ্রাম প্রধানকে বোঝাতে হয় না, কেন তাদের ছেলে-মেয়েদের স্কুলে পাঠান দরকার। বরং উল্টা, ঐসব গ্রামবাসীগণই সরকারের কাছে আরও স্কুল খোলার জন্য আবেদন জানায়। আজ আর তারা নিজেদের অঞ্চলকে বিচ্ছিন্ন রাখতে না চেয়ে বরং বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি দাবী করে। যদিও কোন কোন জনজাতীয় অঞ্চলে যেমন নাগাল্যাণ্ডে, অরুণাচলে ও মিজোরামে, বাইরের লোকদের প্রবেশ করতে হলে পূর্বাহ্ণে অনুমতি পত্র সংগ্রহ করতে হয়। তাহলেও বাইরের সংগে যোগাযোগের পথ এর ফলে বড় একটা রুদ্ধ হয়নি, কারণ, ভারতীয় নাগরিকদের পক্ষে অনুমতিপত্র পেতে বিশেষ কোন অসুবিধা হয় না।

সরকারের বিভিন্ন জনজাতি কল্যাণ প্রকল্প ও জনজাতীয় অঞ্চলের অর্থনৈতিক বিকাশের পরিকল্পনা রূপায়ণের ফলে এ অঞ্চলের জন-জাতির লোকগণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রগতি লাভ করছেন। অবশ্য দেশের অন্যান্য স্থানের তুলনায় এ অঞ্চল এখনও রাস্তা-ঘাট, যোগাযোগ ব্যবস্থা, বৈদ্যুতিক শক্তি, পরিবহণ ব্যবস্থা, ইত্যাদিতে অনেক পশ্চাৎপদ। আসল কথা হল, পূর্বের বহু বছরের অবহেলার ফল

সম্পূর্ণরূপে কাটিয়ে উঠতে আরও বেশ সময় লাগবে। কিন্তু একথা সত্য যে, নানা দিকেই উন্নতি ঘটছে এবং এর গতিও খুব ধীর নয়। অবশ্য এই অগ্রগতির সংগে সংগে কতগুলি গভীর সমস্যাও দেখা দিয়েছে, যেমন, নব্য শিক্ষিতদের মধ্যে নিজস্ব কৃষ্টি, ধর্ম, ঐতিহ্য ও সামাজিক সংগঠন সম্বন্ধে একটা হীনমন্যতার ভাব। এ থেকেই আবার দেখা দিয়েছে আত্মসত্তা হারিয়ে ফেলার সমস্যা। নিজেদের কৃষ্টি ভুলে গিয়ে বিশেষ করে পাশ্চাত্যের অনুকরণ ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সংগে অংগীভূত হয়ে যাওয়ার প্রবণতা দেখা দিয়েছে।

৩

আমাদের দেশের অনেকেই মনে করেন যে, জনজাতিগণের অগ্রগতির পরিণাম হবে তাদের ভারতীয় মূল জীবনস্রোতের সংগে একীভূত হওয়া। এই মিশে যাওয়া বলতে এ কথা বোঝায় না যে, তারা তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য হারিয়ে 'ভারতীয়' হবে। এই একীভূত হওয়ার অর্থ এক জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হওয়া। এই উদ্দেশ্যে এটা কাম্য নয় যে, তারা নিজেদের সংস্কৃতি ভুলে যাবে, বরং নিজেদের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেই তারা ভারতীয় সংস্কৃতির বর্ণচ্ছটার ঔজ্জ্বল্য বাড়াতে সক্ষম হবে। জওহরলাল নেহেরু এক জায়গায় বলেছেন, 'আমি ব্যগ্রভাবে তাদের ( জনজাতিগণের ) অগ্রগতি কামনা করি। কিন্তু আরও ব্যগ্রভাবে চাই যে, তারা যেন তাদের জীবনের চারু কলা, আনন্দ এবং কৃষিটা যা তাদেরকে নানাভাবে বিশিষ্টতা দান করেছে, না হারায়।' ('I am anxious that they should advance, but I am even more anxious that they should not lose their artistry and joy in life and the culture that distinguishes them in many ways.')(৬)

যদিও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পাশ্চাত্য সভ্যতার আঘাতে বহু জনজাতির কৃষ্টির বিলোপ ঘটেছে। প্রখ্যাত নৃতাত্ত্বিক ডঃ ভেরিয়ার

এলউইন মনে করতেন যে, ভারতের ক্ষেত্রে এরূপ ধ্বংসাত্মক প্রভাব রোধ করা সম্ভব হবে। এমন কি, তিনি বিশ্বাস করতেন যে, আদিবাসীদের শিল্পকর্ম ও চারুকলাকে উৎসাহ প্রদান করে তাদের নিজস্ব হস্তশিল্পজাত জিনিসপত্রের এবং নাচ-গানের প্রতি তাদের অনুরাগ ও গর্ববোধ জাগিয়ে ও সেসংগে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে তাদের মধ্যে সৃজনশীল কার্যের এক নব জাগরণ আনা সম্ভব। এই রেনেশাঁ বা পুনরভ্যুদয় পুরানোকে আঁকড়ে ধরে থাকা নয়, সংস্কৃতির সংরক্ষণ শুধু নয়, নব নব রং রূপ ও ছন্দ, হাস্যোজ্জ্বল আনন্দ এবং জীবন মাধুর্য উপভোগের পথ প্রশস্ত করা।(৭)

ডঃ এলউইন অরুণাচলের জনজাতিগণের ক্ষেত্রে গ্রহণীয় পন্থা সম্বন্ধে 'A Philosophy For NEFA' পুস্তকে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন ( পৃঃ ২৫৫ ২৮২ )। ভারতের অন্যান্য স্থানের আদিবাসীগণের তুলনায় উত্তরপূর্ব ভারতের জনজাতিগণ তাদের হস্তবয়ন শিল্পকে অনেকটা বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছে। বস্তুতঃ এ অঞ্চলের বিভিন্ন জনজাতি রমণীগণ হাতে বোনা কাপড়ের উপর যেরূপ সুন্দর সুন্দর নক্সা তোলেন ও অপরূপ রঙের সংমিশ্রণ ঘটান তা যে কোন সমাজের অধিবাসীদের পক্ষেই গর্বের বিষয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এখনও এসব অঞ্চলের আদিবাসী রমণীগণ কোমরে বাঁধা তাঁতেই (loin loom) কাপড় বুনে থাকেন, যার ফলে উৎপাদন ক্ষমতা খুবই কম। তাই প্রয়োজন উন্নত ধরণের তাঁত ব্যবহার, কিন্তু সে সংগে নিজস্ব যেসব নক্সার বৈশিষ্ট্য আছে তাও বজায় রাখা দরকার।

জনজাতিগণের শিল্পকর্মের নিদর্শন ও নমুনা সংগ্রহ করে তা সংগ্রহশালায় রাখার ব্যবস্থা করা এবং ঐসব জিনিস প্রস্তুত করায় তাদেরকে নানাভাবে উৎসাহও প্রদান করা দরকার। অরুণাচলের প্রত্যেক জেলায় একটি করে সাংস্কৃতিক কেন্দ্র আছে যেখানে থাকে একটি করে সংগ্রহশালা, পাঠাগার ও সক্রিয় কেন্দ্র। উদ্দেশ্য হল, জনজাতিগণের মধ্যে নিজেদের উৎপন্ন ও ব্যবহৃত জিনিষপত্রের প্রতি আত্মসম্মান বোধ

জাগানো। বিভিন্ন প্রচার পত্রে, দেওয়াল পঞ্জিকায়, ডাক টিকিটে জনজাতি জীবনের ও শিল্পকলার চিত্র অঙ্কিত করেও তাদের নিজেদের কৃষ্টির প্রতি শ্রদ্ধা বোধ জাগানো যেতে পারে। শুধু খেয়াল রাখা দরকার যে, জনজাতি শিল্পকলার পুনরুজ্জীবনের নামে যেন বাজারে প্রাপ্য রঙচঙে, সস্তা ও রুচিহীন জিনিষপত্রের অন্ধ অনুকরণ করা না হয়।

জনজাতি কৃষ্টির আরেকটি বিশেষ দিক হল তাদের নিজস্ব ধর্মীয় উৎসব, নাচগান ও অবসর বিনোদনের অন্যান্য ব্যবস্থাদি, খেলাধুলা ইত্যাদি। প্রতি বছর প্রজাতন্ত্র দিবসে বিভিন্ন রাজ্যের রাজধানীতে ও দিল্লীতে সরকারী প্রচেষ্টায় যে বিভিন্ন জনজাতির লোক নৃত্যকলার অনুষ্ঠানে যোগদান করে তার সুফল অবশ্যই আছে। কিন্তু অনুরূপ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা জিলা, মহকুমা ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্তরেও করা দরকার। বিভিন্ন শিক্ষায়তনে ঐসব ললিতকলার নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও অনুশীলনের ব্যবস্থাও করতে পারলে ভাল হয়।

সরকারের সাধারণ জনজাতি নীতি অনুযায়ী বিভিন্ন উপায়ে আদিবাসীগণের সংস্কৃতি ও সামাজিক ব্যবস্থা সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলেও আসলে তখনই এই উদ্দেশ্য সফল হবে যখন আদিবাসীগণ নিজেরা এ ব্যাপারে অগ্রণী ও উৎসাহী হবেন। সকল সমাজেই বয়স্ক ব্যক্তিগণের মধ্যে রক্ষণশীল মনোভাব অপেক্ষাকৃত প্রবল থাকে। জনজাতিগণের ক্ষেত্রেও দেখা যায়, বয়স্ক ব্যক্তিগণ তাদের নিজেদের অতীত ঐতিহ্যের প্রতি সাধারণভাবে অনুরক্ত। পূর্বে জনজাতি সমাজের রীতিনীতি ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পালনের ব্যাপারে গ্রাম-প্রধান ও গ্রাম পঞ্চায়েতের ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেসব অঞ্চলে এইসব সংগঠনের ভূমিকা শিথিল হয়ে পড়েছে সেসব অঞ্চলেই সমাজ সংহতি ভেঙে পড়েছে। কাজেই জনজাতি অঞ্চলে আধুনিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখা দরকার এর ফলে তাদের নিজস্ব গ্রাম শাসন ব্যবস্থা যেন দুর্বল হয়ে না পড়ে।

জনজাতির সংস্কৃতির বিকাশের পথে ভারতের অন্যান্য অংশের নৃত্য-কলা, গান, গানের সুর ইত্যাদিরও একটি ভূমিকা আছে। আদিবাসী কলাবিদগণ স্বাভাবিক প্রেরণায়ই ঐসব নৃত্যকলা ও গানের সুর ইত্যাদি গ্রহণ করতে পারে। এ সবের সংমিশ্রণে জনজাতির ললিতকলা সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে।

এ কথা অনস্বীকার্য যে, উৎপাদন কৌশল ও কারিগরী বিদ্যার প্রসারের ফলে অনেক পুরানো সামাজিক নিয়ম কানুন পরিত্যাগ করতেই হবে। যেমন জুম চাষের পরিবর্তে স্থায়ী প্রথায় চাষাবাদ প্রবর্তনের ফলে ত্রিপুরার জনজাতিগণের 'জামাই-খাটা' বিবাহ প্রথা উঠে যেতে বাধ্য। এ ছাড়াও কোন কোন জনজাতির বিবাহ প্রথা এমন কুসংস্কারাশ্রিত যে, তার পরিবর্তন দরকার। যেমন অরুণাচলের গালংদের মধ্যে এমনও দেখা যায় যে, পুত্র সন্তানকে পিতা কোনও কন্যার পিতার কাছ থেকে টাকা নিয়ে বিবাহার্থ বাগদান করে। কোন কোন ক্ষেত্রে পুত্রের জন্মের পূর্বেও এরূপ বাগদান করে ফেলে। অবশ্য শিক্ষার প্রসারের সংগে এ নিয়ম ক্রমশঃ উঠে যাচ্ছে, এবং যত শিগ্‌গির উঠে যায় ততই মংগল। অরুণাচলে এই সেদিনও ক্রীতদাস প্রথা চালু ছিল। গারোদের মধ্যে একটি প্রথা আছে, ওয়াংলে উৎসবের সময় সিদ্ধভাত যথেষ্ট পরিমাণে নোক্‌মার বাড়ির বাইরে ছড়িয়ে রাখা হয় যাতে সকলে তার উপর দিয়ে হেঁটে যেতে পারে। এ প্রথাও যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বন্ধ হওয়া উচিত।

কিন্তু আবার জনজাতি সমাজের এমন কতগুলি ভাল অনুষ্ঠান আছে যা কিছুতেই লোপ পেতে দেওয়া উচিৎ নয়। তাদের সমাজে কোন প্রকারের জাতিভেদ প্রথা নেই, সাধারণ ভাবে তারা সকলেই শ্রমের মর্যাদা দেয়। তাদের মধ্যে ভিক্ষা বা গণিকা বৃত্তির কোন স্থান নেই। জনজাতি সমাজে নারীগণ যেরূপ মুক্তভাবে কাজকর্ম করে বেড়ায় তা ঐ সমাজের এক বিশেষ শক্তিই সূচিত করে। সাধারণ ভাবে ঐ সমাজে ছেলে-মেয়েরা অনেক বেশী স্বাধীন পরিবেশে বড় হয়,

কারণ তাদের মধ্যে নিষিদ্ধকরণ (inhibition) খুবই কম। অথচ সামাজিক শৃংখলা এত সুদৃঢ় যে, কারোর পক্ষে তা ভাঙা মোটেই সহজ নয়। এখন তাদের সমাজে যেরূপ পারস্পরিক সহযোগিতা সাহায্যের মনোভাব বর্তমান বা অনেক সমাজের পক্ষেই অনুকরণীয়।

৪

আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়ার প্রভাবে সর্বত্র জনজাতি সমাজেই ক্রমশঃ শিক্ষিত নব্য যুবক সম্প্রদায়ের হাতে সামাজিক নেতৃত্ব এসে যাচ্ছে। কাজেই মূলতঃ আদিবাসী কৃষ্টি সমাজ ব্যবস্থার বিকাশে এই যুবক সম্প্রদায়ের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে হতে পারে, সমগ্র উত্তর পূর্ব ভারতেই শিক্ষিত অধিবাসী যুবকগণ যেন বেশী পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন। পোষাকে, কথাবার্তায়, চাল চলনে তারা যেন পাশ্চাত্যের অনুকরণেই ব্যস্ত। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে তা সত্য নয়। বিভিন্ন আদিবাসী চিন্তাশীল ব্যক্তি নিজস্ব জাতিগত বৈশিষ্ট্য, ঐতিহ্য ও কৃষ্টি সম্বন্ধে গবেষণা করছেন এবং সকলকে নিজস্ব সত্তা সম্বন্ধে সচেতন করে তুলছেন।

খাসি গবেষক ডঃ হ্যামলেট ব্যারে লিখেছেন, 'The History and Culture of the Khasi People.' নাগাল্যাণ্ডে একটি কৃষ্টি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে, যেখানে নাগা খণ্ডজাতিদের কৃষ্টি, ইতিহাস, সমাজ-ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণার কাজ চলছে। অরুণাচলের বিভিন্ন জেলায় তো আছেই, শিলংএ ( অরুণাচল প্রশাসনের কেন্দ্রীয় দপ্তর শিলংএ অবস্থিত ) একটি কেন্দ্রীয় গবেষণা বিভাগও আছে। বিভিন্ন স্থানে স্থানীয় আদিবাসী যুবকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায়ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও সাহিত্য বিষয়ক সংগঠন গড়ে উঠেছে গাড়ো পাহাড়ে আছে Garo Graduate Association ( গারো স্নাতক সংস্থা )। এ সংস্থার কাজ হল নিজেদের সামাজিক সংগঠনের ও সাংস্কৃতিক ক্রিয়া কলাপের দোষ-

ত্রুটি নিয়ে পর্যালোচনা করা ও সমাজের লোকদের এ বিষয়ে অবহিত করা যাতে সেসব দোষত্রুটি দূর করা সম্ভব হয়। ঐখানে আরেকটি সংগঠন আছে তার নাম Garo Literary Society (গাড়ো সাহিত্য সমিতি), ঐ সমিতি Achic Kurang (আচিক্ কুরাং) নামে একটি মুখপত্র প্রকাশ করে থাকে। খাসিদের মধ্যেও অনুরূপ সংগঠন আছে, যার নাম 'সেইন্ খাসি' (Sein Khasi)। এটি ১৮৯৯ খৃস্টাব্দে ইউ, জিভেন রয় প্রতিষ্টা করেছিলেন। খাসি সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও বিকাশ সাধনে এই প্রতিষ্ঠানটি বিশেষ যত্নবান। জয়ন্তিয়াদেরও আছে, 'সেইন্ জয়ন্তিয়া' (Sein Jaintia) নামে একটি সংগঠন। এটির একটি প্রধান কাজ হল খাসি ও জয়ন্তিয়াদের মধ্যে সামাজিক সংযুক্তি বিধান।(৮)

কাছারী উপজাতিগণের বোড়ো সাহিত্য সম্মেলন নামে একটি সংগঠন আছে। আসামের মিশিং উপজাতিদেরও সাহিত্য সংঘ আছে। একজন তরুণ মিশিং, ভৃগুমুনি কাগইয়ুং-এর সম্পাদনায় 'মিচিং সংস্কৃতির আলেখ্য' নামক একটি মূল্যবান তথ্য বহুল পুস্তক ১৯৭০ স্বাল প্রকাশিত হয়েছে। ত্রিপুরায়ও ককবরক্ সাহিত্য সভা নামে একটি সংগঠন আছে, যেটি ত্রিপুরা উপজাতির ভাষা ককবরক্-এর লিপি নির্বাচন ও তার বিকাশ সম্বন্ধে বিভিন্ন পন্থা নিয়ে বিচার বিবেচনা করছে।

অরুণাচল প্রশাসন প্রতিমাসে Arunachal News (অরুণাচল সংবাদ) নামে একটি মুখপত্র প্রকাশ করে। পূর্বে এটির নাম ছিল NEFA Information। ঐ মাসিক পত্রে অরুণাচলের বিভিন্ন শিক্ষিত যুবক নিজ নিজ উপজাতির ইতিহাস কৃষ্টি, ধর্মীয় উৎসব, ইত্যাদির উপর নিয়মিত তথ্যবহুল প্রবন্ধ লিখে থাকে। এদের মধ্যে শ্রী অছং এরিং-এর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ করতে হয়। তিনি নিয়মিত আদি সংস্কৃতি ও ধর্মের বিভিন্ন দিকের উপর মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশ করে থাকেন।

এসব থেকে এটা বোঝা যায় যে অনেক শিক্ষিত আদিবাসী যুবকদের মধ্যে তাদের নিজস্ব কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের প্রতি দরদ ও আকর্ষণ বোধ আছে। তারা তাদের কৃষ্টির পুনরুত্থান ও বিকাশ সম্বন্ধে খুবই আগ্রহী। সেজন্যই বিশেষ করে দরকার ঐসব সাস্কৃংতিক ও সাহিত্য বিষয়ক সংঘকে সরকারী সাহায্য ও উৎসাহ প্রদান। যে সব রাজ্যে নিজ নিজ জনজাতিদের সংস্কৃতি ও ইতিহাস সম্বন্ধে গবেষণা কেন্দ্র এখনও স্থাপিত হয় নি, সেসব রাজ্যে অবিলম্বে তা স্থাপন করা দরকার। আদিবাসী যুবকগণ যাতে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ইতিহাস ও সামাজিক ব্যবস্থা, ধর্ম উৎসবাদির উপর প্রবন্ধ লিখে প্রকাশ করতে পারে, তার জন্য বিভিন্ন স্থানীয় ও আঞ্চলিক ভাষায়ও মুখপত্র প্রকাশ করা দরকার।

৫

এ প্রসংগে আরেকটি কথা না বলে পারছি না। জনজাতীয় সামাজিক ব্যবস্থা ও সংস্কৃতির বিকাশের পথ সুগম করার জন্য অন্যান্য ভারতবাসীদের মনোভাবের পরিবর্তনও দরকার। জনজাতিদের প্রসংগে আমাদের অনেকের মধ্যেই একটা উন্নাসিক মনোভাব আছে। এটা আমাদের অবশ্যই পরিত্যাগ করতে হবে। কোন কোন ক্ষেত্রে মনে হতে পারে জনজাতিসমূহের সামাজিক রীতিনীতি বড়ই অযৌক্তিক ও পশ্চাৎপদ। কিন্তু আমাদের সমাজই কি দোষত্রুটি থেকে মুক্ত? পূর্বেই বলেছি অনেক বিষয়ে জনজাতি সমাজ আমাদের সমাজ থেকে উন্নততর। জওহরলাল নেহেরু যথার্থই বলেছেন: 'আমি জোরের সংগেই বলতে চাই যে, আমাদের এই ধারণা দূর করতেই হবে যে, আমরা তথাকথিত জনজাতিদের থেকে পৃথক। এই জঘন্য চিন্তা ও উন্নাসিকতা ছাড়তেই হবে। জনজাতিদের অনেকেই উন্নয়নের উঁচু স্তরে পৌঁচেছে। বস্তুতঃ কোন কোন জায়গায় আমি দেখেছি যে, জনজাতিগণ শিক্ষায় উন্নততর ও শৃংখলাপরায়ণ এবং

আমাদের জাতিভেদ প্রথায় জর্জরিত সমাজের তুলনায় উন্নততর সমষ্টিগত জীবন যাপন করে।" [৯]

আমাদের উত্তমর্ণ মনোভাবের পরিবর্তন দরকার এজন্য যে আমরা যেন জনজাতিদের উপর কোন কিছু চাপিয়ে দিতে চেষ্টা না করি এই ধারণা থেকে যে, তাদের কৃষ্টি ও সমাজব্যবস্থা আমাদের চেয়ে পশ্চাৎপদ। উত্তর পূর্বাঞ্চলের আদিবাসী শিক্ষিত যুবকগণ যে 'নব জাগরণের' আন্দোলন গড়ে তুলতে আগ্রহী হচ্ছে তাকে সর্বতোভাবে উৎসাহ প্রদান করা দরকার।

ইদানীং উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডজাতির পার্শ্ববর্তী বৃহৎ জনজাতির সংগে একীভূত হওয়ার একটা প্রবণতা দেখা দিয়েছে। এর কারণ কোন কোন ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে সামাজিক ভাবে স্বীয় অস্তিত্ব বজায় রাখার আকাঙ্ক্ষা যাতে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার সুফল ভোগ করা সম্ভব হয়।[১০] এই একীভূত হওয়ার ঝোঁক আদিবাসী সমাজের সংহতি বাড়াবে এবং নবজাগরণের সহায়কই হবে বলে মনে হয়। জনজাতি সংস্কৃতি পুনরুজ্জীবনের ক্ষেত্রে এই প্রবণতা এক নূতন দিগন্ত সংযোজন করেছে।

---

## উল্লেখ-পঞ্জী (References)

(১) Government of India, Report of the Scheduled Areas and Scheduled Tribes Commission, 1960-61, পৃ: ৮

(২) P. N. Luthra, North-East Frontier Tribes: Impact of Ahom and British Policy, Economic and Political Weekly, Bombay, June 5, 1971, পৃ: ১১৪৪।

(৩) N. K. Basu, Assam in the Ahom Age, Calcutta, 1970, পৃ: ১৪৬-৪৭।

(৪) P. N. Luthra, পূর্ব উদ্ধৃতি, পৃ: ১১৪৪।

(৫) Dr. B. K. Roy Burman, Modernization Process in the Hill Areas of North-East India, Journal of the Institute of Defence Strategy, January, 1970.

(৬) ডঃ ভেরিয়ার এলউইন কর্তৃক, তাঁর, 'A Philosophy for NEFA', Shillong, 1959, পুস্তক উদ্ধৃত, পৃঃ ২৫৫।

(৭) ডঃ ভেরিয়ার এলউইন, পূর্ব উদ্ধৃতি, পৃঃ ২৫৫।

(৮) Dr. B. K. Roy Burman, Demographic and Socio-Economic Profiles of the Hill Areas of North-East India, department of Publications, Government of India, New Delhi, 1970, পৃঃ ৩৪৪-৪৫।

(৯) Jawaharlal Nehru's Speeches, vol. III, The Publications Division, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, New Delhi, 1958, পৃঃ ৪৬০।

(১০) ডঃ বি. কে. রায় বর্মণ, পূর্ব উদ্ধৃতি, পৃঃ ৩৭৪।

# আদিবাসী সংস্কৃতি সংরক্ষণ

ডঃ প্রফুল্ল দত্তগোস্বামী

সংস্কৃতি ছাড়া কোন সামাজিক অস্তিত্বের কথা চিন্তা করাই কঠিন। যদিও মানুষ যে কোন পরিবেশে সংস্কৃতিকে গড়ে তোলে বলা হয় তবু এর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য সাধারণভাবেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমরা যখন কোন আদিবাসী সমাজের কথা ভাবি তখন কোন্ বিষয়টি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে? তাদের সঙ্গীত এবং নৃত্য? সরল জীবনধারা? পানীয়? না তাদের বর্ণাঢ্য পোষাক? পণ্ডিত নেহেরুর মত ব্যক্তি ভারতের নাগরিক জীবন ও আদিবাসী জীবনধারার পার্থক্যের বিষয়গুলি নিয়ে যতই উচ্ছ্বসিত মত প্রকাশ করুন, ব্যক্তিগতভাবে সংস্কৃতি শব্দের অর্থ সম্পর্কে আমার একটু সংশয় রয়েছে। কেননা আমি জানি সংস্কৃতিকে ঠিক বাইরে থেকে সঞ্চারিত করা যায় না। সংস্কৃতি পরিবর্তনশীল এবং সহজেই তা গ্রহণযোগ্যও বটে। ভারতের খ্রীস্টান আদিবাসী, আপাতদৃষ্টিতে হিন্দুর চেয়েও পাশ্চাত্যদেশীয় বলেই যাদের বেশি ক'রে মনে হয়, তাদের দিকে লক্ষ্য করলে সংস্কৃতি সম্পর্কে এক উদার মনোভাব আমরা গড়ে তুলতে পারি।

যখন কোন সমাজ চারদিক থেকে তার ওপর বিশেষ কোন চাপ অনুভব করে এবং পরিবর্তনের স্রোতকে নানান খাতে বইয়ে দেবার চেষ্টা করে সংস্কৃতি তখনই বিশেষ তাৎপর্যময় ও ব্যঞ্জনাময় হ'য়ে ওঠে। সমাজ যখন অর্থনৈতিকক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বনির্ভর হ'য়ে জাতির বৃহত্তর জীবন থেকে দূরে সরে যায়, তখনও সে তার চিরায়ত বিশ্বাস, অনুষ্ঠান, উৎসব, নৃত্যগীত ও কাহিনীর মধ্য দিয়ে তার অস্তিত্বকে টিঁকিয়ে রাখতে পারে। এবং তখন আমরা বলতে পারি সংস্কৃতির গায়ে আঁচটুকুও লাগেনি। সমাজ যখন তার নিজ রাজ্যের সংরক্ষিত

সীমার মধ্যে থাকে তখনও সংস্কৃতিকে সুরক্ষিত বলা যায়—ঠিক যেমনটি হয়েছে উত্তর-পূর্ব ভারতের আদিবাসী রাজ্যগুলির বেলায়। খাসিয়া, গারো, নাগা মিজো এদের নিজেদের পৃথক পৃথক রাজ্য রয়েছে, এবং তারা খ্রীস্টধর্ম ও অন্যান্য কারণবশত পাশ্চাত্যভাবের অনুগামী হবে, না তাদের চিরায়ত সমাজের কিছু কিছু আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্যকে গ্রহণ করবে সেটা মুখ্যতঃ তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীর ওপরেই নির্ভর করছে। কিন্তু সমতল অঞ্চলের বাসিন্দারা যারা হিন্দুধর্মের তরঙ্গে ধৌত হয়ে এবং অপেক্ষাকৃত অগ্রসর সভ্যতার হাতে মার খেয়ে বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে আছে তাদের কি হবে? তারা কি এই তরঙ্গের ওঠানামার মধ্যে জলকেলি করে পুরানো জীবনযাত্রাকে আঁকড়ে ধরতে চাইবে?

আমার মতে এর জবাব রয়েছে অর্থনৈতিক স্বয়ং সম্পূর্ণতা অথবা সংশ্লিষ্ট সমাজের অন্যান্য বিষয়ের ওপরে। আসামের কোন এক এলাকায় ১৯৬১ সালে আদিবাসীদের শতকরা হার ছিল ৪২, ১৯৭১ সালে এই হার ২৬এ নেমে আসে। এক সময় এই অঞ্চলে জমি ছিল অপর্যাপ্ত, খাদ্যের অভাব ছিল না এবং বহিরাগতদের সঙ্গে কোন অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার কথা তো শোনাই যেত না। কিন্তু গত কয়েক যুগে এই এলাকায় বহিরাগতদের ভীড় লেগে যায় এবং যদিও আমরা একে আদিবাসী অঞ্চল বলে থাকি, সরকার এই বহিরাগতদের গতিকে ভিন্নমুখী করার কোন প্রয়াস এ যাবৎ করেছেন বলে শোনা যায়নি যার ফলে আদিবাসীরা শুধু যে জমি হারিয়েছে তাই নয়, অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা যা আগে ছিল না বল্লেই হয়, সাংস্কৃতিক-ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর আদিবাসীদের অবস্থা সেক্ষেত্রেও চরম শোচনীয় হ'য়ে পড়েছে।

পরিবর্তিত অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেবার জন্য এই ব্যর্থতা সমাজের শিক্ষিত ও অধিকতর সচেতন অংশকে ক্ষুব্ধ করেছে এবং এখন এই আদিবাসীরা শুধু যে দারিদ্র্য ও অনাহারের ভয়ে শঙ্কিত তাই নয়, তাদের নিজস্ব 'সংস্কৃতি'কে বজায় রাখার জন্য বিশেষ সংরক্ষণ

ব্যবস্থা পর্যন্ত দাবী করতে হচ্ছে, এমন কি পৃথক রাজ্য পর্যন্ত তাদের চাইতে হচ্ছে। সংস্কৃতির ব্যবহারিক অর্থ যাই হোক, এমতাবস্থায় এ কথাটি মনে হয় যথেষ্ট রাজনৈতিক তাৎপর্য গ্রহণ করবে এবং বিস্ফোরক শক্তির মত কাজ করবে।

আসামের সমতল অঞ্চলের আদিবাসীদের মধ্যে বড়োকাচারিরা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। এরা গোষ্ঠীর দিক থেকে অসমীয়া সমাজের সঙ্গে সম্পর্কিত। অধিকাংশই দ্বিভাষী—কেউ কেউ অসমীয়া ভাষায় লিখে থাকেন। এরা বিভিন্নস্থানে ছড়িয়ে আছেন, অধিকাংশই ব্রহ্মপুত্রের উত্তর তীর বরাবর রয়েছেন। এদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোকের ধারণা এ রাজ্যে অপেক্ষাকৃত অগ্রসর সমাজের জনগণ অনুন্নত শ্রেণীর জনগণের ভালোমন্দ বিষয়ে উদাসীন এবং সরকারও উন্নয়নমূলক কার্যসূচিতে এদের বিষয়কে এড়িয়ে যাচ্ছেন। তাদের যে সমস্যাগুলির ওপর তারা নিজেরা জোর দিয়েছে সেগুলি অর্থনৈতিক ও সংস্কৃতি বিষয়ক। সম্প্রতি দুই তরুণ বড়োযুবকের মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ আলাপ কালে আমি সরলভাবেই জানতে চেয়েছিলাম, 'সংস্কৃতি বলতে তোমরা কি বোঝ?' দু'জনের মধ্যে সপ্রতিভ ছেলেটির জবাব এল: আমাদের নৃত্যগীত আছে, চমৎকার বয়নশিল্প আছে। কতগুলি নাচ অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের। সেগুলির সংরক্ষণ প্রয়োজন।

—হ্যাঁ তোমাদের সুন্দর নৃত্য আছে, তোমাদের বয়নশিল্পও চমৎকার। কিন্তু তোমার কি মনে হয় না যে, যেইমাত্র তুমি শিক্ষার সংস্পর্শে আসছ এবং গ্রাম থেকে শহরে চলে আসছ, যেই তুমি বিজ্ঞান পড়ছ চিরায়ত সংস্কার ও অনুষ্ঠানের ওপর নিজের বিশ্বাসকে হারিয়ে ফেলছ, নতুন ধরনের পোষাক পরছ, তখনই এই নৃত্য গীত ও বয়নশিল্প তার প্রয়োজনীয় পরিচর্যা থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ছে এবং তার আর কোনও আবেগপূর্ণ আবেদন থাকছেনা?'

যুবক: তুমি যা বলছ তা একান্তই সত্যি কিন্তু আমাদের মনে হয়, এই শিল্পগুলিকে সংরক্ষণ করা যেতে পারে যদি সরকার এগুলোর

প্রতি মনোযোগী হন এবং এমন কয়েকটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন যেখানে এই বিষয়গুলির পঠন ও সংরক্ষণ হয়।

আমি: খাঁটি কথা। যদি সরকার বলতে কিছু কাজ বোঝায় তবে তার দ্বারা অনেক কিছুই আশা করা যেতে পারে। তোমাদের বিধানসভার সদস্য ও মন্ত্রীরা কি বলেন?

যুবক: তাঁরা খুব কমই উৎসাহী। তাঁদের কিছুটা অসুবিধাও রয়েছে, কেননা যদি তাঁরা আমাদের স্বার্থে কিছু করেন তা হলে তাঁদের সাম্প্রদায়িক হিসেবে চিহ্নিত করা হবে। সরকার প্রথমে দলের স্বার্থই দেখেন এবং বিধানসভার সদস্যদের এমনভাবে রেখেছেন যাতে তাঁরাও সরকারের অনুকূলে থাকেন।

আমি: এ বিষয়ে আমার কিছু জানা নেই, কিন্তু তোমাদের উচিত জনগণকে তোমাদের সমস্যাগুলি বিশদভাবে অবহিত করা। আমি এই পরিস্থিতির কথা যতই ভাবি ততই মনে হয়, বড়ো জনগণের সমস্যা সাধারণভাবে অসমীয়াদের মতই সাংস্কৃতিক অপেক্ষা অর্থনৈতিক; যদি অনুন্নত সমাজের অর্থনৈতিক ভিতকে অপেক্ষাকৃত বলশালী করা যায় তবে সম্ভবতঃ পরিবর্তিতরূপে সংস্কৃতি পুনরুজ্জীবিত হবে এবং পুনরায় তা অর্থবহ হয়ে উঠবে। নিরন্ন জনগণের কাছে সংস্কৃতির কোন প্রয়োজনীয়তা নেই—তাদের কাছে প্রয়োজনীয় হ'ল খাদ্য।

এই কথোপকথনের মধ্য দিয়ে বর্তমান আদিবাসী চিন্তাধারার রূপকেই প্রতিফলিত করা হল। প্রচলিত পদ্ধতিতে যে শিক্ষাব্যবস্থা চালু রয়েছে তা আদিবাসী ও সাধারণ মানুষকে মোটেই সাহায্য করছে না। আদিবাসীদের পক্ষে যা প্রয়োজনীয় তা হ'ল বৃত্তিমূলক ধাঁচের শিক্ষা ও কারিগরী বিদ্যালয়। বয়নশিল্প ও বাঁশের কাজের মত তাদের হস্তশিল্পকেও উৎসাহিত করা প্রয়োজন, তাদের তৈরী মাল রাখার জন্য একটি বাজার তৈরী করা দরকার। তাদের বয়নশিল্পের নমুনা এই রকম—বড়ো দোখনা (আধাআধি ধরনের সাড়ি), বিছানা ঢাকনী কিংবা গায়ের চাদর হিসেবেও ব্যবহারযোগ্য। সুন্দর নক্সা করা

ফালি ( একটি বড়ো রুমাল ধরনের ) এটি মাফলার হিসেবে ব্যবহার চলে। এগুলো যদি ব্যবসায়িক প্রস্তুত ভিত্তিতে হয় তবে সরকার অথবা সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় গঠিত সমিতি ভিন্ন এইসব সামগ্রীর বিপণন ব্যবস্থা করবে কে ? আদিবাসীদের কিছু কিছু নৃত্য কেনই বা ভারতের সকল অঞ্চলের ছেলে মেয়েদের শেখানো হবে না ? এদের জীবনযাত্রার পদ্ধতি যাতে কোনরকমে বিঘ্নিত না হয় সেই নীতিই এই পার্থক্য রচনার মূলে রয়েছে বলা যায়। এ ছাড়া এর সঙ্গে আর যা যোগ হয়েছে তা হ'ল অর্থনৈতিক শোষণ। আমরা যদি একটি ঐক্যবদ্ধ জাতি গড়ে তুলতে চাই তবে প্রয়োজন ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা ও আদিবাসীদের দৃষ্টিভঙ্গীকে মেনে নেওয়ার মত ঔদার্য্য। আদিবাসীদের দৃষ্টিভঙ্গী কথাটির অর্থ হল এই—আদিবাসীরা তাদের প্রথানুযায়ী অন্নগ্রহণ করলে এবং খাদ্য হিসেবে শূকরকে গ্রহণ করলে বর্ণহিন্দুরা নাক ঘুরিয়ে নেবে এটা মোটেই তাদের কাম্য নয়। হয়ত অনেকেরই জানা নেই বড়ো চাল থেকে তৈরী কাচারি বা অপরিস্রুত জুমাই শ্যাম্পেনের মতোই মিষ্টি এবং স্বাদু। এটা আমার পক্ষে জানা সম্ভব হয়েছে কেননা আমি এর দুটোরই স্বাদ গ্রহণ করেছি। বড়োদের ধর্মীয় জীবনে পানীয় ও শূকর মাংস দুইই অপরিহার্য ঠিক যেমনটি হিন্দুদের ধর্মীয় জীবনেও ছিল বলে আমরা জানি। খাদ্যাভাসও সংস্কৃতিরই একটি অঙ্গ এবং যদি স্বাস্থ্যের পক্ষে এসব মঙ্গলজনক হয় তবে এগুলোকে স্বাগত জানানো উচিত বলেই মনে করি।

যে কথাগুলো প্রায়শই আমার মনে উদয় হয়েছে এই নিবন্ধে শুধু তারই অবতারণার চেষ্টা হল। যদি আমার এই চিন্তার প্রতিফলন আদিবাসী সংস্কৃতির প্রেরণা ও সংরক্ষণে এতটুকুও সহায়ক হয় তবে যথার্থই আনন্দিত হব।

বঙ্গানুবাদ : সুতপা চক্রবর্তী

# পূর্বভারতীয় লোকসংস্কৃতির অখণ্ডতা

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য

ভারতের পূর্বাঞ্চলের প্রদেশগুলো যে একদিন এক অখণ্ড সংস্কৃতিরই অঙ্গ ছিল, তাহা আমরা এখনই বিস্মৃত হইতেছি। প্রধানতঃ পাল সাম্রাজ্য বিস্তারের যুগে একদিকে কাশী কোশল, একদিকে অঙ্গ এবং আর একদিকে কামরূপ পর্যন্ত যে সংস্কৃতি বিস্তার লাভ করিয়াছিল তাহাতেই পূর্বভারতীয় অঞ্চলে একটি অখণ্ড সাংস্কৃতিক ঐক্য গড়িয়া তুলিবার ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। কালক্রমে মাগধী প্রাকৃত এবং তাহা হইতে মাগধী অপভ্রংশ ভাষা এই বিস্তৃত অঞ্চল জুড়িয়া প্রচার লাভ করিয়া তাহাই বিদগ্ধ সমাজের অনুশীলনের বিষয় হইয়াছিল এবং তাহা অবলম্বন করিয়াই খ্রীস্টীয় অষ্টম নবম শতাব্দীতেই রাজনৈতিক ঐক্যসূত্রেই সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ঐক্য বন্ধন সুদৃঢ় হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। কিন্তু তুর্কী বিজয়ের পর হইতেই সেই ঐক্যবন্ধন ক্রমে শিথিল হইতে শিথিলতর হইতে হইতে শেষপর্যন্ত ইংরেজ শাসনের যুগে তাহা বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। যদিও একথা সত্য যে রাজনৈতিক ঐক্যসূত্রেই সমাজজীবনের সংহতি দৃঢ়তা লাভ করে, তথাপি একথাও সত্য যে ভারতবাসী প্রাচীনকাল হইতেই রাজনৈতিক জীবনের উত্থানপতন নিরপেক্ষ ভাবেই তাহার সাংস্কৃতিক জীবনের ক্রমবিকাশের ধারা অব্যাহত রাখিয়া চলিয়াছে। কারণ যাহারা দেশে সিংহাসনের অধিকার লইয়া ব্যগ্র থাকিতেন, তাহারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক সংহতি সৃষ্টি করিবার সহায়ক হইতে পারিতেন না। তবে ইতিহাসে তাহার ব্যাতিক্রম আছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে সম্রাট অশোক তাহার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত। পূর্বভারত অঞ্চলে পাল-সম্রাটগণও সমগ্র পূর্বভারত অর্থাৎ মগধ, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ এবং

কামরূপ ব্যাপিয়া এক অখণ্ড সাংস্কৃতিক ঐক্য গড়িয়া তুলিতে সহায়ক হইয়াছিলেন। তাহারই উপর ভিত্তি করিয়া এই বিস্তৃত অঞ্চলের সাংস্কৃতিক জীবন একদিন গড়িয়া উঠিয়াছিল বলিয়াই ইহার মধ্যে আমরা আজিও ঐক্যের উপকরণগুলি খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি।

ভাষা এবং ধর্মই সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ঐক্য গড়িয়া তুলিবার প্রধান সহায় হইয়া থাকে। ভাষাতত্ত্ববিদ্‌দিগের মতে পূর্বভারতীয় অঞ্চলের আধুনিক ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা মাগধী প্রাকৃত হইতে জন্মলাভ করিয়াছে, কেহ কেহ গৌড়ীয় প্রাকৃত নামে এক ভাষার কল্পনা করিয়া থাকেন এবং তাহা হইতেই যে আধুনিক বাংলা ভোজপুরী ওড়িয়া এবং অসমীয়া ভাষার জন্ম হইয়াছে তাহা নির্দেশ করিয়া থাকেন। সেই সূত্রে এই অঞ্চলের যে সাংস্কৃতিক অখণ্ডতা একদিন সৃষ্টি হইয়াছিল নানা সূত্র হইতেই আমরা তাহার প্রমাণ পাইয়া থাকি। কালক্রমে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচারিত হইবার ফলে ভাষার বিভিন্ন আধুনিক আঞ্চলিক রূপ সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও এই কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে একই ক্ষেত্র হইতে ইহাদের উদ্ভব হইয়াছিল। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। বাংলায় খনার বচনগুলি যে অত্যন্ত প্রাচীন সে বিষয়ে সকলেই নিঃসন্দেহ। তবে অর্থ বোধগম্য হইবার জন্য ইহাদের ভাষা ক্রমে পরিবর্তিত হইয়া আসিয়াছে। খনার বচনগুলি কেবলমাত্র আজ বাংলাদেশেই যে প্রচলিত আছে তাহা নহে, প্রাদেশিক ভাষায় ওড়িশা এবং আসামেও প্রচলিত আছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও একই অখণ্ড ক্ষেত্র হইতেই যে ইহাদের উদ্ভব হইয়াছিল ইহাদের ভাষা হইতে তাহা আজিও বুঝিতে পারা যাইবে।

| বাংলা | ওড়িয়া |
|---|---|
| হাত বিশে করি ফাঁক। | হাত বিশো করি ফাঁক। |
| আম কাঁঠাল পুতে রাখ॥ | অম্ব কণ্ঠল পুথি রাখ॥ |
| গাছাগাছি ঘন সবে না। | গছ গছলি ঘন হে বো না। |
| ফল তাতে ফল্‌বে না॥ | গছ হেব ত ফল হেব না॥ |

এইবার অসমীয়া ভাষার একটি ডাকের বচনের সঙ্গে একটি বাংলা ডাকের বচনের তুলনা করিলেও দেখা যাইবে, ওড়িশার সঙ্গে এই বিষয়ে বাঙ্গালীর যে সম্পর্ক ছিল, আসামের সঙ্গে তাহার কোন ব্যতিক্রম ছিল না।

| বাংলা | অসমীয়া |
|---|---|
| পানী ফেলিয়া পানীকে যায়। | পানীব পেলাই পানীকে যায়। |
| আন পুরুষে আড়ে চায়॥ | তাকে বলে তাইব না দিবা বাঁই॥ |
| তারে নাহি বলিহ সতী। | |
| স্বরূপে সে দুষ্ট মতি॥ | |

জাতির সাংস্কৃতিক জীবনের এমন একটা ক্ষেত্র আছে, যেখানে মানুষে মানুষে ঐক্য আরও স্পষ্ট হইয়া প্রকাশ পায়; কারণ তাহাতে বহির্মুখী কোন কৃত্রিম অলংকরণ থাকে না। খনার কিংবা ডাকের বচনগুলি যেমন কতকটা তেমনই জাতির লোকসাহিত্যের অন্যান্য বিষয়ের মধ্যেও তাহার তেমনই সন্ধান পাওয়া যায়। এখানে বাংলা দেশের প্রচলিত একটি ছড়া উদ্ধৃত করিয়া ইহার ওড়িয়া পাঠের সঙ্গে তাহার তুলনা করিয়া দেখাইতেছি, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে, কৃত্রিমতা বহির্ভূত সাধারণ জীবনের মধ্যে মানুষে মানুষে ঐক্য আরও কত নিবিড়। ছড়াটি বাঙ্গালীর জীবনে যেমন সুপরিচিত ওড়িয়া সমাজেও তাহাই—

| বাংলা | ওড়িয়া |
|---|---|
| আমার কথাটি ফুরাল | মো কথাটি সইলা, ফুল গাছটি মইলা |
| নটে গাছটি মুড়াল॥ | হইরে ফুলগাছ তু কাহি কি মলু? |
| কেন রে নটে মুড়ালি? | মোতে কালী গাই খাই গলা। |
| গরুতে কেন খায়? | হইলো কালী গাই তু কাহি কিখাই গলু? |
| কেন রে গরু খায়? | |
| রাখাল কেন চরায় না? | মোতে গউড় জগিলা নাহি। |

| বাংলা | ওড়িয়া |
|---|---|
| কেন রে রাখাল চরাস না ? | হইড়ে গউড় তু কাহি কি |
| বৌ কেন ভাত দেয় না ? | জগিলু নাহি ? |
| কেন লো বৌ ভাত দিস্না ? | বড় বহু তু কাহি কি ভাত |
| কলাগাছ কেন পাত ফেলে না ? | দেলু নাহি ? |
| কেন রে কলাগাছ পাত ফেলিস্ না | পু অ কান্দিলা। |
| ব্যঙ্ কেন ডাকে না ? | হইরে পু অ তু কাহি কি কান্দিলু ? |
| কেন রে ব্যঙ্ ডাকিস্ না ? | মংতে ধূলিয়া জঙ্গা কামুড়ি দেলা। |
| সাপে কেন খায় ? | হইলে ধূলিয়া জঙ্গা তু কাহিকি |
| কেন রে সাপ খাস্ ? | কামুড়ি দেলু ? |
| খাবার ধন খাবনি ? | মু মাটি তলেযাএ,ক অলমাউস পাইলে |
| গুড় গুড়তে যাব নি ? | রটবার কামুড় দিএ। |

যদিও আজ বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় উদ্ধৃত ছড়া তুইটি প্রচলিত আছে। তথাপি একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে ইহারা উভয়েই একই ক্ষেত্র হইতে হইয়াছে উদ্ভূত হইয়াছে এবং যেদিন উদ্ভূত হয় সেদিন বাঙ্গালীই হোক কিংবা ওড়িয়াই হোক তাহারা একই অখণ্ড লোকসংস্কৃতির অঙ্গীভূত ছিল।

উপরে ওড়িশা এবং আসামের সঙ্গে বাঙ্গালীর ভাষাগত কিংবা লোকসাহিত্যগত ঐক্যের কথা উল্লেখ করা হইলেও মগধ বা উত্তর বিহারের সঙ্গে তাহার সম্পর্কের কথা কিছু উল্লেখ করা হয় নাই, এখন সেই বিষয়েই একটি দৃষ্টান্ত দিব।

মগধের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিল কারণ মগধ উত্তর বাংলার সংলগ্ন প্রদেশ এবং মগধ হইতেই একদিন বৌদ্ধধর্ম উত্তর বাংলার পথে বাংলার অন্যত্র প্রচার লাভ করিয়াছিল, মগধ বিশেষতঃ মিথিলার সঙ্গে বাংলার সাংস্কৃতিক সম্পর্ক অত্যন্ত প্রাচীন। উত্তর বাংলার পথে মগধের সংস্কৃতি আসামের কামরূপ

পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল। শক্তি এবং তান্ত্রিক ধর্মই তাহার প্রমাণ। ভাষার মাধ্যমেও এই সম্পর্ক সুদৃঢ় হইয়াছিল। বর্তমান লৌকিক সাহিত্যের ক্ষেত্র হইতে ইহার একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শনের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

মনসামঙ্গল কাব্য মধ্যযুগে বাংলার লোকসাহিত্যের স্তর হইতেই ক্রমে শিল্পসাহিত্যের স্তরে উন্নীত হইয়া সে যুগে বাঙ্গালীর জাতীয় কাব্যের রূপ লাভ করিয়াছিল। মগধ বা ত্রিহুত ( তীরভুক্তি ) অঞ্চল হইতে মনসামঙ্গলের কাহিনীটি বাংলাদেশে একদিন প্রচারিত হইয়া মধ্যযুগের বাঙ্গালীর জাতীয় কাব্যরূপে গঠিত হইয়াছিল। আজ পর্যন্তও উত্তর বিহারের প্রতি গ্রামাঞ্চলে মনসামঙ্গলের কাহিনী গীত হয় এবং সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় এই যে সেখানে হিন্দীভাষার আঞ্চলিক রূপের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাভাষাও মিশ্রিত করিয়া এই বিষয়ক গীত রচিত হইয়াছে এবং নিরক্ষর হিন্দীভাষী গ্রাম্য কৃষকগণও সেই বাংলা গীত আজও গাহিয়া থাকে। হিন্দী বেহুলার কাহিনীতে প্রচলিত একটি বাংলা গীত এখানে উদ্ধৃত করিতেছি –

ওরে পূরবে খোজিলাম বংগলা রাজ হে।
বালা জোগে কন্যা না দেখিলাম কুমারী হে ॥
ওরে পছিম খোজিলাম দেব করতার হে ॥
বালা জোগে কন্যা না দেখিলাম কুমারী হে ॥
ওরে ওতরে খোজিলাম মোরঙ্গ রাজ হে।
বালা জোগে কন্যা না দেখিলাম কুমারী হে ॥
ওরে দক্ষিণে খোজিলাম পূর্ব জগরনাথ হে।
বালা জোগে কন্যা না দেখিলাম কুমারী হে ॥

উত্তর বিহারে প্রচলিত মনসার গীতি কাহিনীতে বাংলা গান প্রচলিত থাকিবার কারণ কি? প্রথমত বাংলা দেশ হইতে এই গান উত্তর বিহারে প্রচারিত হইয়া থাকিতে পারে সেইজন্য ইহার কিছু-কিছু অংশ বাংলা রহিয়া গিয়াছে, কিংবা যেমন আমরা ব্রজবুলি ভাষাকে

ব্রজের ভাষা বা রাধাকৃষ্ণের ভাষা বলিয়া মনে করিয়া সেই ভাষায় বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করিয়াছি তেমনই হয়ত উত্তর বিহারের গ্রাম্য কৃষকগণ বাংলাদেশকেই বেহুলা লক্ষীন্দরের জন্মভূমি মনে করিয়া সেই দেশের ভাষায় তাহাদের গীত গাহিয়া থাকে। কিন্তু যাহাই হউক, ইহা দ্বারা এই দুই প্রদেশের নিতান্ত সাধারণ জনগণের স্তরেও যে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক কত নিবিড় ছিল তাহা অনুভব করতে পারা যায়।

মিথিলার সঙ্গে বাংলা ভাষার সুনিবিড় ঐক্য ছিল বলিয়াই একদিন মৈথিল ভাষায় রচিত বিদ্যাপতির পদাবলী বাঙ্গালী নিতান্ত আপনার রসবস্তু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল শুধু তাহাই নহে তাহা অনুকরণ করিয়া শত শত পদাবলী রচনা করিয়াছে। বিদ্যাপতির নামে প্রচলিত শিবগীতের অনুকরণ করিয়া বাঙ্গালীর লোকসাহিত্যে শিব উমার প্রসঙ্গ রচিত হইয়াছে। বাংলা শিবায়ন কাব্যের বহু আখ্যায়িকা মৈথিল শিবগীত অবলম্বন করিয়া রচিত। ব্রজবুলি ভাষায় রচিত বাঙ্গালী বৈষ্ণব পদকর্তাদিগের পদগুলিও মিথিলার অধিবাসী প্রাচীনকাল হইতেই নিজেদের বলিয়া মনে করিয়া আসিতেছিল। সেই সূত্রে বাঙ্গালী বৈষ্ণব কবি গোবিন্দদাসকেও তাহারা নিজেদের দেশের অধিবাসী বলিয়া মনে করেন। বাঙ্গালী কবি নারায়ণদেবের রচিত মনসামঙ্গলকাব্য যেমন আসামের সমগ্র ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় প্রচলিত হইয়া অসমীয়া ভাষায় রূপান্তরিত হইয়াছে, মৈথিল কবি বিদ্যাপতিরও বহু পদ তেমনই বাংলাভাষায় সহজেই রূপান্তরিত হইয়া বাংলা দেশে প্রচারিত হইয়াছে। সুতরাং মধ্যযুগেও সমগ্র পূর্বভারতে গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা ব্যাপিয়া একই অখণ্ড ভাষাগত ঐক্য স্থাপিত হইয়াছিল তবে সেই ভাষা বিভিন্ন আঞ্চলিক রূপ বা প্রাদেশিক রূপে বিভক্ত ছিল মাত্র। প্রথমতঃ বৌদ্ধধর্ম দ্বারাই এই অখণ্ডতার প্রথম ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু কালক্রমে যখন দেখা গেল যে বৌদ্ধধর্মের মৌলিক আদর্শ

এই অঞ্চলের সামাজিক জীবনের সম্পূর্ণ অনুকূল নহে, তখন তাহার ভিতর আর একটি ধারার উদ্ভব হইল তাহা তান্ত্রিক বা মহাযান বৌদ্ধধর্ম বলিয়া পরিচিত। বহু প্রাচীনকাল হইতেই পূর্বভারতীয় অঞ্চলের ধর্মসাধনার মধ্যে তান্ত্রিক সাধনার একটি বিশেষ স্থান ছিল। সাময়িকভাবে জৈন এবং বৌদ্ধধর্ম দ্বারা পর পর তাহা প্রভাবিত হওয়া সত্ত্বেও ইহাই শেষ পর্যন্ত শক্তিশালী হইয়া উঠিয়া বৌদ্ধধর্মের মধ্য দিয়াও আত্মবিস্তার করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল। কামরূপের কামাখ্যাতীর্থ তান্ত্রিক সাধনার কেন্দ্রস্থল ছিল। বাংলা দেশ, ওড়িশা, এবং মিথিলায় ইহার প্রভাব বিস্তায় লাভ করিল। এই সূত্রে এই বিস্তৃত অঞ্চলে তান্ত্রিক ভাবধারার সূত্রে একত্র গ্রথিত হইল। বৌদ্ধধর্মের যে ভাবধারা তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের মধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়াছিল তাহা এই অঞ্চলে তুর্কী বিজয়ের পর নূতন শক্তিতে আত্মপ্রকাশ করিল এবং তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই বাংলা দেশে চৈতন্যদেবের এবং আসামে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার শঙ্করদেবের বৈষ্ণবধর্ম প্রচার লাভ করিল। চৈতন্যদেব তাহার প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের সূত্রে বাংলাদেশ সহ ওড়িশা এবং আসামের সুরমা উপত্যকা থেকে সুদূর মনিপুর পর্যন্ত এক অখণ্ড ঐক্য সূত্রে বাঁধিয়া দিলেন।

পূর্বভারতের যে বিস্তৃত অঞ্চল বিহার বাংলা ওড়িশা এবং আসাম প্রদেশ নামে বিভক্ত হইয়াছে তাহাতে উচ্চশ্রেণীয় জাতি ব্যতীত এক বিপুল সংখ্যক আদিবাসী লোক বাস করিয়া থাকে। তাহারা দুইটি প্রধান জাতির বংশধর—একটি নিষাদ জাতি, ইহারাই ইংরাজীতে প্রটো-অস্ট্রোলয়েড নামে পরিচিত, আর একটি কিরাত জাতি তাহারাও ইন্দো-মোঙ্গলয়েড নামে জাতির সন্তান। এই দুইটি স্বতন্ত্রজাতি এই অঞ্চলে ভারতীয় আর্যভাষী জাতির সঙ্গে দীর্ঘকাল প্রতিবেশীরূপে বাস করিয়া তাহাদের সংস্কৃতি দ্বারা যেমন প্রতিবেশী বৌদ্ধ হিন্দু সমাজকে প্রভাবিত করিয়াছিল তেমনই বৌদ্ধ হিন্দু-সমাজের বহু উপকরণ দ্বারাও ইহারা পুষ্টিলাভ করিয়াছে। ইহারা

পরস্পর হইতে পরস্পর সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইয়া বাস করিতে পারে নাই। তবে এই কথা সত্য এই সকল আদিমসমাজ নিজেদের ভাষাগত স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন দিতে পারে নাই। অর্থাৎ বিহারী বাঙ্গালী ওড়িয়া কিংবা অসমীয়া যত সহজে ভারতীয় আর্যভাষা গ্রহণ করিয়াছিল, ইহারা তাহা তত সহজে করিতে পারে নাই। তথাপি ইহারা ভারতীয় সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের স্বাভাবিক ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে নাই, তাহাদের আদিমভাষা বহুলাংশে রক্ষা করিয়াও তাহাদের দ্বারাই অন্তর্মুখী এক অখণ্ড ঐক্য সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে।

ভারতীয় পূর্বাঞ্চলের আদিবাসীদিগের মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে জাতিগত যে পার্থক্যই থাকুক না কেন দীর্ঘকাল যাবত পরস্পর প্রতিবেশীরূপে বাস করিবার ফলে তাহাদের মধ্য দিয়াও এক সাংস্কৃতিক ঐক্য সৃষ্টি হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে তাহাদের সংস্কৃতির প্রভাবের ফলে এই অঞ্চলের সমগ্র ইন্দো-য়ুরোপীয় ভাষাভাষী অর্থাৎ বিহারী ওড়িয়া বাঙ্গালী অসমীয়া ইহাদের মধ্যেও এক সাংস্কৃতিক অখণ্ডতা সৃষ্টি হইবার সহায়ক হইয়াছে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টি স্পষ্টতর হইবে।

সমগ্র পূর্বভারতীয় অঞ্চলে আর্য ভাষাভাষী হিন্দু সমাজের মধ্যেও যে কতকগুলি ধর্মীয় আচার প্রচলিত আছে তাহাদের অধিকাংশই বৈদিক আচার নহে বরং লৌকিক আচার। প্রতিবেশী আদিবাসী জাতির সঙ্গে সংস্পর্শের ফলেই লৌকিক আচারগুলির জন্ম হইয়াছে নতুবা যে হিন্দুসমাজ স্মৃতিশাস্ত্রের অনুশাসন মানিয়া চলে তাহার মধ্যে এইসকল লৌকিক আচার আচরণ প্রবেশ করিবার কোন কথা ছিলনা। প্রথমে এই বিস্তৃত অঞ্চলে সর্পপূজার সম্পর্কে আলোচনা করা যাইতে পারে। বাঙ্গালী, বিহারী, ওড়িয়া এবং অসমীয়া প্রভৃতি সাধারণ হিন্দুসমাজে সর্পপূজার ব্যাপক প্রচলন আছে। উত্তর ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মত সর্পের অধিষ্ঠাতারূপে এই সমগ্র অঞ্চলে নাগরাজ কিংবা বাসুকির উপাসনা হয় না। বরং তাহার পরিবর্তে 'মনসা' নামে এক

দেবীর পূজা হইয়া থাকে। তাহার আর এক নাম জাঙ্গুলি। বলাই বাহুল্য জাঙ্গুলি কিংবা মনসা উভয়েই এই অঞ্চলের লোকমানসের সৃষ্টি। পশ্চিম ভারতের নাগদেবতা বাসুকির পরিবর্তে এই অঞ্চলে কেন যে নাগের অধিষ্ঠাত্রী এক দেবীর পরিকল্পনা করা হইয়াছে তাহার সুগভীর সামাজিক তাৎপর্য আছে। কারণ অনেকেই মনে করিয়া থাকেন যে এই সমগ্র পূর্বভারতীয় অঞ্চল একদিন মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত ছিল। এখন পর্যন্তও আসামের গাড়ো এবং খাসিয়া নামক পার্বত্য উপজাতি প্রত্যক্ষভাবেই মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত। আসাম প্রদেশের কাছাড় এবং তাহার সংলগ্ন অঞ্চল সম্পর্কে একটি ধারণা এই যে ইহা একদিন স্ত্রীরাজ্য ছিল। মধ্যযুগে রচিত 'গোরক্ষবিজয়' নামক বাংলা গাথাকাব্যে এই স্ত্রীরাজ্যের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। এমনকি মধ্যযুগের ধর্মমঙ্গল কাব্যেও এই অঞ্চলের স্ত্রীরাজ্য সম্পর্কে উল্লিখিত হইয়াছে। স্ত্রীরাজ্য যে মাতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত সমাজ তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায় সুতরাং মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার ভিত্তির উপর যে ধর্মীয় আচার বিকাশলাভ করিয়াছে, স্ত্রীদেবতা স্বভাবতই তাহার লক্ষ্য হইয়াছে। রাজ-সিংহাসনের অধিকারিণী যেখানে নারী দেবতার সিংহাসনের অধিকারিণীও সেখানে নারী হইবে ইহাই স্বাভাবিক। যে সমাজের পারিবারিক জীবনে জননীর প্রভাব সর্বতোমুখী, পুরুষের কোন অর্থ-নৈতিক কিংবা সামাজিক অধিকার যে সমাজে স্বীকৃত হয়না তাহাতে নারী দেবত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত হইবে এ বিষয়ে অস্বাভাবিকতা কিছুই দেখা যায় না। সেই সূত্রেই সমগ্র পূর্বভারতীয় অঞ্চলে স্ত্রীদেবতার পরিকল্পনা সম্ভব হইয়াছে। এই সংস্কার এই অঞ্চলে এত দৃঢ়মূল হইয়া গিয়াছিল যে পরবর্তীকালে পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার প্রভাব দ্বারাও তাহা নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইতে পারে নাই।

পশ্চিম ভারতের নাগরাজ উপাসিত হওয়া সত্ত্বেও পূর্বভারতীয় অঞ্চলে সর্পের অধিষ্ঠাত্রীদেবতা কেন যে স্ত্রীদেবতা মনসা কিংবা জাঙ্গুলি

এখন তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে। শুধু সর্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবীই নহেন এই অঞ্চলের সমস্ত দেবতাই স্ত্রীদেবতা। এই সমগ্র অঞ্চলেরই উপাস্য একমাত্র স্ত্রীদেবতা। ইহাদের বিভিন্ন নাম যেমন চণ্ডী, কালী, শীতলা ইত্যাদি। পরবর্তীকালে একমাত্র যে পুরুষদেবতা এই অঞ্চলের সমাজজীবনে প্রবেশ করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন তিনি শিব কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়।

যে সকল ধর্মাচার সমগ্র পূর্বভারত অঞ্চলকে এক অখণ্ড ঐক্যসূত্রে বন্ধন করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে সর্পপূজা অন্যতম। সমগ্র আসাম প্রদেশের অধিবাসী বোড়ো জাতি সিজবৃক্ষে মনসা পূজা করিয়া থাকে। যদিও হিন্দুসমাজে পৌত্তলিকতার প্রভাববশতঃ প্রধানতঃ বাংলাদেশে মনসার মূর্তি নির্মাণ করিয়া উপাসনা করা হয়। তথাপি বাংলাদেশেও সিজবৃক্ষেই মনসাপূজা করা প্রাচীনতর রীতি ছিল এবং এখনও আছে। ভাগীরথীর দুই তীর ব্যাপিয়া সিজবৃক্ষের নীচেই মনসা পূজা করা হইয়া থাকে। বোড়ো জাতির অন্যতম শাখা গাড়ো পাহাড়ের অধিবাসী গাড়ো জাতির মধ্যে মনসা সিজবৃক্ষে পূজা হইয়া থাকে। বাংলাদেশের জনসমাজ যে সকল জাতির মৌলিক উপাদানে গঠিত হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে বোড়ো জাতি অন্যতম। মনে হয় এককালে সমগ্র উত্তরবঙ্গে এবং পূর্ববঙ্গে বোড়োজাতি লোক বসবাস করিত তাহারা ক্রমে হিন্দু এবং মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়া নিম্নশ্রেণীর এক সমাজ গঠন করিলেও তাহাদের পূর্ববর্তী জাতীয় সংস্কার হইতে তাহারা মুক্তি লাভ করিতে পারে নাই। সেইজন্য বাংলাদেশের অধিকাংশ অঞ্চল হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র আসাম প্রদেশ পর্যন্ত প্রায় অভিন্ন উপায়ে একই দেবতার পূজা হইয়া থাকে।

আসামের অন্তর্গত খাসিয়া পাহাড়ের অধিবাসী খাসিয়াজাতি এক সর্পদেবীর পূজা করিয়া থাকে তাহার নাম 'থেলেন', তাহার সম্মুখে অনেক সময় নরবলি দেওয়া হইত। এবং এখন পর্যন্তও সেই সংস্কার ইহাদের মধ্যে সক্রিয় আছে। মনসা পূজাতেও পূর্ববঙ্গে পশুবলি

এমনকি মহিষবলিও অপরিহার্য। সুতরাং দেখা যায় পূজার আচারের দিক হইতেও ইহাদের মধ্যে সম্পর্ক রহিয়াছে। সুতরাং একথা অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না যে একদিকে আসামের বোড়োজাতির প্রভাবে *সিজ-মনসায় মনসাপূজা এবং আরেকদিকে আসামের খাসিয়া জাতির নরবলি দিয়া থেলেন* নামক সর্পদেবীর পূজা এই উভয়ই সমগ্র পূর্বভারত অঞ্চলের সর্পপূজাকে প্রভাবিত করিয়া ইহার মধ্যে একটি অখণ্ড ঐক্য-সৃষ্টির সহায়ক হইয়াছে।

এইবার কালীপূজার কথা কিছু বলিব। সমগ্র পূর্বভারত অঞ্চলে কালীপূজার মত এত ব্যাপক ধর্মীয় অনুষ্ঠান আর কিছু নাই। প্রকৃত-পক্ষে ইহার প্রভাব একদিকে ওড়িশা এবং বিহার হইতে সমগ্র বাংলাদেশ সহ আসাম প্রদেশ পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছে। ইহার দুইটি প্রধান কেন্দ্র ইহার দুইটি প্রদেশের কেন্দ্রস্থলে স্থাপিত। একটি কলিকাতার কালিঘাটে আর একটি কামরূপের কামাখ্যায়। তাহা ছাড়াও বিহারের মিথিলা এবং ওড়িশার কোন কোন অঞ্চলও ইহার দ্বারা প্রভাবিত। মধ্যযুগে বৈষ্ণবধর্মের প্রভাববশতঃ ওড়িশায় ইহার প্রভাব অনেকখানি ম্লান হইয়া গেলেও বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের পূর্ববর্তী-কালে এই অঞ্চলেও ইহার প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক ছিল। মধ্যযুগের গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব কিংবা আসামের শঙ্করদেবের প্রভাব সত্ত্বেও বাংলা এবং আসামে সকলশ্রেণীর সমাজের মধ্যেই ইহার প্রভাব অত্যন্ত সক্রিয়।

কালীপূজাও যে মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফল তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কেহ কেহ এমন কথা মনে করেন যে আসামের নাগাজাতির ধর্মীয় সংস্কারের সঙ্গে কালী উপাসনার সম্পর্ক আছে। তাহাদের বক্তব্য এই যে, আদিম নাগাজাতির মধ্যে যে নরমুণ্ড শিকার (Head hunting) প্রথা প্রচলিত আছে তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই কালী উপাসনার পরিকল্পনা হইয়াছে। কালী-প্রতিমার গলায় যে মুণ্ডমালাটি দেখিতে পাওয়া যায় তাহা নৃমুণ্ডশিকারী

নাগাজাতির সংস্কৃতির প্রতীক। কারণ, নৃমুণ্ডশিকারী নাগাজাতি নৃমুণ্ড শিকার করিয়া প্রতিটি নৃমুণ্ডের কঙ্কাল বিজয়চিহ্ন রূপে পুরুষ হইলে, তাহার মাথার পাগড়িতে এবং স্ত্রী হইলে, তাহার গলায় পরিধান করিয়া থাকে। অনেকসময় নৃমুণ্ড কঙ্কালের পরিবর্তে এক একটি বানরের মুণ্ড মাথায় কিংবা গলায় বাঁধিয়া কিংবা ঝুলাইয়া রাখে। যে যত বেশী নৃমুণ্ড শিকার করিতে পারে (নৃমুণ্ড শিকার করার অর্থ হইতেছে দলবদ্ধভাবে প্রতিবেশী গ্রামবাসীকে আকস্মিকভাবে আক্রমণ করিয়া তাহাদিগের মুণ্ড কাটিয়া লওয়া, ইহার উদ্দেশ্য মুণ্ডগুলিকে কৃষিক্ষেত্রে পুতিয়া দিয়া অধিক শস্যের আশা) সে সমাজে তত গৌরবের অধিকারী হয়। কালীর গলায় ছিন্নমুণ্ডের মালা নাগাজাতির সেই সাংস্কৃতিক সংস্কার হইতে আসিয়াছে বলিয়া মনে করা হয়। বাংলাদেশের দক্ষিণ-ভাগে মকরসংক্রান্তির দিন যে ঝন্নাঠাকুরের পূজা হইয়া থাকে তাহাও এই নৃমুণ্ড পূজা। সুতরাং আসাম হইতে আরম্ভ করিয়া বাংলাদেশের দক্ষিণভাগ পর্যন্ত নৃমুণ্ডের এক একটি বিশেষ শক্তি সম্পর্কে জন-সাধারণের মধ্যে একটি বিশেষ ধারণা প্রচলিত ছিল। যদি তাহাই হয় তবে কালী উপাসনার সঙ্গে নানাজাতির সম্পর্কের কথা অস্বীকার করা যায় না। কালী যে রূপে এই বিস্তৃত অঞ্চলে উপাসিত হইয়া থাকেন তাহা নানাজাতির নৃমুণ্ডশিকারের রূপ, বিশেষ শক্তিশালিনী কোনও নারী নির্বিচারে শত্রু নিধন করিয়া তাহার বিজয়ের চিহ্নস্বরূপ শত্রুর ছিন্নমুণ্ডের মালা কণ্ঠে পরিধান করিয়াছেন ইহাই ইহার বক্তব্য। তারপর সমাজে শক্তি আরাধনা যখন মুখ্য হইয়া উঠিল তখন সেই শক্তিশালিনী নৃমুণ্ডশিকারী নারী সমাজের আদর্শ হইয়া উঠিল। সেই সূত্রে তাহার রূপটি সমাজে উপাস্য বলিয়া গৃহীত হইল। হিন্দুপ্রভাবের যুগে তাহাতে পুরাণের কাহিনী আসিয়া মিশিয়াছে। তাহার ফলে তাহার পদতলে দলিত যে শব তাহা শিবে পরিণত হইয়াছে॥

পূর্বভারতীয় বিস্তৃত অঞ্চলকে যে সকল সাংস্কৃতিক উপাদান একসূত্রে বাঁধিয়াছে তাহাদের মধ্যে কালীপূজা সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী।

প্রকৃতপক্ষে হিন্দু এবং আদিবাসী নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষই ইহার উপাসক। এই পূজাচারের মধ্যেও প্রায় সর্বত্র অভিন্নতা দেখা যায়। আচারের অভিন্নতার দ্বারাও সমাজজীবনের সংহতির সৃষ্টি হইয়া থাকে।

কালীপূজার পর আদিম সূর্যপূজার কথা উল্লেখ করিতে হয়। পশ্চিমবাংলার ডোম জাতি যে ধর্মঠাকুরের পূজা করিয়া থাকে তাহা আদিম সূর্যপূজা। আদিম সূর্যপূজার অর্থ এই যে ইহা বৈদিক সূর্য-পূজারও পূর্ববর্তী। ইহার আচার এবং প্রথা বৈদিক এবং শাকদ্বীপীয় সূর্যপূজা হইতে স্বতন্ত্র। কিন্তু একটি আশ্চর্যের বিষয় এই যে এই সূর্যপূজার প্রণালীর সঙ্গে আসামের নাগাজাতির সূর্যপূজার প্রণালীর ঐক্য আছে। অনেকে মনে করেন যে দ্রাবিড় ভাষাভাষী কোন জাতি এককালে সমগ্র আসাম পর্যন্ত অধিকার করিয়াছিল। তাহার ফলে আসামের সামাজিক জীবনে দ্রাবিড় সংস্কৃতিরও কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। শুধু তাহাই নহে, আসামের আদিবাসীর সমাজজীবনে অস্ট্রিক সভ্যতারও কিছু দান রহিয়াছে। একইভাবে এ কথাও মনে করা হইয়া থাকে যে একদিন আসাম পর্যন্ত অস্ট্রিক ভাষাভাষীর জাতিরও প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। সেইসূত্রে আসাম হইতে ছোটনাগপুর এমনকি ওড়িশা আর মধ্যভারতের আদিবাসী অঞ্চল পর্যন্ত বিভিন্ন আদিবাসীর মধ্যেও সাংস্কৃতিক জীবনে কিছু কিছু ঐক্য দেখা যায়। আদিম সূর্যপূজার প্রণালী আসামের নাগাজাতি হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিমবাংলার ডোমজাতি সহ সমগ্র ছোটনাগপুরের আদিবাসী অঞ্চল পর্যন্ত যে প্রচলিত আছে উপরোক্ত বিষয়গুলি তাহার কারণ। পূর্ব ও পশ্চিমবাংলার হিন্দুসমাজ ইহার প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত নহে।

বাংলার লোকউৎসবগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে ইহাদের নানা উপকরণের মধ্যে বাংলার চতুষ্পার্শবর্তী অধিবাসী আদিবাসী জীবনের প্রভাব অনুভব করা যায়। এইখানে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে

পারে। মালদহের গম্ভীরা গান ও মুখোশনৃত্য বাঙালীর নিকট সুপরিচিত। একদিন ইহার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল সঙ্গীত এবং নৃত্যের ভিতর দিয়া এই অঞ্চলের সারাবছরের ঘটনারাশির পর্যালোচনা। বছরের শেষে এই উৎসবের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে এবং প্রকৃতপক্ষে ইহা এই অঞ্চলের একটি বাৎসরিক উৎসব। দেখিতে পাওয়া যায় যে আসামের বিভিন্ন পার্বত্য উপজাতি যেমন আবর মিস্‌মি ইত্যাদির মধ্যেও একটি অনুরূপ বাৎসরিক উৎসবের অনুষ্ঠান হইয়া থকে এবং তাহার মধ্যেও নৃত্য, গীত এবং নির্বিচার মদ্যপানের মধ্য দিয়া সারা বৎসরের ঘটনারাশির পর্যালোচনা করা হয়। এই উৎসবটি যে কিঞ্চিৎ মার্জিত হইয়া মালদহ অঞ্চলের সাধারণ সমাজের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছে তাহা অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায়। ইহার গম্ভীরা নামটিও অত্যন্ত তাৎপর্যমূলক, কারণ ইহা আর্যভাষা হইতে জাত কোন শব্দ নহে। মনে হয় হিমালয় অঞ্চলে অধিবাসী কোন আদিবাসী ভাষা হইতে শব্দটি আসিয়াছে।

উৎসবের মধ্য দিয়াই জাতীয় ঐক্য যত সহজে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং উৎসবের ভিতর দিয়াই কোন জাতিকে যত সহজে চিনিতে পারা যায়, আর কোন বিষয়ের মধ্য দিয়া তাহা তত সহজে চিনিতে পারা যায় না। পূর্বভারতীয় অঞ্চলের উৎসবগুলি একদিক দিয়া হিন্দু প্রভাব এবং মুসলমান ধর্মের প্রভাব এবং আর একদিক দিয়া পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষার প্রভাব প্রভৃতি নানা দিক হইতে এই সমস্ত প্রভাবের ফলে বাহিরের দিক হইতে পরিবর্তিত হইলেও অন্তরের দিক দিয়া ইহাদের বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই।

শুধু আদিমজাতির ধর্মই নহে উচ্চতর ধর্মও যে এই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক জীবনের ঐক্যসৃষ্টির সহায়ক হইয়াছে তান্ত্রিক ধর্মের আলোচনায় তাহা আমরা দেখিয়াছি। মধ্যযুগের আরও একটি ধর্ম এই সমগ্র অঞ্চল ব্যাপিয়া সাংস্কৃতিক এবং ভাবমূলক ঐক্যসৃষ্টি করিবার সহায়ক হইয়াছিল তাহা চৈতন্যপ্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম। ইহা এক

দিকে ওড়িশা এবং আর একদিকে মনিপুর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়া এই বিস্তৃত অঞ্চলকে এক অখণ্ড ভাষাতে এবং সংস্কৃতিগত ঐক্যবন্ধনে বাঁধিয়াছে। চৈতন্যধর্মের পূর্ববর্তীকালে ওড়িশায় বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এবং খণ্ড খণ্ড ধর্মসম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল। চৈতন্যধর্মের ভাববন্যা ইহাদের উপর প্রভাবিত হইয়া গিয়া ইহাদিগকে একাকার করিয়া দিয়াছে। বাঙ্গালীর আধ্যাত্মিক ধ্যানধারণার সঙ্গে তাহাকে একসূত্রে বাঁধিয়া দিয়াছে। তেমনি আসামের অন্তর্গত শ্রীহট্ট, কাছাড় এবং মনিপুর অঞ্চলেও খণ্ড খণ্ড নানা সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল। তাহাদের উপর দিয়াও বৈষ্ণব ভাবধারার কূলপ্লাবী বন্যা প্রবাহিত হইয়া গিয়া ইহাদের মধ্যেও ভাব এবং সংস্কৃতিগত অখণ্ডকার সৃষ্টি করিয়াছে। তাহার ফলে সুদূর কাছার হইতে ওড়িশা পর্যন্ত এক অখণ্ড ভাবধারা এখন পর্যন্ত প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। এই ভাবধারা সঙ্গীতে, নৃত্যে, চিত্রশিল্পে নানা বিচিত্ররূপে প্রকাশিত হইয়াও এক অখণ্ড আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।

সমগ্র পূর্বভারতীয় অঞ্চলের সামাজিক জীবনের আচার আচরণ যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তাহা হইলেও দেখিতে পাই যে মৌলিক বিষয়ে ইহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। বিবাহের স্ত্রী-আচার, মেয়েলীব্রত ও তাহার আচার ইহাদের মধ্যে, এই বিস্তৃত অঞ্চলের সমাজের মধ্যেও বিশেষ কিছু পার্থক্য দেখা দেয় না। কারণ আগেই বলিয়াছি এই সমগ্র অঞ্চলের সমাজজীবনই মাতৃতান্ত্রিক ভিত্তির উপর স্থাপিত।

# পূর্বভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য

## ডঃ কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

জীবনকে অবলম্বন করে মানুষের যে মনন ও তার যে প্রকাশ তাকেই বলা হয়ে থাকে সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতির মাধ্যমেই বিধৃত থাকে মানুষের পরিচয়, কোন বিশেষ সমাজের মানুষের গুণাবলীর মূল্যায়ন করা যায়, পরিবেশ ও কালের ব্যাপ্তির মধ্যে বিধৃত সেই সমাজের সাংস্কৃতিক রূপে। একক মানুষ তার নিজস্ব গুণাবলীকে প্রসারিত করে তার ব্যক্তি পরিচয়কে কখনও কখনও প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেও পৃথিবীতে এই ধরনের প্রতিষ্ঠাবান একক মানুষের সংখ্যা খুবই কম, নগণ্য ; মানুষের যে স্মৃতি কালকে অবলম্বন করে প্রসারিত হয় ও প্রতিষ্ঠালাভ করে, সে স্মৃতি তার সাংস্কৃতিক রূপের স্মৃতি। সংস্কৃতি তাই মানুষের মূল্যবান সম্পদ ; তবে জীবনের সঙ্গে এই সম্পদ এত সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে জড়িয়ে যায় যে মানুষ অনেক সময় এই সংস্কৃতির রূপ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবহিত হয়ে ওঠেনা। কালের বিবর্তন পথে সংস্কৃতিরও বিবর্তন হয় ; আর এই বিবর্তন যখন ঘটে তখন প্রচলিত সংস্কৃতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট চৈতন্য না থাকলে সমাজেই নানা প্রকারের বিভ্রান্তি দেখা দিতে পারে।

ভারতবর্ষের প্রবহমান জীবনধারায় বারংবার এসেছে এই ধরনের বিবর্তন। ঐতিহাসিক যুগের সূত্রপাত থেকেই পুনঃ পুনঃ এই ধরনের বিবর্তনের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে ; সংস্কৃতি ও জীবন ধারায় নানা প্রকারের পরিবর্তনের পথে ভারত-মনীষা সমাজকে সংরক্ষিত করেছে। সময়ের বিবর্তন ও বহিরাগত বহু দুর্যোগের ঝাপ্টা সত্ত্বেও—এই সমাজ আত্মবিকাশের মানসিকতাটিকে কখনও হারায় নি। জীবনযাত্রার বহু বৈশিষ্ট্য যেমন বিভিন্ন যুগে গড়ে উঠেছে তেমনি নানা অবস্থা

প্রভাবে সেই সব বৈশিষ্ট্যকে পরিবর্তিতও করে নিতে হয়েছে। তথাপি এই ভারতবর্ষে সংস্কৃতির একটা ক্রমিক প্রবহমানতার পরিচয় পাওয়া যায়, তা যেমনি বৈচিত্র্যপূর্ণ তেমনি প্রাণশক্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত।

এই ভারতভূমিরই পূর্ব প্রত্যন্তের মানুষ আসন্ন নূতন যুগের উন্মেষ কালে পূর্বাগত সাংস্কৃতিক সম্পদের মূল্যায়নে আজ যে উৎসুক হয়ে উঠেছে তার পেছনে ইতিহাসের বিধানই দায়ী। বস্তুত অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদে পশ্চিমজগতে কর্মের ক্ষেত্রে প্রয়োগ বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল তারই ব্যাপক বিস্তারে আজ তাবৎ পৃথিবী এক বিপর্যয়কর যুগ পরিবর্তনের সম্মুখীন হয়েছে। সমগ্র জগৎ জুড়ে আজ দেখা দিয়েছে প্রথাগত ও পুরাতন জীবনচর্চার সঙ্গে নূতন পরিবেশের এবং সেই পরিবেশ সঞ্জাত জীবন-কল্পনার সংঘাত। এই যুগ সন্ধিক্ষণে প্রচলিত সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় ও তার মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা স্বভাবতই আজ নূতন তাগিদ নিয়ে উপস্থিত হয়েছে সন্দেহ নেই।

আজকের এই উৎসবে পূর্বাঞ্চলের যে জনসমষ্টিকে সমীকৃত করার আয়োজন করা হয়েছে তার মধ্যে ধরা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, মনিপুর, নাগাভূমি, অরুণাচল, মেঘালয়, মিজোরাম, বিহার ও ওড়িশা। পূর্বভারতের একাত্মক হওয়ার এই চেতনা আজ নূতন করে আত্মপ্রকাশ করে থাকলেও এই বিস্তৃত অঞ্চলের পারস্পরিক আত্মীয়তার ঐতিহাসিক পটবিন্যাস কম উল্লেখনীয় নয়। বলতে কি বৈচিত্র্যপূর্ণ বিশাল এই ভারতভূমিতে বসবাসকারী নানা জাতি সমুদ্ভূত ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভাষী পরস্পর থেকে দূরদূরান্তে উপনিবিষ্ট, নদী পর্বত অরণ্য কান্তার দ্বারা বিচ্ছিন্ন মানুষের মধ্যে যে একটা গভীর অন্তর্নিহিত ঐক্য বহু সহস্র বৎসরের সভ্যতার বিবর্তনের মধ্য দিয়ে ইতিহাসপুরুষ গড়ে তুলছে তার অন্তর্নিহিত বৈজ্ঞানিক পটভূমিতে এই অঞ্চলবিন্যাস ও আঞ্চলিক চেতনার দান কিছু কম ছিল না। ঋগ্বেদের ঋষিদের রচিত গাথায় এই দিকভিত্তিক অঞ্চল চেতনার প্রথম উন্মেষ লক্ষ্য করা যায়। হিমালয় থেকে আরব সাগরে প্রবহমান সরস্বতীর তীরে যজ্ঞসংস্কৃতির

প্রবর্তক বৈদিক ঋষিরা পূর্বগামী গঙ্গা নদীর প্রবাহের অস্তিত্বের মাধ্যমে এই প্রাচ্য সম্পর্কিত চেতনার পরিচয়টি তাদের রচনায় নথিভুক্ত করেন। এই প্রাচ্যখণ্ডের কোন জনপদের অযজ্ঞ-পরায়ণ লোকনেতা ভেদের পরাক্রমের কথাও এই ঋগ্বেদেই শোনা যায়। এরপর মরুশোষিত সরস্বতীর উপকূল পরিত্যাগ করে যখন এই যজ্ঞধর্মী ঋষি ও জননায়কের উত্তর পুরুষেরা গঙ্গা-যমুনা বিধৌত ভূখণ্ডে আপন প্রতাপ প্রতিষ্ঠা করে তখনই ধ্রুব মধ্যদেশ নামে অভিহিত এই আর্যাবর্ত-ভূমির উত্তর, পশ্চিম, দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চল প্রচলিত ভারতভূমির অংশরূপে উদীচ্য, প্রতীচ্য, দক্ষিণাপথ ও প্রাচ্য নামে অভিহিত প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলি ভারতবাসীর মানসলোকে প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে থাকে। বস্তুত যজ্ঞীয় সমাজের প্রতিনিধিরূপে বিদেঘ মাধব যখন পূর্বে গণ্ডকী বা সদানীরার তীরে সমুপস্থিত হয়েছিলেন তখন পূর্বভারতে যে প্রাকপ্রতিষ্ঠিত জন-বসতি ছিল না এমন প্রমাণ কিছু নেই। বরং মগধের রাজগৃহে প্রাগৈতিহাসিক আমলেই যে একটি দুর্গ-নগরের অস্তিত্ব ছিল, বর্ধমানের পাণ্ডুরাজার ঢিবি ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলে, চব্বিশ পরগণার বেড়াচাপা ( চন্দ্রকেতু গড় ), মেদিনীপুরের তমলুক, পশ্চিম দিনাজপুরের বাণগড়, বগুড়ার মহাস্থান, আসামের প্রাগজ্যোতিষপুর, কলিঙ্গের তোষলি ইত্যাদি স্থানে বহু প্রাচীন যুগ থেকেই যে সভ্য ও সমৃদ্ধ সামাজিক জীবনের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তারই বহু প্রমাণ বর্তমানে ধীরে ধীরে আবিস্কৃত হচ্ছে।

### প্রাচ্য জন সংস্থানের স্বাকৃতি

সংহিতা সাহিত্যের মধ্যে ঋগ্বেদের সঙ্গে গঙ্গানদীর পরিচয় হয়ে থাকলেও গঙ্গার সঙ্গমক্ষেত্র পর্যন্ত ঋগেদের গোচর হয়নি; অথর্ব সংহিতার পরিচয় অঙ্গ মগধ পর্যন্ত [ অথর্ব—৫।২২।১৪ ] ঐতরেয় আরণ্যকের জ্ঞানের বিস্তৃতি মগধ অতি কম করে বঙ্গ পর্যন্ত [ ঐতরেয় আরণ্যক ২।১।১ ] কিন্তু এই পরিচয়ের সঙ্গে মর্যাদার উল্লেখ নেই।

সংস্কৃতিগত বিভেদই যে এই অপরিচয় ও মর্যাদার অভাবের কারণ এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বৌদ্ধ পালি সাহিত্যে [ অঙ্গু ওর নিকায় ] এবং জৈন ভগবতীসূত্রে জম্বুদ্বীপের যে ষোড়শ মহা জনপদের উল্লেখ আছে তাতে অঙ্গ মগধের নাম থাকলেও বঙ্গ কলিঙ্গ পুণ্ড্র ও প্রাগজ্যোতিষের নাম পাওয়া যায় না। বৌদ্ধ ও জৈনদের ধর্ম কোশল ও মগধে প্রাদুর্ভূত হয়ে থাকলেও এই ধর্মের গণ্ডী আর্যজনপদ সংস্কৃতিরই উত্তর সাধক ; এই জনসমাজ ইন্দ্র এবং ব্রহ্মা পরিচালিত ত্রয়স্ত্রিংশ দেবতার অনুগামী ; তবে এই তেত্রিশ বৈদিক দেবতার অতিরিক্ত বহু অবৈদিক লোক-দেবতা যক্ষ, নাগ ইত্যাদিতেও এই জন সমাজের বিশ্বাস ছিল অগাধ। মনে হয় সরস্বতী তীরে ইন্দ্র সংগঠিত যজ্ঞীয় সমাজের আধিপত্য বিস্তার ব্যবদেশে একদিকে যেমন প্রাকপ্রতিষ্ঠিত সমাজের দ্বারা এই নূতন বিশ্বাস ও সেই বিশাস ভিত্তিক ক্রিয়াকলাপ গৃহীত হচ্ছিল তেমনি বহুদিন যাবত প্রচলিত আদিম স্তরসম্ভুত বিশ্বাস ও ক্রিয়াকলাপও এরা সম্পুর্ণ পরিত্যাগ করেনি। ফলে অঙ্গ মগধ পর্যন্ত অঞ্চলে এই মিশ্রসংস্কৃতি প্রসারিত হয়ে থাকলেও তার বাইরে পূর্বাঞ্চলে প্রাচীন সংস্কৃতিই স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত ছিল।

মহাভারত কাহিনীতেই প্রথম অঙ্গ মগধেরও পূর্বে অবস্থিত জনপদ সমূহের স্বীকৃতি লক্ষ্য করা যায়। মহাভারতের মতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অঙ্গ বঙ্গ পুণ্ড্র সুক্ষ্মের রাজন্যবর্গ পরাক্রান্ত হস্তীসৈন্য নিয়ে দুর্যোধন পরিচালিত কৌরবপক্ষে যোগদান করেছিলেন বলে উল্লেখ আছে। [ মহাভারত, কর্ণপর্ব ১।৩ ] এই মহাভারতেই ভারত উপমহাদেশের রাজনৈতিক সমীকরণের যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় সেই প্রসঙ্গে পাণ্ডব কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় ভীমের দিগ্বিজয় উপলক্ষে পূর্বে পুণ্ড্রদেশ, কৌশিকী কচ্ছ, বঙ্গ, তাম্রলিপ্তি, কর্বট ও সুক্ষ্ম ইত্যাদি অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তারের সংবাদ পাওয়া যায়। বস্তুত বৈদিক দেবতা ইন্দ্রের অনুগামী, বেদবিহিত যজ্ঞীয় সংস্কারের পরিপোষক ভরতবংশীয় নরপতিরা সমগ্র জম্বুদ্বীপ তথা সমুদ্রের উত্তরে অবস্থিত ও উত্তরে হিমালয় সীমিত এই উপ-

মহাদেশকে ইন্দ্রক্ষেত্র তথা ভারতভূমি অর্থাৎ নিজেদের এক্তিয়ারভুক্ত বলে গণ্য করতেন। স্বভাবতই পূর্বভারত খুব সহজে এই সাংস্কৃতিক বা রাজনৈতিক সমীকরণকে স্বীকার করে নেয়নি। এই মহাভারতের মতেই পূর্বাঞ্চল ছিল দৈত্য বা অসুরবংশীয় বলির অধিকৃত। এই বলি পুরাণে পরিচিত দৈত্যরাজ প্রহ্লাদের পৌত্র বামনরূপী বিষ্ণু কর্তৃক ছলনা দ্বারা পাতালে প্রেরিত অসুররাজ বলিরই অবতার। আবার বিষ্ণুপুরাণ মতে ইনি চন্দ্রবংশীয় নৃপতি যযাতির পুত্র অনুর বংশে সম্ভূত পূর্বদেশের রাজা। এই যযাতির অন্য পুত্র পুরুর বংশে ভরতের জন্ম হয়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ নামে ঋগ্বেদ সংহিতার অন্তর্গত ব্রাহ্মণে উল্লেখ আছে যে দীর্ঘতমা নামে একজন বৈদিক ঋষি ভরতকে ঐন্দ্রাভিষেক দ্বারা রাজচক্রবর্তী পদে অভিষিক্ত করেন। এই দীর্ঘতমা ঋষির রচিত একটি সূক্ত ঋগ্বেদে সন্নিবেসিত থাকায় ইনি ষে একজন ঐতিহাসিক পুরুষ ছিলেন এবিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না [ ঋগ্বেদে ১ম মণ্ডল, ১৫৮ সূক্ত ] মহাভারতের একটি কাহিনী থেকে জানা যায় এই, এই ঋষি দীর্ঘতমাকে তার পুত্রেরা কোন কারণে গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করলে তিনি গঙ্গাপ্রবাহের দ্বারা বাহিত হয়ে রাজা বলীর রাজ্যে উপনীত হন। সেই ক্ষণে রাজা বলি গঙ্গায় স্নান করছিলেন. তিনি দীর্ঘতমাকে উদ্ধার করে প্রসাদে নিয়ে আসেন। পরে ঋষি দীর্ঘতমা নিঃসন্তান বলির পত্নী সুদেষ্ণার গর্ভে নিয়োগ প্রথায় অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র, ও সুহ্ম নামে পাঁচটি সন্তান উৎপন্ন করেন। বলির মৃত্যুর পর তাঁর সাম্রাজ্য এই পঞ্চপুত্রের মধ্যে বণ্টিত হলে ভিন্ন ভিন্ন পুত্রের অধিকৃত রাজ্য সেই সেই পুত্রের নামানুসারে অঙ্গ, বঙ্গ ইত্যাদি নামে পরিচয় লাভ করে।

মহাভারতোক্ত এই কাহিনীটির মধ্যে প্রাচ্য ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের একটি নিগুঢ় ইঙ্গিত সন্নিহিত আছে বলে আমার মনে হয়। [ প্রথমত ঋগ্বেদের বহুকাল পূর্ব থেকেই পূর্বভারত যে জনপদ অধ্যুসিত ছিল এই কাহিনীতে তার স্বীকৃতি আছে ] আরও স্বীকৃতি পাওয়া যায়

যে ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বর্ণিত সম্রাট ভরত গঙ্গা যমুনার তীরবর্তী অঞ্চল অধিকার করে তাঁর আধিপত্য বিস্তার করে থাকলেও পূর্বভারত তার অধিকারের বাইরে অসুর জাতীয় রাজা বলির অধিকারভুক্ত ছিল। ইন্দ্রপূজক যজ্ঞানুরাগী সম্রাট ভরত ও তদ্বংশীয়দের আধিপত্যের বাইরে থাকাই পূর্বভারতের ইতিবৃত্ত সম্পর্কে বৈদিক তথা বেদ পরবর্তী সাহিত্যে কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। বৈদিক সংস্কৃতির বাইরে থাকলেও অসুর নামে অভিহিত সমাজ কিন্তু ইন্দ্রপূজক সমাজ থেকে খুব স্বতন্ত্র ছিল না। বরং বৈদিক সমাজে বহু নূতন সংস্কার ও ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপের প্রবর্তন হলেও প্রাচীন আদিম সমাজ উদ্ভূত সংস্কার ও ক্রিয়াকলাপ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নি। অথর্ব বেদ সংহিতায় এই সব প্রাচীন বিশ্বাস ও ক্রিয়াকলাপের বেশ বিস্তৃত স্বীকৃতি দেখা যায়। যজ্ঞীয় সমাজে অগ্নিই উপাসনার একমাত্র মাধ্যমরূপে পরিগণিত হলেও অথর্ব বেদে জল, মৃত্তিকা, প্রস্তর, বৃক্ষলতা, পশুপক্ষী ইত্যাদির ইঙ্গিতগর্ভ বৈশিষ্ট্য এবং শব্দ এবং মন্ত্রের প্রতি বিশ্বাসপ্রবণতার পরিচয় পাওয়া যায়। নূতন সংস্কার পরিশীলিত বৈদিক সমাজ এই সব আদিম সংস্কৃতিগত ও ধর্মীয় বিশ্বাস ও ক্রিয়াকলাপকে অস্বীকার করে যজ্ঞ-ধর্মকেই প্রাধান্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার প্রয়াস করলেও বাছাই করা উচ্চকোটীর গোষ্ঠীর বাইরে এই সংস্কার কতটা জনভিত্তি অর্জন করেছিল সে বিষয়ে খুব স্পষ্ট ধারণা করা এখন আর সম্ভব নয়। এই সংস্কার হয়ত মার্জিত উচ্চতর গোষ্ঠীর মধ্যে সীমিত ছিল, বৃহৎ জনগোষ্ঠী কতটা ঐ সংস্কার মানত সে বিষয়ে হয়ত নেতৃস্থানীয় রাজন্যবর্গের খুব মাথা ব্যথা ছিল ছিল না। এছাড়া পুরোহিত সমাজ রাজন্যবর্গের অনুগ্রহেরই আকাঙ্খাভাজন থাকায় জনগোষ্ঠীর ক্রিয়াকলাপ তাদের এক্তিয়ারে অর্থাৎ বেদবিদ্যা অর্জনে অনধিকার চর্চা না করলে তাদের উপর নিজেদের প্রভাব বিস্তার করবার চেষ্টা করত বলে মনে হয় না। ফলে সাধারণ জনতা তাদের যক্ষ, যক্ষিণী, নাগ দেবতা, বৃক্ষ, প্রস্তর নদী, সরিৎ নিয়ে, শস্যপ্রজনন, পশুপ্রজনন এবং স্বগোষ্ঠী প্রজনন ভিত্তিক পুজা, উৎসব

আহার বিহারেই জীবন অতিবাহিত করত। আর পূর্বাঞ্চলে যেখানে বৈদিক সংস্কৃতির বহু পরবর্তী কালেও সেখানকার অধিবাসীদের তাই রক্ষণশীল বেদপন্থীরা অসুর নামে অভিহিত করেছেন। আনুমানিক অষ্টম শতাব্দীতে রচিত আর্যমঞ্জুশ্রী মূলকল্প নামক বৌদ্ধগ্রন্থে গৌড় এবং পুণ্ড্রের অধিবাসীদের ভাষাকে অসুর ভাষা বলে অভিহিত করা হয়েছে বলে দেখা যায়। সেই আদিম প্রেরণা সঞ্জাত জীবনচর্যাকেই মার্জিততর করে বৈষয়িক ভোগসুখের অনুশীলনের সঙ্গে উন্নততর চিন্তার সমন্বয় সাধনে ব্রতী হয়েছিল। বেদের দেবতারা ভিন্ন ভিন্ন শক্তির আধার ও অভিঃপ্রকাশ ; এইসব বিভিন্ন শক্তি যে মূলত এক সেই উপলব্ধির উদয় হয়ে থাকলেও, 'একো হি বিপ্রা বহুধা বদন্তি' এই চেতনা দেখা দিয়ে থাকলেও প্রার্থনার নির্ভুলতা এবং যজ্ঞপ্রকরণের যথাবিহিততার দ্বারা সকল অভীষ্ট লাভের বিশ্বাসই ছিল বেদের কর্মকাণ্ডের প্রধান উপজীব্য।

এই যজ্ঞকাণ্ড যজ্ঞধর্মীদের বেশ কিছু পরিমাণে বস্তুজীবনের বিবর্তন থেকে পশ্চাৎপদ করে রেখেছিল বলে অনুমান করা যায়। এই যজ্ঞ-পন্থীদের নির্মাণ ক্রিয়ার প্রধান উপকরণ যখম কাঠ তখন তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীরা পাথর এবং সম্ভবত ইঁটের ব্যবহারে পারদর্শীতা অর্জন করেছিল। বর্তমানে তাই সুপ্রাচীন অতীতের বহু উপকরণ আবিষ্কৃত হতে থাকলেও প্রত্যক্ষভাবে বৈদিক যজ্ঞপন্থীদের তৈরী এবং ব্যবহৃত উপকরণ দুর্লভ।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে কুরুভরত পরিবারে সংকট উপস্থিত হলে যদুবংশীয় লোকোত্তর পুরুষ বাসুদেব কৃষ্ণ পাণ্ডুর সন্তানদের পক্ষ অবলম্বন করে পুরুভরত বংশকে কিছু কালের জন্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। এই প্রসঙ্গের ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ছিলেন ইন্দ্রপূজার বিরোধী ; [ হরিবংশ গিরিগোবর্ধন কাহিনী স্মর্তব্য ] এবং তাঁরই প্রভাবে ইন্দ্রপ্রস্থের নূতন প্রতিষ্ঠিত যুধিষ্ঠিরের রাজধানী নির্মাণের দায়িত্ব ময় নামক দানবের উপর অর্পিত হয়েছিল। মহাভারত মূলত

ভরতবংশীয়দের প্রাধান্যের কাহিনী হলেও কুরুপাণ্ডব আমলেও মূল আর্যাবর্তেই কংশ, শিশুপাল, জরাসন্ধ ইত্যাদি বহু খ্যাতিসম্পন্ন অসুর নৃপতির অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। যজ্ঞধর্মী বেদবাদীরা প্রবল অসুর বিরোধী হলেও অসুরের সঙ্গে তাদের দ্বন্দ্বের অবসান পরিপূর্ণ যজ্ঞীয় সংস্কৃতির আনুকূল্যে হয়নি। যজ্ঞপন্থীরা যেখানে প্রাত্যহিক অগ্নিহোত্র বা আড়ম্বরপূর্ণ অশ্বমেধ, রাজসূয় রাজপেয় শৌত্রামনি ইত্যাদি যজ্ঞের কর্ম-কাণ্ড নিয়ে পরিমণ্ডিত হয়ে থাকতেন তখনই অসুরদের সংস্কৃতির অন্যতর বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়। বৈদিক সাহিত্যে অসুরদের অসংখ্য পুর বা দৃঢ় সংরক্ষিত জনপদের উল্লেখ আছে। এরা যে বস্তুগত ও ব্যবহারিক সংস্কৃতিতে যথেষ্টই অগ্রসর ছিল এ-সিদ্ধান্ত বৈদিক সাহিত্য থেকেই করা যায়। পুরাণগুলিতে আবার আসুর সংস্কৃতির অন্য একটি দিকও বিধৃত আছে। পুরাণের স্বীকৃতি মতেই দেবতারা উদ্দেশ্য সাধনে খল, সত্যভঙ্গ-কারী এবং প্রতারক, অন্যদিকে অসুররা অধিকতর কুশলী এবং বলবান হলেও সত্যসন্ধ ও সরল। দেবধর্মীদের নিকট অসুরদের পরাজয়ের এই স্বভাবও ছিল অন্যতম কারণ। এছাড়া অসুরদের সম্পর্কে আর একটি সংবাদ উল্লেখযোগ্য। যজ্ঞপন্থীদের দেবতা ইন্দ্র শতক্রতু অর্থাৎ বহু যজ্ঞের কারক। অসুরেরা ধ্যানী, তাদের অনেকেই বহুকাল ব্যাপী ধ্যানে ব্যাপৃত, সমাহিত। বেদের ঋষিদের যজ্ঞই একমাত্র কৃত্য ; ধ্যানের কথা বৈদিক সাহিত্যে উল্লেখ পাওয়া যায় না। পুরাণের মুনিঋষিরা কিন্তু যজ্ঞ অপেক্ষা ধ্যানেই অধিকতর আগ্রহী। বস্তুত যজ্ঞের সঙ্গে ধ্যানের এই সংমিশ্রণ ও সহাবস্থান যজ্ঞ সংস্কৃতির সঙ্গে প্রাকযজ্ঞীয় সমাজ উদ্ভূত স্মরণ মনন ধ্যান ও কর্মের সমন্বয়েরই ফল। চিন্তা ও ধ্যানলব্ধ প্রজ্ঞার পরিচয় পাওয়া যায় উপনিষদের প্রতিবেদনে। এই উপনিবেশ সমূহের বেশ কিছুটা বোধ হয় কোশল বিদেহ ইত্যাদি প্রাচ্য দেশেই অদ্ভুত হয়েছিল। এই সকল উপনিষদে যজ্ঞপন্থী বেদবাদের প্রত্যক্ষ প্রত্যব্যয় না থাকলেও বৈদিক

মনন কল্পনাকে উপনিষদবাদ যে বহুলাংশে অতিক্রম করে এসেছিল এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই ঔপনিষদিক জ্ঞান বিশ্লেষণের পরিণতিতেই যে কোশল বিদেহ অঞ্চলে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের উত্থান হয়েছিল এ কথা আজ সর্বজন স্বীকৃত। মহাভারতের নানা কাহিনীতে যেমন লোকজীবনের কিছু পরিচয় লক্ষ্য করা যায় বৌদ্ধ জাতকগুলি তেমনি অত্যন্ত ব্যাপকভাবে জনজীবনের সাম্যে সমৃদ্ধ। সাধারণ মানুষের বিষয় কর্ম, পেশা, উপার্জন, সংসারযাত্রা, পারস্পরিক সম্পর্ক, শত্রুতা ও ভালবাসা; প্রেম ও বিদ্বেষ, আশা আকাঙ্খা ইত্যাদি নানা বৈচিত্র্যমণ্ডিত জীবন প্রবাহের সমুজ্জ্বল পরিচয়ে পরিপূর্ণ জাতক কাহিনীগুলি প্রাচীন ভারতের জীবনচিত্রের উজ্জ্বলতম আলেখ্য। এই সব কাহিনী অবলম্বনে অন্যদিকে রূপশিল্পীরা যে তক্ষণচিত্র রচনা করেছিলেন ভারহুত, সাঁচী, বুদ্ধগয়া ইত্যাদি বৌদ্ধ শিল্পক্ষেত্রে তার সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। বৌদ্ধসাহিত্য ও পূর্বভারত তথা অঙ্গ, ,বঙ্গ কলিঙ্গ পুণ্ড্র, সুক্ষ্ম প্রাগজ্যোতিষ সম্পর্কে অনুচ্চার থাকলেও সমকালীন পূর্বভারতের পাটলীপুত্র, বৈশালী, তমলুক, বেড়াচাপা, বানগড়, পাণ্ডুরাজার ঢিপি ইত্যাদি অঞ্চলে আবিস্কৃত পোড়ামাটির নানা কুশল চিত্রবিন্যাসে অনুরূপ জীবনপ্রবাহের প্রত্যক্ষ পরিচয় পাওয়া যায়।

আর্যাবর্তের জ্ঞান ও পরিচয়ের পরিধিতে পূর্বভারত অজ্ঞাত থাকলেও পূর্বভারতের পরিচয়ের গণ্ডিতে বেদে পরিকল্পিত দেবদেবী, পরিচিত জননেতা [ যেমন ব্যসরাজ উদয়ন ] ইত্যাদির কাহিনী অজ্ঞাত ছিল না। এই যুগের পূর্বভারতের জনজীবন মূল ভারতখণ্ডের জন-জীবন থেকে অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধতরই ছিল, তমলুক, বেড়াচাপা, বানগড় ইত্যাদি অঞ্চলে আবিষ্কৃত বিচিত্র অলঙ্কার ও বেশভূষা মণ্ডিত সৌষ্ঠবপূর্ণ দেহগঠন সমৃদ্ধ অসংখ্য নারী ও পুরুষ মূর্তি এবং জীবনদৃশ্য থেকে এ কথাই অনুমান হয়। যে ব্যাপকভাবে সুলভতম ব্যবহার্য উপকরণ পোড়ামাটিতে এই সব গৃহগত ব্যবহারের উপযোগী জীবনচিত্র

পাওয়া যাচ্ছে তাতে এই সব জীবনচিত্র যে তৎকালীন জনজীবনেই প্রতিফলিত রূপ একথা মনে করা খুব অসঙ্গত হবে না। এই সব উপকরণ থেকে পরিচিত সাধারণ মানুষের জীবনের মান সবিশেষ উন্নত, ভোগ প্রকরণ ব্যাপক ও বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং জীবনের সুখ সমৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য না হলে এই ধরনের আলেখ্যের প্রবর্তন সম্ভব হত না। সহজ ও নিরুদ্বেগ এই জীবন যে ক্ষাত্রশক্তিতেই ন্যূন ছিল না, আলেকজাণ্ডারের অনুগামী ঐতিহাসিকদের রচনায়ও তার প্রমাণ পাওয়া যায়। উত্তরখণ্ডের শক্তিধর রাজপুরুষ পুরুর সঙ্গে সংঘর্ষের পর পূর্বভারতের বহুবীর্য সম্পন্ন প্রাসিয়য় ও গঙ্গারিডির অধিপতির সঙ্গে সম্ভাব্য সংঘর্ষের আশঙ্কা আলেকজাণ্ডারের সৈন্যদলকে যথেষ্ট উৎকণ্ঠিত করে তুলেছিল গ্রীক লেখকরাই তার সাক্ষ্য রেখে গেছেন। নিম্নগাঙ্গেয় অববাহিকায় প্রাচ্য ও গঙ্গারিডি রাজ্য যে বর্তমানের মগধ ও বঙ্গদেশ, একথা ইতিহাসসম্মত বলে গণ্য। এরপর পরবর্তীকালের ইতিহাসে এই প্রাচ্যখণ্ডে মৌর্য, গুপ্ত, গৌড় ও পাল সাম্রাজের অভ্যুত্থান এবং গৌড়ীয় পাঠান রাজ্যের যে জনজীবনের সন্ধান পাওয়া যায় সংস্কৃতি এবং জীবন সম্ভারে তার সমৃদ্ধি স্বভাবতই উল্লেখনীয়।

## প্রাচ্য সংস্কৃতির অর্থনৈতিক ভিত্তি

প্রাচ্যভারতের সংস্কৃতিগত জীবনপ্রবাহের ঐতিহাসিক ভিত্তির গঠনে এই অঞ্চলের সম্পদ বিন্যাসের প্রভাবও এই প্রসঙ্গে উল্লিখিত হওয়া প্রয়োজন। উত্তর ভারতের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রভাবকে দীর্ঘকাল উপেক্ষা করে পূর্বভারত যখন আত্মস্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলছিল তখনই এখানকার সমাজের মধ্যে যে যথেষ্ট পরিমাণে শক্তির সঞ্চয় ঘটেছিল একথা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। মহাভারতে উল্লিখিত পুণ্ড্র দেশের শক্তিধর অধিপতি বাসুদেব, পাণ্ডব শক্তির প্রতিনিধি ভীষ্মের দিগ্বীজয়ের প্রতিরোধকারী পুণ্ড্র, বঙ্গ, কলিঙ্গ

[illegible]র ক্ষাত্র শক্তি ও বীর্যবত্তা কলিদাসের রঘুবংশে বর্ণিত গঙ্গাস্রোতের কূলে মহাপরাক্রমশালী মহাপ্রতাপশালী বঙ্গগণের দোর্দণ্ড প্রতিরোধ বাহিনীত স্পষ্টতই উত্তরভারতের সম্প্রসারণশীল রণশক্তির বিরুদ্ধে পূর্বভারতের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার ইঙ্গিত লক্ষ্য করা যায়। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে গঙ্গাযমুনার অন্তরালবর্তী রাষ্ট্রশক্তি প্রাধান্য বিস্তার করে থাকলেও ঐতিহাসিক যুগে মগধের নন্দরাজ বংশ অতীতের জরাসন্ধের চক্রবর্তীত্ব লাভের স্বপ্নকে সফল করেছিল। নন্দদের উত্তরাধিকারী মৌর্যেরা ঐতিহাসিক যুগে প্রথম প্রত্যক্ষভাবে সমগ্র ভারতব্যাপী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে সমগ্র জম্বুদ্বীপে একটি ঐক্যবদ্ধ সংস্কৃতি গড়ে তুলতে ব্রতী হয়েছিলেন। মৌর্যরাজ অশোকের ধর্মবিজয়ের ঘোষণা স্থান ও কালের সীমানাকে অতিক্রম করে আজও ভারতীয় সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করছে। নন্দরাজ বা মৌর্যদের এই সুবিপুল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ভিত্তিভূমি কখনও উপযুক্ত আর্থিক বনিয়াদ ভিন্ন সম্ভব হয়নি। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের নিম্ন অববাহিকার উর্বর ক্ষেত্র সম্ভূত অপ্রমেয় শষ্য সম্ভারই এই অর্থনৈতিক সম্পদের একমাত্র উপকরণ ছিল না। শিল্পমণ্ডিত নানা ভোগ্যপণ্য উৎপাদনে এবং সেই পণ্যের পসরা বাণিজ্য ব্যপদেশে রপ্তানী করেও যে এই অঞ্চলের আর্থিক সমৃদ্ধির বনিয়াদ সুপ্রাচীন কাল থেকেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এ সম্পর্কে প্রমাণের কিছু অভাব নেই। কৌটীল্য অর্থশাস্ত্রে বঙ্গের যে দুকূল বস্ত্রের প্রশংসা করেছেন, খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দীর গ্রীক অনামী লেখক পেরিপ্লাস এবং ভৌগলিক টলেমীর রচনায় পূর্বভারতীয় বাণিজ্য উপকরণের মধ্যে সেই সূক্ষ্ম মস্‌লিন বস্ত্রের রপ্তানীর উল্লেখ পাওয়া যায়। ঐ আমলেই অমিত প্রতাপ গঙ্গারিডি রাজ্য এবং নিম্নগাঙ্গেয় অববাহিকায় বহু বন্দর-গঞ্জের খ্যাতি সুদূর রোমক জগতে গিয়ে পৌঁছে ছিল। নানাবিধ পণ্য রপ্তানী করে এই অঞ্চল যে অপ্রমেয় রোমক সুবর্ণমুদ্রা উপার্জন করে আনত, ল্যাটিন লেখক প্লিনির রচনায় সে সম্বন্ধে খেদোক্তি আছে। গুপ্ত আমলে গুপ্ত সম্রাটেরা পশ্চিমে

আরব সাগর পর্যন্ত যে সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিল এবং অসংখ্য সুবর্ণ-মুদ্রা প্রচলনে যে অর্থ নৈতিক সমৃদ্ধির প্রবর্তন করেছিল তার পেছনেও ছিল প্রাচ্য ভারতের এই আর্থিক সম্পদের প্রভাব। সাম্রাজ্যের এই ব্যাপ্তি ও বিস্তৃতি না থাকলেও সুপ্রাচীন যুগের ব্যক্তিজীবন ও সমাজ-বিন্যাসের যে পরিচয় পাটলীপুত্র, তমলুক, বেড়াচপা, বানগড়, মহাস্থান ইত্যাদি প্রত্নসম্পদের কেন্দ্রগুলি থেকে পাওয়া যায় সেই সংস্কৃতি গুপ্ত আমলের মাধ্যাহ্নিক দীপ্তি অপেক্ষা খুব কিছু কম ছিল না। সাগর-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আরব প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় পূর্বভারতের এই বাণিজ্য সমৃদ্ধিতে ভাটা পড়লেও পাল আমলের অবসানকাল পর্যন্ত পূর্বভারত আপন স্বাতন্ত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। সেন আমলের সামাজিক সংকীর্ণতা এবং আর্থিক অনটন পূর্বভারতকে ঐতিহাসিক দিক থেকে এক অবরোধ অবস্থার সম্মুখীন করে তোলে; এর পর আসে তুর্কী উপদ্রব। অতি সমৃদ্ধ আর্থিক বনিয়াদ ক্ষীয়মান হতে শুরু করে; পূর্বভারত হয়ে পড়ে এক বিচ্ছিন্নতার শিকার। যেখানে গুপ্তযুগে ভূমি বিক্রয়ের মাধ্যম ছিল সুবর্ণমুদ্রা সেখানে সেন আমল থেকে বিনিময়ের মাধ্যম হয়ে পড়ে কড়ি। নালন্দা, বিক্রমশীলা, সোমপুর, জগদ্দল ইত্যাদি বিশ্রুতখ্যাতি শিক্ষাকেন্দ্রগুলির উৎপাদন, বৃহত্তর জগতের সঙ্গে আদান-প্রদানের অবসান এবং আত্মরক্ষার তাগিদে সঞ্জাত সীমিত আত্ম-প্রবণতা পূর্বভারতকে এক নূতন ইতিহাসের সম্মুখীন করে তোলে। এই অবদমনের পর্বে পূর্বভারত সংস্কৃতির সেই তুঙ্গক্ষেত্র থেকে বিচ্যুত হয়ে দীর্ঘকাল অতিবাহিত করেছে। এখন চলেছে তার আত্মানুসন্ধান।

## জন সংস্কৃতির রূপ ও বৈশিষ্ট্য

যখনই কোন সংস্কৃতিকে লোকসংস্কৃতি বা জনসংস্কৃতি বলে অভিহিত করা হয় তখনই মনে মনে একটি উচ্চতর বা বিদগ্ধ সংস্কৃতি ও সেই সংস্কৃতির সঙ্গে লোকসংস্কৃতির ব্যবধানের ছবি জেগে ওঠে। বস্তুত পূর্বভারত তথা ভারতের সর্বত্র লোকসংস্কৃতি নিরপেক্ষ কোন বিদগ্ধ

সংস্কৃতির অস্তিত্ব সম্পর্কে তেমন কিছু প্রমাণ আছে বলে মনে হয়না। বহুযুগ আগে পাণিনির রচনায় শিল্পকলা সম্পর্কে উল্লেখে রাজশিল্প ও জনশিল্প নামে দুই ধারার শিল্পের অস্তিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। অনুমান হয় রাজণ্য শ্রেণী পরিভোগের জন্য সৃষ্ট শিল্প উপকরণকেই তিনি রাজশিল্প বলে অভিহিত করেছিলেন। পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিভিন্ন যুগে বহু সংস্কৃতি ও সভ্যতার উদ্ভব হয়েছে। সুপ্রাচীন যুগ থেকে এই সব সংস্কৃতির পরিচয় নিলে দেখা যায় মিশর, ক্রীট, সুমের, আসুর ও বাবিলন ইত্যাদি অঞ্চলের সংস্কৃতি ছিল ফারাও, সম্রাট এবং পুরোহিতকেন্দ্রিক উচ্চ কোটির সংস্কৃতি। গ্রীস ও রোমে প্রথম কিছু পরিমাণে বৃহত্তর জনগোষ্ঠি ভিত্তিক সংস্কৃতি আত্মপ্রকাশ করে থাকলেও এই উভয় সংস্কৃতির কালোত্তীর্ণ উপকরণগুলিও মিশর, ক্রীট ইত্যাদি অঞ্চলের মানুষের কর্তৃত্ব ও অধিকার, অপ্রমেয় ভোগপ্রবণতা এবং পরস্বাপহরণ ও শোষণের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সংস্কৃতি ধ্বংসে পর্যবসিত হওয়ার পূর্বে কোন ক্ষেত্রেই নিজ নিজ সংক্ষিপ্ত পরিধি ছাড়িয়ে বিস্তৃততর জনসমাজকে উদ্‌বুদ্ধ করতে পারেনি বা সংস্কারের আওতায় আনতে পারেনি।

ভারতবর্ষের সংস্কৃতির বিশ্লেষণে দেখা যায় যে বৈদিক সংস্কৃতির ভিত্তি ছিল বিশ বা জন নামে পরিচিত জনসমষ্টি, এদের প্রাত্যহিক জীবনের ব্যবহারিক দিক অত্যন্ত সরল ও সাধারণ। এদের সমাজের পরিচালনায় বিশ্‌পতি বা রাজন নামে পরিচিত রাজা থাকলেও আড়ম্বর-পূর্ণ রাজপ্রাসাদ, রাজা বা পুরোহিতের কর্তৃত্বের দ্যোতক প্রতিকৃতি, দেবমূর্তি বা সমাধির কোন অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। যারা হরপ্পা ও মহেঞ্জোদরোর নাগর সভ্যতার পত্তন করেছিল তাদের মধ্যেও উচ্চ-কোটির সমাজ ও সাধারণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিভেদের দ্যোতক উপকরণের খুব সন্ধান পাওয়া যায়না। নগরবিন্যাস, গৃহনির্মাণ ইত্যাদি বিষয়ে প্রভূত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার পরিচয় থাকলেও হরপ্পা সভ্যতা আড়ম্বরহীনতা, সাধারণ সরলতা ও সামরিক-শোষণহীনতারই পরিচয় দেয়।

পূর্বভারতে সমসাময়িক যুগে যে সব জনবসতি গড়ে উঠেছিল সেখানেও হয়ত অনুরূপ অনাড়ম্বর সরল জীবনেরই প্রচলন ছিল।[৮] হরপ্পা সভ্যতার মতই ধাতুদ্রব্যের অভাব, উপকরণ হিসেবে মাটির তৈরি পাত্র ও পুতুলের ব্যাপক ব্যবহারকে মগধের পাটলীপুত্র থেকে পূর্বে আসামের গৌহাটী পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য বলে গণ্য করা যেতে পারে। কিন্তু অপ্রত্যক্ষভাবে এই সব উপকরণ থেকে সংস্কৃতি আর যে সব পরিচয় পাওয়া যায় তা কিন্তু কম ব্যাপকতা বা ঐশ্বর্যমণ্ডিত নয়। এই সূত্রেই মনে হয় এখানকার এই সরল ও অনাড়ম্বর ভিত্তির উপরই এক উন্নততর মনন ও গভীর ব্যঞ্জনাপূর্ণ সংস্কৃতির উদ্ভব হয়েছিল। পরবর্তী যুগে প্রাচীন মিশর, সুমের বা পারস্য অপেক্ষা অনেক বিস্তৃততর সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হলেও পূর্বভারতের মৌর্য, গুপ্ত, গৌড় বা পাল সম্রাটদের অহঙ্কার, ক্ষমতা, ঐশ্বর্য বা স্থায়িত্বগর্বী স্মৃতির কোন উপকরণ প্রত্নতাত্ত্বিকেরা খুঁজে পাননি। কিন্তু এই সভ্যতা যে নির্মাণ কৌশলে, ব্যবহারিক উপকরণের বৈচিত্র্যে এবং সৌকর্যে, সাহিত্যে, শিল্পে প্রভূত উন্নতি করেছিল সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। একথা প্রমাণ করা খুব দুরূহ নয় যে সংস্কৃতির এই ঔৎকর্ষ জনজীবনকে অবদমিত করে ব্যাপক শোষণের উপর এক বিচ্ছিন্ন সংখ্যালঘিষ্ঠ গোষ্ঠি দ্বারা সাধিত হয়নি; উপলব্ধির ব্যাপকতায় সমাজের গণ্ডিভুক্ত সকল জনসমষ্টিই এই উন্নততর সংস্কৃতির অংশীদারত্বে প্রতিষ্ঠিত ছিল; মনন ও উপলব্ধির ক্ষেত্রে যা কিছু উন্নত নানা উপায়ে সেই সব সম্পদ সমাজের নিম্নতর স্তরেও সঞ্চারিত করা হয়েছিল। ফলে একসময় তুর্কী উপপ্লবের ফলে উচ্চকোটির সমাজ তার জীবনধারা বজায় রেখে নূতন সৃষ্টিতে আর পূর্বের পারদর্শিতা অর্জন করতে না পারলেও সংস্কৃতির মৌলিক সম্পদ জীবনের প্রেরণা ও সংগ্রামশীলতা নিয়ে জনসমাজ জাগ্রত রইল সুযোগের সন্ধানে। তাই লক্ষ্য করা যায় যে তুর্কী আক্রমণের অল্পকালের মধ্যে লোকসমাজ প্রচলিত জীবনে গতি সঞ্চার করে পুনরায় আত্মবিকাশে তৎপর হয়ে ওঠে।

এই যুগেও ওড়িশা প্রচলিত জীবনধারা বজায় রেখে চলছিল। ব্রহ্মপুত্রের উত্তরাঞ্চলে ও বিস্তৃত পূর্বখণ্ডের জনজীবনও আরও দীর্ঘকাল স্বকীয় ধারায় প্রবাহিত হতে থাকল। এই যুগেই দেখি মিথিলায়, বঙ্গে, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় ও উড়িশায় লোকসংস্কৃতির এক নূতন উদ্বর্তন। এই সংস্কৃতি আত্মপ্রকাশ করে সাহিত্যে ও কাব্যে, গৃহ, মন্দির ও মসজিদ নির্মাণে, পোড়ামাটির খোদাইয়ের কাজে ও পটের ছবিতে, ধাতু, কাঠ ও মাটির মূর্তিতে। নানা গ্রামদেবতা ও মুসলমানদের পীর সম্পর্কে চেতনায়, ধাতু, কাঠ, বেত, বাঁশ, হাতীর দাত, মাটি ইত্যাদি উপকরণে তৈরি ব্যবহারিক নানা উপকরণে, গীতে, নৃত্যে, মেলায় উৎসবে এবং জীবনের নানা উপলক্ষে।

## কাব্য ও সাহিত্য

তুর্কী আগমনে দেশের প্রাচীন শিক্ষাকেন্দ্রগুলি গুরুতররূপে ক্ষতিগ্রস্ত হলে সংস্কৃতের চর্চায় ভাটা পড়ে এবং উচ্চ সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান বাহন সংস্কৃত ভাষায় নূতন সৃজনকর্ম অসম্ভব হয়ে পড়ে। রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্ত কিছুটা স্থিতিলাভ করলে পুনরায় জনসমাজে সাহিত্যের দাবী দেখা দেয়। এই বার দেখা দেয় এক নূতন বৈচিত্র্য; সাধারণ মানুষের কথিত ভাষায় সংস্কৃতির প্রধান বাহক রামায়ণ মহাভারত যেমন সমাজের দাবিতে অনুদিত হয় তেমনি আত্মপ্রকাশ করতে থাকে বৈষ্ণব কবিদের রসমধুর ও ভাবগর্ভ পদাবলী সাহিত্য; আর সেই সঙ্গে কীর্তনের সুমধুর নিস্বনে লোকজীবন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। অতীতে স্মৃতি ও কল্পনাকে অবলম্বন করে রচিত হয় মঙ্গল কাব্যগুলি। এই সব মঙ্গল কাব্য পূর্বভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের জনমানসে ভাবগর্ভ ও বৈচিত্রপূর্ণ উপলব্ধির জোগান দিয়ে এক অভূতপূর্ব মায়া লোকের সৃষ্টি করেছিল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে মিথিলার কবি বিদ্যাপতি, গৌড়ের চণ্ডিদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস ইত্যাদির কথা, আসামের শঙ্করদেব এবং ওড়িশার জানা না-জানা বহুগীতকর্তার। এই

বৈষ্ণব জাগরণের মধ্যে জনচেতনার ভাবগর্ভ স্মরণের সঙ্গে সামাজিক শক্তি সঞ্চয়ের ও আত্মরক্ষার প্রয়াসও দেখা দিয়েছিল। এ ছাড়া সমন্বয়, গোড়ামী থেকে মুক্তি এবং পরমত সহিষ্ণুতার অনুশীলন এই বৈষ্ণব জীবনচর্যার অন্যতম বিশেষত্বরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। বৃহৎ প্রাচ্যখণ্ডের ঐক্য ও সমন্বয় সাধনে মধ্যযুগের এই সাহিত্য আজও জনমানসকে অনুপ্রাণিত করে রেখেছে।

## গৃহ, মন্দির ও মসজিদ

সংস্কৃতির অন্যতম অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যায় প্রাত্যহিক জীবন-যাত্রার আশ্রয়স্থল আবাসগৃহের সংস্থান ও রূপ কল্পনায়। উপকরণের তারতম্যে খড়, পাতা, খোলার আচ্ছাদন, মাটি বা বাঁশের বেড়া পূর্বাঞ্চলের আবাসগৃহ নির্মাণে ব্যবহৃত হলেও নিকোনো দাওয়া, পরিচ্ছন্ন গৃহাভ্যন্তর এবং গড়ানো চাল এই অঞ্চলের আবাসগৃহের পরিকল্পনাকে এক রূপসমৃদ্ধ আকৃতি দিয়েছিল। আবাসগৃহের এই মৌলিক রূপটির সৌন্দর্যের কাঠামো অনায়াসে আরোপ করে বাংলার স্থপতি এক অপূর্ব মন্দিরশিল্প গড়ে তুলেছিল, বাংলার জনজীবনের সঙ্গে দৈনন্দিন দেবসেবা এবং উৎসব আনন্দে যার সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। গগনচুম্বীশিখর সম্বলিত যে অপরূপ মন্দির পূর্বভারতকে একদিন অলঙ্কৃত করে তুলেছিল ওড়িশার অধিবাসিরা আজও তার প্রসাদে সমৃদ্ধ থাকিলেও আসাম, পার্বত্য পূর্বাঞ্চল, বাংলা বা বিহারে সেই প্রাচীন মন্দির ধারার অবশেষ আজ বড় একটা দেখা যায় না। কিন্তু বাংলার স্থপতি পূর্বাঞ্চলীয় চালা ঘরের অনুকৃতির উপর প্রাচীন শিখর মন্দিরের চূড়া আরোপ করে যে মন্দির রচনা করেন, বিহার, ওড়িশা ও আসামেও তার প্রভাব অনুভূত হয়েছিল। তেমনি মাথার শীর্ষে গম্বুজ এবং কোণে কোণে টুপির মত ছাতে ঢাকা চাতালে অলংকৃত মসজিদের মূল কাঠামোটি দিল্লীর তুগলকী প্রভাবদ্বারা রূপায়িত হলেও বাংলার স্থপতি মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রার্থনাগৃহেও মনোহর গড়ান আচ্ছাদনের

সমাবেশ করে একটা বৈশিষ্টপূর্ণ রূপ দিয়েছিল। পরিত্যক্ত রাজধানী গৌড়ের কদমরসুল ( ১৫৩০ খৃঃ অঃ ) মসজিদ থেকেই এই বৈশিষ্ট্যটির ব্যাপক বিস্তৃতি লক্ষ্য করা যায়। ইটের তৈরি মসজিদের প্রাচীরে সুন্দর নক্সাকাটা টালির ব্যবহারও পূর্বভারতের নিজস্ব সংযোজন।

## পোড়ামাটির খোদাই ও ঢালাই

পূর্বভারত সংস্কৃতির আর একটি বৈশিষ্ট্য পোড়ামাটির তক্ষণ শিল্প। চন্দ্রকেতুগড়ে মণামিহিরের ঢিবির, অধুনা খুঁড়ে-পাওয়া বিপুল ইটের তৈরী মন্দিরটির গায় সম্ভবত গুপ্ত আমলের কিছু পোড়ামাটির কাজের পরিচয় আছে। এই ধরনের মন্দির প্রাচীর অলঙ্করণের জন্য ব্যবহৃত পোড়ামাটির কাজের প্রাচুর্য পাল আমলের *পাহাড়পুর মন্দিরের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বিহারের নালন্দা* ও বিহার শরিফে, পূর্ববঙ্গের [ বর্তমান বাংলাদেশের ] কুমিল্লার ময়নামতি ও ঢাকার সাভার এবং আসামের গৌহাটী থেকে এই ধরনের পোড়ামাটির কাজ আবিষ্কৃত হওয়ায় সমগ্র পূর্ব-ভারতেই যে এক সময় পোড়ামাটির শিল্পের আদর হয়েছিল তার পরিচয় পাওয়া যায়।

পরে নিকট অতীতে মন্দিরের প্রাচীরকে অবলম্বন করে পোড়ামাটির শিল্পের যে ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল তার তুলনা বিরল। ভাগবতের কৃষ্ণজীবন এবং রামায়ণের রাম-রাবণের যুদ্ধকে অবলম্বন করে প্রধানত এই পোড়ামাটির ফলকগুলি রচিত হলেও পালযুগের জনজীবনের নানা আলেখ্যের মত এই সব মন্দির ফলকে সমসাময়িক দৃষ্টিতে দেখা লোকজীবনের নানা উল্লেখযোগ্য দৃশ্যে বড় সমাবেশ দেখা যায়। পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে প্রচলিত জীবন প্রবাহের এই সব আলেখ্য জনমানসের এক বৈচিত্র্যপূর্ণ সংবেদন রূপেই সমাজকে অনুপ্রাণিত করেছে। পটের ছবি যেন এই বিচিত্র মৃৎফলকেরই বর্ণসম্ভারে সমুজ্জ্বল পরিপূরক। মিথিলার গৃহ-বধূরা নানা উপলক্ষ্যে যে সব নক্সা বা দৃশ্যচিত্র এখনও আঁকেন

তার সংবেদন যেমন গভীর, ওড়িশার চিত্রকরদের জগন্নাথের পট বা নানা ভঙ্গীতে আঁকা নরনারীর মূর্তি তেমনি সহজ আনন্দের পরিচয়ে সমৃদ্ধ। এই দিক থেকে বাংলার পটুয়া শ্রেণীর আঁকা গড়ানো পটে এক বহু প্রাচীন লোক মনোরঞ্জন প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। বৌদ্ধযুগে মংখলী বা চরণচিত্রের মুদ্রারাক্ষসের পটচিত্রের, হর্ষচরিতের যমপট্টিকের ধারাবাহী বাংলার এই পটুয়াচিত্র জনমানসে সংবেদন সঞ্চায়ের উপকরণ হিসেবে কোন এক প্রাণশক্তির ক্রিয়ায় কিভাবে এই বিংশ শতাব্দী পর্যন্তও সজীব রয়েছে তা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য না করে পারা যায় না।

## ধাতু, কাঠ ও মাটির মূর্তি ও পুতুল

এক সময় সমাজে সমাদৃত যক্ষদেবতাদের জনপ্রিয় মূর্তি সাধারণের অধিগম্য স্থানে প্রতিষ্ঠিত করা হত। পাটনা ও মথুরায় পাওয়া বৃহদায়তন এই জাতীয় মূর্তির মতই পাটনা, তমলুক, বেড়াচাপা ইত্যাদি অঞ্চল থেকে পাওয়া ক্ষুদ্রায়ত পোড়ামাটির মূর্তিগুলি সাধারণ মানুষের রুচিতে প্রীতিকর। পরে এই জনপ্রিয় মূর্তির উপর ভাব ও গাম্ভীর্য সংযোজন করে দৈবীমূর্তির উদ্ভব হয়। প্রাচীন পরিশীলিত শিল্পরীতির ধ্বংসের পর দেবদেবী সমাহিত ভাবসমৃদ্ধ মূর্তি নির্মাণ অপ্রচলিত হয়ে পড়লেও মধ্যযুগে ধাতু, কাঠ ও মাটিতে তৈরি নানা দৈবীমূর্তি এবং সাধারণের উপভোগ্য ব্রত এবং শিশুদের ক্রিয়া উপলক্ষ্যে নির্মিত পুতুলে মূর্তি, গঠনের কৌশল এক অপূর্ব অভিব্যক্তি লাভ করে। বাংলার মন্দির-গুলিতে রাধাদামোদর রূপে পূজিত কাঠ ও অষ্টধাতুর মূর্তি, নিত্যানন্দ ও গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর নিমকাঠের মূর্তি, পাথর, অষ্টধাতু বা মাটির কালী, তারা এবং অন্যান্য দেবদেবীর মূর্তি এবং হাল আমল পর্যন্ত নানা ধাতুতে পূজিত দুর্গা, কালী, সরস্বতী ইত্যাদি দেবদেবীর মূর্তি নির্মাণে বাংলায় এক ভাব গম্ভীর এবং ঐতিহ্যপূর্ণ মূর্তি শিল্পীজনচিত্তকে পরিতৃপ্ত করে আসছিল। অন্যদিকে সুদূর আসাম থেকে বিহার ও ওড়িশা

পর্যন্ত নানা রূপ ও ঢংএ তৈরি মাটির, কাঠের এবং ক্বচিৎ শোলা এবং অন্যান্য উপকরণের তৈরি পুতুলও লোকচিত্তের অন্যতম পরিপোষক রূপে ব্যাপক স্বীকৃতি লাভ করেছিল।

## গ্রামদেবতা ও মুসলমানদের পীর

মূর্তি ও পুতুলকে অবলম্বন করে জনমানস যে বিশ্বাস ও আনন্দ-লোকের সন্ধান করেছিল তারই প্রতিফলন দেখা যায় ক্ষেত্রপাল, সপ্তমাতৃকা, বাড়াঠাকুর, দক্ষিণরায় ও মুসলমানদের ভিন্ন ভিন্ন নামের পীরের যে সব স্থান বা পূজাক্ষেত্রে। জনসংস্কৃতিতে এইসব লোক-দেবতাদের স্থানও কিছু কম উল্লেখযোগ্য নয়। পরিশীলন মার্জিত সমাজ প্রাচীন যক্ষ, নাগ, গ্রাম ও নগর দেবতাদের পরিকল্পনার উপরে ভাব ও ধ্যানের প্রকরণ বিন্যাস করে নানা দেবদেবীর পরিকল্পনা করে থাকলেও তারা লৌকিক গ্রাম ও নগরপালক দেবতাদের উৎসাদন করেনি। এক প্রবল পৌত্তলিকতা বিরোধী সংস্কৃতি সংগে নিয়ে এলেও স্থানীয় মুসলমানেরা কুসংস্কার বলে পরিগণিত এই লৌকিক চেতনায় সাড়া দিয়ে অচিরেই গ্রাম-জনপদে পীরের অবস্থানের পরিকল্পনা করে পূর্বাবস্থিত জনগোষ্ঠীর সংগে আত্মীয়তার সামিল হয়েছিল। গ্রাম-দেবতাদের ক্ষেত্রে যেমন অনেক সময় স্থানীয় হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে শ্রদ্ধা নিবেদনে সমবেত হয়েছে এই সব পীরের থানও তেমনি হিন্দুদের অগম্য থাকেনি। কঠোর রক্ষণশীল মোল্লাশ্রেণী এই অনৈশ্লামিক লৌকিক সংস্কৃতিকে প্রতিহত করতে পারেনি।

ধাতু, কাঠ, বেত, বাঁশ, হাতীর দাঁত, মাটি, চামরা, রেশম, তুলা ইত্যাদি উপকরণে তৈরি প্রাত্যহিক ব্যবহারের দ্রব্যসামগ্রীতেও এই ভাবমূর্তিটি লক্ষ্য না করে পারা যায় না। বাসনকোসন, হাড়িকুড়ি, সরা-সিকা, কাঁথা মাদুর-আসন-গালচে, ধুতি-শাড়ি সবকিছুতেই এই পূর্ব-ভারতের কারুশিল্পীরা সুপ্রাচীন যুগ থেকেই এক ইঙ্গিতগর্ভ বৈশিষ্ট্য আরোপ করে রেখেছে। নাগাদের নক্সাকরা কাপড়, মনিপুর ও ত্রিপুরার

বাঁশ-বেতের কাজ, আসামের এণ্ডি-মুগা, শিলেটের শীতলপাটী, খাগরার বাসন, ঢাকার শাড়ি, সবং-এর মাদুর, পুরীর বটুয়া, সম্বলপুরের শাড়ি—উদাহরণের কিছু শেষ নেই। এই সব উপকরণেও জনচিত্তের সংবেদনশীলতা বিধৃত রয়েছে খুবই উল্লেখনীয় ভাবে। আর এই সংস্কৃতির সার্বিক অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যায় মেলায় ও উৎসবে গীত এবং নৃত্যে। পূর্বভারতের হেন অঞ্চল নাই যেখানে সাধারণের মিলন-ক্ষেত্ররূপে হাট বসে না, বা বৎসরের কোন এক সময় ছোট বড় মেলার অধিবেশন না হয়। এই মেলা উৎসবগুলি ছিল সাধারণ মানুষের মিলনক্ষেত্র, ভাববিনিময়ের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। স্থানীয় অধিবাসীরা দিন গুনত গ্রামের বা সন্নিকটবর্তী অঞ্চলের মেলার দিনটির। যেখানে বহু জনসম্মেলনে এক অভাবনীয় ঐক্য ও আনন্দের আস্বাদনে জন-মানস তৃপ্তিলাভ করত, মুক্তি পেত বিচ্ছিন্নতা থেকে, অনুভব করত বহুজনের সান্নিধ্যে বিশ্বজগতে তার অস্তিত্বের স্বার্থকতা—আমি আছি, আরও অনেকের মত ব্যক্তি হিসেবে সেও যে সত্য—অণুপরিমাণ হলেও পৃথিবীর জনগোষ্ঠীর মধ্যে সেও অন্যতম, এই চেতনার সৃষ্টিতে এই ধরনের উৎসব ও মেলার সাংস্কৃতিক মূল্য ছিল অপ্রমেয়।

এই সামগ্রিক সংস্কৃতির অনেক কিছুই হয়ত ছিল অনাবশ্যক ও অর্থহীন ; উন্নাসিকদের বিশ্লেষণে এর মধ্যে হয়ত কুসংস্কারই ছিল প্রধান। কিন্তু সামগ্রিক বিচারে এই জনসংস্কৃতি সমাজ পোষণে যে উল্লেখযোগ্য স্থান গ্রহণ করেছিল তা খুবই উল্লেখযোগ্য। বহু বিবর্তনের ভেতর দিয়ে এই সংস্কৃতিকে অবলম্বন করেই সমাজ বর্তমানের যুগসন্ধিক্ষণে উপনীত হয়েছে।

দ্রুত পরিবর্তনের ফলে এই সংস্কৃতির যা কিছু অবশিষ্ট আছে অচিরেই হয়ত তার অনেক কিছুরই বিলোপ ঘটবে সন্দেহ নেই। অর্থ-নৈতিক ও উৎপাদন ব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তনে সংস্কৃতির নানা পরিচয় ও ভিন্ন ভিন্ন অভিব্যক্তি দ্রুত অবলুপ্ত হয়ে যাবে। কিন্তু এই সংস্কৃতির মৌলিক যে সংবেদন ছিল, তার সঙ্গে পরিচয় বিলুপ্ত হলে

নবীন সংস্কৃতি গঠনে এবং সেই সংস্কৃতিকে প্রকৃত জনকল্যাণে সুপ্রতিষ্ঠিত করা খুব সহজসাধ্য হবে না। বহু শতাব্দীর এই সংস্কৃতির অন্তরালে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে এক মানবিক মূল্যবোধ সক্রিয় ছিল. সেই সংস্কৃতিতে মানুষে মানুষে ছিল একটা ঐক্যবোধ ও আত্মীয়তা প্রতিষ্ঠার প্রয়াস। যে মনন এবং সরল অনুষ্ঠান ও উপভোগের মাধ্যমে জীবনকে পরিচালিত করার প্রয়াস এই সংস্কৃতিতে ছিল ভবিষ্যতের স্বার্থেই সে সম্বন্ধে সচেতনতা থাকা প্রয়োজন। আজ তাই লোক সংস্কৃতির উপর গবেষণার উৎসাহ ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই ক্রিয়াশীল হয়ে উঠছে। যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান এবং উৎসাহী গবেষক লোক-সংস্কৃতিকে নিয়ে অন্বেষণ, পর্যবেক্ষণ করছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাদের আয়োজিত সাংস্কৃতিক উৎসবে লোকসংস্কৃতির আলোচনাকে স্থান দেওয়ায় উৎসাহিত বোধ করবেন। এই সমস্ত গবেষণার উপযুক্ত পরিবেশ হয়ত এমনি করেই গড়ে উঠবে। জনজীবন ও জনসংস্কৃতি সম্পর্কে এই উৎসাহী শ্রোতাদের সমাবেশে আমার বক্তব্য উপস্থিত করার সুযোগ দেওয়ার উদ্যোক্তাদের বহু ধন্যবাদ দিয়ে আমার প্রসঙ্গ শেষ করছি।

# পূর্বভারতের লোকসংস্কৃতি

ডঃ অরুণকুমার বসু

হেলিকপ্‌টারে চেপে বন্যাপ্লাবিত অঞ্চল পরিদর্শন করা যায়। মোটরলঞ্চে চেপে নদীকূলের ভাঙনের চেহারা চেনা যায়; কিন্তু শহরের সুসজ্জিত মঞ্চে দাঁড়িয়ে কয়েক মিনিটের বক্তৃতায় বিরাট পূর্বভারতের লোকসংস্কৃতির সমীক্ষা করা যায় না; যারা গাছ-গাছালি নিয়ে গবেষণা করেন, তারা পায়ে হেঁটে দিনের পর দিন ধরে জঙ্গলে ঘুরে অশেষ পরিশ্রমে লতাপাতায় শিকড়ে-শাখায় ফুলে-রেণুতে সন্ধানী দৃষ্টি মেলে রাখেন। তেমনি যাঁরা লোকসমাজে প্রচলিত ছড়া, ধাঁধা কিংবা রূপকথা, কি খেলাধূলার প্রকৃতি অথবা লোকজীবনে প্রচলিত বিশ্বাস-সংস্কার নিয়ে গবেষণা করেন, তাঁদেরও লোকজীবনের অন্ধিতে-সন্ধিতে দিনের পর দিন ঘুরতে হয়, সতর্ক দৃষ্টি নিয়ে। উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানী জানেন, ঠিক বিশেষ ঋতুর বিশেষ রোদ-হাওয়া-জল না পেলে জাইগো-ক্যাকটাস ট্রাংকেটাসের (Zygocactus truncatus) ফুলটি ফোটে না। লোকসংস্কৃতিবিদ্‌ও জানেন, ঠিক বিশেষ ঘটনা, বিশেষ পরিস্থিতি না ঘটলে বর্ষীয়সী গ্রামবৃদ্ধার মুখে অনুকূল প্রবচনটি খইয়ের মত ফোটে না। কিংবা গ্রহ নক্ষত্রের ঠিক ঠাক যোগাযোগ না ঘটলে যখন তখন উৎসবের উলুধ্বনি ওঠে না। বিপুল মানবজীবন রহস্য রাজসিংহাসনের পতন-অভ্যুত্থানে, যুদ্ধজয়ে, রাজ্যাভিযানে নয়। তার প্রাতঃসন্ধ্যার নিভৃত মুহূর্তে, তার ভয়ে শঙ্কায়, অমঙ্গলে-শুভকামনায়, তার সংস্কারে-বিশ্বাসে, রোগশোকের লড়াইয়ে, আহার সংস্থানে, যৌনাচারে, বেশভূষায়, প্রীতিতে-শত্রুতায়, পূজাপার্বণে, জন্মের অভ্যর্থনায়, বিবাহের মাঙ্গলিকে, মৃত্যুর গাঢ় বিষণ্ণতায়, তার নিঃসঙ্গতায়, কিংবা তার কর্ম্মমুখরতায়। লোকসংস্কৃতির নেশায় যারা পাগল, তাঁরাও বলতে পারেন, "হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি

পৃথিবীর পথে।” কিন্তু হঠাৎ পাওয়া ক'খানি লোকগীত বা একটি চিত্রিত পুতুল 'নাটোরের বনলতা সেনে'র মত তাঁদের 'দুদণ্ড শান্তি' দিতে পারে না। অনন্ত বিশ্বসংসারে জ্যোতির্লোকে আপনার চেতনাকে প্রসারিত করেও মহাকবিকে একদিন গভীর আক্ষেপে বলতে হয়েছিল :

বিশ্বের মাঝে মানুষের সংসারটুকু
দেখতে ছোট তবু ছোট তো নয়।
তেমনি ওই কীটের সংসার।
ভালো করে চোখে পড়ে না,
তবু সমস্ত সৃষ্টির কেন্দ্রে আছে ওরা।
কত যুগ থেকে অনেক ভাবনা ওদের,
অনেক সমস্যা অনেক প্রয়োজন
অনেক দীর্ঘ ইতিহাস।
দিনের পর দিন রাতের পর রাত
চলেছে প্রাণশক্তির দুর্বার আগ্রহ।
মাঝখান দিয়ে যাই আসি
শব্দ শুনিনে ওদের চির প্রবাহিত
চৈতন্যধারার,
ওদের ক্ষুধা পিপাসা-জন্মমৃত্যুর।
গুনগুন সুরে আধখানা পদের
জোর মেলাতে খুঁজে বেড়াই
বাকি আধখানা পদ,…
ওদের নীরব নিখিলে এখনি উঠছে কি
স্পর্শে স্পর্শে সুর, ঘ্রাণে ঘ্রাণে সংগীত,
মুখে মুখে অশ্রুত আলাপ,
চলায় চলায় অব্যক্ত বেদনা। (পুনশ্চ)

আসলে লোকসংস্কৃতিও এই কীটের সংসারের মতই—'ভালো করে চোখে পড়ে না, 'তবু সমস্ত সৃষ্টির কেন্দ্রে আছে ওরা'। লোক-

সংস্কৃতির জগৎও 'ক্ষুদ্র অসীম' 'নীরব নিখিল'। তাদের অন্তরের যবনিকা তুলতে না পারলে আমাদের সংস্কৃতির ইতিহাসও জোড় হারানো গানের মত আধখানা পদ হয়ে থাকবে, সম্পূর্ণ হবে না কোনদিনই।

দুই ॥

সাধক কবি রামপ্রসাদ মানবজীবনকে জমিনের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। লোকসংস্কৃতি সেই জীবনজমির উপর জন্মানো উদ্ভিদ। কিছু আবাদ করা, কিছু সহজাত। লক্ষ কোটি তৃণগুল্ম থেকে 'দুর্গম পল্লব দুর্গ অরণ্যের ঘন অন্ধকার' পর্যন্ত ওরা মৃত্তিকার রস পান করে বেড়ে ওঠে; এই বিশ্বব্যাপ্ত বনস্পতির সঙ্গেই তুলনা করা চলে লোকসংস্কৃতিকে। মানব রক্তের গভীরে তার শিকড়। পরিবেশ ও বহির্জগত থেকে তার আলো আর হাওয়া সংগ্রহ। লোকসংগীত তার ফুল, লোকনৃত্য যেন তার পল্লবের দোলা, লোকশিল্প তার পাতাবাহার, ধর্ম বিশ্বাস সংস্কার তার শস্যের স্বাদ। উদ্ভিদ বিজ্ঞানী যেমন শুকনো ফুল সংগ্রহ করে রাখেন হারবেরিয়ামে, লোকসংস্কৃতি সংগ্রাহকও তেমনি শুকনো ব্যালাড ছাপান বইতে। এক ছোট্ট নিশ্চিন্দিপুরের ঝোপেঝাড়ে আকন্দ আলুকুশি, মুচুকুন্দ, কনকচাঁপা, অপরাজিতা, কালকাসুন্দে, গন্ধভেদালি, ধুঁধুল, বৈঁচি, সেঁয়াকুল, নাটাকাঁটা, ওড়কলমী, যজ্ঞিডুমুর, রাংচিতা, পাথরকুচি, বনতুলসীর গাছ অপুকে পাগল করেছিল। লক্ষ নিশ্চিন্দিপুরের উদ্ভিদ জগতের খোঁজখবর নিতে শত শত অপুর পথের পাঁচালি নিঃশেষ হয়ে যাবে।

লোকসংস্কৃতির কোনো বিজ্ঞানসম্মত সংজ্ঞা নিরূপণের দায়িত্ব বিশেষজ্ঞরা গ্রহণ করবেন। তাঁরা অনেকেই আজ এই বক্তৃতামঞ্চে উপস্থিত আছেন। তাঁদের দীর্ঘকালের সঞ্চিত জ্ঞানে আমাদের জিজ্ঞাসা নিবারণের পানপাত্র তাঁরা পূর্ণ করবেন। আমরা শুধু জানি, সমগ্র মানব সমাজের রীতিনীতি, সংস্কার, স্মৃতি, ধর্ম, সমাজবিন্যাস বর্ণ-গোত্র

সামাজিক শ্রেণী, আচার-প্রথা-বিশ্বাস, সাহিত্য-শিল্প, সব নিয়েই তার সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। সংস্কৃতির ক্ষেত্র যেমন ব্যাপক, তেমনি তার অনুশীলনের দিকগুলিও অত্যন্ত প্রসারিত। আমরা এক বিপুল ভূভাগের, বিপুলতর জনসমষ্টির, বহু সহস্র বর্ষের, সম্মিলিত জীবনকৃতি সম্পর্কে কি কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারি? পূর্বভারতের দশটি রাজ্যে শত শত সামাজিক গোষ্ঠী ও জনবিন্যাসের অস্তিত্ব রয়েছে। বহু লক্ষ মানুষের সংস্কারে বিশ্বাসে শিল্পে সাহিত্যে এখানে এক সমৃদ্ধ বিচিত্র বিস্ময়কর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে। এক দুর্ভেদ্য লতাজটিল অরণ্যের অগণ্য বৃক্ষ-তরু-তৃণ-পুষ্পের মর্মর ধ্বনি পরিমাপ করার মতই তা হাস্যকর।

ভৌগোলিক দিক থেকে ওড়িশা বিহার বাংলা ও আসাম এই চারটি বৃহৎ রাজ্যে পূর্বভারত গঠিত। এর মধ্যে পূর্ব বাঙলা এক রাজনৈতিক ইতিহাসের মধ্য দিয়ে পৃথক স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। নানা কারণে আসামকে বেষ্টন করে গড়ে উঠেছে ভারতবর্ষের আরো অনেকগুলি অঙ্গ রাজ্য—ত্রিপুরা, মনিপুর, নাগাভূমি, মেঘালয়, অরুণাচল ও মিজোরাম। প্রত্যেক অঞ্চলের culture-trait পৃথক। সুতরাং culture-complex ও আলাদা হতে বাধ্য। Ecology ও habitat-এর দিক দিয়ে এই সুবিশাল সাংস্কৃতিক রাজ্যগুলির অখণ্ড চেহারা তুলে ধরা কোনো এক ব্যক্তির দ্বারা সম্ভব নয়। আবার এই সবকটি পূর্বভারতীয় রাজ্যেই আদিবাসী-উপজাতি মিলিয়ে এক বৃহৎ মানব সম্প্রদায় বাস করে। তাদের ধর্মবিশ্বাস, প্রথা, সংস্কার, ভাষা, জীবনযাপন প্রণালীর মধ্যে স্বাতন্ত্র্য আছে, সংহত সমাজের সঙ্গে সুস্পষ্ট পার্থক্য আছে। সমতট অরণ্য পর্বত ও নদী এই বৃহৎ ভূখণ্ডের ভৌগোলিক বিশিষ্টতাকে চিহ্নিত করেছে।

এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে আসাম ভিন্ন সমগ্র অংশের প্রাচীন নাম ছিল সম্ভবত গৌড় মগধ। অথর্ববেদের ধূসর যুগেই আর্যরা একে অনার্য ও ব্রাত্যদের দেশ বলে অবজ্ঞার ধূলিমুষ্টি নিক্ষেপ করেছিলেন।

খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে বৌধায়ন বললেন, মগধ হল মিশ্র রক্তের মানুষদের রাজ্য। সেই মিশ্র রক্তের সংস্কার নিয়েই পূর্বভারত সমৃদ্ধ হয়েছে'। আসামও তার সঙ্গে ব্রাত্য অনভিজাত অনার্য সংস্কৃতিকে পুষ্ট করেছে। এই বিপুল অঞ্চল জুড়ে নানা সময়ে প্যালিওলিথিক, নিওলিথিক, ক্যালকোলিথিক ও তাম্রযুগের নিদর্শন মাটির তলা থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। আর মাটির উপরে জলে বাতাসে লোকজীবন নিশ্বাসে ছড়িয়ে আছে সেই আদিম জীবনের স্মৃতিচিহ্ন। প্রেয়সীর স্মৃতি তাজমহল রচনা করে ভারমুক্ত শাজাহান জীবনের খরস্রোতে ভেসে গেছেন। জীবনের প্রতি গভীর প্রেমে সামাজিক মানুষও উৎসবে-বিশ্বাসে-নৃত্যে-সংগীতে-আচারে-প্রথায় তার স্মৃতিচিহ্ন রচনা করে অনন্ত জীবনের স্রোতে মিশে যায়। পূর্বভারতের লোকসংস্কৃতি সেই মানবাত্মা শাজাহানের অগণ্য তাজমহল—'কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল'। আসামের সংস্কৃতির ইতিহাসটাই দেখা যাক। এদেশে আবহমানকাল ধরে এসেছে অস্ট্রিক নিগ্রোবটু কিরাত বোড়ো ভোটচীনরা। সেই সঙ্গে এখানকার প্রাচীন অধিবাসী নাগা, মিসির, খাসি, জয়ন্তিয়া প্রভৃতি পাহাড়ি জাতির সংস্কৃতির আদানপ্রদান ঘটেছে। সেই আদান-প্রদানেরই স্মৃতিসৌধ আজ আসামের লোকসংস্কৃতি—যা রূপহীন মরণকে মৃত্যুহীন অপরূপ সাজে বরণ করেছে। প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর-কামরূপের সেই আর্য সভ্যতা আজ কোথায়? সেখানকার বৈদিক সংস্কৃতির সঙ্গে মিশেছে তিব্বতীয় তন্ত্রাচার, তারপর এসেছে 'ধম্মং সরণং গচ্ছামি'র বাণী। এসেছে শৈব ধর্ম। শান জাতির অহোম সংস্কৃতি তার উপর আর এক বনিয়াদ গড়ে তুলেছে। আবার মনিপুরের বৈষ্ণব-ধর্ম ও বৈষ্ণবীয় সংস্কৃতির সঙ্গেও তার বিরোধ ঘটেনি। নাগাদের রক্তে ইওলিটিক যুগের নেগ্রিটো সংস্কার আর খাসিয়াদের রক্তে প্রাগৈতি-হাসিক যুগের অস্ট্রিক সংস্কার কখন মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে।

জলবায়ুর ভেদ, শস্য ও অন্যান্য উৎপাদনের পার্থক্য, ভাষা ও জীবনযাপন প্রণালীর দিক থেকে পূর্বভারতীয় লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে

অবিশ্বাস্য অমিল রয়েছে। আবার তারই মধ্যে আছে অন্তর্নিহিত এক গভীর ঐক্যসূত্র। সে ঐক্যসূত্র রাষ্ট্রনৈতিক বললে যথেষ্ট বলা হয় না। সবাই ভারতবাসী, সকলেই ভারতীয় সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী—এই ধরনের জীর্ণ পুরাতন প্রবাদের কথা বলছি না। এই ঐক্যসূত্র আঞ্চলিক সংস্কৃতির মধ্যবর্তী এক রহস্যময় সম্পর্ক—আদিম ইতিহাসের কোন গুহাহিত জীবনচেতনা থেকে তার যাত্রা শুরু, কেউ বলতে পারে না। পূর্বভারতীয় লোকসংস্কৃতির সেই বৈচিত্র্য এবং বৈচিত্র্যের গভীরনিহিত ঐক্যকে আজ আমরা পূর্বভারতবাসী সমবেত করপুটে সাংস্কৃতিক অভিবাদন জানাই।

॥ তিন ॥

পূর্বাঞ্চলের সমাজব্যবস্থা ও সংস্কৃতির কতকগুলি সাধারণ ধর্মের উল্লেখ করছি। পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলি মোটামুটি গ্রাম প্রধান এবং গ্রামগুলি কৃষিভিত্তিক। অধিকাংশ অঞ্চলের ঘরবাড়ি স্থানীয় উপাদানে তৈরি। সম্বলপুর থেকে কামরূপ, ছোটনাগপুর থেকে আইজল—সবগুলির সামাজিক বিন্যাস প্রায় একই প্রকার। আদিবাসী প্রধান অঞ্চল বাদ দিলে সবগুলি রাজ্যে কৃষিজীবীরাই গ্রামসমাজের মেরুদণ্ড এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতার ভিত্তিতে গ্রামসমাজগুলি গঠিত। বর্ণ বিভাগ শ্রমবিভাগের মত। অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা দিয়েই আমাদের গ্রামসমাজ সংবদ্ধ ছিল, কিন্তু সেই স্বয়ংসম্পূর্ণতা গত দুশো বছরে ভেঙে গেছে। ধর্ম বিশ্বাস, উৎসব, মেলা, নগরবিন্যাস, জনবিন্যাস এসবের দিক থেকেও পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির মধ্যে মিল আছে। স্বাধীনতার পর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির পরিবর্তন, উন্নয়ন ও সংগঠনেও প্রায় একই ধরনের নীতি অনুসৃত হয়ে আসছে।

ইন্দো-ইউরোপীয়, দ্রাবিড়ীয়, অস্ট্রিক ও তিব্বত-ব্রহ্মী— পৃথিবীর এই বৃহৎ চারটি ভাষাগোষ্ঠীর অসংখ্য শাখা পূর্বভারতের এই ভূখণ্ডে প্রচলিত। ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠীর প্রধান ভাষাগুলি হল ওড়িয়া,

বাঙলা, অসমীয়া ও বিহারী, যার মধ্যে আছে মৈথিলী মগহী ও ভোজপুরী। আর সেই সঙ্গে উর্দু। দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষাগুলি হল তেলুগু, গোণ্ড, কন্ধ বা কুই, কুঁড়ুখ বা ওরাওঁ, মালহর ও মালতো— অস্ট্রিক গোষ্ঠীর অঞ্চলিক ভাষাগুলি হল কোল-মুণ্ডা সাঁওতালি, মুণ্ডারী, হো, ভূমিজ, খাড়িয়া, কোরকু, শবর বা শোরা, গদর, খাসিয়া প্রভৃতি। আর তিব্বত-ব্রহ্মী ভাষা বলতে পাই নেওয়ারি, মেইতেই, বোড়ো, গারো, লুশেই ও নাগা। আরো আছে এদের শাখা-উপশাখা, উপভাষা বিভাষা। মাল পাহাড়িয়াদের বাঙলা, ছোটনাগপুরের কুর্মীদের ও ওড়িশার কুর্মালিদের ভাষা, পাহাড়ি খাড়িয়া বা খেড়ি ঠার—এগুলো হল একজাতের বিকৃত ভাষা—corrupt patois। শুধু আসামেই একশো কুড়িটি কথ্য ভাষা প্রচলিত আছে। অনেক ভাষারই লিপি নেই, বর্ণমালাও নেই, লিখিত সাহিত্য নেই। কিন্তু আছে মৌখিক সাহিত্য। আছে অসংখ্য মানুষের মুখের বুলি যে ভাষায় তার "কান্নাহাসির দোল দোলানো পৌষ ফাগুনের পালা' রচিত হয়, যা বেঁচে থাকে যুগযুগান্তরে, 'কালের সাগর পাড়ি দিয়ে' চলে আসে 'শ্যামল মাটির ধরাতলে'। সেখানেই পুঞ্জিত হয় তার প্রবাদ-প্রবচন, লোক-কাহিনী, পুরাণ-জনশ্রুতি, রূপকথা-লোকগীতের মধুচক্র।

॥ চার ॥

পূর্বভারতীয় লোকসংস্কৃতির আলোচনায় আদিবাসীদের ভূমিকার কথা উপেক্ষা করা শহরবাসী আমাদের অন্যায় হবে। লোকসংস্কৃতির সঙ্গে আদিবাসী সংস্কৃতির সম্পর্ক নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে। কিন্তু পূর্বাঞ্চল ভারতের আদিবাসী সংস্কৃতিকে বাদ দিয়ে লোকসংস্কৃতির স্বতন্ত্র সত্তা অর্থহীন। যদিও আমাদের এই রামমোহন মঞ্চের শেষ দিনের আলোচনা-চক্রে আদিবাসী জীবনচর্যার উপর বিদগ্ধ আলোচনা নির্দিষ্ট আছে, তবু লোকসংস্কৃতি প্রসঙ্গে তার পূর্বোল্লেখ অনিবার্য।

সমাজ সংগঠনের দিকে তাকালে দেখি, এই পূর্ব ভারত অসংখ্য

অন্তর্বিবাহমূলক (endogamous) উপজাতি ও বংশের ( অর্থাৎ tribe ও caste এর ) মিশ্রণে গঠিত জনসংখ্যার দ্বারা অধ্যুষিত। শুধু বিহার ও ওড়িশাতেই চারশো উপজাতি বংশ আছে, আর তাদের শাখা-প্রশাখার তো সংখ্যাই নেই। পশ্চিমবঙ্গে এই সংখ্যা ২৮২টি। এমনকি বিহার ওড়িশার মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেও ৪০টি স্বতন্ত্র শ্রেণী আছে, যাদের ভিতর বহির্বিবাহ (exogamy) নিষিদ্ধ। আবার তাদের অনেক-গুলির সৃষ্টি হয়েছে হিন্দু বংশ থেকে। বিহারের পূর্ণিয়া জেলার আবদাল সম্প্রদায় ডোকলা নামেও পরিচিত এবং তাদের বংশে হিন্দু নাম গ্রহণও চলে। লালবেগি সম্প্রদায়ের মধ্যে হিন্দু মুসলমান দুইই আছে। সাঁওতাল পরগনা ও মালভূমের যত্নু পেটিয়া সম্প্রদায়ও তাই। চম্পারন জেলার ঠাকুরিয়া সম্প্রদায় মূলত রাজপুত, পরে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছে। বাঙলার মাটিতে বাউল ও সুফীতত্ত্ব এক হয়ে মিশে গেছে। বীরভূমের গৈরিক মাটিতে একতারা বাজিয়ে বৈরাগী বাউল গেয়েছে—

> ভক্তির দ্বারে বাঁধা আছেন সাঁই
> হিন্দু কি যবন বলে তাঁর কাছে জাতের বিচার নাই।

সমাজবিন্যাসে ধর্মচেতনায় এই বিচিত্র সংমিশ্রণ পূর্বভারতেই সম্ভব হয়েছে। সমগ্র ওড়িশায় জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশই উপজাতীয়। এদের মধ্যে আছে সাঁওতাল, ভুইঞা, কোয়া, শবর, গোণ্ডা, কন্ধা, পরাজা, গধবা, জুয়াঙ, সৌরা, দম্বা প্রভৃতি শ্রেণী। মেইতেই ছাড়া মনিপুরে নাগা ও কুকিসহ মোট ৪০টি উপজাতি আছে। পূর্ব-ভারতীয় লোকসংস্কৃতির বনিয়াদ আদিবাসীদের জীবনচর্যার দ্বারা অনেকখানি প্রভাবিত।

পূর্বাঞ্চলীয় আদিবাসী সমাজের মধ্যে মূলত পাঁচটি শ্রেণী আছে। এক, যাদের বৃত্তি যাযাবর, শিকার, মাছধরা বা অন্য উপায়ে খাদ্য সংগ্রহ ; দুই, যাদের বৃত্তি অস্থায়ী কৃষিকার্য ; তিন, শিল্প উৎপাদক বা কারিগরি দ্রব্যের নির্মাতা বা কারুশিল্পী ; চার, স্থায়ী কৃষিকর্মজাবী ;

পাঁচ, শ্রমিক ও ভূমিদাস। এদের মধ্যে স্থায়ী কৃষিজীবী ছাড়া অন্যান্য শ্রেণীর আচার-প্রথা ও জীবনাচারেই আদিম সমাজলক্ষণ সবচেয়ে বেশি। তবে ধীরে ধীরে এদের জীবনযাত্রায় পরিবর্তন ঘটছে—সেই সঙ্গে সংস্কৃতির রূপবদলও ঘটছে। তার সঠিক মূল্যায়ন হয়ত এখনি সম্ভব নয়। এদের ঐন্দ্রজালিক বিশ্বাস, বস্তুদেবতা (fetish god), জাদুমন্ত্র, সংস্কার, পালপার্বণ, আত্মীয়তা, আহারবিহার, বিবাহ-মৃত্যু-জন্ম, লোকবিশ্বাস, গৃহনির্মাণ পদ্ধতি, গ্রামশাসন—গবেষণার অজস্র সম্পদ ছড়িয়ে রেখেছে। শুধু আসামের উপজাতিগুলির দিকে চোখ দিলেই বোঝা যাবে, কী বিপুল বর্ণের শোভাযাত্রা সেখানে। উত্তরপূর্ব সীমান্তের পশ্চিম ও দক্ষিণপূর্ব কামেঙ উপত্যকায় আছে মনপা, শেরডুকপেন, অকাশ, বুগুন, বাংনি ও ডাফলা সম্প্রদায়। সুবনসিরি অঞ্চলে আছে ডফলা, আপাতানি, তাগিন, গালোং ও পাহাড়ি মিরি সম্প্রদায়। সিয়াং অঞ্চলে আছে পদম আবোর, থেমবা, খাম্বা, মিম্যোং সম্প্রদায়। লোহিত উপত্যকায় আছে মিশমি, আদি, খাম্প্‌তি ও সিংফো সম্প্রদায়। তিরাপ অঞ্চলে নোকৃটে ও ওয়াঞ্চু সম্প্রদায়। এদের আরো উপশাখা আছে। ত্রিপুরার হিন্দু সংস্কৃতির পাশেই রয়েছে বোম খোম, হারম বাং, মুরসিম, তোতারাম, দাংর, মদূবান, নোয়াতিয়া, খালিশা, খাকলু, গাবিন প্রভৃতি সম্প্রদায়। এদের এক একটি উপজাতির সংস্কৃতির পূর্ণাঙ্গ সমীক্ষাতেই সমাজবিজ্ঞানীর এক জীবন অতিক্রান্ত হতে পারে। হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীস্টান ও ইসলাম ধর্মের বিচিত্র সমন্বয় ঘটেছে পূর্বাঞ্চল আদিবাসীদের ধর্মাচরণে, তার সঙ্গে জড়োপাসনা (animistic religion) তো আছেই। উচ্চতর সংহত লোকসমাজের ধর্মবিশ্বাসেও তার প্রভাব পড়েছে। ভারতীয় পুরাণ কল্পনা লোক-সমাজে ও আদিবাসী সমাজে কতটা প্রভাব বিস্তার করেছে, এই বিষয়ে আমাদের অনুসন্ধিৎসা আজও তৎপর হয়নি। তবে আদিবাসীদের পুরাণকথা সংগ্রহের কিছু কিছু চেষ্টা হয়েছে। লোকগীত ও লোকশিল্পেও আদিবাসী সমাজের জীবনধর্মিতা অসাধারণ। আদিব্যাধির উপদেবতা,

ভূতপ্রেত, ওঝা, ঝাড়ফুঁক, হটযোগ, কুলোপড়া, সরাচালা, বিষঝাড়া, চাল পড়া, black magic, white magic, omen, totem, taboo, ornithomancy, hydromancy, haruspicy, weather lore, plant lore, calender lore, animal lore প্রভৃতি লোকবিশ্বাস ও সংস্কার পূর্বাঞ্চলের এই প্রাচীন মানুষগুলিকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছ।

॥ পাঁচ ॥

কামনার প্রতিচ্ছবিকে রূপদান করাই ছিল আদিম সমাজের শিক্ষা চেতনার মূলে। তার যোগ ছিল আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে। তারপর শ্রেণীবিন্যস্ত সমাজে জনমানসের রূপসৃষ্টির আবেগ থেকেই লোকশিল্পের বিকাশ ঘটেছে। এই লোকশিল্পের বিচারেও পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে একজাতীয় সমধর্মিতা আছে। এই বৃহৎ অঞ্চলের লোকশিল্পের প্রায় সবটাই বাস্তুশিল্প। গৃহস্থাপত্যে, দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অলংকরণে, বেশভূষায়, অঙ্গসজ্জায়, কাঠ খোদাইয়ে, মূর্তি-মুখোশ-পুতুল ও প্রতিমা নির্মাণে, কারুশিল্পে ওড়িশা বিহার, আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে অনেক অমিল যেমন আছে, তেমনি মিলও আছে। মুর্শিদাবাদের তাঁতির কাজের সঙ্গে নাগাভূমির বয়নশিল্পের অবশ্যই পার্থক্য আছে। কিন্তু যে deccrative art-এ নাগাদের বৈশিষ্ট্য, মেদিনীপুরের নকশিকাঁথায় কোথায় যেন তার প্রতিধ্বনি আছে। কালীঘাটের পট আর ওড়িশার জগন্নাথের পট, বাঙলার লক্ষ্মীসরা, কুলোচিত্র বা পিঁড়ির সঙ্গে নেফার শেরডুকপেন বা শিমঙ সম্প্রদায়ের আসন-অলংকরণের ভঙ্গির তুলনা করলেই বোঝা যায় লোকসংস্কৃতির অভিপ্রায়-গত সাদৃশ্য কোনখানে। আদিম সমাজের ঐন্দ্রজালিক মন্ত্র ও ক্রিয়ার কতখানি এইসব শিল্পে তার পাঞ্জার ছাপ রেখে গেছে, সে বিষয়ে এখনো পূর্ণ তদন্ত হয়নি। হাতির দাঁতের কাজ পশ্চিমবঙ্গেই শুধু নয়, পূর্বাঞ্চলের অনেকগুলি আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিশেষ জনপ্রিয়।

বাঙলার আলপনা আর পদ্মকলি, ধানছড়া, কলমিলতা, শঙ্খলতা, লক্ষ্মীর পায়ের ছাপ, আর মনিপুরের রাসলীলায় রাধাকৃষ্ণের মোটিভ, আসামের রঙ্গোলি বিহুর অলংকরণরীতি সবই আমাদের জীবনসংস্কৃতির দুর্লভ উপকরণ। কিন্তু এ পর্যন্ত সুসজ্জিত প্রদর্শনীতে কাঁচের শবাধারে সাজিয়ে রাখা কিংবা অভিজাত মাসিক পত্রে দামি আর্ট পেপারে প্রতিলিপি ছাপানো ছাড়া এই লোকশিল্পের সংরক্ষণে আমরা কতটুকু কী করেছি সে আত্মসমীক্ষা কি একেবারে অবান্তর হবে?

বাঙলার ব্রতের মত ওড়িশাতেও বহু লোকব্রতের মধ্য দিয়ে গৃহলক্ষ্মী নারীসমাজের কামনার শুচিস্মিত প্রকাশ ঘটে। বাঙলার তুষতুষলী, সুবচনী, ভাদুলি, পুণ্যিপুকুর, হরিচরণ, সেঁজুতি বা লক্ষ্মীব্রতের মত ওড়িশাতেও কুক্কুটি ব্রত, কেদার ব্রত, বজ্র মহাকালী, রবিনারায়ণ, সুদশা, রাইদামোদর, নিশা মঙ্গলবার ব্রত প্রচলিত।

লোকসংস্কৃতির সাম্রাজ্যে উৎসবের সূর্য কখনো অস্তমিত হয় না। মেলা-উৎসব বাঙলার গ্রামে গ্রামে যেমন অসংখ্য, তেমনি প্রতিবেশী রাজ্যগুলিতেও। বাঙলা দেশের চৈতন্য আবির্ভাব উপলক্ষে উৎসব ও মেলার সঙ্গে আসামে শংকরদেবের আবির্ভাব উৎসব ও মেলার তুলনা চলে। চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে গাজন শুধু বাঙলারই জনপ্রিয় উৎসব নয়, সমগ্র পূর্বভারতের এটি লোকোৎসব। ওড়িশার কোরাপুট ও সম্বলপুর জেলার দণ্ডনাটের সঙ্গে রাঢ়ের গাজনের আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে। খোণ্ড ও অন্যান্য উপজাতিদের মধ্যে প্রচলিত চিরিক পোজা চড়ক পূজারই নামান্তর। বাঙলার কৃষ্ণযাত্রা, মনিপুরের রাসলীলা, ওড়িশার ঘট পটুয়া, উরখি পটুয়া, খণ্ড পটুয়া প্রভৃতির তুলনামূলক আলোচনা করলে এক সূক্ষ্ম সূত্রের সন্ধান মিলতে পারে। ওড়িশার 'পালা' আর প্রাচীন কলকাতার কবিগান কি, একই মাতৃগর্ভের পরিচয়হীন, বিচ্ছিন্ন দুই স্থানান্তরিত সন্তান? বাঙলার পটুয়া সংগীত আর ওড়িশার পটুয়া যাত্রা কি এক উৎস থেকে যাত্রা করে দুই দেশে পথ হারিয়ে ফেলেছে?

লোকসংস্কৃতিবিদরা বলবেন, আদিম সমাজের কৃষিতান্ত্রিক জাদুবিশ্বাস, পৃথিবীর উর্বরাশক্তিতে বিশ্বাস, সূর্য ও পৃথিবীর বিবাহ সম্পর্কের বিশ্বাসই আমাদের অধিকাংশ লোকউৎসবের প্রেরণামূলে। তবে প্রত্যেক উৎসবই যুগে যুগে তার পুরনো বৈশিষ্ট্য কিছু কিছু হারিয়ে ফেলে ও তার সঙ্গে নতুন বৈশিষ্ট্য যুক্ত হয়। পরিবর্তমান সমাজের মূল্যবোধই তার কারণ। এই পরিবর্তন সত্ত্বেও উৎসবের আভিন্নতা স্থান কালের দূরত্ব স্বীকার করেও আপনাকে সংরক্ষিত করে। তাই বাঙলার চড়ক-গাজন-গম্ভীরা বা আসামের বিহু সেই আদিম বিশ্বাসের স্মৃতি বহন করে বেঁচে আছে আজও। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনগণনা দপ্তর থেকে প্রকাশিত পশ্চিমবঙ্গের উৎসব ও মেলা সমীক্ষার বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি যে, শুধু মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, হাওড়া ও হুগলি জেলাতেই বছরে কম করে মোট ৭২৫টি মেলা হয়। আর তাদের অন্তত এক তৃতীয়াংশের মূলে আছে আদিম কৃষিঘটিত ঐন্দ্রজালিক বিশ্বাস ও ক্রিয়াকর্ম। আসামের বিহু ও সংশ্লিষ্ট উৎসব-গুলিও তাই। আসামের দারাং জেলার 'বৈসাগু' বা কাছাড়ী বিহু উৎসব, নওগাঁও জেলার লালুঙদের বিহু, নেফার সিয়াং অঞ্চলের পদম আবর সম্প্রদায়ের উইং বা আরান উৎসব, সুবনসিরির তীরবর্তী মিরিদের পারাগ বিহু, মিশিদের আলি-আই লিগাং উৎসব মোটামুটি একই সময়ের কাছাকাছি এবং একই অভিপ্রায়ের দ্বারা অনুপ্রাণিত। ওড়িশা, বিহার পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের অধিকাংশ উৎসবের সঙ্গে যে নৃত্য প্রচলিত আছে, তার মূলে রয়েছে একই ধরনের অনুকরণাত্মক জাদুবিশ্বাস।

ওড়িশার চৈত পরব ও ছোটনাগপুরের কোলদের মধ্যে প্রচলিত চৈত্র সংক্রান্তির পরব – এদের মধ্যে কোথাও একটি গভীর ঐক্য আছে। হয়ত দুই উৎসবের উর্বরতার জাদু প্রতীকটি পৃথক্ হয়ে গেছে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় যেমন পাতা নাচ বা করম নাচে গাছের ডাল মাটিতে পোঁতা হয়, তেমনি ওরাওঁ কোল

প্রভৃতি আদিবাসীদের মধ্যেও করম বৃক্ষের ডাল পুঁতে নৃত্যগীত মূলক উৎসবরীতি প্রচলিত আছে। ওড়িশায় এরই নাম করমা পূজা ও করমা নৃত্য। ওড়িশার গোণ্ড, বইগা, বিলাসপুরের বিন্ঝওয়ারদের মধ্যে করম উৎসব চালু আছে। পশ্চিমবঙ্গের অম্বুবাচী ও অসমীয়া অম্বুবাসী বা আমুচি প্রায় একই ধরনের। শিবরাত্রিও আসাম, ত্রিপুরা ও মনিপুরের লোকপার্বণ। পুরুলিয়া মালভূম মেদিনীপুরের টুসু, ভাদুই বা পৌষ পরব নামে কোথাও কোথাও অভিহত হয়। স্থানীয় মাহাতো মুণ্ডা ভূমিজ কোরা লোধা ও সাঁওতাল সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ এই উৎসবের মূল প্রকৃতিকে লোক-সংস্কৃতিবিজ্ঞানীর কাছে তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলে। আবার বাঁধনা ও করম উৎসবের সঙ্গেও এর পার্থক্য রয়েছে। বম্পাস (C. H. Bompas) তাঁর সাঁওতালি লোককথা সংগ্রহে সাঁওতালদের মধ্যে প্রচলিত চড়ক পূজা ও ছাতার পরবের উল্লেখ করেছেন, যেগুলি অন্যান্য রাজ্যেও প্রচলিত। হোলি সমস্ত উত্তর ভারতের জনপ্রিয় উৎসব, পূর্ব ভারতেরও। আসামের একাধিক স্থানে যে মদন-কামদেবের মন্দির আছে, সেগুলি আসামে প্রচলিত প্রাচীন হোলি উৎসবেরই স্মারক। ত্রিপুরার রাধাকিশোরপুরের শিবচতুর্দশীর মেলা, তীর্থ-মুখে ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরে পৌষসংক্রান্তি মেলা, অমরপুরে মঙ্গল-চণ্ডীর মন্দিরে শ্রীপঞ্চমীর মেলা পশ্চিমবঙ্গের মেলাগুলির মতই। মনিপুরের কুঞ্জরাস গোপরাস, নদিয়া নবদ্বীপের রাস-উৎসবের জোড়কলম মনে হয়। মনসাপূজা ওড়িশা বিহার পশ্চিমবঙ্গই শুধু নয়, আসামেও ব্যাপকভাবে প্রচলিত, কাছাড়ীদের মধ্যেও এর চল আছে। এমনকি, মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেও। জয়ন্তিয়াদের মধ্যে প্রচলিত বেহ্‌দিন খ্লাম বা বৃক্ষ উৎসবের মধ্যে হিন্দু হোলি রথযাত্রার স্মৃতি আছে বলে অসমীয়া লোকসংস্কৃতি গবেষকের ধারণা। পশ্চিমবঙ্গের 'লক্ষ্মী,' বিহার ওড়িশা ও আসামেও ব্যাপক ভাবে উপাসিতা। আসামে তার নাম লখিমি। বোড়োদের মৈনিমি, মিরিদের মরিন্নুমা, রাভাদের

বৈখু, গারোদের রোকিমে, দেউড়িদের মিরুছি, মনিপুরীদের ফউমিকউবা আসলে একই সম্পদ, শ্রী, শস্য ও ভূমির দেবী। আসামের বিহু আবার বোহাগ বিহু, মাঘ বিহু, কাতি বিহু নামে বিভক্ত। এর সঙ্গে কেউ ঋগ্‌বেদের বিষুবাহু যজ্ঞের সম্পর্ক খোঁজেন, কেউ অনার্য সংস্কৃতির। বিহু শব্দটি আসাম ছাড়া চট্টগ্রামে বিযু উচ্চারিত হয়। চাকমাদের প্রধান উৎসব বিসু, ওরাওঁদের গ্রীষ্মকালীর শিকার উৎসবের নাম বিশু শিকার। এমন কি দক্ষিণ ভারতের নায়ারদের ও হিমাচল প্রদেশের খাশাদের নববর্ষ উৎসবের নামও বিসু। এই ধ্বনি সাদৃশ্য কি আকস্মিক?

॥ ছয় ॥

লোকগীত ও লোকনৃত্যে পূর্বাঞ্চলীয় ভারত বিশেষ ভাবে চিহ্নিত। তাছাড়া এই অঙ্গ ভারতের ছড়া, গীতিকা, রূপকথা, পুরাণ, জনশ্রুতি, উপকাহিনী, ধাঁধা, প্রবাদও মোটামুটি এক শতাব্দী ধরে কিছু কিছু সংগৃহীত হয়েছে। কিন্তু অসংগৃহীত সম্পাদের পরিমাণও কম নয়। এই সুবিশাল লোকায়ত সৃষ্টি সংগৃহীত হলে এদের মধ্যে তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষণ, নৃতাত্ত্বিক ও সমাজবিজ্ঞানগত সমীক্ষা একদিন নিশ্চয় শুরু হবে। আলোচ্য এলাকার গবেষক ও বিদ্যার্থীরা তার উদ্যোগ আয়োজন করছেন। বিভিন্ন অঞ্চলের রূপকথা-উপকথা, গল্প-মিথ (myth) প্রভৃতির শ্রেণী বিন্যাস motif বা অভিপ্রায়গত বিভাগ, সেগুলির মধ্যে জনজীবনের সাংস্কৃতিক স্পন্দন, বিশ্বাস, প্রথা ও আচারের বিশ্লেষণের যে একটি ক্ষেত্র পড়ে আছে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে তার সমীক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। এই লোককথাগুলি যেন 'অনাদি সৃষ্টির যজ্ঞ হুতাগ্নি' থেকে বেরিয়ে এসেছিল 'সংখ্যা গণনার অতীত প্রত্যূষে'। তাদের 'চক্রতীর্থে পথে পথে' ছড়িয়ে আছে 'শত শত ভাঙা ইতিহাসের অর্থলুপ্ত অবশেষ'। ছড়া-বাঁধা প্রবাদের মধ্যে এই মহাভূখণ্ডের

বহু কোটি মানুষের নিত্যকালের হৃৎস্পন্দন প্রতিদিন ধ্বনিত হয়ে চলেছে। আমাদের এই পূর্বাঞ্চলে যে সব পুরাকীর্তি রয়েছে, মন্দিরময় ওড়িশায়, শিল্পশোভন পশ্চিমবঙ্গে, শিলাবন্ধুর বিহারে, অরণ্যপাহাড়ি আসামে, সেই সব মন্দির, মসজিদ, প্রস্তরমূর্তি, পোড়ামাটির টেরাকোটা, ধাতুমূর্তি শুধু কি প্রত্নতাত্ত্বিকের শবদেহাগারে মমি হয়ে থাকার জন্য? তারই রেখায়-প্রস্তরে আমাদের পিতৃপিতামহের আকাঙ্ক্ষার অঙ্গুলি একদিন চঞ্চল হয়েছিল। একথা যেন আমরা ভুলে না যাই।

পূর্বভারতের প্রায় অধিকাংশ অঞ্চলের লোকগীতের সঙ্গেই একজাতীয় ধর্মবোধ জড়িত। যদিও লোকগীত বলতে আমরা ধর্মনিরপেক্ষ সৃষ্টি বুঝি। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে ধর্মের নামে যা থাকে তা হয় লোকায়ত ধর্মতত্ত্ব, অথবা লোকাচার, পূজা ও সাধনপদ্ধতি, সংস্কার, আচার-অনুষ্ঠান ও আনুগত্যের ধ্যানধারণা। লৌকিক জীবনদর্শন ও অতিলৌকির জীবন সম্পর্কে লোকায়ত আদর্শই লোকগীতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রকাশিত হয়। তবে সংহত সমাজের লোকগীতেই তত্ত্বকথা বেশি থাকে। আদিবাসীদের লোকগীতে জীবনচেতনাই বেশি। ধর্মীয় জীবন ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে লোকগীতের সম্পর্ক গভীর হয় সংহত লোক সমাজেই।

লোকগীতের সুরকে প্রভাবিত করে অরণ্য পাহাড় সমতট ও নদী। পূর্বভারতের লোকগীতের এক-এক অঞ্চলের সুরে এই চারটি নৈসর্গিক প্রকৃতিও আশ্চর্য প্রভাব বিস্তার করেছে। অরণ্য তার লোকগীতের সুরে এনে দিয়েছে বন্য মাদকতা, সমতলের সুরে আছে উৎসবের আনন্দ, নদীর দেশের সুরে আছে অন্তরঙ্গতার আহ্বান, পাহাড়িয়া সুরে আছে বৈরাগ্য। আবার পূর্বভারতের লোকগীতে নারী ও পুরুষের গানেও ভেদ আছে। প্রায় সর্বত্রই নারীর গান বাস্তববাদী, ও অনুষ্ঠাননির্ভর। নারীমনের নিজস্ব মেয়েলি ভাবনায় থাকে সুরের গৃহস্থালি। পুরুষের গানে আছে কল্পনাপ্রবণতা, আকাঙ্ক্ষা

ও উদ্দামতা। অনুষ্ঠানের চেয়ে অভিজ্ঞতা, প্রথার চেয়ে নতুনত্বই সেখানে বেশি। পুরুষের গানে অঞ্চলের প্রভাব, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সমন্বয়ের প্রভাবও গুরুত্বপূর্ণ। জননীর প্রসববেদনা থেকে প্রৌঢ়ের সংসার বেদনা ও মুক্তির বৈরাগ্য—সবই লোকগীতের বিষয়। এই জীবনধর্মিতা আদিবাসীদের লোকগীতে আরও বেশি। সাংকেতিকতা, কবিত্ব, সহজিয়া আবেগ প্রকাশ, প্রচলিত দৃষ্টান্তের দ্বারা সূক্ষ্ম ইঙ্গিত ফুটিয়ে তোলা—এ সবই পূর্বভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকগীতের সাধারণ ধর্ম। বাউল গান, গাজনের গান, নীলের গান, জারি, সারি, ভাটিয়ালি, ঝুমুর, ভাওয়াইয়া, চটকা, খেমটা, লেটো, ভাদু, টুসু, গম্ভীরা, আলকাপ, পীর কীর্তন, গাজি, ধামাইল, বিষহরী পালা গান, খেচেনি গান, হাতি খেদার বিরুয়া গান, মৈষাল গাড়োয়ালদের গান, খড়িবাড়ির রাজধারী ও রাভানদের পালা গান, তিন্নাথের গান, ঢপ—বাঙলার লোকগীতে আঞ্চলিকতা, বিষয়চারিতা, আনুষ্ঠানিকতা ও ব্যবহারিকতার দিক থেকে আশ্চর্য সম্পদ আছে, আসাম ওড়িশা বা বিহারেব লোকগীতেও তার সমধর্মী ঐতিহ্য আছে।

॥ সাত ॥

নৃত্য সমৃদ্ধ পূর্বভারতের বিপুল বিচিত্র নৃত্যের কথা এখানে উল্লেখ মাত্র করা যায়। সে নৃত্য আবহমানকালের লোকজীবনের ছন্দে গাঁথা। প্রেমিক ও বৈরাগী, লোভী ও উদাসীন, ত্যাগী ও আসক্ত, সংসারী ও ছন্নছাড়া মানুষের চরিত্র তার নৃত্যকলায় বিকশিত হয়। বীরত্বের উল্লম্ফন কিংবা ভক্তির উল্লাস, আনুষ্ঠানিকতার অহংকার কিংবা সন্ন্যাসের দৈন্য নৃত্য ছাড়া কে প্রকাশ করতে পারে? এক বাঙলার নৃত্যই কত অসীম সম্পদে ভরা। বাঙলার রায়বেঁশে, ঢালি, বাউল নৃত্য, গাজন সন্ন্যাসীদের নাচ, দশাবতার কালীকাচ, ছো, কাঠি নৃত্য, সন্ন্যাসী ভক্তদের কাঁটাঝাঁপ আগুন খেলা নাচ, মহিষাসুর বধ, গম্ভীরা,

সূত্রাসাই, শ্মশান জাগানো প্রভৃতি নাচ, লেটো, ধাইচণ্ডীর নাচ, নানা জাতের মুখোশ-নৃত্য—তালিকা দিয়ে শেষ করা যাবে না। তারসঙ্গে শেরপা লেপচাদের বিয়াছম, ভুটিয়াদের সিঙ্গীছম, মেপাছম, চমরী ছম নৃত্য সবই বঙ্গ সংস্কৃতির অঙ্গীভূত হয়ে গেছে। সেই সুপ্রাচীন কাল থেকে আসামও লোকনৃত্যে সমৃদ্ধ। সত্রিয় নাচ একজাতীয় শাস্ত্রীয় ও লোকনৃত্যের মিশ্রণ যা শংকরদের প্রচলিত করেছিলেন। বিহু উৎসবে নৃত্য একটি মুখ্য অঙ্গ। এক এক অঞ্চলে নৃত্যের সঙ্গে এক এক ধরনের বাদ্যযন্ত্র ও ছন্দ প্রচলিত। এদের অনেক কিছুর সঙ্গেই অনেক কিছুর মিল আছে। বিষ্ণুপুরের মুখোশপরা রাবণকাটা নৃত্যের সঙ্গে কেউ শ্যামদেশের নৃত্যের মিল খুঁজে পেয়েছেন। আবার সেরাই-কেলার ছো নাচে আদিম সমাজের জাদুনৃত্যের চিহ্ন আছে বলে মনে করা হয়। মনিপুরের মৈরং অঞ্চলের খাম্বা থৈরি নাচের সঙ্গে খাসিয়াদের শাদসুকমিসিয়াম নাচের অঙ্গভঙ্গিগত সাদৃশ্য বিস্ময়কর মনে হয়। মনিপুরের থাবল, চোংরা জাতীয়া বসন্তনৃত্য পূর্ব ভারতের অন্যত্রও প্রচলিত। মেদিনীপুর জেলার নাড়াজোলের পুতুলের সঙ্গে প্রাচীন মিশরীয় পশুদেবতা মূর্তির আদল নিয়েও কেউ কেউ ইঙ্গিত করেছেন। খাসিয়াদের নংকিম ও ওড়িশার পদমতোলা নৃত্যানুষ্ঠানের আচারগত সাদৃশ্য কোন্ গোপন বন্ধনে যুক্ত কে বলতে পারে? যুক্তবেণী ও মুক্তবেণীর এই রহস্যমোচনেই লোকসংস্কৃতির সার্থকতা।

॥ আট ॥

পূর্বভারতীয় লোকসংস্কৃতির সমীক্ষা, সংগ্রহ ও সংরক্ষণের পবিত্র দায়িত্বে যে সব মনীষী জীবনরসিক লোকশ্রুতিবিদ নৃতাত্ত্বিক সাহিত্যিক ও সমাজবিজ্ঞানী তাঁদের জীবনের সোনার মুহূর্তগুলি উৎসর্গ করেছেন, তাঁদের প্রতি আমাদের প্রণাম। বিশ্বমানুষের সমুদ্র অভিযান, নতুন দেশ আবিষ্কার, বিদেশভ্রমণ বা রাষ্ট্রদৌত্যের তুলনায় এঁদের কৃতিত্বও কোনো অংশে কম নয়। এঁরাই আমাদের লোকসংস্কৃতির সাম্রাজ্য-

বিস্তার ঘটিয়েছেন, লোকসংস্কৃতির নতুন জনপদ বা দ্বীপ আবিষ্কার করে সেখানে কৌতূহলী বিজ্ঞান ও ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসার উপনিবেশ পত্তন করেছেন। এঁরাই লোকসংস্কৃতির ইতিহাসে মার্কোপোলো, টমাস রো, এঁরাই আমাদের কলম্বাস, ভাস্কো-ডা গামা, ফার্দিনান্দ ম্যাগেলান। এঁদের কারো নাম অজ্ঞাত জনপদের অখ্যাত মানুষের ভিড়ে হারিয়ে গেছে। তবু তাঁদের জন্য পূর্বাঞ্চলের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ইতিহাস কৃতজ্ঞতার পুষ্পার্ঘ নিবেদন করছে। যাঁরা বাঙলা বিহার ওড়িশা আসাম ও সংশ্লিষ্ট অঙ্গ রাজ্যগুলির লোকসংস্কার, লোকসংস্কৃতি ও লোকজীবনের নানাদিকের প্রতি শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, হয়ত তাঁদের অনেকেই এই বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন না। সকলেই রমাপ্রসাদ চন্দ, শরৎচন্দ্র রায়, দীনেশচন্দ্র সেন, নগেন্দ্রনাথ বসু, ডঃ নীহাররঞ্জন রায়, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, ডঃ কল্যাণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মত স্বনামধন্য বিশেষজ্ঞ নন। তবু সকলের আগ্রহে সাধনায়, নিষ্ঠা ও মানবপ্রীতিতেই লোকসংস্কৃতির গবেষণাগার দিনে দিনে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। ওড়িশায় লক্ষ্মীনারায়ণ সাহু, কপিলেশ্বর বিদ্যাভূষণ, গোপাল চন্দ্র গ্রহরাজ, রাঘবানন্দ দাস, উপেন্দ্রনারায়ণ দত্ত গুপ্ত, পীতাম্বরী দেবী বা ডঃ কুঞ্জবিহারী দাসের মত সন্ধানীর সংগৃহীত সম্পদে ও বিজ্ঞানী বুদ্ধিতে এই মহান দেশের লোকসংস্কৃতির ভাণ্ডার ভরে উঠেছে। আসামের স্বনামধন্য গবেষক ও সংগ্রাহক লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া, নীলকান্ত সিং, ফণীন্দ্র কলিতা, ডঃ প্রফুল্ল দত্তগোস্বামী, সত্যেন্দ্র গোস্বামী, ভদ্রসেন বোরা, লীলা গোগোই, বিরিঞ্চিকুমার বড়ুয়া—এঁদের নাম মনে পড়ছে। বিহারী লোকসংস্কৃতির কয়েকজন প্রতিপালক হাজারি-প্রসাদ দ্বিবেদী, শ্রীনিবাস, শিবপূজন সহায়, অজিতনারায়ণ সিংহ, প্রসাদ সিং, দুর্গাশংকর প্রসাদ, শিবসহায় চতুর্বেদী, তারকেশ্বর প্রসাদ, দমন সাহু সমীর প্রভৃতি। পূর্বপাকিস্তান, অধুনা বাঙলাদেশের কয়েকজন গবেষকও এই ক্ষেত্রে অনির্বাণ আলোকবর্তিকা জ্বালিয়ে রেখেছেন। সব মিলিয়ে অনেক শ্রম, অনেক সাধনার ইতিহাস।

এই সূত্রে কয়েকজন বিদেশী ভারতপ্রেমিকের নামও নতমস্তকে স্মরণ করি। যে উদ্দেশ্যেই তাঁরা এদেশে আসুক না কেন, এখানকার মানুষের প্রতি গভীর প্রীতি তাঁদের টেনে নিয়ে গেছে দুর্গম অরণ্যে, হিমশৃঙ্গের শীতল জনপদে, হিংস্র অসহিষ্ণু সন্দিগ্ধ অধিবাসীদের রহস্যময় জীবনসন্ধানে। 'কালো ঘোমটার নিচে অপরিচিত ছিল যে মানবরূপ উপেক্ষার আবিল দৃষ্টিতে', তার প্রতি এঁদের অনুকম্পায়ী দৃষ্টি পড়েছে। এঁরা লোহার হাতকড়ি পরাতে আসেন নি, এসেছেন ভালোবাসার রাখি পরাতে। হান্টার, রিজলে, ওম্যালি, গ্রিয়ার্সন, বম্পাস, আর্চার ও ভেরিয়ার এলুইনের মত ভারতপ্রেমিকের আরব্ধ পূর্বভারত লোক-সংস্কৃতি গবেষণা ভারতীয় লোকসংস্কৃতির আকাশে অনন্তকাল সপ্তর্ষিমণ্ডল হয়ে থাকবে।

তবু এখনো লোকসংস্কৃতি বড় লোভনীয় শব্দ। সস্তায় বাজিমাত করা কিংবা সহজে সবজান্তা হওয়ার একটা মজার পথ খুলে দিয়েছে শব্দটি। রাত জেগে মেলায় ঘুরে বাদাম-পাঁপড়ের গন্ধ শুঁকে টেপ রেকর্ডার নিয়ে বাউল গান রেকর্ড করলে, বিষ্ণুপুরের ঘোড়া, আগরতলার মাদুর, সেরাইকেলার মুখোশ বা কালীঘাটের পট দিয়ে ঘর সাজালেই লোকসংস্কৃতি-বিশারদ হওয়া যায় না। তারজন্য দরকার একটি গভীর কৌতূহল, মানবজীবনের ইতিহাস সন্ধানে নৃতাত্ত্বিক জিজ্ঞাসা, নিস্পৃহ বিজ্ঞানী বুদ্ধি, জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে আন্তঃশৃঙ্খলামূলক চিন্তা এবং সর্বোপরি মানবপ্রেম। বিদ্যার অহমিকা নয়—অন্য গবেষকের প্রতি ঈর্ষা নয়—সহিষ্ণুতা, ত্যাগস্বীকার ও সহধর্মিতা না থাকলে গবেষণা প্রতারণা মাত্র। জীবনে জীবন যোগ করার ঔদার্য, জাতীয় সংহতি ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্য ও ঐক্যসূত্রকে পাথেয় করে নতুন কালের তরুণ সম্প্রদায় ভারতবর্ষের জনজীবনের বিপুল ইতিহাস রচনা করতে এগিয়ে আসুন। এই হোক আজকের সম্মেলনের সমবেত প্রার্থনা।

# পূর্বভারতে বিভিন্ন ভাষার বিকাশ ও সেগুলির আন্তঃ-সম্পর্ক

শ্রীসুকুমার সেন

একথা কারো অজানা নেই যে পূর্ব ভারতে অনেক ভাষা প্রচলিত আছে। সে ভাষাগুলিকে মোটামুটি তিনটি বর্গে ভাগ করা হয়েছে—আর্য বর্গ; অস্ট্রিক বর্গ ও ভোটচীন বর্গ। তা ছাড়া দ্রাবিড়বর্গের একটি ভাষাও অত্যন্ত মিশ্রিত রূপে এ দেশে বলা হয়, তবে সে ভাষা যারা বলেন তাঁরা সংখ্যায় বেশি নন, তবে খুব কমও নন। ১৯৭১ সালে আদম-সুমারিতে এদের সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ। এই ভাষা—মালপাহাড়িয়া বা মালতো, বলা হয় রাজমহল পার্বত্য অঞ্চলে ও আশে-পাশে। এঁরা প্রায় সবাই দ্বিভাষিক, অর্থাৎ বাংলা জানেন। এঁদের ভাষায় বাংলার প্রভাব খুব বেশি পড়েছে।

অস্ট্রিক বর্গের কোন ভাষাই আধুনিক কালের—অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগের পূর্বে লিপিবদ্ধ হয় নি। সাঁওতালির মতো দু'একটি ভাষার অনুশীলন করেছেন পণ্ডিতেরা। এ সব ভাষার বিকাশের প্রশ্ন ওঠে না, কেননা এ ভাষার ইতিহাস জানা নেই। ভোট-চীন বর্গের ভাষার সম্পর্কেও সেই কথা খাটে। একটি মাত্র ব্যতিক্রম হল তিব্বতী। তিব্বতী সাহিত্যের ইতিহাস হাজার বছরের পুরানো। তিব্বতী ভাষার অক্ষর আমাদের ব্রাহ্মী থেকে নেওয়া। তিব্বতী ভাষা আমাদের আলোচনার অন্তর্গত নয়।

পূর্বভারতে আর্য ভাষাগোষ্ঠী বলতে এখন মাঝখানে বাংলা আর তার আশেপাশে অসমিয়া, মৈথিলী, মগহী, ওড়িয়া এবং নেপালী। এই চারটি ভাষার মধ্যে নেপালী কিছু কম ঘনিষ্ঠ, বাকি তিনটি অসমিয়া, মৈথিলী, মগহী ও ওড়িয়া অত্যন্ত নিকট সম্পর্কিত। হাজার

-বারশ বছর আগে এই ভাষাগুলির পৃথক অস্তিত্ব ছিল না, ছিল তখন একটি ভাষা, যার নাম পণ্ডিতেরা দিয়েছেন মাগধী অপভ্রংশ, আমি দিই পূর্বী-প্রাচ্য অপভ্রংশ (বা অবহট্‌ঠ)। মাগধী নামটির সম্বন্ধে আমার আপত্তি হল যে এ নামটি আধুনিক কালে তৈরি এবং এর দ্বারা একটি সাহিত্য গড়া কৃত্রিম ভাষাকে অযৌক্তিক মর্যাদা দেওয়া হয়। এদেশের কথ্য ভাষাকে খ্রীস্টপূর্ব কালে "প্রাচ্য" বলা হত। খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে বৈয়াকরণ পতঞ্জলি বলেছেন যে "ত্রয়ঃ প্রাচ্যাঃ" অর্থাৎ প্রাচ্যের লোকেরা তিন জনপদগোষ্ঠীতে বিভক্ত। তা যদি হয় তবে সেই তিন জনপদগোষ্ঠীর কথ্যভাষাও ছিল তিন উপভাষায় লক্ষণাশ্রিত। সে যাই হোক ভাষাবিজ্ঞানের বিচারে প্রাচ্য আর্য ভাষাগুলিকে দু' থাকে পৃথক্ করা যায়—পশ্চিমা থাক ও পূর্বী থাক। পশ্চিমা থাক হল—বারাণসী থেকে কজঙ্গল (অর্থাৎ রাজমহল পার্বত্য অঞ্চল) পর্যন্ত দেশখণ্ডের ভাষা। তার মানে ভোজপুরী, মগহী ও মৈথিলী—এই তিন বিহারী ভাষা। আর পূর্বী থাক হল, কজঙ্গল থেকে পূর্ব ও দক্ষিণপূর্ব এই ভূখণ্ডের অর্থাৎ প্রাচ্যখণ্ডের প্রাচ্য প্রান্তের ভাষা—অসমীয়া, বাংলা ও ওড়িয়া। এই তিনটি ভাষার পরস্পর সম্পর্ক যে কতটা গভীর ও অন্তরঙ্গ তা সহজেই বোঝা যায়। আস্তে আস্তে বললে অসমিয়াভাষী বাংলাভাষীর প্রায় পঁচানব্বই শতাংশ কথা বুঝতে পারেন, আর সেই ভাবে ওড়িয়াভাষীর কথাও আশী-নব্বই অংশ বাংলাভাষী বুঝতে সমর্থ হন। ছাপার অক্ষরে অসমিয়া ও বাংলা আরও ঘনিষ্ঠ কেন না দুটি ভাষার অক্ষর প্রায় এক, ওড়িয়া ও বাংলা অনেকটাই দূর কেন না দুটি ভাষার অক্ষর আলাদা আলাদ। এক অক্ষর হলে তিনটি ভাষাকে পরস্পর উপভাষা-সম্পর্কিত বলতে বাধতো না। (একদা, পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত ওড়িয়া ও বাংলা প্রায়ই এক অক্ষরে লেখা হত।)

হাজার বছর আগে পূর্বভারতে অর্থাৎ বারাণসী থেকে আসাম-বর্মার পার্বত্য অঞ্চল ও সমুদ্রতীর পর্যন্ত দেশখণ্ডে একটি বিশেষ আর্যভাষা

প্রচলিত ছিল, তবে সে ভাষায় সর্বত্র উচ্চারণরীতি ও ব্যাকরণপদ্ধতি, সর্বাংশে সমান ছিল না। এই ভাষায় যে যৎকিঞ্চিৎ রচনা অর্থাৎ 'সাহিত্য' গড়ে উঠেছিল তার থেকে তখনকার দিনের আঞ্চলিক উপভাষার অস্তিত্বের নিশ্চিত প্রমাণ পাই। আপনারা প্রাচীন বাংলায় লেখা চর্যাগীতির কথা অবশ্যই জানেন। যে ভাষায় চর্যাগীতিগুলি বিরচিত হয়েছিল তা পণ্ডিতেরা মোটামুটি সাব্যস্ত করেছেন যে তাতে বাংলা ভাষার সবচেয়ে পুরানো রূপ প্রতিফলিত আছে। কিন্তু এখন অসমিয়া, ওড়িয়া, মৈথিলী ও ভোজপুরী ভাষার পণ্ডিতেরা তাঁদের নিজ নিজ ভাষার দাবি জানাচ্ছেন। তাঁদের এই দাবি থেকেই অনুমান করা যায় যে প্রাচীন বাংলার, রূপ অনেক অংশে প্রাচীন অসমিয়ার তো বটেই প্রাচীন ওড়িয়ার প্রাচীন মৈথিলীর ও প্রাচীন ভোজপুরীর সমান অথবা সদৃশ ছিল। অর্থাৎ চর্যাগীতির ভাষা বাংলা-অসমিয়া, ওড়িয়া, মৈথিলী ভোজপুরী ভাষার মতো প্রাচ্য অপভ্রংশ বা অবহঠ্‌টের লঘিষ্ঠ অনুরূপ ছিল। চর্যাগীতি রচয়িতাদের সম্বন্ধে যেটুকু জানা যায় তাতে বলতে পারি যে তাঁরা সবাই দেশের বিশেষ কোন এক অঞ্চলের অর্থাৎ যাকে আমরা দু'হাজার বছর ধরে বঙ্গদেশ বলে জানি তার অধিবাসী হয়তো ছিলেন না। একজন তো নিশ্চয়ই নন, এখন যাকে ওড়িশা বলি তার অধিবাসী ছিলেন তিনি।

ভাষার একত্ব থেকে এই যে সাহিত্যে একতা গোড়া থেকেই দেখা দিয়েছিল তা পরবর্তীকালে—যখন ভাষাগুলি নৈসর্গিক ও ঐতিহাসিক কারণে—বিবর্তন বশে পরস্পর ক্রমশ দূরে সরে যেতে থাকে তখনও কয়েক শতাব্দী ধরে তাদের যোগাযোগ যথাসম্ভব অবিচ্ছিন্ন ছিল। তুর্কী-আফগান অভিযানের সময় থেকে দু'তিন শতাব্দী ধরে প্রাচ্য আর্য ভাষার কোন সাহিত্যে কোনই উচ্চবাচ্য হয়নি। এর প্রধান কারণ হল, তখন পর্যন্ত, বলতে কি চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত অর্থাৎ বাংলায় স্বাধীন সুলতানের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত, সাহিত্যের কারবার চলত সংস্কৃত এবং সে সাহিত্যের কারবারীরা

ছিলেন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতবর্গ। দেশী ভাষার—তখনও আঞ্চলিক কথ্য ভাষাগুলি কোন বিশিষ্ট নাম পায় নি, সে নাম পেতে আরও কয়েক শতাব্দী দেরি হয়েছিল—সাহিত্যের অনুশীলন বলতে তখন বিশেষ কিছু ছিল না। যেটুকু ছিল তা সমাজের নীচে তলায়; যোগী-সাধক সম্প্রদায়ের পরিব্রাজকেরা দেশে বিদেশে দেশী ভাষায় রচিত নিজেদের অধ্যাত্মচিন্তাগর্ভ সাধনসঙ্গীত শুনিয়ে লোকের মনো-বিনোদন, চিত্ত-সম্মার্জন করে ভিক্ষাচর্যা করতেন। বাংলাদেশেই তাঁদের মূল ঘাঁটি ছিল। তাঁদের মূল এদেশে থাকলেও শাখাপ্রশাখা আর্যাবর্তের সর্বত্র এমনকি দাক্ষিণাত্যেও তাঁদের গান একদা প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। সব প্রদেশের সাহিত্যে একথার সাক্ষ্য মিলবে।

বঙ্গদেশের যোগী সম্প্রদায়ের এক নিজস্ব পুরাণকাহিনী ছিল। সে কাহিনীর সঙ্গে সংস্কৃতে রচিত পুরাণকাহিনীর কোন মিল নেই। বরঞ্চ বলা যায় যে যোগীদের পুরাণ কাহিনীর কিছু কিছু বস্তু সংস্কৃত পুরাণ কাহিনীতে গৃহীত হয়েছে। যেমন ধরুন, বেদ উদ্ধারকারী মৎস্যাবতার। যজুর্বেদীয় ব্রাহ্মণে যে মনু-মৎস্যর গল্প আছে তার সঙ্গে অর্বাচীন পুরাণকাহিনীর মৎস্যাবতারের কোন সম্পর্ক নেই। ব্রাহ্মণের উপাখ্যানটি বিদেশী—সেমিটিক পুরাণ কাহিনীর রূপান্তর, এ কাহিনী বাইবেলের নোয়ার কাহিনী। যোগীদের আখ্যানে সিদ্ধা-গুরু মৎস্যেন্দ্রনাথ সমুদ্রগর্ভে মাছ হয়ে শিবের জলটুঙ্গির নীচে থেকে গৌরীকে উপদেশ দেওয়ার কালে শিবের মুখে মহাজ্ঞান শুনে নিয়েছিলেন। মৎস্যরূপ ধারণ করে বিষ্ণু সাগরগর্ভ থেকে বেদ উদ্ধার করেছিলেন এই যে কাহিনী জয়দেব প্রভৃতি কবি উল্লেখ করেছেন তার মূল হল যোগীদের গল্পটি। এই পরিব্রাজক যোগীসাধকদের অবিচ্ছিন্ন যোগাযোগে বাংলার সঙ্গে নিকট ও দূর প্রতিবেশী আর্যভাষা ও সাহিত্যের যোগাযোগ ঘটেছিল। রাজস্থানে প্রাপ্ত রাজস্থানী ও ব্রজভাষায় লেখা যোগীসাধকদের ছড়ায় বাংলা ভাষার শব্দ ও বাক্যাংশ পাওয়া যায়। মৎস্যেন্দ্রনাথ ও গোরক্ষনাথ নিয়ে কাহিনী বাংলা ছাড়া মৈথিলী নেপালী

অবধি হিন্দী পাঞ্জাবী রাজস্থানী মারাঠী প্রভৃতি সম্পর্কিত ভাষায় একদা প্রচলিত ছিল। সাহিত্যের বস্তু দিয়ে বিভিন্ন ভাষার যোগাযোগের এই একটা বড় দৃষ্টান্ত।

ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলার মতো কোনো নব্য আর্যভাষা উচ্চতর সমাজে সাহিত্যের বাহনরূপে গৃহীত হয় নি। তা ছিল অশিক্ষিত অর্থাৎ সংস্কৃত না-জানা জনসমাজের ছড়া-গানের, এবং সেই সমাজে গতিবিধি ছিল যাদের, সেই ব্রাত্যসাধক সমাজের উপদেশ ছড়ার ও সাধনা-গানের ভাষা। উচ্চতর অর্থাৎ পণ্ডিতসমাজে এবং রাজসভায় যে সাহিত্যের অনুশীলন ছিল সে সংস্কৃতে রচিত। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে বঙ্গদেশে সাহিত্য-সংস্কৃতির এক প্রধান পীঠস্থান ছিল বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেনের, বিশেষ করে লক্ষ্মণসেনের রাজসভা। এই রাজসভার ছায়ামণ্ডপে বাংলা তথা অন্য কোন কোন নব্য আর্য-ভাষার সাহিত্যমঞ্চের প্রথম খুঁটি, কৃষ্ণলীলা নাটগীত স্থাপিত হয়েছিল। মৎস্যেন্দ্র-গোরখ কাহিনী যে কাজ নীচের তলার জনসমাজের ভিতরে ভিতরে করে আসছিল, লক্ষ্মণসেনের সমাদৃত জয়দেবের গীতগোবিন্দ তা উপরতলায় মৃদঙ্গনির্ঘোষে সর্বত্র ছড়িয়ে দিলে। এখানে মনে রাখতে হবে যে, যোগীসাধকদের রচনা আর জয়দেবের রচনা ভিন্ন জাতীয়, তবে দুই-ই নাটগীত, পড়বার বই নয়, শোনবার অথবা দেখবার ও দেখাবার বস্তু। এই জন্যে ভাবের ও ভাষার বিস্তার-কর্মে এমন রচনার বিশেষ মূল্য ছিল। গীতগোবিন্দের গান বাংলা অসমিয়া মৈথিলী ওড়িয়া মারাঠী গুজরাটী রাজস্থানী ভাষায় পদাবলীর সৃষ্টির সম্ভাবনা আনিয়েছিল। গীতগোবিন্দের নাট মৈথিলী অসমিয়া নেপালী প্রভৃতি ভাষায় নাটপালার সৃষ্টি করেছিল। গীতগোবিন্দের ভাষা বঙ্গদেশে, আসামে, ওড়িশায়, মিথিলায়, নেপালে বৈষ্ণব কবিতায় বিশিষ্ট ভাষা-ছাঁদ ব্রজবুলি তৈরি করেছিল।

ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীতে পূর্বভারত প্রান্তের সাহিত্যসংস্কৃতির কেন্দ্র প্রথমে স্থাপিত হয়েছিল মিথিলায় তার পর ক্রমে নেপাল

তরাইয়ে ও নেপালে। নেপালের রাজসভাগুলিতে নাটগীত অভিনয়ের অনুশীলন বিশেষভাবে হয়েছিল। এই সব নাটপালার অনেক পুঁথি মিলেছে। সে সব পুঁথির মূল্য এখন সব যাচাই করা হয়নি, অপ্রকাশিত বলে। যেগুলি ছাপা হয়েছে তার থেকে দেশীয় নাট্য রচনার অর্থাৎ যাত্রাপালার পুরানো ও খাঁটি নিদর্শন পাচ্ছি; এবং আরও জানছি যে এসব রচনায় বাংলা, মৈথিলী, হিন্দী, নেপালী (এমনকি নেপালের অন্-আর্য ভাষাও যৎকিঞ্চিৎ) গৃহীত হয়েছে। পূর্বভারতের ভাষা সমন্বয়ের ও সংস্কৃতি বিনিময়ের এ-এক অপূর্ব উদাহরণ। বিদ্যাপতি বিরচিত গোরক্ষবিজয় নাটকের পুঁথি নেপালে পাওয়া গেছে। পুঁথির লিপিকাল ১৬১৪ খ্রীস্টাব্দ। রচনাকাল তার আগে, কিন্তু কত আগে তা বলা যায় না। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধ হওয়া অসম্ভব নয়। এই ছোট বইটি প্রধানত সংস্কৃত, মৈথিলী ও ব্রজবুলিতে লেখা। দু'একটি গানের ভাষায় বাংলার ছাপ স্পষ্টভাবে পড়েছে। এর থেকে অনুমান করতে পারি যে বিদ্যাপতি ভনিতায় যে সব বাংলা পদ মিলেছে তার কিছু কিছু প্রাচীন মৈথিলী কবি বিদ্যাপতির রচনা হতে পারে।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে চৈতন্য এবং তাঁর প্রেমধর্ম বাঙালী ওড়িয়া মৈথিল এবং আশেপাশের সব মানুষকে এক ছাউনির তলায় একত্রিত করেছিল এবং গুজরাট রাজস্থান-মথুরা-প্রয়াগ-কাশীকে বঙ্গভূমির কাছে টেনে এনেছিল। তার ফলে বাংলার মতো অনেক ভাষাই নূতন জীবন ও উদ্দীপনা লাভ করে। চৈতন্যর ধর্মের জাল দক্ষিণেও ছড়িয়েছিল। ভাষার দিক দিয়ে নয়, তবে সব ভাষার মন যে মানুষের মন, সেই মনের দিক থেকে ভারতবর্ষকে একসূত্রে বাঁধবার চেষ্টা তাঁর কর্মে বাক্যে জাগরূক হয়েছিল।

মুসলমান অধিকারের ফলে বাংলা প্রভৃতি আর্যভাষায় দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে—ওড়িয়া ও অসমিয়ায় অনেক কাল পরে

*সুতরাং তুলনায় অল্প পরিমাণে পড়তে থাকে।* এ প্রভাব প্রধানত শব্দ ভাণ্ডারে। বাংলায় কিন্তু ভাষাছাঁদে অর্থাৎ ব্যাকরণে ও পদবিধিতেও পড়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে বাংলা গদ্যের প্রকাশ্য ব্যবহার হয়। বাংলা গদ্যের গোড়ার দিকে সংস্কৃত গদ্যরীতির প্রভাব সব চেয়ে বেশি প্রকট, তার পরেই ফারসীর। অসমিয়া ভাষায় গদ্যের প্রকাশ অনেক কাল আগেই ঘটেছিল। সেখানে ফারসীর প্রভাব তেমন পড়েনি।

ফারসীর সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুস্থানীর অনুশীলনও দরবারী আমলা-সমাজে এবং নব-অভিজাত জমিদার মহলে চলতে থাকে। মুসলমান লেখকেরা যে ভাষা ব্যবহার করতেন তাতে ফারসীর ভাগ স্বভাবতই বেশী থাকত এবং হিন্দুস্তানীও কিছু কিছু থাকত। তাঁদের এই ভাষারীতির একটু বিশেষ মাধুর্য ছিল, তাই ভারতচন্দ্রের মতো ফারসী ও হিন্দুস্তানী জানা শক্তিশালী কবি সে রীতি প্রয়োজনবশে স্বীকার করেছিলেন। বাংলা ভাষার শক্তি যে এই "মুনশীয়ানা রীতি" অনুশীলনের ফলে সমৃদ্ধ হয়েছিল তা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না।

জন্মকাল থেকে আধুনিক আর্যভাষাগুলি সংস্কৃতের নিয়ন্ত্রণে থাকায় পরস্পরের মধ্যে কালক্রমিক ব্যবধান যতটা হতে পারত ততটা হয় নি; সংস্কৃত যেন পক্ষিমাতার মতো ভাষাগুলিকে হাতের নাগালে রেখে এসেছে। সংস্কৃত আমাদের ভাষার মাতামহী, কিন্তু কোনক্রমেই মৃতা নয়, স্তন্যদায়িনী ধাত্রীমাতা। সংস্কৃতের স্তন্যভাণ্ডার —তার অপরিসীম শব্দকোষ—ভারতীয় যে কোন ভাষার প্রয়োজনে সর্বদা খোলা আছে। আধুনিক কালে অন্য দিক দিয়ে ভারতীয় ভাষা আর এক পোষণকারিণীর অলক্ষ্য সঞ্চারে আবির্ভাব ঘটেছে। মুখে যাই বলি না কেন ইংরেজী ( এবং ইংরেজীর মারফৎ ফরাসী জর্মান ইত্যাদি ) ভাষা ও সাহিত্য এখন আমাদের সাহিত্যরথের যাকে বলে "রিমেট কনট্রোলার" অর্থাৎ অদৃশ্যসারথী। ভাষার বিকাশ হয় সাহিত্যের

অনুশীলনে। অনুশীলন মানে দাগাবুলানো নয়। অনুশীলন মানে নবনব কল্পনায়, নবনব প্রেরণায় নব নব প্রকাশের উত্তম। সেই উত্তমের ফলেই সাহিত্য "সৃষ্টি" হয়, "কপি" হয় না। ইংরেজীর ছায়ায় আমাদের সাহিত্যকারদের উত্তম বোধ হয় ম্লান হচ্ছে। তবে ইংরেজী ভাষার শব্দ ও পদবিধি যে ভারতীয় ভাষাগুলির শক্তিবৃদ্ধি করছে তা আমার মাতৃভাষার অবস্থা থেকেই অনুমান করতে পারি। এই প্রভাব অবশ্য আমাদের দেশেই সীমাবদ্ধ নয়, অন্যান্য দেশেও পড়েছে, পড়ছে এবং পড়বে বলে আমার ধারণা। সভ্যজগৎ যে সব দিক দিয়েই একঘাতিক হতে চলেছে এও তার একটা বড় লক্ষণ।

সে যাই হোক্ সংস্কৃত ও ইংরেজী আমাদের ভাষাগুলির যেন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। সুতরাং সংস্কৃত বয়কট করা ও ইংরেজী হটানো অত্যন্ত অসমীচীন চিন্তা। আমাদের অনেকেরই মনে এই ভুল ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে সংস্কৃত (তৎসম) শব্দকে খাঁটি বাংলা (তদ্ভব-দেশী) শব্দ দিয়ে তাড়ালেই অথবা / এবং ইংরেজী শব্দের পরিবর্তে সংস্কৃত-কল্পিত অথবা অকল্পিত-শব্দ বসালেই বাংলা (বা অন্য কোন আর্যভাষা) দ্রুতগতিতে উন্নতির পথে ধাবমান হবে তা নয়। শব্দশক্তি ভাষার প্রধান শক্তি। যে ভাষায় যত বেশি শব্দ গৃহীত—গৃহীত হওয়া মানে বৃহৎ বৃহৎ ভলুমে সঙ্কলন নয়, লেখার কাজে ব্যবহৃত হয়েছে সে ভাষা তত্তই শক্তিসম্পন্ন। সংস্কৃত ভাষা তার দু'হাজার আড়াই হাজার বছরের ইতিহাসে যে যে অগ্রগামীকে বজায় রেখেছিল বিভিন্ন কালে সমসাময়িক সম্পৃক্ত ও অসম্পৃক্ত সকল ভাষার থেকে যথাযোগ্য শব্দ আহরণ করে। তার মধ্যে গ্রীক আছে, ইরানীয় আছে, তুর্কি আছে, দুহিতৃস্থানীয় প্রাকৃত আছে, দৌহিত্রীস্থানীয় আধুনিক আর্যভাষা আছে ; তেলগু-কানাড়ী প্রভৃতি দ্রাবিড়ী ভাষা আছে ; অসংখ্য অস্ট্রিক ভাষা আছে, ভোটবর্মী ভাষা আছে। সংস্কৃতের মহাজন পথ অনুসরণ করে

আধুনিক ভাষাভাষী আমরাও যদি নিজেদের ভাষার প্রতিবেশী ভাষা থেকে শব্দাগমের পথ উন্মুক্ত রাখতে পারি তাহলে আমাদের পরস্পর বোঝাপড়া সহজসাধ্য এবং আনন্দের হবে।

আরও একটু বলবার আছে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর থেকে হঠাৎ আমাদের নিজের নিজের ভাষা নিয়ে একটু বেশি মাত্রায় উৎসাহ জেগেছে। এর আসল কারণ এ নয় যে, হঠাৎ আমাদের এ বিষয়ে শুভবুদ্ধি জাগ্রত হয়ে আমাদের বিবেকে দংশন করতে লেগেছে। আসল কারণ আমাদের শিক্ষা আমাদের মানস গড়তে এসব আজ সাহায্য করছে না। আক্ষরশিক্ষিতের সংখ্যা যতই বাড়ছে, আমাদের মন যেন ততই সহবৎ ও শিক্ষা এড়িয়ে দুর্বিনীত, অবিবেচক ও অসহিষ্ণু হয়ে উঠ্‌ছে। তার ফলে এখন অনেক নিতান্ত আঞ্চলিক উপভাষা স্বাধীন ভাষার স্বীকৃতি লাভ করতে চেষ্টিত হয়েছে। এ বিষয়ে আমাদের জ্ঞানান্ধতার একটা বড় উদাহরণ হল যে, গত ১৯৭১ সালের আদমসুমারিতে ২৬৫ জন ব্যক্তি—নিশ্চয়ই শিক্ষিত—নিজের মাতৃভাষা নির্দেশ করেছেন, বলেছেন সংস্কৃত অথবা কোন প্রাকৃত ভাষা। অর্থাৎ এদের কথা বিশ্বাস করতে হলে মানতে হবে যে ভারতবর্ষে এখন এমন কয়জন ব্যক্তি আছেন যাঁরা ভূমিষ্ঠ হবার পরই স্তন্যপানের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত, পালি ও অর্ধমাগধী শিক্ষা করেছিলেন। কিমাশ্চর্যম্ অতঃপরম্।

ভাষা হোক সংস্কৃতি হোক ব্যবসা বাণিজ্য হোক সব ব্যাপারেই আমাদের পরস্পর সহানুভূতিশীল ও সমদর্শী হতে হবে—একথা যেন আমরা সর্বদা মনে রাখি।

# পূর্বভারতের ভাষাসমূহের ক্রমবিকাশ এবং পারস্পরিক সম্পর্ক

**অধ্যাপক উশম চেতন সিং**

জি-পি-মহিলা কলেজ, ইম্ফল

পূর্বভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বহু ভাষাভাষি মানুষের বাস। ভারতীয় জনগণের ব্যবহৃত ভাষা স্পষ্টত চারটি ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত যেমন, অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, চীনা-তিব্বতী এবং ইন্দো-ইউরোপীয় ( অথবা আর্য ) ভাষাগোষ্ঠী। এইসব ভাষাগোষ্ঠীর পারস্পারিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে বহুদিন ধরে এবং শুধু পারস্পরিক সম্পর্কই নয়, একে অপরের উপর প্রভাবও বিস্তার করেছে। বিগত তিনহাজার বছর একাদিক্রমে এইসব ভাষাগোষ্ঠী একে অপরের কাছাকাছি এসেছে এবং পারস্পরিক সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করেছে। এই যোগাযোগের ফলশ্রুতিতে যে শব্দ-কোষের সৃষ্টি হয়েছে তার মধ্যে বৃহত্তর ভারতের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। এ ঘটনাকে আমরা শুধুমাত্র পূর্বভারতের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ করে দেখতে পারি না, এটা সারা দেশের ক্ষেত্রেই বাস্তব সত্য। এক ভাষায় কথাবার্তা বলার সময় বক্তাকে প্রতিবেশী ভাষার বহু শব্দ ব্যবহার করতে দেখা যায় এবং এটা হলো স্বাভাবিক ঘটনা। এটাও দেখা যায় যে, কোন এক ভাষায় কথা বলার সময় বক্তা প্রতিবেশী ভাষা অথবা উপভাষার বহু শব্দ কিম্বা বাকবৈখরি ব্যবহার করছেন।

পূর্বভারতের ভাষাসমূহের পারস্পরিক দেয়া-নেয়া প্রত্যেকেরই একটি স্বাভাবিক সাধারণ চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্য। এই সব ভাষার শব্দ ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে নানা ভাবে; সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও অন্যান্য ঘটনাবলী এইসব ভাষার শব্দ সঞ্চয়নে প্রভাব বিস্তার

করেছে। এ সূত্রে পারস্পরিক অনুবাদের কাজও হয়েছে উল্লেখযোগ্য। একে অন্যের ভাষা-সম্পদের সন্ধান করতে এসে সব ভাষাই পরস্পর পরস্পরের নিকটবর্তী হয়েছে এবং পারস্পরিক প্রভাব বিস্তারের ফলে সব পক্ষেরই উন্নতি হয়েছে। সমস্ত ভাষার শব্দকোষ সৃষ্টিতে সমতা স্থাপনের পথে যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটেছে।

ঋকবেদের কাল থেকে আজ পর্যন্ত—শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলেছে এই পারস্পরিক দেয়া-নেয়ার কাজ এবং এখনও চলেছে অব্যাহত গতিতে। পূর্বভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বহু কথ্য ভাষা, বহু ভাব ও বহুরকম ভাষা এবং নানাবিধ কারণে সেগুলি বিকাশ লাভ করেছে ও সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। সহজ ভাবে মেলামেশা, বিবাহের মধ্যে দিয়ে মিলন, বিভিন্ন তীর্থক্ষেত্রে মেলামেশা, ধর্মীয় অনুশাসন, রাজনৈতিক সীমানার পরিবর্তনে ঐক্য, অন্য অঞ্চলে গিয়ে বসবাস, শিক্ষা বিস্তারের ফলে জ্ঞানের প্রসার, ভৌগলিক অবস্থিতির জন্য ঐক্যবোধ ইত্যাদি বহুবিধ কারণে পূর্বভারতের লিখিত ও কথ্য সব ভাষাই পারস্পরিক ভাবে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে।

ভাষাবিদ্ পণ্ডিতগণের মতে ইন্দো-আর্য ও দ্রাবিড়ীগণ কিছু সাংস্কৃতিক শব্দাবলী আহরণ করেছিলেন আদিবাসী ও তিব্বতী-ধর্মী ভাষাগোষ্ঠীর কাছ থেকে। এতে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, ইন্দো-আর্য ও দ্রাবিড়ী ভাষা গোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগের গুরুত্ব। আদিবাসী ভাষাগোষ্ঠীর সঙ্গে এ দুই অথবা একটি ভাষার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটেছিল, যার ফলশ্রুতিতে ঐ শব্দাবলীর উদ্ভব হয়েছে। প্যারিসের ভাষাবিদ্ পণ্ডিত সিলভাইন লেভি ও জঁ প্রজিলাস্কির মতে ঋক্‌বেদ ও অথর্ববেদে পুরোনো ইন্দো-আর্য যে সব শব্দ পাওয়া গেছে সে সব শব্দের উৎস হলো অস্ট্রিক-এশিয়াটিক ভাষা।

অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত মুণ্ডা ও মন-খমের ভাষা এখন যথেষ্ট সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলেছে, অতীতে কিন্তু এতটা বিকাশ এ ভাষাদ্বয়ের ঘটেনি। অহমিয়া বর্ণমালার অতিপ্রয়োজনীয় ভিত্তি

হলো অস্ট্রিক ভাষার উপাদান। অহমিয়া শব্দের সঙ্গে অস্ট্রিক শব্দাবলীর যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়। উত্তর-পূর্বভারতের অস্ট্রিক-এশিয়াটিক ভাষাগোষ্ঠীর সঙ্গে মেঘালয় রাজ্যে ব্যবহৃত খাসি ভাষার সুস্পষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। এ ব্যাপারে খাসি ও অহমিয়া—দুই ভাষার মধ্যেই পারস্পরিক দেয়া-নেয়া ঘটেছে। কিছু কিছু শব্দ আছে, যেগুলির উৎস সম্ভবতঃ অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠী, যেগুলি খাসি ভাষায় দেখা যায় এবং এগুলি পুরোনো সংস্কৃতে স্বীয়িকৃত করে নেওয়া হয়েছিল। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়—সংস্কৃত 'চোলাঙ্গা' ( লেবু ), অহমিয়াতে 'স্লোলেন', 'সোলেন' ; খাসিতে 'সোহ্-লঙ্' ( সোহ্, ফল )। সংস্কৃত 'সিম্বা'—( শিম ), অহমিয়াতে 'সেয়েই', 'চেই' ; খাসিতে 'সিম্বাই', 'সিম্বো'—বীজ, শস্য। ইউ-এস-সিং কৃত খাসি-ইংরেজি অভিধান ১৯০৬, বনাই কান্ত কাকতি কৃত ও ডঃ গোপালচন্দ্র গোস্বামী পরিমার্জিত ও সম্পাদিত 'আসামিজ : ইটস্ ফরমেশন এণ্ড ডেভেলপ-মেণ্ট'—১৯৬২এর দ্বিতীয় সংস্করণ অবলম্বনে।

জল শব্দের সমার্থক অস্ট্রিক শব্দ—হো, হোঙ্, ওঙ্, তায়া, তিও, তু, তুয়েহ্ ; ডু, ডিইউ ; লাউ—পরিস্রুত জল ; তিমেনু,—একটি বড় নদী, তিয়ুমি,—ছোট নদী ; কুওড তেয়ু,—একটি শাখানদী। জলের বোরো প্রতিশব্দ—'ডি' ( পার্বত্যাঞ্চল ও পূর্ব আসামে ব্যবহৃত ) এবং 'ডুই' ( সমতলে ও পূর্ব আসামে )। জলের লুসাই প্রতিশব্দ—'টু-ই'। মনিপুরী ভাষায় 'টু-খোয়ঙ'—খাল, ছোট নদী ; টুরেন—নদী। এ ভাবে বিশ্লেষণ করে দেখলে এই সব ভাষাগুলির মধ্যে পারস্পরিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখতে পাব।

ভাষাবিদ্ শ্রীরবিনস্ বার্লিং-এর মতে আঙামি ভাষার শব্দ উচ্চারণে পাঁচটি স্বর আছে। শ্রীডি-এন-শঙ্করের মতে বোরো ভাষায় আছে দুটি স্বর। আমার বিশ্লেষণে মনিপুরী ভাষায় রয়েছে তিন রকমের স্বর। রবিনস বার্লিং-এর মতে আঙামি-এর পাঁচটি স্বর হলো : ।Λ। নিম্নাবরোহী, ।\। নিম্নসমতা, ।-। মধ্য-ধ্বন্যাত্মক, ।V।

মধ্য সাধারণ ও। ´। উচ্চ। আর লুসাই-এ স্বর ৪টি যেমন।—। উচ্চ স্বর, ।ˎ। উচ্চ অবরোহী, ।-। নিম্নস্বর, ।ˏ। নিম্ন অবরোহ। শ্রীশঙ্করের মতে রোবো-তে স্বর ২টি—।´ উচ্চ অবরোহী এবং ।-। মধ্য অবরোহী। মনিপুরী ও লুসাই ভাষার শব্দের উচ্চারণে যে সাদৃশ্য নিচে তার কিছু দৃষ্টান্ত তুলে দেওয়া হলো :

| মনিপুরী শব্দ | লুসাই শব্দ | ইংরেজি প্রতিশব্দ |
| --- | --- | --- |
| । সে̌ ম́ । | । সাম । | "hair" ( কেশ ) |
| । সা̌ ` । | । সা্ । | "meat" ( মাংস ) |
| । পা̀ ক । | । প্াম । | "belly" ( পেট ) |
| । `পি । | । ্পে । | "give" ( দেওয়া ) |
| । টু̂ । | । টু উ ই । | "sew" ( সেপাই ) |
| । চি̌ক । | । ্সে । | "bite" ( দংশন ) |

প্রত্যেক ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যেই সমজাতীয় শব্দাবলীর সূত্র দেখতে পাই। পূর্বভারতের ভাষাগুলির মধ্যে ইন্দো-ইউরোপীয়ান ( আর্য ), অস্ট্রিক ( কোল অথবা মুণ্ডা ও খাসি ) এবং চীনা-তিব্বতী ভাষাগোষ্ঠীর পারস্পরিক দেয়া-নেয়ার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষা সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। যদিও এদের প্রত্যেকের উৎস পৃথক তবু এদের মধ্যে কিছু কিছু সাদৃশ্য দেখা যায় যা দীর্ঘকালের—শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অক্ষয় হয়ে আছে। শুধু যে এই ঐক্যসূত্র পূর্বভারতেই রয়েছে তা নয়, এটা হলো বৃহত্তর ভারতের ভাবচিত্র। পারস্পরিক যোগাযোগের যে সমস্যা আমরা দেখি তা দূর হয়ে যায় এই অন্তঃস্রাবী সাদৃশ্যগুলির মধ্যে।

পৃথক পৃথক সাহিত্য থাকা সত্ত্বেও অহমিয়া ও ওড়িয়া ভাষার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে বাংলা ভাষার সঙ্গে। মৈথিলি, মাগহি ও ভোজপুরী ইত্যাদি ভাষার গতিপ্রবণতা হিন্দীভাষামুখী হলেও এদের নাড়ীর

সম্পর্ক ওড়িয়া-বাংলা-অহমিয়া ভাষার সঙ্গে। চীনা-তিব্বতীয় (তিব্বতী-বর্মী) ভাষা ছাড়া অন্যান্য সমস্ত ভাষাগোষ্ঠীর ভাষা নিয়ে গভীর গবেষণার কাজ চলেছে।

পূর্বভারতে বহুকাল থেকেই তিব্বতী-বর্মী উপভাষা গোষ্ঠীর মানুষের বসবাস কিন্তু এ সব ভাষায় হাতেকলমে কাজ অবহেলিত হচ্ছে বলে অভিযোগ শোনা যায়। তবে এক সময় এ কাজে হাত দেওয়া হয়েছিল এবং যথাশক্তি দিয়েই কাজে নামা হয়েছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাজ আর এগোয় নি; মনীষার অভাব ও অশিক্ষাজনিত পরিবেশই এর জন্য দায়ী। তবে বাস্তবিক পক্ষে যখন একাজটি সুসম্পাদিত হবে তখন তার প্রভাব হবে সুদূরপ্রসারী। এই ভাষাগোষ্ঠীর সঙ্গে অন্যান্য ভাষাগোষ্ঠীর পারস্পরিক নেয়া-দেয়ার ফলাফল এক আলোজ্জ্বল ঐক্য-চিত্র ফুটিয়ে তুলবে। তখন দুরূহ ও অপরিচিত ভাষাবিদ্‌গণ কাজ শুরু করতে পারবেন। উল্লেখ্য যে, ১৯৬৭ সালে জিওফ্রে এডওয়ার্ড মরিসন লণ্ডনের "স্কুল অব ওরিয়েন্টাল এণ্ড আফ্রিকান স্টাডিজ"-এর মাধ্যমে তার বিখ্যাত বই "দি ক্লাসিফিকেশন অব নাগা ল্যাঙ্গুয়েজেজ অব নর্থ-ইষ্ট ইণ্ডিয়া" রচনা সমাপ্ত করেছেন। পূর্ব-ভারতের তিব্বতী-বর্মী ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে ভাবের আদান প্রদানে বইটির যথেষ্ট অবদান রয়েছে। ১৯৭২ সালে পল-কে-বেনিডিক্ট-এর "সিনো-টিবেটান: এ কনসপেক্টাস" বইটি প্রকাশিত হয়।

খ্রীস্ট জন্মের অন্তত ৪০০০ বছর আগে পশ্চিম চীনের যোয়াংওটেজ ও হোয়াং-হো নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে মূল চীনা-তিব্বতী ভাষা প্রচলিত ছিল বলে ধারণা করা যায়। এ অভিমত ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও এস. এম. খাত্রের। ডি-জি-ই হলের মতে তিব্বতী-বর্মী ভাষাগোষ্ঠীর মানুষদের আদি নিবাস ছিল গোবি মরুভূমি ও তিব্বতের উত্তরপূর্ব অঞ্চলের মাঝামাঝি কোন অঞ্চল, সম্ভবত কান্‌সু অঞ্চলে।

তিব্বতী-বর্মী ভাষা সমূহকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় যেমন, (১) হিমাচল প্রদেশ, কাশ্মীর, লাডাক অঞ্চলের তিব্বতী ভাষাগোষ্ঠী

এবং অরুণাচল প্রদেশের গোয়ারাঙ-মুসৃমী গোষ্ঠী, (২) আসাম, ত্রিপুরা ও মেঘালয়ের বোরো গোষ্ঠী, (৩) মনিপুর ও নাগাভূমির নাগা-কুকি-চীনা গোষ্ঠী। এই তিন ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ তিনটি পৃথক উৎস-ভাষার প্রতিনিধ্ব করেছেন এবং তাঁরা তিনটি পথ ধরে ভারতে এসে বসবাস করেছেন। তাদের আগমনের পথগুলি হলো ঃ তিব্বতের পথ, ব্রহ্মপুত্র নদী ও এর শাখানদীর পথ এবং (৪) পূর্বদিকে ব্রহ্মদেশের পথ। মনিপুরী, লুসাই, মিকির এবং নানারকম নাগা ভাষা যেমন, আও, সেমা, আঙামি ও থ্যাঙ্‌কুল ভাষাভাষীরা তৃতীয় উৎস থেকে তাঁদের ভাষা পেয়েছেন। আর তাঁরা ভারতে এসেছেনও তৃতীয় পথ ধরে।

লক্ষ্য করলেই দেখতে পারা যায় তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত ভাষা-গোষ্ঠীর ভাষা-কাঠামো এবং শব্দাবলী মূলত ঐ উৎস-ভাষা থেকে উদ্ভূত। এদের উৎস-প্রকৃতি প্রায়ই দ্বৈত শব্দ সম্বলিত এবং এমনও দেখা গেছে যে এদের আয়তন দশ বা তার চেয়ে বেশী শব্দ সম্বলিত। এ সব শব্দ বিশ্লেষণ করলে সহজেই বোঝা যায় যে, উৎস-উপাদান এদের কত বড় আশ্রয়। উচ্চারণে শব্দের ভিন্নতা কিন্তু পরিস্ফুট।

মনিপুরী ভাষার রয়েছে সুপ্রাচীন সাহিত্য সম্পদ। সূচনা কালে এর বর্ণমালা এর নিজস্ব ধারাতেই চলেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে মনিপুরের জনগণ অহমিয়া-বাংলা লিপি ব্যবহার শুরু করে। মনিপুরী ভাষা ও সাহিত্য এখনও বিকাশ লাভ করছে। জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে স্নাতকোত্তর পঠনপাঠনে মনিপুরী ভাষা ও সাহিত্য অনুমোদন করেছেন।

পূর্বভারতের বিভিন্ন ভাষার মধ্যে যে দেয়া-নেয়া চলেছে তা বহু শব্দের মধ্যে পরিস্ফুট। যেমন, ধরা যায় 'বিষ্ণুপ্রিয়া' শব্দটি, এটি এখন বাংলা ভাষার একটি মধুর শব্দ। এ শব্দটি এসেছে সুপ্রাচীন কালে পূর্বভারতের আর্য-ভারতীয় ভাষার ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে যার সঙ্গে তিব্বতী-বর্মী ভাষা মনিপুরীর ভাণ্ডারের বহু সাদৃশ দেখা যায়। পূর্বভারতের ভাষা সমূহের মধ্যে দেয়া-নেয়া ও ভাব মিলনের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এই 'বিষ্ণুপ্রিয়া' শব্দ।

বঙ্গানুবাদ ঃ অপূর্বকুমার সাহা

# জাতীয় সংহতি এবং বিভিন্ন ভাষার আন্তঃসম্পর্ক

সত্যেন্দ্র নারায়ণ মজুমদার

স্মরণাতীত কাল থেকে ভারতবর্ষে বৈচিত্র্যের ভেতরে ঐক্য দেখা গেছে। পূর্বভারত নিজেই এই বৈচিত্র্যের মধ্যে এক ঐক্যস্বরূপ। ভাষার ক্ষেত্রে এসে আমরা দেখতে পাই যে ভারতে চারটি বাক্ পরিবারেরই এই অংশে প্রতিনিধি রয়েছে। এই অঞ্চলে বিভিন্ন ভাষার ইতিহাস, তাদের অভ্যুত্থানের গতি প্রকৃতি এবং আন্তঃসম্পর্ক একত্রে একটি বিরাট ও জটিল বিষয়; এক্ষেত্রে এ পর্যন্ত বিশেষ কিছুই অনুসন্ধান হয়নি।

ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতানুসারে অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, চীন-তিব্বত ও ইন্দো-আর্য এই চারটি বিরাট ভারতীয় বাক্ পরিবারের অন্তর্গত ভাষাগুলি তিনহাজার বছর বা তারও বেশি পাশাপাশি বসবাস করেছে এবং উন্নত হয়েছে। তারা গভীরভাবে পরস্পরকে প্রভাবিত করেছে, বিশেষ করে অস্ট্রিক, দ্রাবিড় এবং ইন্দো-আর্য ভাষাগুলির ক্ষেত্রে এই ঘটনা ঘটেছে। অন্যান্য বাক্পরিবারের অন্তর্গত ভাষাগুলির ক্ষেত্রে যেমন হয়েছে তেমন বিস্তৃত বা যথাযথভাবে চীন-তিব্বত বা কিরাত ভাষাগুলির দ্বারা আর্য ভাষাগুলির সংস্কার সাধনের বিষয়ে এখন পর্যন্ত অনুসন্ধান হয় নি। তথাপি মোটামুটিভাবে বলতে গেলে ডঃ চট্টোপাধ্যায় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে চারিটি বাক্ পরিবারের অন্তর্গত ভাষাগুলির পারস্পরিক প্রভাব বিস্তারের ঘটনার ফলে বর্তমান ভারতীয় ভাষাগুলির সাধারণ ক্ষেত্রে একটি ভারতীয় চরিত্রের অভ্যুত্থান ঘটেছে। মৌল পার্থক্য সত্ত্বেও এমন কতকগুলি সাধারণ বৈচিত্র্যের উদ্ভব হয়েছে যা

*নির্দিষ্ট ভাবেই ভারতীয়। বিভিন্ন পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ভাষাগুলির* অধিকাংশের মধ্যে এই নির্দিষ্ট ভারতীয় বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা যায়। এইরূপে ভাষার ক্ষেত্রে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

কিন্তু বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য সম্পর্কে একটি অমূর্ত বক্তব্য রেখেই আমরা সন্তুষ্ট থাকতে পারি না। বাস্তবভাবে এর বহু দিক অধ্যয়ন করতে হবে এবং তা করতে হবে বর্তমান কালের গতিপ্রকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে। এরূপ অধ্যয়নের সামনে একটি স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকাও আবশ্যক।

একথা সাধারণ ভাবে মেনে নেওয়া হয় যে এই বৈচিত্র্যের অনস্বীকার্য ঘটনাটি মেনে নিয়ে এবং তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেই কেবল ভারতীয় ঐক্যকে শক্তিশালী ও সংহতও আরো উন্নত করা যেতে পারে। ঐক্য ও বৈচিত্র্য এই উভয় বিষয়কে একে অপরের পরিপূরক হতে হবে এবং একটি জীবন্ত ও অটুট পূর্ণতা গড়ে তুলতে হবে। ঐক্যের ফলে যেমন বৈচিত্র্যের স্বাস্থ্যকর দিকগুলির উন্নয়নের সুযোগ অবশ্যই আনতে হবে তেমনি এই সব বিষয়ের উন্নয়নকেও আবার অপরদিকে ভারতীয় ঐক্যের অন্তর্গত বিষয়গুলির সমৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

আমাদের লক্ষ্য হল এই অঞ্চলের বিভিন্ন ভাষার উন্নয়ন ও পূর্ণ প্রস্ফুটন এবং এমন অবস্থার সৃষ্টিতে সাহায্য করা যাতে বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠী পারস্পরিক সহযোগিতার আবহাওয়ায় ভাষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের স্পষ্ট দিকগুলির স্বাধীন ভাবে উন্নতি বিধানে সক্ষম হয়। এই লক্ষ্যের বাস্তব রূপায়ণের ফলে আবার পারস্পরিকভাবে বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতির তথা সামগ্রিকভাবে ভারতীয় সংস্কৃতির সমৃদ্ধি হবে।

এই পরিপ্রেক্ষিত যদি গৃহীত হয় তবে যে অর্থে সাধারণত ভাষাবিজ্ঞানকে গ্রহণ করা হয় তার বাইরে ভাষাতত্ত্বের অনুসন্ধান ও অধ্যয়নের সুযোগ প্রসারিত করা যাবে।

উপরোক্ত লক্ষ্য সামনে রেখে অধ্যয়ন ও অনুসন্ধানের ক্ষেত্রের মধ্যে আবশ্যিকভাবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলিকে রাখতে হবে :

(ক) একক ভাবে ভাষাগুলির ইতিহাস ও তাদের আন্তঃসম্পর্কই কেবল নয়, পরন্তু সাংস্কৃতিক সম্পর্কের ইতিহাস এবং তজ্জাত বিভিন্ন ভাষার পারস্পরিক প্রভাব।

(খ) সাম্প্রতিক কালে যে সব সংস্কৃতি সম্পর্ক ঘটেছে—এবং ভাষাগুলির উপর তজ্জাত পারস্পরিক সম্পর্ক।

(গ) পারস্পরিক সহযোগিতা বিনিময় ও সমৃদ্ধির পথানুসন্ধান।

লোকগাথা ও জাতি বিবরণ অধ্যয়নের সঙ্গে ভাষা-বিজ্ঞান অধ্যয়নের সমন্বয়ই সামাজিক ভাষা বিজ্ঞানের কাজ। অধ্যাপক এম. বি. এমেনিয়ানের মতানুসারে, "ভাষা বিজ্ঞানের ছাত্র চূড়ান্ত যে মূল্যবস্তু নৃতত্ত্বকে দিতে পারে তা হল সমাজের অত্যন্ত উচ্চ স্তরের বাচনিক ও সাংস্কৃতিক বহিঃপ্রকাশের অধ্যয়ন।" যে কোন সমাজের জীবনে এই সমন্বয় প্রবণতা ভাষার প্রকৃত ভূমিকা তুলে ধরতে সাহায্য করে। কোন নির্দিষ্ট সমাজ বা সংস্কৃতিগোষ্ঠির সদস্যরা জীবনে যে সব পদ্ধতি অনুসরণ করেন বা প্রচার করেন বাচনিক কলারূপগুলিতে, গল্পে, সঙ্গীতে ও বক্তৃতায় তারা তার সর্বাধিক স্পষ্ট ও আত্মসচেতন প্রকাশ দান করে থাকেন।

সমাজ ভাষাবিজ্ঞানমূলক প্রবণতা অনুসন্ধানের সীমান্ত বিস্তৃত করে। ভাষাবিজ্ঞান সংক্রান্ত বস্তুগুলি বিচ্ছিন্নভাবে নয় সামাজিক জীবনের প্রতিফলন রূপই অধ্যয়ন করতে হবে। কিন্তু আমাদের অধ্যয়নের যে উদ্দেশ্যগুলি উপরে নির্দিষ্ট হয়েছে তার জন্য আরো কিছু প্রয়োজন। সামাজিক বিজয়রূপে, ভাষার গতিবিজ্ঞানকে এর দ্বারা অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সামাজিত কর্তব্যকে এবং উন্নয়নের বিভিন্ন পর্যায়ে নির্দিষ্ট সমাজের বৃদ্ধির প্রতিফলনকারী সব কর্তব্যেব প্রসারণকে আমাদের অধ্যয়ন করতে হবে।

এ সম্পর্কে ভাষাবিজ্ঞানের প্রতি মার্কসীয় গতিপ্রকৃতি এবং

সোভিয়েত ভাষাবিজ্ঞানের অভিজ্ঞতাখুবই সহায়ক হবে। এই মতে বলে বহু প্রজন্মের মাধ্যমে সংগ্রহীত সমগ্র জনগণের অভিজ্ঞতার সামগ্রিক ঐতিহাসিক ফল হল ভাষা। এতে সংশ্লিষ্ট জনগণের ইতিহাসের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে উন্নয়নের নিয়মকানুনসমূহ এবং ভাষা অধ্যয়নের প্রয়োজনের উপরে জোর দেওয়া হয়। নির্দিষ্ট সমাজের উন্নয়ন পদ্ধতির ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এর অধ্যয়ন অবশ্য কর্তব্য। সংক্ষেপে, সামাজিক, আর্থনীতিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ভূমিকায় ভাষা বিজ্ঞানের গতিপ্রকৃতি অধ্যয়ন করতে হবে।

ভাষাবিজ্ঞানের মার্কসীয় তথ্য বিশেষ জোর দিয়েছে ভাষার বিবিধ সামাজিক কর্তব্য অধ্যয়ন এবং এই সব কর্তব্য ও সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন পর্যায়ের প্রসারণের উপর। কেবলমাত্র বহিরঙ্গই নয়, ভাষাসমূহের সামাজিক উপাদানও মনোযোগের প্রধান বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। যে ঐতিহাসিক পটভূমিকায় অনুরূপ ঘটনা ঘটে তার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে বিষয়টির অধ্যয়ন করা হয়।

যে সব ভাষা পূর্বে পশ্চাদপদ মুমূর্ষু এবং আরো উন্নতির সুযোগ বিরহিত বলে গণ্য হত সেই সব ভাষার অন্তর্নিহিত উন্নয়ন সম্ভাবনা সোভিয়েত ভাষাবিজ্ঞানে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অধ্যয়ন করা হয়েছে। অনুরূপ বহু ভাষায় সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশের উপযুক্ত অবস্থা সৃষ্টি হল সোভিয়েত ভাষাবিজ্ঞানের অন্যতম উল্লেখযোগ্য অবদান। যে সব ভাষার নিজস্ব কোন লিপি ছিল না তাদের নতুন লিপি উদ্ভাবিত হয়েছে। কতিপয় ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রাচীন লিপির সংস্কার সাধিত হয়েছে। এই সব ভাষায় আধুনিক সাহিত্যের বিকাশে এই সব ভাষাভাষী জনগণের মধ্যে যে মূল্যবান লোকগাথা বস্তু ছিল তা ব্যবহার করা হয়েছে।

বিভিন্নক্ষেত্রে সামাজিক জীবনের প্রয়োজন মেটাতে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে এই সব ভাষায় সামাজিক কর্তব্য যথেষ্ট পরিমাণে প্রসারিত ও পরিচালিত হয়েছে। এর মধ্যে আছে প্রশাসন, শিল্প, সংস্কৃতি এবং

তাত্ত্বিক ও ফলিত বিজ্ঞানের বিবিধ শাখায় গবেষণা। একথা সত্য যে এই সব ভাষার সবগুলিই সম পরিমাণে উন্নত হয় নি। কতিপয় ক্ষেত্রে উপর-কাঠামোর উচ্চতর পর্যায়ের সঙ্গে সম্পর্কিত সামাজিক কর্তব্য সম্পাদনের মাধ্যম হিসাবে সংশ্লিষ্ট জনগণ তুলনামূলক ভাবে উন্নততর কোন ভাষা গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তাতে উপরে যে সাধারণ উন্নয়নের কথা বর্ণনা করা হল তার গতির বিরোধিতা করা হয় নি।

সোভিয়েত ভাষাবিজ্ঞানের অপর একটি উল্লেখযোগ্য অবদান হ'ল ভাষাগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয় এরূপ অবস্থার সৃষ্টিতে এর ভূমিকা। এতে দেখা গেছে যে যেখানে মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ দূরীভূত হয়েছে এবং শ্রেণী আধিপত্য বর্জিত হয়েছে, সেরূপক্ষেত্রে যখন সম্পূর্ণ নতুন ঐতিহাসিক অবস্থায় বিবিধ ভাষা একে অন্যের সংস্পর্শে আসে তখন সংঘর্ষ সৃষ্টি হয় না, পারস্পরিক সমৃদ্ধি ঘটে। এই সব ভাষাও কতকগুলি সু উন্নত আবার কতকগুলি তুলনামূলক ভাবে কম বা এমন কি অনেক কম উন্নত। কিন্তু তবু এতে কম উন্নত ভাষাগুলির অবলুপ্তি ঘটে নি। অপর পক্ষে নতুন ঐতিহাসিক অবস্থায় সংঘটিত এই সব সম্পর্ক কম উন্নত ভাষাগুলির উন্নতিতে সহায়ক হয়।

উপরে যে গতিপ্রকৃতির কথা বলা হ'ল তা এবং সোভিয়েত ভাষাবিজ্ঞানীর অভিজ্ঞতা আমাদের দেশে ভাষা সমস্যার যথাযথ অনুধাবন এবং সমাধানে এবং জাতীয় সংহতিও গতি সবারে প্রভূতরূপে সহায়ক বলে প্রমাণিত হবে।

পূর্ব ভারতের কথা বিশেষভাবে মনে রেখে আমাদের দেশের ভাষা সমস্যার একটি বিশেষ দিকের পরিপ্রেক্ষিতে উপরোক্ত বক্তব্যের আলোচনা করা যায়। বিষয়টি হল পূর্বে যে সব ভাষা অনুন্নত, পশ্চাদপদ অথবা মুমূর্ষু বলে গণ্য হত তার কতকগুলিতে সম্প্রতি কয়েকটি দশকে যে উন্নতি হয়েছে তার গতিপ্রকৃতির আলোচনা।

ভারতের সংবিধানে বলা হয়েছে যে, "ভারত ভূখণ্ডে অথবা তার কোন অংশে বসবাসকারী জনগণের কোন অংশের স্পষ্ট একটি ভাষা, লিপি বা নিজস্ব সংস্কৃতি থাকলে তা রক্ষা করার অধিকার ঐ অংশের থাকবে।" [শাখা ২৯ (১), মৌলিক অধিকার, তৃতীয় খণ্ড, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত অধিকার]

এই বিধান নিঃসন্দেহে গণতান্ত্রিক এবং স্বাস্থ্যপ্রদ। কিন্তু একটি নির্ভুল ও সামগ্রিক ভাষানীতি গঠনে এ যথেষ্ট নয়। সাম্প্রতিক দশকগুলিতে যে সব পারিবর্তন সংগঠিত হয়েছে তাতে এই অপর্যাপ্ততা স্পষ্টরূপে ধরা পড়েছে। যেমন :

পূর্বাঞ্চলে ইন্দো-আর্য ভাষাগুলির মধ্যে মৈথিলী ও নেপালীতে উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটেছে।

একই মাগধী অপভ্রংশ সঞ্জাত বাংলা, অসমীয়া ও ওড়িয়ার সঙ্গে মৈথিলীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। নিজস্ব বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে বলে একে ভাষাবিজ্ঞানী পণ্ডিতরা স্বীকৃতি দিয়েছেন। এর সাহিত্য চতুর্দশ শতাব্দীতে পাওয়া যায় এবং প্রাথমিক পর্যায়ে এই ভাষা সমপর্যায়ের বাংলা, অসমীয়া ও ওড়িয়া বাক্-গোষ্ঠিগুলির উপরে উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করেছিল। কতিপয় ঐতিহাসিক কারণে এই ভাষা গত তিন প্রজন্মে পশ্চাতে হটে যায়, কিন্তু এর প্রাণ কখনো নিঃশেষিত হয়নি। কিছু কিছু ভাষাবিজ্ঞানী পণ্ডিতের মধ্যে মৈথিলীকে পূর্বীহিন্দীর একটি রূপ বলে গ্রহণ করার প্রবণতা আছে। এ বিষয়ে কোন পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনায় প্রবেশ না করে নিশ্চয়ই বলা যায় যে, একথা এখন যে আর খাটে না কাল নিজেই তা প্রমাণ করেছে। মৈথিলীভাষীগণ এই ভাষায় আধুনিক সাহিত্যের উন্নয়নে প্রচণ্ড প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন এবং তাঁরা যে সাফল্যলাভ করছেন না তাও নয়। কতিপয় পণ্ডিত ও লেখক এই কাজে আত্মোৎসর্গ করেছেন। মৈথিলীভাষীগণের মধ্যে একটি নতুন সামাজিক চেতনাই এর কারণ। তাঁরা তাঁদের নিজ সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন। মৈথিলী

সাহিত্যের একটি ইতিহাস গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। দ্বারভাঙ্গার মিথিলা মণ্ডল এবং কলকাতার মৈথিলী প্রকাশন ইতিমধ্যেই উপন্যাস, ছোটগল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, সমালোচনা, নাটক ও অন্যান্য বিষয়ে একশোটির অধিক বই প্রকাশ করেছেন। বর্তমান প্রবন্ধের লেখকের কলকাতার মৈথিলী ভাষীদের সাহিত্যসভায় দুবার যোগদানের সুযোগ হয়েছিল। তখন তিনি তাঁদের ভাষার জন্য প্রবল ভালবাসা এবং ভাষা উন্নয়নের উৎসাহ লক্ষ্য করেছেন। সাম্প্রতিক দশকগুলিতে, বিশেষ করে ভারতের স্বাধীনতার পরে মৈথিলীভাষী অঞ্চলে যে বাস্তব সামাজিক-আর্থনীতিক তথা রাজনীতিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে, তাঁদের আত্ম অভিব্যক্তির মাধ্যমরূপে মৈথিলীর উন্নয়নে তাদের এই ইচ্ছা হল তারই ফল।

পূর্ববর্তীকালে পর্বতীয়া বা খাসকুরা এবং পরে কোয়রখালি নামে নেপালীভাষা পরিচিত ছিল। সৌরসেনী অপভ্রংশ থেকে এর উৎপত্তি। নেপালে প্রচলিত তিব্বতী-ব্রহ্মের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসার পর এই ভাষা সুস্পষ্ট উন্নয়নের পথে যাত্রা করে। নেপাল উপত্যকায় নেপালী নামে পরে যে ভাষা প্রচলিত হয় তার উপর নেওয়ারী প্রভাব বিস্তার করে এবং তাকে সংশোধন করে। মৈথিলী দ্বারাও নেপালী প্রভাবিত হয়।

ভারতের কাছে নেপালী বিদেশী ভাষা নয়। নেপালীভাষী এমন বেশ কিছু সংখক লোক আছেন যাঁরা স্থায়ীভাবে ভারতের বাসিন্দা ও নাগরিক। ভারতে যে প্রায় ১,০২১,১০২ জন নেপালীভাষী আছেন তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যা অর্থাৎ ৫২৪,৭৯৭ জন বাস করেন পশ্চিমবঙ্গে। এর পরে আসামের স্থান, বসবাসকারীর সংখ্যা ২১৫, ২১৩। পশ্চিমবঙ্গের নেপালীভাষীদের প্রায় ৭০ শতাংশ দার্জিলিং জেলার তিনটি পাহাড়ী মহকুমায় কেন্দ্রীভূত। নেপালী ভাষার সাহিত্যিক কার্যক্রমেরও দার্জিলিং অন্যতম প্রধান কেন্দ্র।

বর্তমান প্রবন্ধের লেখক তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখেছেন বিভিন্ন তিব্বতী-ব্রহ্ম ভাষা গোষ্ঠীকে একত্রিত ও সংহত করে কিরূপে নেপালী

ভাষা একটি নেপালীভাষী সমাজের সৃষ্টি করেছে। বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকের শেষের দিকে এই কর্মপর্যায় সুরু হয়। এর একটি বাস্তব প্রকাশরূপে দেখা দেয় দার্জিলিং এ নেপালী সাহিত্য সম্মেলন। আসল নেপাল থেকে স্পষ্টত পৃথকরূপে দার্জিলিংএ নেপালী ভাষার উন্নয়ন কতকগুলি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। ঐ অঞ্চলের সামাজিক-আর্থনীতিক পটভূমিকায় রেখে বিচার করলে এই সব বৈশিষ্ট্যের প্রকৃত তাৎপর্য যথার্থভাবে বোঝা যাবে। এ ক্ষেত্রেও নেপালীতে একটি আধুনিক সাহিত্য সৃষ্টির জন্য প্রবল প্রচেষ্টা চালান হচ্ছে। এ ভাষার ইতিহাস তথা এর সাহিত্যিক ঐতিহ্য সম্পর্কে অনুসন্ধান চালানো হয়েছে। বিবিধ বিষয়ে কতিপয় পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। সাময়িক পত্রও প্রকাশিত হচ্ছে। ১৯৬১র লোকগণনার রিপোর্টে নেপালীভাষী সমাজের এই নতুন আত্ম উপলব্ধি প্রতিফলিত হয়েছে। ১৯৫১-৬১র দশকে যাঁরা নেপালীকে মাতৃভাষারূপে ঘোষণা করেন তাঁদের সংখ্যা দার্জিলিং পাহাড়ী অঞ্চলে ১৯৫১র ২৬ শতাংশ থেকে দ্রুত বেড়ে ১৯৬১তে ৮৭ শতাংশে উঠে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে আনুপাতিক হারে তিব্বতী-ব্রহ্ম বা তিব্বতী-হিমালয় ভাষাভাষী জনগণের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। নির্ভুলভাবে এই অগ্রগতির মর্ম বুঝতে হলে এবং জাতীয় ঐক্যের প্রশস্ত পটে একে সংহত করতে হলে এই অবস্থার পশ্চাতে সামাজিক-আর্থনীতিক দিকগুলির অনুধাবন করা অত্যাবশ্যক। কেবলমাত্র একটি ভাষা সম্পর্কীয় ঘটনা অর্থাৎ তিব্বতী-ব্রহ্ম-ভাষাকে একটি ইন্দো-আর্য ভাষার দ্বারা অপসারণরূপে সোজাসুজি একে ব্যাখ্যা করাই যথেষ্ট নয়।

এই অঞ্চলে ইন্দো-আর্য ভাষাগোষ্ঠীগুলির বাইরে উপরে আলোচিত অভিমত ব্যাখ্যা করার জন্য মনিপুরী, খাসি এবং সাঁওতালীকে গ্রহণ করা যেতে পারে। বর্তমান প্রবন্ধ লেখকের মনিপুরী বা খাসি ভাষার সঙ্গে সরাসরি পরিচয় নেই। প্রথম বয়সে স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসাবে তিনি বৃটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে মনিপুরী ও খাসি জনগণের বীরত্বপূর্ণ

প্রতিরোধের কাহিনীর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। পরবর্তী জীবনে ভারতে ভাষা সমস্যার বাস্তব সামাজিক দিকের ছাত্র হিসাবে এই সব ভাষার সাম্প্রতিক অগ্রগতির কতকগুলি দিক তিনি অধ্যয়ন করেছিলেন।

ভাষার ক্ষেত্রে তিব্বতী-ব্রহ্ম অনুপরিবারের আসাম-ব্রহ্ম শাখার কুকি-চীন প্রশাখার অন্তর্ভুক্ত হল মনিপুরী বা মেই থেই। প্রাথমিক পর্যায়ের মনিপুরীতে বেশ বিস্তৃত সাহিত্য আছে বলে প্রকাশ। এতে মেই থেই উপকথা, পৌরাণিক কাহিনী এবং পৌরাণিক ইতিহাস এই সাহিত্যের বিষয়বস্তু। সংস্কৃত সাহিত্য ও সংস্কৃতি এবং হিন্দু ধর্ম দ্বারা মনিপুরী বিপুলভাবে প্রভাবিত হয়েছে। কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতিতে মনিপুরীর অবদান সম্পর্কে এখন পর্যন্ত যথাযথ অনুসন্ধান না হলেও তা খুব নগণ্য হবে না। সাম্প্রতিক দশকগুলিতে মনিপুরীতে একটি আধুনিক সাহিত্য সৃষ্টির প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন সাহিত্যের ঐতিহ্যের নিবিড় অধ্যয়ন সুরু হয়েছে। উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, প্রবন্ধ ও দীর্ঘ কবিতা নিয়ে আধুনিক সাহিত্য গড়ে উঠেছে। ইম্ফলে একটি মনিপুরী সাহিত্য পরিষদ আছে। স্নাতক পর্যায় পর্যন্ত কলেজে মনিপুরী পড়ান হয়।

অস্ট্রিক ভাষার মন-খ্মেন শাখার অন্তর্ভুক্ত হল খাসি ভাষা। খ্রীস্টীয় মিশনারীগণ কর্তৃক খাসিতে লিখিত-সাহিত্যের ভিত্তি স্থাপিত হয়। কিন্তু গত শতাব্দীর শেষ কয়েকবছর থেকে খাসি জনগণের শিক্ষিত অংশটি তাঁদের নিজ ভাষায় আধুনিক সাহিত্য সৃষ্টির ও তার উন্নয়নের কাজে যথাযথ অভিনিবেশ সহকারে আত্মনিয়োগ করেছেন। ১৮৯৫-১৯১৫ তে সাংস্কৃতিক জাগরণ সুরু হয়। খাসি জনগণের ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিষয়ে অনুসন্ধান চালান হয়েছে এবং খাসি লেখকদের উপরোক্ত বিষয়গুলিতে লেখা বই প্রকাশিত হয়েছে। এই কাজ শক্তি ও গতিবেগ লাভ করছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ পর্যায় পর্যন্ত খাসি ভাষাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

ভারতের অস্ট্রিক ভাষাগুলির মধ্যে সাঁওতালী একটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভাষা। সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত ভারতে ভাষা বিজ্ঞানের পণ্ডিতগণের মধ্যে চিন্তার প্রবণতা এই ছিল যে এই ভাষা লুপ্ত হয়ে যেতে বাধ্য। কিন্তু সাঁওতালীভাষী জনগণের মধ্যে সাম্প্রতিক কালে নতুন চেতনার উন্মেষের ফলে এই ভাষাকে আর অবহেলা করা বা পশ্চাতে হটিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়।

বহু উপজাতীয় ভাষার ক্ষেত্রে যেমন হয়েছে তেমনি সাঁওতালীতেও লিখিত সাহিত্যের ভিত্তি বিদেশী মিসনারীগণই স্থাপন করেন। কিন্তু সাম্প্রতিক দশকগুলিতে সাঁওতালীভাষীদের শিক্ষিত অংশটি একাজে অকপট উৎসাহ ও আগ্রহের সঙ্গে আত্মনিয়োগ করেছেন। সাঁওতালী-ভাষী জনগণ বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা ও আসাম প্রভৃতি বিভিন্ন রাজ্যে ছড়িয়ে থাকার জন্য এ ভাষার উন্নয়নের কাজ যে জটিল হয়েছে এ কথা সত্য। সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির প্রধান ভাষার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বিভিন্ন রাজ্যের সাঁওতালী ভাষা উন্নয়নের কিছুটা ভিন্ন গতিপথ অবলম্বন করেছে। বিহারে এ ভাষার বই ও সাময়িক পত্র রোমান ও দেবনাগরী এই উভয় লিপিতে প্রকাশিত হচ্ছে, তাতে হিন্দীর প্রভাব স্পষ্ট। পশ্চিমবঙ্গে বাংলা লিপিতে প্রকাশনার কাজ হচ্ছে—বাংলার প্রভাবও তার উপরে রয়েছে। জনৈক সাঁওতালী পণ্ডিত সাঁওতালীর জন্য একটি নতুন লিপি উদ্ভাবনের চেষ্টা করেছেন। এ ভাষা চূড়ান্তরূপে কোন্ লিপি গ্রহণ করবে সে সম্পর্কে এ পর্যন্ত কোনো ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয় নি। এই প্রশ্নে সাঁওতাল জনগণের শিক্ষিত অংশে নিবিড় ও তীব্র মতদ্বৈধ রয়েছে। তাঁদেরই এবিষয়ে একটি ঐক্য-সিদ্ধান্তে আসতে হবে। এই সব বিভেদের জন্য শেষ পর্যন্ত সাঁওতালী কি আকার নেবে এখনই অবশ্য তা বলা কঠিন। কিন্তু ভাষাবিজ্ঞানের কয়েকজন প্রখ্যাত পণ্ডিত এই ভাষাকে ছিন্ন-বিছিন্ন হওয়া ও ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা যাবে না বলে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন কাল নিজেই তাকে ভুল প্রতিপন্ন করেছে।

সাঁওতালী অত্যন্ত সমৃদ্ধ লোককথার ঐতিহ্য নিয়ে গর্ব করতে পারে। সোভিয়েট ভাষাবিজ্ঞানের অভিজ্ঞতার বিচারে সাঁওতালী সাহিত্যের উন্নয়নের জন্য এ অন্যতম পাদপীঠের কাজ করতে পারে।

উপজাতীয় ভাষাগুলির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীর পুনর্বিন্যাসের সময় এসে গেছে। এ ভাষাগুলির কতকগুলি অষ্ট্রিক, কতকগুলি দ্রাবিড় এবং অধিকাংশ চীন-তিব্বত ভাষা পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। এই ভাষাগুলি উন্নয়নের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। ভাষাবিজ্ঞানের পণ্ডিতগণ প্রধানত এইগুলিকে অতীত ভারতের মূল্যবান চিহ্নরূপে এবং ব্রহ্ম, মালয়, ইন্দোনেশিয়া, ইন্দোচীন এবং পলিনেশিয়ার সঙ্গে তার প্রাচীন সম্পর্কের চিহ্নরূপে দেখেন। কিন্তু আজ পুঁথিগত অধ্যয়নে নিযুক্ত পণ্ডিতগণও একথা অস্বীকার করতে পারেন না যে, এই সব ভাষাভাষীরাও তাঁদের আত্ম-অভিব্যক্তি এবং আকাঙ্ক্ষার মাধ্যমরূপে তাঁদের ভাষাগুলির মূল্য সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠছেন। প্রায় সব পণ্ডিতই স্বীকার করেন যে এই সব ভাষার অনেকগুলিতে সঙ্গীত, উপকথা, পৌরাণিক কাহিনী ও পৌরাণিক বীরদের কীর্তিকথা, প্রেমকাহিনী, রূপকথা প্রভৃতি সমৃদ্ধ মৌখিক সাহিত্য আছে। এগুলি সামগ্রিকভাবে তাদের বহু শতাব্দীর পুরাতন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পরিচায়ক। সঙ্গে সঙ্গে ভাষায় প্রতিফলিত নব উন্মেষিত সামাজিক সচেতনতা সামাজিক কর্তব্য প্রসারণে অবহিত হচ্ছে। আধুনিক ভাষা ও সাহিত্যের সৌধ যে ভিত্তির উপর গড়ে উঠছে এই দুটি বিষয়ের দ্বারাই সেই ভিত্তির সৃষ্টি হবে।

সর্বশেষে বলব অতীতে বিভিন্ন ভাষার মধ্যে যে আন্তঃসম্পর্ক ছিল আমাদের অধ্যয়ন তার মধ্যে অনুসন্ধান সীমিত রাখা যথেষ্ট নয়। এই সব ভাষাভাষী নতুন জীবন ও নতুন উপলব্ধি-স্পন্দনের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ভাষার আন্তঃসম্পর্ক স্থাপন করা অত্যাবশ্যক। অনুন্নত ভাষাগুলি সকলে একইরকম উন্নতি করবে কিনা অথবা তাদের মধ্যে কতক ভাষাভাষী লোক জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে স্বেচ্ছায় অন্য কোন

অপেক্ষাকৃত উন্নত ভাষা গ্রহণ করবেন কিনা তা একটি পৃথক প্রশ্ন। কালই তা স্থির করবে। তবে খুব স্পষ্ট করে একথা অবশ্যই বলতে হবে যে প্রকাশ্যে বা গোপনে জোর করে সংহতি সাধনের এবং ইচ্ছাকৃত অবহেলার কোন চেষ্টা হতে পারে না এবং তা করাও উচিত নয়।

সাধারণ নীতিরূপে বলা যায় যে, ঘোষিত উন্নয়নের বিভিন্ন স্তরে অবস্থিত ভাষাগুলির নির্ভুল আন্তঃসম্পর্কের ভিত্তি হওয়া উচিত আভ্যন্তর সম্ভাবনার উন্নয়নে, প্রত্যেক ভাষার পূর্ণ ও বাধাহীন সুযোগে। এক বা কতিপয় ভাষার অন্যান্যদের উপরে প্রাধান্য নয়, সমতা, বন্ধুসুলভ সহযোগিতা এবং পারস্পরিক সমৃদ্ধির সম্পর্কই এর পরিচালক নীতি হওয়া উচিত।

বাংলা, অসমীয়া, ওড়িয়া ও হিন্দীর ন্যায় প্রধান ভাষাগুলির মধ্যেকার সম্পর্ক এই নীতিতেই পরিচালিত হওয়া উচিত।

বঙ্গানুবাদ: সত্য গঙ্গোপাধ্যায়

# পূর্বভারতের বিভিন্নভাষার বিকাশ ও তাদের আন্তঃসম্পর্ক

ডঃ অনিমেষকান্তি পাল

পূর্বভারত একটি ভৌগোলিক অভিধা মাত্র। স্মরণাতীত কাল থেকে এই অঞ্চলে বহু ভাষা-সম্প্রদায়ের বাস। এই ভাষা-সম্প্রদায়গুলিকে মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা যায়—ভারতীয়-আর্য, মুণ্ডিক এবং ভোটবর্মী। এই অঞ্চলের প্রধান ভারতীয়-আর্যভাষাগুলি হ'ল ওড়িয়া. হিন্দী, মৈথিলী, নেপালী, বাংলা এবং অসমীয়া। মুণ্ডিকগোষ্ঠীর প্রধান ভাষাগুলি হ'ল সাঁওতালী, মুণ্ডারী এবং হো। ভোট-বর্মীগোষ্ঠীর প্রধান ভাষাগুলি হ'ল তিব্বতী, চাকমা, গারো, বোড়ো, বিভিন্ন নাগা এবং মিজো উপভাষা এবং মনিপুরী। নব প্রতিষ্ঠিত অরুণাচল প্রদেশে ভোট-বর্মীগোষ্ঠীর বহু অপ্রধান ভাষা প্রচলিত আছে। তার মধ্যে মাত্র একটির নিজস্ব লিপি আছে। এই লিপিটি বর্মী লিপি থেকে উদ্ভূত। মেঘালয়ের একটি প্রধান ভাষা হ'ল খাসিয়া। এ ভাষাটি এর প্রতিবেশী ভাষা থেকে স্বতন্ত্র। এটিকে অস্ট্রিক গোষ্ঠীর ভাষা বলে মনে করা হয়ে থাকে, কাজেই মুণ্ডিক গোষ্ঠীর ভাষাগুলির সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকার কথা।

## ২। মুণ্ডিক্ গোষ্ঠীর ভাষাসমূহে সাহিত্যচর্চা ও গবেষণার বিবরণ

পূর্বভারতের ভারতীয়-আর্যভাষাগুলির বিকাশের ধারাটি এখন সুপরিচিত। এর কারণ হোর্ন্‌লে, ব্লীম্‌স্, গ্রীয়ারসন্, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং সুকুমার সেন মহাশয়গণের গবেষণা। কিন্তু মুণ্ডিকগোষ্ঠীর ভাষাগুলির বিকাশের ধারা নিয়ে বেশী চর্চা

করা হয়নি। স্‌ক্রেফ্‌স্‌রুড্‌ এবং বোডিং সাঁওতালী ব্যাকরণ বেশ কিছুটা চর্চা করেছিলেন। মুণ্ডারীর চর্চা করেছিলেন এস্‌. সি. রায় মহাশয়। মুণ্ডিকগোষ্ঠীর ভাষাগুলি সম্বন্ধে আরো কেউ কেউ প্রবন্ধ লিখেছেন। ইদানীংকালে সুধীভূষণ ভট্টাচার্য এবং রামকুমার মুণ্ডা এই ভাষাগুলি সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু, এই গোষ্ঠীর ভাষাগুলির ব্যাকরণগত কাঠামো বিজ্ঞান সম্মতভাবে এবং সম্পূর্ণভাবে পর্যালোচনা করা হয়নি। খাসিয়া এবং মুণ্ডিকগোষ্ঠীর ভাষাগুলির মধ্যেকার সম্পর্কটি ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখা দরকার। খাসিয়া ভাষার ব্যাকরণ এবং তার লৌকিক সাহিত্য নিয়ে কিছু লেখা প্রকাশিত হয়েছে। মুণ্ডিকগোষ্ঠীর ভাষাগুলির মধ্যে সাঁওতালী ভাষায় ইতিমধ্যেই একটি লিখিত সাহিত্য গড়ে উঠেছে। আমাদের দেশের সাহিত্যিক মহলে প্রায় অজ্ঞাত হলেও সাঁওতালী ভাষার আধুনিক লেখকেরা স্বীকৃতি পাওয়ার যোগ্য। খাসিয়া ভাষারও আধুনিক লিখিত সাহিত্যের বাহন হয়ে ওঠার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

### ৩। ভোট-বর্মী গোষ্ঠীর ভাষাসমূহে সাহিত্যচর্চা

ভোট-বর্মী গোষ্ঠীর সর্বাপেক্ষা অধিক বিকশিত ভাষা হ'ল তিব্বতী এবং মনিপুরী। তিব্বতীভাষার লিখিত সাহিত্য খুবই প্রাচীন। কিন্তু, ভাষাটির এই বিকাশ ঘটেছে খাস তিব্বতে, ভারতে নয়। আমাদের দেশের উত্তর সীমান্তে তিব্বতীভাষীদের বসতি অনেকদিন ধরেই রয়েছে। ১৯৬২ সালের পর ভারতে তিব্বতীভাষী লোকের সংখ্যা বেশ বেড়েছে এবং নানা জায়গা থেকে এখন নিয়মিত তিব্বতীভাষার পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। এইসব প্রকাশনার বেশীরভাগ সাংবাদিকতাধর্মী। তিব্বতীভাষায় আধুনিক কবিতা, উপন্যাস, মননশীল প্রবন্ধ এইগুলির বিকাশ ঘটেছে কি না এবং ভারতে তিব্বতীভাষার ঐ জাতীয় চর্চা হচ্ছে কি না তা আমাদের সঠিক জানা নেই। কিন্তু,

তিব্বতীভাষার, একটি সমৃদ্ধ আধুনিক ভাষা হয়ে ওঠার সব গুণই আছে। অনেকেই জানেন যে একটি আধুনিক সাহিত্যের ভাষা হিসেবে মনিপুরী বেশ ভালোভাবেই বিকাশ লাভ করছে। এই ভাষাটি লিখিত হয় বঙ্গলিপিতে। মনিপুরী ভাষায় নিয়মিত পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হয় তবে প্রকাশিত বই-এর সংখ্যা খুব বেশী নয়। মনিপুরী হ'ল ভোট-বর্মী গোষ্ঠী একমাত্র ভাষা যা ভারতেই পূর্ণ বিকশিত হয়েছে। এই ভাষাটিকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব উপযুক্ত স্বীকৃতি দেওয়া উচিত।

৪। **নবপ্রতিষ্ঠিত অঙ্গরাজ্যগুলির সরকারী ভাষা**

ভোট-বর্মী গোষ্ঠীর গারো, নাগা এবং মিজো প্রভৃতি ভাষাগুলি নিয়ে প্রধানত ইংরেজ রাজকর্মচারী এবং মিশনারীরা কিছু কাজ করেছিলেন। নাগাল্যাণ্ড্ সরকারের সরকারী কাজকর্ম ইংরেজী ভাষাতেই চালানো হয়ে থাকে। নাগা উপভাষাগুলির কোনটিকেই এখনও এই কাজের উপযুক্ত মনে করা হয় না। নাগাল্যাণ্ডের বাইরের লোকেরা জানেন না, নাগাল্যাণ্ড সরকার নাগাজনগণের মুখের ভাষার উন্নতির জন্য কি ব্যবস্থা করেছেন। মেঘালয় ও মিজোরামে সরকারী কাজকর্ম কি ভাষায় পরিচালিত হয় তাও বাইরের লোকেরা বড় একটা জানেন না। অরুণাচল, মিজোরাম, নাগাল্যাণ্ড ও মেঘালয় ভারতের এই চারটি প্রত্যন্ত অঞ্চলের অনগ্রসর অঙ্গরাজ্যে ইংরেজীকে ধরে রাখতেই হবে বলে মনে হয়। এইদিকে উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম হ'ল মনিপুর ও ত্রিপুরা সরকার। এঁরা ইংরেজীর বদলে মনিপুরী ও বাংলা ভাষায় সরকারী কাজকর্ম চালানোর চেষ্টা করছেন।

৫। **ত্রিপুরার ভাষাগত পরিস্থিতি**

ত্রিপুরার পরিস্থিতি, যে রকম মনে হয়, ঠিক ততটা, সরল নয়। ওখানে অনেকগুলি ভাষাগত-সংখ্যালঘু-সম্প্রদায় বাস করেন। এঁরা তফশীলভুক্ত উপজাতির লোক, অত্যন্ত দরিদ্র এবং অনগ্রসর। এদের

ভাষাগুলি দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডঃ সুহাস চট্টোপাধ্যায় এঁদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষার পর্যালোচনা করেছেন। ভাষাটি হ'ল—কগবরক। ডঃ চট্টোপাধ্যায় কগবরক-এর জন্য একটি লিপি উদ্ভাবন করেছেন। এ কাজটির উল্লেখ করা প্রয়োজন এইজন্যে যে ভারতে এখনও কয়েকশত ভাষার নিজস্ব কোন লিপি নেই। এদের জন্য লিপি উদ্ভাবন করতে হবে। এটা যত তাড়াতাড়ি হয় ততই ভাল। ত্রিপুরার সরকারী কাজকর্মে ত্রিপুরার এই সংখ্যালঘুদের কি স্থান হবে তা স্থির করবেন অবশ্যই ত্রিপুরা সরকার। কিন্তু, সংখ্যালঘুদের ভাষাগুলিকে আর অবহেলা করা ঠিক হবে না।

৬। **পুর্বভারতের বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠী সম্বন্ধে গবেষণার অপুর্ণতা**

ভোট-বর্মী গোষ্ঠীর ভাষাগুলি আমাদের ভাষাবিজ্ঞানীদের দ্বারা খুব কমই আলোচিত হয়েছে। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম হ'ল শরৎচন্দ্র দাস মহাশয়ের তিব্বতী ভাষার অভিধানটি ও তিব্বতী ব্যাকরণ গ্রন্থটি। মুণ্ডিকগোষ্ঠীর ভাষাগুলি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের পরিমাণ সামান্য একটু বেশী। এটা স্বীকার করা ভাল যে ভারতীয় ভাষা বিজ্ঞানীরা এখনও ভোট-বর্মী এবং মুণ্ডিকগোষ্ঠীর ভাষাগুলির ক্রমবিকাশের ধারা সম্বন্ধে প্রামাণিকভাবে খুব বেশী কিছু বলতে পারেন না। কিন্তু, ভারতীয় আর্যগোষ্ঠীর ভাষাগুলির বিকাশের ধারা সম্বন্ধে প্রচুর লেখা হয়েছে। কিন্তু, ঊনবিংশ শতাব্দীতে জন্ বীম্স্ এবং ইদানীংকালে ডঃ দেবীপ্রসন্ন পট্টনায়েক ছাড়া পূর্বভারতের ভারতীয়-আর্যগোষ্ঠী ভাষাগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে আর কেউ বেশী কিছু লেখেন নি। পূর্বভারতের ভারতীয় আর্যগোষ্ঠীর সবচেয়ে কম আলোচিত ভাষা হ'ল মৈথিলী এবং নেপালী। প্রায় সহস্রাব্দ প্রাচীন সাহিত্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও মৈথিলীভাষা এখন এত অবহেলিত

যে এর অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা দেখা যাচ্ছে। একমাত্র মৈথিল-ভাষীদের ওপরেই নির্ভর করছে তাদের মাতৃভাষাটি অন্য কোন ভাষার কাছে আত্মসমর্পণ করে অবলুপ্ত হয়ে যাবে কি না।

**৭। নেপালীভাষা সম্বন্ধে গবেষণা**

ভারতে নেপালীভাষী লোকের সংখ্যা কয়েক নিযুত। পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং নেপালীভাষীগণের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। একটি আধুনিক সাহিত্যসহ আধুনিকভাষা হিসেবে নেপালীর খুব দ্রুত বিকাশ ঘটছে। এখন সাহিত্যচর্চার কেন্দ্র হিসেবে দার্জিলিং কাঠমাণ্ডুর প্রায় সমকক্ষ হয়ে উঠেছে। কিন্তু, নেপালী শিক্ষিত সম্প্রদায় নিজেদের অবহেলিত মনে করেন কারণ তাঁদের ধারণা, তাঁদের সাহিত্যকে যথাযোগ্য স্থান দেওয়া হয় নি। ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ দয়ানন্দ শ্রীবাস্তব নেপালীভাষা পর্যালোচনা করে এর একটি ঐতিহাসিক ব্যাকরণ রচনা করেছেন। বর্ষীয়ান নেপালী বিদ্বান শ্রীপারশমণি প্রধান অসুস্থতা সত্ত্বেও কালিম্‌পং-এ এখনও নেপালী ভাষার চর্চায় রত রয়েছেন। প্রধান মহাশয়ের নেপালীভাষার ব্যাকরণ এবং নেপালী অভিধান নেপালী চর্চার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান। নেপাল সরকার প্রধান মহাশয়কে সম্মানিত ও পুরস্কৃত করেছেন কিন্তু অন্যান্য ভাষার পণ্ডিতদের কাছে তিনি এখনও ভালভাবে পরিচিত নন।

**৮। আপাত বিরোধ, যোগাযোগের অভাব এবং বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর পারস্পরিক নৈকট্য**

পূর্বভারতের বিভিন্নগোষ্ঠীর ভাষাসমূহের আন্তঃসম্পর্কটি কি ভাবে পর্যালোচনা করা সম্ভব? এখনও পর্যন্ত আলাদা আলাদাভাবে বহু-ভাষার কোন প্রাথমিক পর্যালোচনাই শুরু করা হয় নি। এখনও পর্যন্ত এই অঞ্চলের রাজ্যসরকারগুলি ভাষার প্রশ্নটি নিয়ে উপযুক্ত মনোযোগ দিতে পারেন নি। এঁরা তখনি শুধু সজাগ হন যখন ভাষা নিয়ে আইন শৃঙ্খলার সমস্যা দেখা দেয়। পূর্বভারতের বিভিন্ন

রাজ্যে ভাষাগত সংখ্যালঘুরা বৃহত্তর ভাষা-সম্প্রদায়ের সামনে নিজেদের বারবার অসহায় এবং উৎপীড়িত বোধ করেছেন। এটা ভারতবর্ষের প্রায় প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কি করে ভাষার প্রশ্নটি কৌশলী ও স্বার্থান্ধ রাজনৈতিক নেতাদের কলকাঠি হয়ে ওঠে তা অবশ্য আজকের আলোচনার বিষয় নয়। কিন্তু, এটা মনে রাখলে আমরা উপকৃত হব যে ওড়িয়া, হিন্দী, বাংলা, নেপালী এবং অসমীয়া ভাষা সমূহের যে শুদ্ধ সাহিত্যিক রূপটি এই ভাষাগুলির আধুনিক সাহিত্যে দেখা যায় তা পরস্পরের কাছে খুবই সহজে বোধগম্য। এটাও মনে রাখা ভাল যে মুণ্ডিক ও ভোট-বর্মী গোষ্ঠীর ভাষাগুলি পূর্বভারতের আধুনিক-ভারতীয়-আর্যগোষ্ঠীর ভাষা-গুলির বিকাশকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে। সেই সঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে যে মুণ্ডিকগোষ্ঠীর ভাষাগুলিও তাদের নিজেদের এলাকার ভারতীয় আর্যভাষার দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবান্বিত হয়েছে। ভোট-বর্মী গোষ্ঠীর ভাষাগুলির সঙ্গে মুণ্ডিকগোষ্ঠীর ভাষার সম্পর্কটি কি তা এখনও পর্যন্ত ভালভাবে জানা যায় নি। খাসিয়া ভাষার ভালভাবে পর্যালোচনা হ'লে এই সম্বন্ধে হয়ত আরো কিছু জানা যেতে পারে।

## ৯। পূর্বভারতে ভারতীয়-আর্যভাষার বিকাশের ইতিহাস

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় পূর্বভারতের ভাষাসমূহের পারস্পরিক সম্পর্কের সূত্রগুলিকে একটি ছকের মধ্যে এনে দেখানোর চেষ্টা করা যেতে পারে মাত্র। আর্যভাষা খ্রীস্টজন্মের আনুমানিক সহস্র বৎসর আগে মগধ এবং মিথিলায় এসে পৌঁছে ছিল। তারপর খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ-তৃতীয় শতাব্দে তা বরেন্দ্রভূমিতে নীত হয়েছিল। তারপর ক্রমশ আর্যভাষা বরেন্দ্র বা পুণ্ড্র থেকে কামরূপে ছড়িয়ে পড়ল। ওদিকে আর্যভাষা বরেন্দ্র থেকে রাঢ় ও সুহ্ম হয়ে ওড্র ও কলিঙ্গ দেশে পৌঁছুলো। এই ব্যাপারটা ঘটেছিল অনেক পরে। পূর্বভারতে

আগন্তুক আর্যভাষার ছড়িয়ে পড়ার এই ছকটি বর্ণনা করেছিলেন অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। এই সম্বন্ধে পরবর্তীকালে প্রাপ্ত তথ্য অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের অনুমানকেই সমর্থন করেছে মাত্র। কিন্তু, পূর্বভারতের বিভিন্ন ভারতীয়-আর্যভাষাগুলি লোকমুখে কি ভাবে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে মিশে গেছে সেটা ঔপভাষিক পর্যায়ে ভালো-ভাবে পর্যালোচনা করে দেখা এখনও বাকী আছে। নেপালী হ'ল ভারতীয় আর্যভাষার উত্তরা বা পর্বতীয়া শাখার অন্তর্গত। আর্যভাষা নেপালে নীত হয়েছিল প্রধানত গাঙ্গেয় উত্তর প্রদেশ থেকে; পরে উত্তর বিহারের আর্যভাষা একে প্রভাবান্বিত করেছিল। এইজন্যেই নেপালীর সঙ্গে কিছুটা মিল দেখা যায় কয়েকটি হিন্দী উপভাষার এবং মৈথিলীর। বাংলার সঙ্গেও নেপালীর কিছু চমকপ্রদ মিল আছে।

### ১০। ভারতীয়-আর্যগোষ্ঠীর এক একটি ভাষা-সম্প্রদায়কে ঘিরে অনার্য-গোষ্ঠীর ভাষা সম্প্রদায়গুলির অবস্থিতি

বাংলাভাষা সম্প্রদায়কে ঘিরে যদি আমরা দুইটি অর্ধবৃত্তাকার রেখা টানি ম্যাপের ওপরে তাহলে আমরা দেখতে পাব নিকটস্থ অর্ধবৃত্তটি পশ্চিমদিকে মুণ্ডিকগোষ্ঠীর ভাষাসম্প্রদায়গুলিকে ছুঁয়ে যাবে এবং উত্তর ও পূর্বদিকে ভোট-বর্মী গোষ্ঠীর ভাষা সম্প্রদায়গুলিকে ছুঁয়ে যাবে। দূরের অর্ধবৃত্তটি পশ্চিমদিকে ওড়িয়া, হিন্দী ও মৈথিলী ভাষা সম্প্রদায়কে, উত্তরদিকে নেপালী ও পূর্বদিকে অসমীয়া ভাষা সম্প্রদায়কে স্পর্শ করে যাবে। পূর্বভারতের প্রতিটি ভারতীয়-আর্যভাষা সম্প্রদায়ই কতকগুলি করে অনার্য ভাষার দ্বারা পরিবেষ্টিত। পূর্বভারতের বিভিন্ন ভারতীয়-আর্যভাষাগুলির আলাদা আলাদা বিকাশের মূলে এই ব্যাপারটির বিশেষ গুরুত্ব থাকা সম্ভব।

### ১১। ক্ষুদ্র ভাষা-সম্প্রদায়গুলির অবলুপ্তির বিপদ

অনেকেই জানেন বহু অনার্য ভাষা সম্প্রদায় বাংলা, নেপালী, হিন্দীর মত ভাষা-সম্প্রদায়ের ভেতরে ক্রমেই অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছেন।

চট্টগ্রামের চাক্‌মা-রা, মৈমনসিংহের হাজংরা, মেদিনীপুরের লোধারা তাদের আদিভাষা ত্যাগ করে এখন বাংলাভাষা ব্যবহার করেন। পার্বত্য অঞ্চলের রাই, লিম্বু, গুরুং প্রভৃতি ক্ষুদ্রভাষা সম্প্রদায়গুলি নেপালীভাষা সম্প্রদায়ের মধ্যে অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এই প্রবণতা ক্ষুদ্রভাষা সম্প্রদায়গুলির অস্তিত্ব বজায় রাখার পক্ষে বিপজ্জনক। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যেকার সম্পর্কের এই ধরনটিকে আমাদের মত গণতান্ত্রিক দেশে মেনে নেওয়া উচিত নয় বলেই মনে হয়। এখানে মাত্র কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হ'ল কিন্তু ব্যাপারটা পূর্বভারতের নানা জায়গায় ব্যাপকভাবে প্রতিনিয়তই ঘটে চলেছে।

## ১২। পূর্বভারতে দ্রাবিড়গোষ্ঠীর ভাষার অবলুপ্তি

এই প্রসঙ্গে ওঁরাও এবং মাল্‌তোদের ভাষার কথা উল্লেখ করতে হবে। এই দুটি ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের ভাষা দ্রাবিড় গোষ্ঠীর অন্তর্গত বলে মনে করা হ'ত। দুঃখের বিষয় পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী ওঁরাও-রা কোন দ্রাবিড় ভাষাই বলেন না। এখন বাড়ীতেও এঁদের অনেকে বাংলা বলেন। মালদা জেলার গেজেটিয়ার লেখার সময় মাল্‌তো বলে কোন দ্রাবিড় ভাষাভাষী সম্প্রদায়কে অনুসন্ধানকারীরা খুঁজে পান নি। তাঁরা খুঁজে পেয়েছিলেন ভারতীয়-আর্যগোষ্ঠীর উপভাষা ব্যবহারকারী মালপাহাড়ীয়াদের।

## ১৩। দুটি গুরুত্বপুর্ণ অপভাষার উদ্ভব

বিভিন্ন অনার্যভাষা সম্প্রদায়গুলি পরস্পরের সঙ্গে কোন ভাষায় ভাব বিনিময় করে? আসামে বিভিন্ন নাগাগোষ্ঠী পরস্পরের সঙ্গে এবং অ-নাগাদের সঙ্গে ভাব বিনিময় করার সময় কোন কোন ক্ষেত্রে একটি মিশ্রিত অপভাষা ব্যবহার করেন। এর মধ্যে আছে অসমীয়া, হিন্দী এবং নাগা প্রভৃতি উপভাষার উপাদান। ঠাট্টা করে এই খিচুড়িভাষাটিকে বলা হয় 'নাগামীজ'। এই রকম আরেকটি মিশ্রিত অপভাষার জন্ম হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত অঞ্চল ও ছোটনাগপুরে।

একে বলা হয় 'সাদানী'। সাদানী হচ্ছে হিন্দী, বাংলা এবং সাঁওতালী প্রভৃতি ভাষার ঔপভাষিক উপাদানের খিচুড়ি। এই প্রকার অপভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে বুদ্ধিজীবীগণের ভাব বিনিময়ের পক্ষে সহায়ক হতে পারে না। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে পূর্বভারতে বিভিন্ন ভাষা সম্প্রদায়ের বুদ্ধিজীবীগণের পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের জন্য ইংরেজীকেই এখন বহাল রাখতে হবে। নাগাল্যাণ্ড, মিজোরাম, মেঘালয় এবং অরুণাচলের মত বহুভাষী অঞ্চলগুলিতে ইংরেজীর এখনও যথেষ্ট গুরুত্ব রয়ে গেছে। কারণ, এইসব অঞ্চলে এক একটি স্থানীয় ভাষাকে ভাব বিনিময়ের প্রধান বাহন করে তুলতে এখনও অনেক সময় লাগবে।

## ১৪। ভাষাগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির অধিকার সুরক্ষিত করার প্রয়োজনীয়তা

ইতিমধ্যে ভাষাগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির অধিকার সর্বত্র সুরক্ষিত করতে হবে। যদি কারো সঙ্গে তার মাতৃভাষার জন্য বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয় তবে তা শুধু পারস্পরিক বিদ্বেষেরই জন্ম দেবে এবং সমগ্রদেশের সংহতিকে বিপন্ন করবে। পূর্বভারতে আমরা বিভিন্ন ভাষা সম্প্রদায়ের লোকেরা বহু শতাব্দী ধরে সুপ্রতিবেশী হিসেবে বসবাস করে এসেছি। এখন স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক ভারতে আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যত জীবন অন্যরকম হয়ে যাওয়ার কোন কারণ নেই। আমাদের ভাষাগুলির বিকাশের সম্বন্ধে আমরা যে তথ্য পাই এবং আমাদের ভাষাগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে আমরা যা জানতে পারি তাতে বৃহৎ ভাষা সম্প্রদায়গুলির স্বার্থরক্ষার থেকেও ক্ষুদ্রতর ভাষা সম্প্রদায়গুলির স্বার্থরক্ষা অনেকবেশী গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হওয়া উচিত।

# পূর্বভারতীয় ভাষার প্রেক্ষাপট

অধ্যাপক প্রণবেশ সিংহ রায়

আমাদের ভারতবর্ষের প্রকট মহাভারতীয়রূপের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রথিত ও বিন্যস্ত পূর্বাঞ্চলীয় ভাষামগুলীর যে আলেখ্যটি উদ্ভাসিত তাহার বিচিত্র বর্ণসুষমা আজও বহুলাংশে আত্মগোপন করিয়া আছে। বহুক্ষেত্রে অনেকগুলি ভাষার ক্ষেত্রে ভাষ্য হয় নাই, সাহিত্যক্ষেত্রে আদর ও আঙ্গিকের অভাব আছে তথাপি পূর্বদিগন্তের পারিপার্শ্বিক পরিবেষ্টনীর প্রভাবে একটা সৃজ্যমান পারস্পরিক সম্বন্ধে সম্বন্ধিত আত্মীয়তা গড়িয়া উঠিবে আশা করিতে পারি। এই সম্মেলন বোধ করি সেদিক দিয়া একটি পথিকৃৎ ও প্রশংসনীয় পদক্ষেপ হইবে। এ বিষয়ে একটি কোন স্থায়ী সংস্থার দিকে উদ্যোক্তাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতে পারে। তাঁহারা সেখানে মূলাধার ব্যঞ্জনা 'প্রাণময়ী' ভাষাগুলির পটভূমি তাত্ত্বিকরূপে (academic) নহে জনমানসের অধিগম্যরূপে বিরচন করিবেন। অতঃপর তথ্যমূলক যৎকিঞ্চিৎ বিবৃত করিতেছি।

পূর্বভারতের ভাষা পরিস্থিতির প্রায় সামগ্রিক পর্যালোচনায় ভারতের সামুহিক ভাষা চালচিত্রেরই যেন এক ক্ষুদ্র সংস্করণের আভাস মিলে। ১৯৬১ সালের আদমসুমারী অনুসারে পূর্বভারতের প্রদেশ-গুলিতে এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলসমূহে ( আসাম, বিহার, ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, মনিপুর নাগাভূমি ও অরুণাচল-মেঘালয় ও মিজোরাম তখনও নামধেয় ছিল না ) সর্বমোট ৪৯৫টি ভাষা-উপভাষার লীলাস্থলী বলিয়া বর্ণিত। তন্মধ্যে ৩৭২টি শ্রেণীভুক্ত (classified) ৮০টি অশ্রেণীভুক্ত (unclassified) এবং ৪৩টি বহিরাগত বিদেশী বা বহির্ভারতীয় (foreign extra-Indian)[১]। বিভাজিত বা শ্রেণীভুক্ত ভাষা-উপভাষাগুলির মধ্যে ২২৯টির ক্ষেত্রে গ্রীয়ার্সনকৃত শ্রেণীকরণই

(classification) গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু ১২৭টির ক্ষেত্রে গ্রীয়ার্সন প্রদর্শিত শ্রেণীকরণ বিতর্কের সৃষ্টি করিয়াছে এবং নবচিন্তন অনুসারী নূতন দিগ্দর্শনের অবকাশ দিয়াছে। এই হিসাবে একটি পরীক্ষামূলক পুনশ্রেণীকরণ (tentative reclassification) এবং ১৬টি উপভাষার ক্ষেত্রে (গ্রীয়ার্সন কর্তৃক অশ্রেণী বিভাজিত) পরীক্ষা-মূলক নূতন শ্রেণীকরণ (tentative classification) করা হইয়াছে। শ্রেণীভুক্ত ভাষা-উপভাষাগুলিকে চারটি প্রধান ভাষাবর্গ বা গোষ্ঠীর মধ্যে নিম্নে প্রদত্ত হিসাব মত বিন্যস্ত করিতে পারা যায়, যথা—(১) তিব্বত-চীনীয়—১৯৫ ; (২) দ্রাবিড়ীয়—২২ ; (৩) অস্ট্রীয় (অস্ট্রিক)—৪৪ এবং (৪) ভারোপীয় (ইন্দো-ইউরোপীয়)—১১১।

পূর্বভারতের তাবৎ অঞ্চলে ব্যাপৃত হইয়া এই সকল আঞ্চলিকভাষা-উপভাষার মেলা নিম্নলিখিত তথ্য তালিকাক্রমে মোটামুটিরূপে বিবৃত :

| | আসাম | বিহার | ওড়িশা | পঃবঙ্গ | মনিপুর | ত্রিপুরা | নাগাভূমি | অরুণাচল |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| মোট ভাষা-উপভাষা | ১৯২ | ১৫৩ | ৫৮ | ২৭৩ | ৮৭ | ১১২ | ৯৫ | ১৬৮ |
| শ্রেণীভুক্ত | ১৫৭ | ১০৮ | ৫০ | ১৫৯ | ৬৮ | ৮৬ | ৮৮ | ১২৯ |
| (ক) গ্রীয়ার্সনসহ ঐক্যমত্যে | ১৩১ | ৮৫ | ৪০ | ১৩০ | ৪৬ | ৬৪ | ৬৬ | ৯১ |
| (খ) গ্রীয়ার্সনসহ মতানৈক্যে (পরীক্ষামূলক পুনশ্রেণীকরণ) | ১৫ | ১৬ | ৫ | ২৩ | ২২ | ১৯ | ২১ | ৩৭ |
| (গ) নূতন শ্রেণীকরণ (পরীক্ষামূলক শ্রেণীকরণ) | ১১ | ৭ | ৫ | ৬ | × | ৩ | ১ | ১ |
| অশ্রেণীভুক্ত | ৫ | ১৩ | × | ৭৭ | ১৪ | ২০ | ১ | ৩৩ |
| বিদেশী (বহির্ভারতীয়) | ৩০ | ৩২ | ৮ | ৩৭ | ৫ | ৬ | ৬ | ৬ |

পূর্বভারতের উপর্যুক্ত বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্ষিপ্ত উপভাষাগুলি নিম্নে প্রদত্ত প্রধান প্রধান ভাষাগুলির সহিত সম্পৃক্ত বলিয়া মোটামুটিভাবে ধরা হইয়াছে। এখানে অবশ্য যে সকল অপ্রধান ভাষা-উপভাষা কোন প্রধান ভাষার নামধারীরূপে আসন লইয়াছে সেগুলি অনুল্লিখিত রাখা হইয়াছে :

১) অসমীয়া ভাষার সহিত সম্পৃক্ত উপভাষা—কুল্লী।

(২) বাঙ্গালা ভাষার সহিত সংযুক্ত উপভাষা সমূহ—বাহে, বারিক, ভাটিয়ারী, চাকমা, দেহারী, হাইজং / হাজং, কাছারী-বাংলা, কিষাণ-গঞ্জিয়া, লোহারী, মাল পাহাড়িয়া, মুরারী, রাজবংশী, সামারিয়া ও তাকাম।

(৩) গুজরাতীর সহিত সংস্পৃক্ত উপভাষাগুলি—জেনী ও পারশী।

(৪) হিন্দীর সহিত সম্পর্কযুক্ত উপভাষাসমূহ—অওধী, বঙ্গারু, বিলাসপুরী,ব্রজ ভাষা/ব্রজভাথা, বুন্দেলখণ্ডী,ছত্রিশপঢ়ী, দেশোয়ালী/দেশ-বালী, হরিয়ানী, দেবনাগরী, গৌরিয়া, জাতি, কাহারী, কনৌজী, খরিবোলী, কোয়রী, লারিয়া, মরারী, মির্জাপুরী, নাগরী-হিন্দী, নাগপুরী, পূর্বী, রোহতকী, সুরগুজিয়া, থারু-অওধী।

(৫) মারাঠীর অন্তর্গত উপভাষাগুলি—ভাণ্ডারী, ঘাটি, গোভারী, হলবী, কামারী, মহারী, নাগপুরী-মারাঠী।

(৬) ওড়িয়ার অন্তর্ভুক্ত উপভাষাগুলি—ভাৎরী, ভুঁইয়া/ভুয়ান-ওড়িয়া, ভূমিজালী, ঢেলুকী-ওড়িয়া, ঝরিয়া, কালাহাণ্ডী, মাতিয়া, সম্বলপুরী, শৌন্তী, উৎকলী।

(৭) পাঞ্জাবীর সহিত সংশিষ্ট উপভাষাচয়—ডোগরী, গুরুমুখী, কাংড়ি, শিথী।

(৭) বিহারী পাঙক্তেয় উপভাষানিচয়—অঙ্গ, বনারসী, ভাগলপুরী, ভোজপুরী, বিহারী, ছোরা, চিকা-চিক্কী, ধরমপুরিয়া, ডোমডী, গবরী, গোরখপুরী, খোরথা/খোট্টা, কুর্মালী-থার, মধেসী, মগহী/মগধী, মৈথেলী,

মোঙ্গেরিয়া, মুশাহার, মুজঃফরপুরিয়া, নাগপুরী-পূর্বমগহী, পাঁচপরগনীয়া, পূর্বী-মৈথিলী, সদন/সদরী, সহর্ষবাদী, সুরজপুরী, তামারিয়া, তিরহুতিয়া।

(৯) রাজস্থানী ছত্রছায়ার উপভাষাবলী—ভোপালী বিকানেরী, হরৌতী, মাড়বারী, মেবারী, নাগৌরী, নাইকীবঞ্জারী, রাজপুতানী এবং রাজবারী।

(১০) উর্দুর অন্তর্গত পাকিস্তানী উপভাষা।

(১১) ভিলীর অন্তর্ভূক্ত বাওরী ও ভীমচৌরা উপভাষাদ্বয়।

(১২) সিন্ধীর সহিত সম্বন্ধিত কচ্ছী উপভাষা।

(১৩) কোঙ্কনীর অন্তর্গত গোয়ানীজ উপভাষা।

(১৪) কুমায়ুনীর অন্তর্গত আলমোরী উপভাষা।

(১৫) নেপালীর অন্তর্গত গোর্খালী উপভাষা।

(১৬) হিন্দুস্তানীর অন্তর্গত ক্ষত্রী ও পশ্চিমা উপভাষা।

(১৭) কন্নদ অন্তর্ভুক্ত কর্ণাটক উপভাষা।

(১৮) মলয়ালম ভাষার অন্তর্গত উপভাষা—মালাবরি।

(১৯) তেলুগুর অন্তর্ভূক্ত উপভাষা—অন্ধ্র।

(২০) গোণ্ডীর অন্তর্ভুক্ত উপভাষা—মারিয়া।

(২১) কুই সম্পৃক্ত উপভাষা—পেঙ্গু।

(২২) পারজী " "—কোরাপুটী।

(২৩) মালটো " "—সৌরিয়।

(২৪) কুরুখ/ওরাঁও " উপভাষাকুল—আদিভাষা-কুরুখ/ওরাঁও, অঙ্গিভাষা-নাগেশিয়া, ধাঙ্গরী, কিষাণ-কুরুখ / ওরাঁও, লোহারী-কুরুখ ওরাঁও, নাগেশিয়া।

(২৫) সাঁওতালীর অন্তর্গত উপভাষাসমূহ—গয়ারী, কার্মালী, কামরি-সাঁওতালী, কিসান-সাঁওতালী, লোহারী-সাঁওতালী, মাহিলী, মান্‌ঝি ( মাঁঝী ) এবং পাহাড়িয়া।

(২৬) হোর অন্তর্গত উপভাষা—লোহারা।

(২৭) মুণ্ডারীর অন্তর্গত উপভাষা—মুরা।

(২৮) খাসির অন্তর্গত উপভাষাগুলি—ডোন্দ-খাসি, জৈন্তিয়া, নোংটুং, প্নার/সিনতেং এবং ওয়ার।

(২৯) খরিয়ার অন্তর্গত উপভাষাগুলি—বাইতি, লোধা, মির্ধা-খরিয়া।

(৩০) ভূমিজের অন্তর্গত উপভাষাগুচ্ছ—ভুইয়া / ভুয়ানং, কিসান-ভূমিজ, কুর্মী, লার্কা, পার্শী ভূমিজ ও রাহিয়া।

(৩১) কোডা/কোরার অন্তর্গত উপভাষাগুচ্ছ—খৈরা, মির্ধা-কোতা/কোরা এবং উদং মুদরিয়া।

(৩২) বিরজিয়া/ব্রিজিয়া/বিঞ্চিয়রি অন্তর্গত উপভাষা-পাহাড়ী-বিরজিয়া/ব্রিজিয়া/ বিনঝিয়া।

(৩৩) মুণ্ডার অন্তর্গত উপভাষাগুলি—অঙ্গিভাষা-মুণ্ডা, কোল, লোহারী-মুণ্ডা, পারেং, পরহাইয়া এবং থার।

(৩৪) মনিপুরী/মেইথেই এর অন্তর্ভুক্ত উপভাষাদ্বয়—মোয়োল এবং বিষ্ণুপুরিয়া।

(৩৫) বোডো/বোরোর অন্তর্গত উপভাষাদ্বয়—কছারী ও মেচ।

(৩৬) গারোর অন্তর্গত উপভাষা দুটি—আছিক এবং ডালু।

(৩৭) ত্রিপুরী/টিপ্রার উপভাষাগুলি—জামাতিয়া, মুরাসিং, কোক-বারাক ( কগবরগ ), নোয়াসিয়া ও রেয়াং।

(৩৮) লুসাই/ মিজোর অন্তর্গত উপভাষা—পাং।

(৩৯) মিকিরের " " —আরলেং।

(৪০) মিরির " " —মিসিং।

(৪১) আওভাষার " উপভাষাদ্বয়—মোনসাং/মোংসেন ও নোকপু।

(৪২) রাভার অন্তর্গত " উপভাষা রংদানিয়া।

(৪৩) অঙ্গামীর " " ছক্রু /

(৪৪) তিব্বতীর " উপভাষাগুলি—গাজাই, গিরহু, খামা, খাম্বা, কোংবো, লামা, মোনপা, তাংবো এবং ইয়োরা।

(৪৫) দিমাসার অন্তর্গত উপভাষাটি—হৈরম্বা।

(৪৬) থাডোর অন্তর্গত উপভাষাসমূহ বাইতে, ছাংসেন, ছোঙ্গ-লোই, হান্‌গুই, ইনদোই, খোংজাই, কিনগেন, লুসহাও, মাতে এবং তেজাং।

(৪৭) কাবুই অন্তর্গত উপভাষা—রোংমেই।

(৪৮) মাও ,, ,, পাওমাতা।

(৪৯) পছুরী ,, ,, ফেলুনগ্রে ও সাংতাম।

(৫০) হলম ,, ,, বানশী, বোংছের, ছায়িছোং, খেলমা, মুরস্থম, শেকাসিপ।

(৫১) আরাকানীর ,, ,, কামান, মোখ।

(৫২) কাছা-নাগার ,, ,, লেমেইং লিয়াংমেই।

(৫৪) সিমতের ,, ,, তিদিম, জৌউ।

(৫৪) কোচের ,, ,, বোনাই।

(৫৫) আবোর/আদির ,, আশিং, বোকার।

(৫৬) ডাফ্‌লার ,, ,, আপাতানী, বাঙ্গনী।

(৫৭) ভুটানীর ,, ,, ডুক্‌পা।

(৫৮) মিসমীর ,, ,, ছুলিকাটা/ইহু, দিগারু, মিজু।

(৫৯) জৈমিনাগার ,, ,, উপাসা-নাগা, উরিমা-নাগা।

(৬০) তাংসার ,, ,, তিখাক।

অধুনা সারা ভারতের ভাষা গবেষণার কাজে সরকারী ও বেসরকারী বহু প্রতিষ্ঠান ব্যাপৃত আছেন। যতদূর আমার জানা, ভারতের রেজিস্ট্রার জেনারেলের অধীনস্থ ভাষা-বিভাগের মাধ্যমে স্বল্প প্রমাণ স্বরূপ তিনটি অভিলেখ প্রকাশিত হয়েছে—লিম্বু, রাভা এবং লেপচা ভাষার উপরে। ঐগুলিতে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন পার্বত্যভূখণ্ডে পর্বত পাদদেশীয় অংশে উল্লিখিত তিনটি ভাষাভাষীদের ভাষাগুলির বর্তমান অবস্থা ভাষা বৈজ্ঞানিক সত্যদিদৃক্ষার প্রতিফলিত। দার্জিলিংয়ের সব নামাপন্ন (pronominalised) মৃতপ্রায় লিম্বুভাষা ক্রমশঃ

নেপালীকে স্থান করিয়া দিতেছে। উত্তরবঙ্গে রাভাভাষী অধ্যুষিত এলাকার ঐ ভাষাটি লিম্বুর ন্যায় অদ্যাপি সংস্কৃতিগত আগ্রাসন ( acculturation ) পর্যায়ে আসে নাই। বর্তমানে রাভাকে গারো উপগুচ্ছের ( Garo subgroup ) অঙ্গীভূত করা হইয়াছে। কালিম্পং মহকুমায় অধিকতর সংখ্যায় উপনিবিষ্ট লেপচাভাষীগণ মাতৃভাষা পুরামাত্রায় আত্মস্থ করিয়া চলিতেছেন। অবশ্য দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে এতদঞ্চলে প্রথমটি নেপালী। এতদ্ব্যতীত আমাদের তরুণ ছাত্রছাত্রী ও অপরাপর গবেষকগণের সহিত আলাপ আলোচনায় যতদূর জানিয়াছি তাহাতে মনে হইয়াছে যে উত্তরবঙ্গের চা বাগিচা শ্রমিককুলের ভাষাটি মোটামুটিভাবে বিহারী-ঘেঁষা, বিহার হইতে আনীত ও তাহার ঐতিহাসিক কারণও প্রতীয়মান। তথাকার লোহারী, নাগেশিয়া ( গ্রীয়ার্সন-মতানুসারে দ্রাবিড় গোষ্ঠী অন্তর্ভুক্ত) ও গৌড় মূলতঃ বিহারের নাগপুরিয়ার অন্তর্গত। জলপাইগুড়ির শৈব্যা উপভাষাটি নাকি মেচ্ তথা বোডো/বোরো ভাষা বৈশিষ্ট্যবাহী। এদিকে আসানসোলের কয়লাখনি এলাকার গৌরিয়া এবং বিলাসপুরী ভাষাদ্বয় ছত্তিশগঢ়ীর পক্ষপুট অবলম্বিত। আসামের বিষ্ণুপুরিয়া বিষয়ে দ্বিমত পোষিত কিন্তু ত্রিপুরার বিষ্ণুপুরিয়া স্থূলতঃ বাংলাভাষা অনুসারী যদিও তাহাতে যে অসমীয়ার কিঞ্চিৎ প্রভাব বিদ্যমান তাহাও গবেষকগণ অস্বীকার করেন না। ত্রিপুরার চাকমা যে শিলেটী বাংলার ঘনিষ্ঠতর ইহাও গোচরে আসিয়াছে। অপর পক্ষে আমাদের পূর্বভারতের তথাকথিত 'বিহারী' ভাষা লইয়া বিতর্কের আজও সুরাহা হয় নাই। গ্রীয়ার্সনপ্রদত্ত এই বিহারী অভিধা কতদূর বিজ্ঞানসম্মত সে বিষয়ে ভাষা বিদ্বৎসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। পূর্বভারতের ভাষা-ধ্যয়নের ও চর্চ্চার জন্য ভাষা পরিবেশ ও পরিস্থিতি একটি সামগ্রিক প্রকল্পের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। তিব্বত-চীনীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত ব্যাপ্তিহিসাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাষা-উপভাষা সমূহের ব্যাপক অনুসন্ধানের সময় এসেছে এবং অস্ত্রীয় ( অস্ট্রিক ) ভাষাগোষ্ঠী সম্বন্ধেও সেকথা একই

ভাবে প্রযোজ্য। এই দুই গোষ্ঠীর ভাষা, জীবন ও সমাজ-চিত্রের উপর যুগপৎ অভিনিবেশ ও অধ্যয়ন গবেষণাদি আমাদের পূর্বভারতীয় জনজীবন ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের বলিষ্ঠ সহায়ক হইবে।

সম্প্রতি নাগাল্যাণ্ড ভাষা পরিষদের কার্যকলাপ ও প্রকাশন দেখিবার সৌভাগ্য হইয়াছে। পরিষদের প্রশংসনীয় প্রচেষ্টার পরিপ্রেক্ষিতে আমার এই কথা বার বার মনে হইয়াছে যে আমাদের দেশে ভাষাচর্চ্চা সাহিত্য-বাহন ক্ষেত্রে যে দুইটি ধারা চলিতেছে সে দুইটি কিছু সমন্বয় বিশেষ প্রয়োজন। একদিকে অতিরিক্ত ভাষাতাত্ত্বিক জালে কণ্টকিত লেখমালা অপরদিকে অবৈজ্ঞানিক ভাবে তৌলিত মামুলী ব্যাকরণ ও স্বয়ং শিক্ষক পর্যায়ের পুস্তক পুস্তিকা নিবন্ধাদির কোনটিই শিক্ষার্থী জনসমাজের যথার্থ সেবা করিতে পারে না। বৈজ্ঞানিক সত্যদিদৃক্ষার প্রয়োজন জীবনের সকল ক্ষেত্রেই কিন্তু ব্যবহারিক জীবনের ভিন্নরূপ একটি তাগিদ আছে তাহাও পূরণ করা প্রয়োজন। সমাজের সকলেই কিছু আর ভাষাশাস্ত্র পণ্ডিত হইবে না, সেজন্য আপামর জনসাধারণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ভাষাপীঠিকায় পদক্ষেপে সুযোগ করিয়া দেওয়ার প্রয়োজন। অতএব আসুন আমরা ঐ দুই ধারার মধ্যবর্তী একটি পন্থা অবলম্বনে আমাদের নানা ভাষা-উপভাষার চর্চ্চার পথ সুলভ সুগম করি।

ভাষা জীবনের বিশিষ্ট অঙ্গ, কিন্তু জীবন বৃহত্তর সেই জীবনের পথে আমাদের ঐক্যবদ্ধ ভারতের পূর্ব-সীমার আমরা "বিবিধের মাঝে মিলন" ঘটাইব ও মহা-ভারতের সংস্কৃতি সমন্বয়ের অগ্রদূত হইব। জয়হিন্দ

Ref. 1. Mitra, A : Census of India 1961 Vol. I Pt. II (c) (ii)

2. Chaudhury K Mrs. : A note on Limba D.C.H. Darjeeling Census of India 1961

3. Datta, S. D. Rabha Speech—a Preliminary Study D. C. H. Jalpaiguri Census of India 1961

4. Neethivanan, J : A note on Lepcha : D.C.H. Darjeeling : Census of India 1961

5. Nagaland Bhasha Parishad : Souvenir & Publications

6. Grierson, G. S. I.

7. R. K. Roy Burman Ed : Bibligraphy of publications in tribal languages. Census of India, 1961

8. Language & Society in India (Transactions of Indian Institute of Advanced Study Vol. 8) Simla 1969

# ত্রিপুরায় স্বাধীনতার উত্তরপর্বে কবিতার গতিপ্রকৃতি

**অপরাজিতা রায়**

সাহিত্যকে ভূগোল দিয়ে ততটুকুই চিহ্নিত করা যায়, যতটুকু তার তাৎক্ষণিক প্রকাশ, যতটুকু তার বিনশ্বর অংশ। নিখিল মানবমন যেহেতু তার বিচিত্র ভাবনা অনুভব নিয়েও একই প্রকৃতির ফসল, তারই সাযুজ্যের ভিত্তিতে সৃষ্ট সাহিত্য তাই বিচিত্র হলেও বিচ্ছিন্ন হয়ে কখনো দীর্ঘায়ু হতে পারে না। গল্প-উপন্যাস-নাটক ঘটনার পটভূমিতে উপধৃত বলে অক্ষাংশের চিহ্নে লক্ষিত হয়ত হতেও পারে, কিন্তু সাহিত্যের পেলব অংশ কবিতার বাস উপলব্ধির রাজ্য। কবিতা তাই বাঁচতে চাইলে নদী-পাহাড়-উপত্যকার বেড়া ডিঙ্গিয়ে বৈশ্বিক মানবতার বুকে আসন বিছোবেই। কবি অনায়াসেই অচেনা মানুষের কাছে চলে যেতে পারেন তাঁর কবিতার মাধ্যমে। বিদেশীকে না জেনেও কবি তার মনের অনুভবটিকে বলে দিতে পারেন, তার চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন, জলবায়ুর বাধা কেমন অবলীলায় অপ্রয়াসে ডিঙ্গিয়ে যেতে পারেন। কবিতার চিরন্তন মূল্যটুকু তাই কিছুতেই আঞ্চলিক হতে পারেনা। এছাড়াও অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সমাজভূমি সারা বিশ্বেই আজ প্রায় সমান আকার ধারণ করেছে। অপ্রভাবিত স্বতন্ত্র মানসিকতার কোন সাহিত্য-অঞ্চল কোথাওই টিঁকে থাকতে পারে না। মাইকেল ও মিল্টনকে, রবীন্দ্রনাথ ও শেলীকে, বিষ্ণুদে ও এলিয়টকে আজ আমরা আত্মীয় বলে সহজেই ভাবতে পারি। ত্রিপুরার তরুণ কবিরা অডেনের পরিবারভুক্ত হয়ে যান। বোদলেয়ারের উত্তরাধিকার ছড়িয়ে পড়ে ফ্রান্সের সীমান্ত ছাড়িয়ে, পাবলো নেরুদাকে হারিয়ে ভারতের পূর্বপ্রান্তে চোখের জলে আগুন জ্বলে। সাহিত্যকে কবিতাকে চিহ্নিত করা যায় সময় দিয়ে, অন্ততঃ আজ আর ভূগোল দিয়ে নয়।

স্বাধীনতা লাভ ভারতের রাজনীতিতে এক বিরাট ঘটনা হলেও জীবন-মানসে তা কোনও হঠাৎ বিপ্লব এনে দেয়নি। ভারতের কোন খণ্ডাংশেই নয়। না হতাশা, না আশার কোনও তরঙ্গ-সংক্ষোভই স্বাধীনতার এপার ওপারকে গভীর রেখায় বিচ্ছিন্ন করে দেয়নি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ইয়োরোপকে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যেমন ভারতকে প্রবল ঝাঁকানি দিয়ে মনের স্থিতিশীল বৃত্তিগুলোকে ওলোট পালট করে একেবারে অচেনার্থে প্রায় নতুন করে তুলতে পেরেছিল, স্বাধীনতা তা পারেনি। তার ওপিঠেও যেমন এপিঠেও তেমনি নিরুদ্যম উত্তাপ-হীনতা সাহিত্যের বড় অংশটাতে জাঁকিয়ে বসেছিল। ত্রিপুরার মানসিকতায় সামন্ততন্ত্রও খুব একটা গভীরে শিকড় গাড়তে পারেনি, যার উৎপাটন দিয়েও স্বাধীনতাকে একটা দিকচিহ্ন বলে আখ্যা দেওয়া যায়। স্বাধীনতা একটা ঘটনামাত্র, একটা সময়রেখামাত্র, যেখান থেকে আমরা কবিতার আপাত অধ্যায় উন্মোচন করতে চলেছি।

ভাষাসূত্রে ত্রিপুরা পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে গ্রথিত বলেই সেখানকার সাহিত্যই ত্রিপুরার সাহিত্যের পশ্চাৎপট রচনা করেছে। ত্রিপুরার আদিবাসীদের স্বয়ং-সম্পূর্ণ কোন ভাষা আজও নেই! হরফহীন এই ভাষার সাহিত্যের মাধ্যম হওয়ার যোগ্যতা ছিল না। ত্রিপুরী ভাষায় কিছু লোকগীতি পাওয়া যায়। তাদের জীবনের বিভিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে এগুলো রচিত। জুমচাষ ফসলতোলা যুদ্ধযাত্রা—এসব বিষয়ে আনন্দ উৎসাহ সৃষ্টি করাই এই লোকগীতির প্রধান উদ্দেশ্য। ত্রিপুরী ভাষায় পরবর্তী যুগে খুব সামান্য কবিতাই লেখা হয়েছে। চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ দশকের মধ্যে শ্রীরামচন্দ্র দেববর্মা ত্রিপুরী ভাষায় কিছু প্রেমভক্তিমূলক আবেগধর্মী কবিতা লিখেছেন। শ্রীমহেন্দ্র দেববর্মা রাজনৈতিক সমাজ-সচেতন কিছু কবিতা ত্রিপুরী ভাষায় লিখেছেন এককালে। এখনও মাঝে মাঝে রাজনীতির প্রয়োজনে লিখে থাকেন। এছাড়া ত্রিপুরা ভাষায় লেখা কবিতা আর তেমন

পাওয়া যায় না। ত্রিপুরায় রাজন্যবর্গ বাংলা ভাষাকেই সাদরে গ্রহণ করেছেন। সাগ্রহে আমন্ত্রণ করে এনেছেন, সমর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন বাংলাভাষা ও সাহিত্যকে। মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য তরুণ কবি রবীন্দ্রনাথকে কবি-সম্মান দান করেন। মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্য রবীন্দ্রনাথকে 'ভারত-ভাস্কর' উপাধিতে ভূষিত করেন তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করারও আগে। ত্রিপুরায় রাজভাষা রূপে ব্যবহৃত হয়েছে বাংলাভাষাই। ত্রিপুরার রাজান্তঃপুরে বাংলা সাহিত্যের চর্চা চলেছে। মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য নিজে কবিতা লিখতেন। তার প্রথমা কন্যা অনঙ্গমোহিনী দেবীর তিনটি কাব্যগ্রন্থ মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়। বীরচন্দ্রের অন্য দুই কন্যা কুমুদিনী দেবী ও মৃণালিনী দেবীও কবিতা লিখতেন।

কিন্তু বাংলা সাহিত্যে ১৯৩০ সালে যে একটা বড় রকমের জোয়ার এসেছিল—এসেছিল এক পরিপ্লবের প্রবল স্পন্দন, তার রেণু ত্রিপুরার মাণিক্যখচিত বাংলা সাহিত্যের গায়ে এসে লাগেনি। ত্রিপুরার সেসব কবিতায় তখনও ষোড়শ শতাব্দীর সৌরভ। বৈষ্ণব ভাবরস, আত্মনিবেদিত প্রেমভক্তির অনুলেপ। পশ্চিমবঙ্গে তখন কল্লোলের ঢেউ আছড়ে পড়ছে। রবীন্দ্র পরবর্তী যুগ সুরু হয়ে গেছে রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতিতেই। রবীন্দ্রনাথের স্থৈর্য, দুর্নীরিক্ষ্য সুদূরের উপাসনা, দেহহীন সৌন্দর্যের লাবণ্যবিলাসকে সবলে সদম্ভে অস্বীকৃতি জানিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, জীবনানন্দ। প্রথমা, বন্দীর বন্দনা, ধূসর পাণ্ডুলিপি, উর্বশী ও আর্টেমিস কবিতার যে নতুন দিগন্তের যবনিকা তুলে ধরেছিল, তা এত ব্যাপক, এত জীবনস্পর্শী ছিল যে, কবিতা পথিকেরা আজও তা পার হয়ে যেতে পারেন নি, সেই দিগন্তের ক্যানভাসেই নতুন রং বোলাচ্ছেন মাত্র। প্রেমেন্দ্র মিত্রের মানবতাবাদ, বুদ্ধদেবের বস্তুতীক্ষ্ণতা, জীবনানন্দের মাটির গন্ধ, বিষ্ণু দের বৈজ্ঞানিকম্মন্য ঝোঁক তখন বাংলা কবিতাকে একেবারে নেড়ে চেড়ে ঢেলে সাজিয়ে দিচ্ছে। বুদ্ধি প্রোজ্জ্বলভাব,

তির্যক অবয়ব, প্রতীকী ভাষার অলঙ্করণ বাংলা কবিতার পায়ে জোর কদমে এগিয়ে যাওয়ার শক্তি যোগাচ্ছে। ত্রিপুরার অর্গল-বদ্ধ বাংলা-সাহিত্যে এর প্রভাব তখন পড়েনি। নিস্তরঙ্গ মন্থরতা নিয়েই এখানে তখন বাংলা সাহিত্যের দিন যাপনের হিসেবী ছক আঁকা চলেছে।

স্বাধীনতার অঙ্গাঙ্গী ফসল হয়ে বাস্তুহারা বাঙ্গালীর প্রবেশ ঘটলো ত্রিপুরায়। তারা সঙ্গে করে আনলো তাদের শিকড়-ছেঁড়া জীবনের রক্তঝরা যন্ত্রণা, আপৈত্রিক বিশ্বাসের অপমৃত্যুজনিত সক্ষোভ চীৎকার, আর তারই প্রকাশের হাতিয়ার হিসেবে আনলো বাংলা সাহিত্য, বাংলা কবিতার উপজীবন। ধীরে ধীরে ত্রিপুরার পাণ্ডুর সাহিত্য শরীরে রক্ত সঞ্চার ঘটতে লাগলো। স্বাধীনতালাভের সোজাসুজি কোনও প্রভাব ত্রিপুরার সাহিত্য বা কবিতায় এসে লাগেনি। লেগেছে দেশবিভাগের আঘাত। দেশবিভাগের শরীকী দায়িত্ব যদি প্রত্যক্ষভাবে তখনই ত্রিপুরাকে না নিতে হোতো, তাহলে হয়তো তার সাহিত্যের দেহে স্পন্দন আসতে আরো দেরী হয়ে যেতো। এ সময় অবশ্য নতুন সাহিত্যসৃষ্টি ত্রিপুরার উল্লেখ্যভাবে দেখা যায়নি। তখন স্থানীয় যাঁরা ত্রিপুরায় কবিতা লিখতেন, তাঁদের মধ্যে বিধুভূষণ ভট্টাচার্য, আবদুল মতিন, সমাচার চক্রবর্তী প্রমুখের নাম করা যেতে পারে। এঁদের কোনও কবিতাগ্রন্থ তখনও প্রকাশিত হয়নি। স্থানীয় পত্রিকায় এঁরা লিখতেন পুরোনো ধারায় রবীন্দ্র-প্রভাবের আওতায় থেকে। এঁদের মধ্যে বিধুভূষণ ভট্টাচার্যের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। রবীন্দ্র অনুসারী ছায়ার নীচে থেকেও আধুনিক কবিতার আভাস তাঁর কবিতায় এসেছে। তাঁর 'অর্কিড' কবিতার অংশ : 'এখানেতে এককোণে একটি মাটির / মেদরস, সুষমার কতটুকু আর / যোগাবে বাহার'—আরেকটি কবিতায় : 'আমাদের আছে সাধ, নেইকো সাহস / প্রাণ নেই প্রতিমায়, খড়ের খোলস / অথবা সে তুলতুল / রেশমী রুমালে মোড়া তুলোর পুতুল / অথবা সে ছিপি খোলা সোডা

ওয়াটার।' এসব কবিতায় বাস্তব জীবনের তিক্ত রিক্ত বিরক্ত জিজ্ঞাসা প্রকাশ পেয়েছে যা আধুনিক কবিতা-মানসের পূর্বসূরী।

১৯৫০ সালে ঘটনা বিপর্যয়ে উদ্বাস্তু-স্রোত আগের চেয়ে অনেক অনেক বেড়ে গেলো। উদ্বাস্তু বাঙ্গালীর সংখ্যা ত্রিপুরার মূল অধিবাসীর সংখ্যার প্রায় দ্বিগুণ হয়ে দাঁড়ালো। ত্রিপুরার শিক্ষা প্রসারের কার্যক্রম রূপায়নের মধ্যদিয়ে বাইরে থেকে বুদ্ধিজীবী শিক্ষাবিদ্‌দের প্রবেশ ঘটলো ত্রিপুরায়। কবি রণেন্দ্রনাথ দেব ত্রিপুরায় এলেন মহারাজা বীরবিক্রম কলেজের বাংলা ভাষার অধ্যাপক হয়ে। পঞ্চাশ থেকে ষাট দশকের মধ্যে ত্রিপুরায় কবিতা লেখার এক বিশেষ উদ্যম দেখা গেল। আগরতলায় 'সাহিত্য-বাসর' নামে এক সাহিত্য সংস্থা গড়ে উঠলো। সেখানে স্থানীয় কবি সাহিত্যিকরা এসে-নিজেদের পাণ্ডুলিপি পড়ে শোনাতেন, তার ওপর আলোচনা হতো। বিধুভূষণ ভট্টাচার্য, আবতুল মতিন, সলিল কৃষ্ণ দেববর্মন, অপরাজিতা রায়, চিদানন্দ গোস্বামী, শক্তি হালদার, অশ্বিনী আঢ্য, অনিলচন্দ্র ভট্টাচার্য, খগেশ দেববর্মণ এই সাহিত্যবাসরের সাপ্তাহিক আলোচনা-চক্রের নিয়মিত অংশ নিতেন। সাহিত্যের কবিতার বিভিন্নধারা, বিশেষ প্রবণতা নিয়ে আলোচনা-বিতর্ক হতো। পশ্চিমবঙ্গের বাংলা কবিতার হাওয়া বইতে শুরু করলো ত্রিপুরার আকাশে। এছাড়া অসিতকৃষ্ণ দেববর্মণ কিছু বিদ্রূপাত্মক ও রাজনৈতিক কবিতা লিখলেন।

ষাট দশকের শুরু থেকে ত্রিপুরায় সংহত কাব্য-প্রচেষ্টা দেখা গেল। ১৯৬১তে সলিলকৃষ্ণ দেববর্মণ ও খগেশ দেববর্মণের সম্পাদনায় স্থানীয় কবিদের কবিতার এক সংকলন প্রকাশিত হোলো 'প্রান্তিক' নামে। রণেন্দ্রনাথ দেব, বিজন চৌধুরী, অপরাজিতা রায়, সলিলকৃষ্ণ দেববর্মণ, করবী দেববর্মণ, প্রবীর দাশ, অশোককান্তি দাশগুপ্ত, সত্যব্রত চক্রবর্তী, কিরণশঙ্কর রায়, খগেশ দেববর্মণ, প্রদীপ চৌধুরী—এই এগারো-জনের কবিতা এতে স্থান পেয়েছে। এর কিছুদিন পর প্রকাশিত হলো, রণেন দেবের কবিতাগ্রন্থ 'প্রথম বৃষ্টির জল'। অনন্য কবি প্রতিভার

স্বাক্ষর থাকা সত্ত্বেও 'প্রথম বৃষ্টির জল' কেন যে পাঠক সমাজের বিস্তৃত আঙ্গিনায় স্থায়ী আসন লাভ করলো না, সেটাই আশ্চর্য। হয়তো এর জন্য বইটির প্রচারের উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাবই দায়ী। উত্তর তিরিশ বাংলা কবিতার জীবনধর্মী প্রকাশ তার কবিতায়। চিত্রকল্প অপরূপ। 'পুরানো উদ্যান প্রান্তে নির্জন নিমের ছায়া ধরে / শিশির বিন্দুর মতো সূর্যালোক যেই নামে ঘাসে / দিনের আহার্য নিতে ক্ষুধাতুর গিনিপিগ আসে / শব্দহীন পদক্ষেপে, সতর্ক দু' কাণ খাড়া করে।

( গিনিপিগ : প্রথম বৃষ্টির জল )

ছোট এক শাদা বাড়ি, কেউ নেই, উন্মুক্ত কপাট, / টগরের ডালভাঙা, চিনি বটে হাওয়ার স্বনন, / বিকেলের দৃষ্টিহীন সূর্য তার মাথার ওপরে / স্থিরমূর্তি, মৃত্যুভারী বোবা এক ছোট শাদা বাড়ি, / খোলা জানালার পাশে বাঁদিকের পরিচিত ঘরে / লুপ্ত হয়ে গেছে কবে ফেনার মতন শাদা শাড়ি ॥ / ( শাদাবাড়ি : প্রথম বৃষ্টির জল )

এসব কবিতা আলতো হাতে ছবি এঁকে দিয়ে যায়। ছবির আড়ালে এক দূর অর্থবহ ইঙ্গিৎ তাঁর 'জন্মদিন' কবিতায়—'সোনালী চায়ের কাপে, বিদগ্ধ আলাপে আর মুহুর্ মুহুর্ গানে / আসর জমাট, উগ্র পুষ্পসার সঙ্গে কিছু কবিতা ব্যাখ্যানে / সুসম্পন্ন জন্মদিন, সাক্ষ্য তার টেবিল বোঝাই করা দানে / তারপর শ্রান্তি নামে, কালপুরুষের মূর্তি আসে জানালাতে / বাসিগন্ধে অন্ধকারে হাইচেপে শয্যাপাতে মরুতুল্য রাতে / তন্বীনয়, লোলচর্ম বৃদ্ধা কোনও শিরা আঁকা ঠাণ্ডা শাদা হাতে /

এরপর লেখা তাঁর কবিতা আরো রস-ঋদ্ধ, 'কখনো কী যেন রহস্য ঘটে / দৈনিক গ্লানি সহসা মিলোয় / তিনটি ধ্বনির সামান্য পটে / মহাকাল জোড়া ছবি ফুটে ওঠে / ধ্রুবতারকার অসীম সময়ে / চন্দ্রোত্তর সৌর নিলয় / ( আকাশ—এক আকাশ তারা )

প্রান্তিক কবিতা সংকলনে যাঁরা লিখেছেন, তাঁদের লেখায় ষাট দশকের আমাদের সমাজ মানস প্রকাশ পেয়েছে। বিক্ষোভ, হতাশা, বিরক্তি, আশ্বাস খোঁজার চেষ্টা দেখা গেছে তাঁদের লেখায়। কবি বিজন

চৌধুরীর কবিতা, 'দু হাতেই অবধারিতকে রুখে চলি / পায়ে পায়ে বাধে রক্ত মর্ম ক্লেদ গ্লানি / ধুলো ওড়ে, ধাঁধায় অন্ধগলি / আকাশে তাকাই / মেঘ / ( উপবনের হাওয়া, প্রান্তিক )

খগেশ দেববর্মণের কবিতা,'নরকে আকণ্ঠ ডুবে আছি। তীর্থের তিমিরে / স্নেহ ক্ষমা, সহিষ্ণুতা আর সব মানবিকবোধ / আংশিক মৃত / অনীহার ফুল দিয়ে যে মালা / গেঁথেছি তাও। / ( স্বর্গের দিকে হাত : প্রান্তিক )

এসব কবিতা লিরিকধর্মী রোমান্টিক কবিতা হলেও এদের মধ্যে সাম্প্রতিক কালচেতনা পরিলক্ষিত। সে চেতনা মানুষের অতৃপ্তি, পরিবেশের সঙ্গে সংঘর্ষ, দ্বান্দ্বিক জীবনানুভূতিতে স্বকীয় ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠার জন্য প্রবল উচ্চারণ ধ্বনিত। সেদিক দিয়ে এ কবিতাগুলি ত্রিপুরার আধুনিক কবিতার এক সুনির্দ্দিষ্ট সোপান। এর বছর দুই পরে ১৯৬৫তে আরেকটি কবিতা-সংকলন ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত হলো প্রবীর দাশ ও শ্রীবাস ভট্টচার্যের সম্পাদনায় 'এক আকাশ তারা' নাম নিয়ে। শ্রীবাস ভট্টাচার্য, মৃণাল পাল, প্রবীর দাশ, ধীরেন বসাক, সলিলকৃষ্ণ দেববর্মণ, আশিস সিংহ, অপরাজিতা রায়, বিজন চৌধুরী, রণেন্দ্রনাথ দেব—এই ন'জন কবির কবিতা এতে সংকলিত হলো। এখানে কবি বিজন চৌধুরী এক নতুন আঙ্গিকের প্রয়োগে লিরিকের ওপর উঠতে চাইলেন ; তাঁর, 'দুপুরে একটি লোক' ও 'যে নদীর পারে' কবিতা দুটিতে। গদ্য ধরনের প্যারাগ্রাফে লেখা এ কবিতার ভাবানুষঙ্গ রোমান্টিক হলেও বস্তুনিষ্ঠা অনেক বেশী প্রকট। 'কাল দুপুরে একটি লোক এসেছিল। দুপুরের মত বয়স্ক / জীবনের ভারে, দুপুরের মতো রুক্ষ হাসি নিয়ে, এক মাথা ভর্তি / চুলেতে শ্মশ্রুতে দুপুরের আরণ্যক স্তব্ধতা নিয়ে, উদাস দুই চোখে / দুপুরের এক বিষন্নতা নিয়ে। আমরা কেউ বসে মাসিকে/সাপ্তাহিকে, চোখের আলোক প্রান্ত, কেউ মধ্যদিনের নিদ্রায় ফোলা/ মুখে তৃপ্ত সেলাইটা নিয়ে যেন প্রস্তুত হয়ে বসেছিলাম লোকটা/আসবে, দুপুরের মতো হ্রস্ব পা ফেলে ফেলে, ভিক্ষে নেবে, তারপর/তাকিয়ে তাকিয়ে বাড়িট

উপর দৃষ্টির রহস্যতা বুলিয়ে, ম্লান হাসি/দিয়ে আমাদের দেখে চলে যাবে। ( দুপুরে একটি লোক, এক আকাশ তারা )

কীন ব্রীজ থেকে তোমায় দেখা এ জীবনে আর শেষ হবে না। / শৈশবে মায়ের মুখ কৈশোরে আরেকের যেমনটি ঘুরে ঘুরে ফিরে ফিরে জ্বলে, অন্ধকারে শেজের আলোয় বিসর্জনী প্রতিমার/সারি। সকালের পূব আকাশ কতবার রঙ বদলালো তোমার/দেহের দর্পণে, শ্রাবনে আশ্বিনে। ( যে নদীর পারে—এক আকাশ তারা )

কবিতা দু'টির চিত্রকল্প আধুনিক, ব্যঞ্জনা বস্তুনিষ্ঠ। এঁদের ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি ছিল। বিজনবাবু কোনও কবিতার বই প্রকাশ না করলেও, ত্রিপুরার বিভিন্ন সাহিত্যপত্রে নিয়মিত যে সব কবিতা লিখছেন, তাতে চমক লাগানো অতি সাম্প্রতিকতার আবহ না থাকলেও, বর্তমান কাব্যযুগের সঙ্গে সঙ্গে তিনি চলেছেন, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

শ্রীমতী করবী দেববর্মণ রোমান্টিক গীতি-কবিতা ভাল লিখেছেন এককালে। প্রান্তিকে লেখা তাঁর 'জীবনায়ন' কবিতার লাইন: 'এ এক আশ্চর্য নীল অতলান্ত সমুদ্রের/গোপন কাহিনী। প্রাণের প্রাচুর্য নিয়ে/ফেনায় ফেনায় ছিনিমিনি এ নীল দেখেছি আমি নবজাতকের/ দু চোখের তারায় / প্রথম প্রাণের সেই পবিত্র অগ্নিস্নানে'দৃপ্ত সূর্যে আলো ঠিকরায়/'—এ কবিতা গীতরস ও কাব্য-মাধুর্যে পূর্ণ। বর্তমানে কবিতা কম লিখছেন তিনি, যা লিখছেন, তাও এক বিশেষ বক্তব্য ঘেঁষা হয়ে যাওয়ায় সম্ভাবনাময় কবিতার ভাবীকাল তাঁর উপস্থিতিতেই বিরল হয়ে যাওয়ার আশঙ্কাবাহী।

সলিল কৃষ্ণ দেববর্মণ ত্রিপুরার কবিতা ধারায় আরেক উল্লেখযোগ্য নাম। তাঁর কবিতার বই 'জলের ভেতর বুকের ভেতর' প্রকাশিত হয়েছে মাত্র ১৯৭৩ এর প্রথম দিকে, কিন্তু সেই পঞ্চাশ দশক থেকে এ পর্যন্ত ত্রিপুরার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় কবিতা লিখে তিনি নিজের এক নির্দিষ্ট ধারাকে প্রবাহিত করে চলেছেন শান্ত ধীর

স্রোত পথে। ত্রিপুরা পশ্চিম বাংলার যুগাঞ্চল দ্বারা প্রভাবিত, আবার পশ্চিম বাংলাও কোন বিশ্বছাড়া সৃষ্টির মনোভূমি নয়। ইয়োরোপের সাহিত্য বিভিন্ন মাধ্যমে একটু সময় নিয়ে পৌঁছোয় পশ্চিম বাংলায়। সেখান থেকে আরো কিছুপরে আসে ত্রিপুরায়। এখানকার সাময়িক সমস্যা, পরিবেশ, সমাজমূল্য পশ্চিমবাংলা থেকে অভিন্ন। কোনও একটি বিশেষ পৃথক ধ্বনি কবিতার ক্ষেত্রে শোনা যাচ্ছে না আজকের শব্দময় বহু বাচনিক ব্যক্তিত্ব প্রকাশের সুযোগ সদ্ব্যবহারের জন্য। লেখকের সঙ্গে পাঠকেরা চিন্তা করছে, সমালোচকরা নীরব নয়। মানুষের যুক্তি, বোধ, প্রকাশ ক্ষমতা, অনেক বেড়ে গেছে বলেই স্বাতন্ত্র্য এত বেশী প্রকট। এত বেশী ভিন্নাত্মক ব্যক্তি সত্তার ভীড়ে তাই কোনও একটি বিশেষত্ব আলাদা হয়ে মাথা তুলতে পারছেনা। হয়তো তার তেমন প্রয়োজনও নেই। তবু প্রত্যেকের থেকে প্রত্যেকে স্বতন্ত্র। সূক্ষ্ম সেই স্বাতন্ত্র্যের আবিষ্কার ও মর্যাদাই আজকের সার্থক যুগধর্ম। অর্কেষ্ট্রা সুরলোকের অনেক পরের সৃষ্টি। অর্কেষ্ট্রার মধ্যে যেমন প্রত্যেকটি ধ্বনি তরঙ্গের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে. অথচ সমন্বয়ের ঐকতানই সেখানে প্রধান, আজকের সমাজে মানস বোধ হয় তাই। একক প্রাধান্যের নিঃসঙ্গতার আজ অবসান ঘটেছে। স্বাতন্ত্র্যের যোগফল আজকের মানুষ চেতনা। সলিলকৃষ্ণের কবিতাও তাই অবিশেষ হয়েও স্বতন্ত্র। জীবনান্দের প্রভাব তাঁর কবিতার অবয়বে জড়ানো আছে, তা সত্ত্বেও সেগুলো তাঁরই নিজস্ব সৃষ্টি। মৌলিক লক্ষণ সেগুলো হারিয়ে ফেলেনি। তাঁর কবিতা,—'ঘুমিয়েও কাটেনা বেলা, হাস্নুহানা, স্মৃতিগন্ধ, জলাশয়/বদ্ধঘরে কড়া নাড়ে সমুদ্রের যদি কিছু মেলে এ ঠিকানায়/হৃদপিণ্ডে, মুষড়ে উঠে প্রিয়কণ্ঠ যদি পুনর্বার/হঠাৎ আছাড় খেয়ে পড়ে বুকে, দু'বেলা প্রলয় চিহ্ন/ফুটে ওঠে চোখে, ধর্ষিত গোলাপ, স্মৃতি-গন্ধ / নিরিবিলি থাকার ক্যাম্পে কখন হারিয়ে গেছে,/কার্পেটে ধুলোয় আস্তরণে ধর্ষিত এখন স্মৃতি/ঘুমিয়েও কাটেনা

বেলা জীবনের স্মৃতি সন্নিকটে।/ (অজ্ঞাতবাস—জলের ভেতর বুকের ভেতর)

প্রভু, নষ্ট বলেই নষ্ট নয় সব কিছু/দুঃখ বলেই দুঃখ নয় আরো কিছু/চেয়েছিলাম অসহিষ্ণু বুকের ভেতর সহিষ্ণুতা/নষ্টফুলে প্রাণের গন্ধ অফুরান প্রভু, নষ্ট বলেই চেয়েছি যখন বুকের শালুক; কামরাঙার অধর হাসি/ভিটে মাটির গায়ে লাগা রোদের প্লাবন/শুকায় যখন, যখন সকল গন্ধ/একতারাতে জাগায় মাতন, তখন কি আর লাগে ভাল প্রভু তোমার বিরূপ শাসন/যখন জানি নিজেই তুমি প্রবঞ্চিতের স্বত্বভোগী/

(প্রভু, নষ্ট বলেই/জলের ভেতর বুকের ভেতর)

সলিলকৃষ্ণ দেববর্মণের এ পর্যন্ত রচিত কবিতার দৃষ্টিপাত করে বলা যায়, তিনি নির্জনতাধর্মী রোমান্টিক কবি। আমরা তাঁর কবিতার নতুনতর পরিণতির অপেক্ষায় রয়েছি।

প্রদীপ চৌধুরী ত্রিপুরার কবিতাক্ষেত্রে একটি বিতর্কিত ও বহু উচ্চারিত নাম। তাঁর কবিতার বই '৬৪ ভূতের খেয়া' বেরিয়েছে ১৯৭১ এ। এর আগেও বের হয়েছে আরো দু'টি, বই, কোন বিশেষ কারণে বই দুটোর প্রচারও ছিল সঙ্কীর্ণ গণ্ডীবদ্ধ। 'হাংরি' মানসিকতা সম্পন্ন এই কবির কাব্য-প্রতিভা ত্রিপুরায় স্বীকৃত। হাংরিদের ঐতিহ্য বিরোধিতার অবাস্তব ও গর্বোদ্ধত সুর তাঁর কণ্ঠস্বরে ক্রমশ স্তিমিত হয়ে রোমান্টিকতার আ-তিরিশ পর্বই ক্রম পরিণতিতে অপেক্ষমান। তাঁর কবিতা, 'আমার লেখার খাতা এলোমেলো শব্দের কঙ্কালে/ভরে গেছে/আমার ভেতর/যেন ফিরে এশিচ আমি/আজ মনে পড়ে যায় সেই নষ্ট বালকের/তিমির আগুনে পোড়া মুখ/ তাকি মুখ নাকি এক সভ্যতার রক্তের অসুখ/নাকি জন্ম সারা জীবনের উদাসীন প্রসব চীৎকার/ কিম্বা এসব খেলা/মানুষের হাত থেকে কেড়ে নেয়/ অলিখিত কবিতার খাতা ?/ (৬৬-র কালো সুখ ও কালো দুঃখ)

ত্রিপুরার কবিতায় আরেকটি স্নিগ্ধ উচ্চারিত নাম কল্যাণব্রত

চক্রবর্তী। মাত্র ৩৩ বছর বয়স্ক এই কবি পঞ্চাশ দশকের শেষভাগ থেকে কবিতা লিখে আসছেন। কিছুদিন সত্যব্রত চক্রবর্তী নামেও লিখেছেন। যদিও কোন কবিতার বই তাঁর আজও প্রকাশিত হয়নি তাঁর নিজেরই উদাসীন আত্মবিস্মৃতির কারণে, তবু ত্রিপুরার মানস, বিদগ্ধ পাঠককুল এই কবিকে এখনই তাঁর এতাবৎকাল সৃষ্টির জন্য আন্তরিক স্বীকৃতি দিয়ে অপেক্ষা করে রয়েছে, অনাগত সম্ভাবনার। কবিতার ইতিহাসে সাম্প্রতিকতা, আধুনিকতা, বিপ্লব, পরিবর্তন, কোন এক বিশেষ কবির প্রভাব এই শব্দগুলো খুব বেশী প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথের পর ত্রিশ দশকের কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, জীবনানন্দ যে অন্যপথ চিহ্নিত করলেন। এখনও তা থেকে অপসৃতি ঘটেনি, এমন অভিযোগ শোনা যায়। হাংরি কবিকুলও বিদ্রোহবিপ্লবে ক্ষান্তি দিয়ে রোমান্টিকতার পূর্বচিহ্নিত পথেই পরিব্রজ্যা নিয়ে ফেলেছেন, দেখা যাচ্ছে। তর্ক তুললে সূক্ষ্মবোধের অণুবীক্ষণে ত্রিশ সালের রেখাটাও গভীরতা হারাবে। একাত্ম উপলব্ধির সেতু বেয়ে অনায়াসেই এপার ওপার করা যাবে। প্রশ্নটা সেতুভগ্ন বিপ্লবের নয়, কবিতার পক্ষে প্রশ্নটা সব সময়ই উত্তরণের, অগ্রগমনের। সে গতি সব সময়েই সংগতি। ইতিহাসকে মুছে ফেলে নয়, মানুষের দীর্ঘসঞ্চিত মানস সম্পদের সঠিক সংগ্রহণের মধ্যেই তার সার্থকতা নিহিত। বিপ্লব নাড়াচাড়া করে দেয় পরিবেশকে, কিন্তু মানুষকে তো তার রক্তমাংসের শরীরী উপাদানের অদলবদল করে কোনও কিম্ভূত জীবে পরিণত করতে পারে না। মানুষ তার অনুভূতি নিয়ে, তার প্রবৃত্তি নিয়ে, আবেগ সংক্ষোভ নিয়ে, সেই আদিকাল থেকে অনন্তপথের অভিযাত্রায় চলেছে। না পাওয়ার অতৃপ্তি, আঘাতে ক্রোধ, পাওয়ায় উল্লাস এসবই চিরন্তন বিষয়। ভালোবাসার আনন্দে আত্মহারা সেদিনও যেমন মানুষ হয়েছে, আজও হচ্ছে, দৈববাণীর উচ্চারণে বলা যায়, ভবিষ্যতেও হবে। ফলস্বরূপ কতকগুলো শাশ্বত অপরিবর্তনীয় মূলবস্তু কবিতা থেকে কিছুতেই নির্বাসন দেওয়া যাবে না।

কবিতায় প্রগতির পথে যা ঘটবে, তা অভিযোজন মাত্র, বিলুপ্তি নয়। কল্যাণব্রতকে তাই রোমান্টিক কবিগোত্রীয় বললে তাঁর আধুনিকতা ক্ষুন্ন হয় না। তাঁর করিতায় জীবনানন্দের দেখা মাঝে মাঝে পাওয়া গেলেও কবি নিজেও স্পষ্ট রেখায় স্বীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল থাকেন। এ পর্যন্ত লেখা তাঁর কবিতা পরিক্রমা করে এলে মনে হয়, কবি এক অসীম বৈরাগ্য নিয়ে পৃথিবীকে দেখছেন। আজকের পৃথিবীর দুঃখ-ব্যথা মানুষকে যে কল্পনার নন্দনলোক থেকে নামিয়ে এনে বস্তু কঠিন ভূমিতলে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে, তার সঙ্গে কবি পরিচিত। কিন্তু সেজন্য তিনি কোন সময়েই ক্ষুব্ধ-তিক্ত-চিত্ত নন। যন্ত্রণার সঙ্গে যেন তাঁর একটা আপোষরফা হয়ে গেছে। জীবনের একপাশে যন্ত্রণাকেও যেন তিনি একটু জায়গা ছেড়ে দিয়েছেন পরম নির্লিপ্তিতে। তাঁর এই বৈশিষ্ট্যই ত্রিপুরার বর্তমান কবিদের থেকে তাঁকে পৃথক করেছে। তাঁর বৈশিষ্ট্য বিচারে এই উদ্ধৃতিগুলো লক্ষ্মণীয় : 'অবিরাম দ্বিধা, ঝড়, দীর্ঘদাহ একান্ত মুছেও / আমায় নিওনা কোথা হে আদিম স্বয়ম্ভূ পুরুষ / এরা আমায় ভালবাসে, দুঃখ দেয় অহরহ / আগুনে পোড়ায়। নিষিদ্ধ যে পাখী পোষে রাত হলে / স্বকীয় বাগানে অভিমানী হাত দিয়ে ভোরবেলা / আকাশে ওড়ায় ( আলোয় প্রথমা / প্রান্তিক )

সকালের রোদ দেখবে অসঙ্কোচে আশ্বস্ত যুবক / যে নাকি প্রেমের মত দুঃখকেও ধ্রুব বলে মানে / প্রান্তর নির্জন হলে বৃষ্টিতে বেরিয়ে পড়া শখ / সে যাবে রোদের দিকে অসঙ্কোচে নিঃসঙ্গ প্রয়াণে।

( নিঃসঙ্গ প্রয়াণে / প্রান্তিক )

১৯৬১তে যে কবি এসব লেখেন, ১৯৭৩ এ তিনিই তীব্রতর সুরে এই ভাবই ব্যক্ত করেন।—চরিত্রহীনতা খুব প্রিয় তবু আর্তিহীন নয়। / মানুষ খুন হয়ে গেলেও তার বাগানে ফুল / ফোটে। নির্লজ্জ হতে হতেও রোজ ক্লান্তি এবং / ক্ষমা, সঙ্গ এবং নিঃসঙ্গতা / জানালা খুলে / দিলেই আমি দূরে উড়ে যাওয়া ঘোড়ার / পায়ের শব্দ পাই / ( আত্মার কোন ফেডারেশন নাই ) অথবা,—'এ ঘরে নাইবা এলি ৮

তোরা সব বাইরে গিয়ে দাঁড়া / অন্ধকার হয়ে এলে—আজ ঘরে আলো জ্বালবো না / ইচ্ছে রেখে মুহূর্ত জড়াই / বুঝিবা অনেকদিন অন্ধকারে নক্ষত্র দেখিনা। (পুরাতন এ্যালবাম)

স্বপন সেনগুপ্ত ত্রিপুরার কবিতায় আর একটি নাম। এই তরুণ কবি তাঁর সৃষ্টিতে একনিষ্ঠ। তাঁর কবিতার বই 'নীল আকাশ : পাখি' কয়েক বছর আগে প্রকাশিত হয়েছে। 'নান্দীমুখ' নামে একটি কবিতাপত্র তিনি কয়েক বছর ধরে সম্পাদনা করে আসছেন। তাঁর কবিতার স্বতন্ত্র লক্ষণ হোলো যাবতীয় বস্তু পরিমণ্ডল সম্বন্ধে এক তীব্র অসন্তোষ। যা আছে, তা শুধু চাইনা নয়, তা কেন তার কৈফিয়ৎ তলব। তাঁর আকাঙ্খার কোন মূর্তরূপ স্পষ্ট ধরা দিয়ে তাঁকে কোথাও আশ্বস্ত করছে না। অস্তিত্বের সঙ্গে আপোষহীন এই কবি নিজের ক্ষোভ ও যন্ত্রণা দিয়ে সৃষ্টি করে যাচ্ছেন নতুন কবিতা, নতুন বলার ধরন, নতুন বক্তব্য। নিজের চিত্তদাহ নিজে বহন করে পাঠককুলকে দিয়ে চলেছেন তুলে রাখার মত সম্পদ। তাঁর কবিতা : 'মানুষের একটা দুঃখ ও বেদনার বয়স আছে, মানুষ ভোলেনা কিছুই/ভুলে থাকতে হয়, একটা মস্ত পাথরের চাঁই এর নীচে মানুষের অনেক কালের / অনেক কিছু চাপা পড়ে আছে—বেশ বড় ওজনের কুচকুচে কালো এবং / অন্ধকার পাথর। (আসলে মানুষ)

দ্রাক্ষারসের বাইরেও আমাদের মৌলিক স্বাস্থ্য / খরা ও বন্যার পর / যুদ্ধ ও মড়কে পুলের নীচে ছেঁড়া জামা গায়ে রোদ ও আর্ত বাতাসে ঘুরি / আমরাই তো প্লুত স্বর / উপোসের দুঃখ কী রকম সয়ে গেছে সারা শরীর / ঘর ছিল না কোনদিন / আমরা সব সন্ন্যাসী উদ্বাস্তু।

শঙ্খ পল্লব আদিত্য ত্রিপুরায় এক দশকের কম সময় এসে লিখছেন। কবিতার বই এখনও বার হয়নি। বিভিন্ন সাহিত্যপত্রে তাঁর কবিতা সাম্প্রতিককালে নিয়মিত প্রকাশ হয়ে চলেছে। এক উজ্জ্বল স্বাতন্ত্র্য তাঁকে আজকের কবিতায় ভাস্বর করে তুলেছে, একথা নিরপেক্ষ

পাঠকের ভূমিকায় দাঁড়িয়েই বলা যায়। কবিতার ছন্দোবদ্ধ গীতিধর্মকে অপসারিত করতে মনে হয় তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তার সনিষ্ঠ প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন দীর্ঘ পংক্তি রচনায়, অত্যন্ত আটপৌরে চলিত গদ্য শব্দ ব্যবহারে নিজ সৃষ্ট কঠিন সমাস প্রয়োগে। ভাবের দিক থেকে কবি বস্তু পৃথিবীর আঘাতে ক্ষুব্ধ-ক্রুদ্ধ হলেও হারিয়ে যাচ্ছেন না। তাঁর ব্যক্তিসত্তা পরিবেশের চেয়ে বড় হয়ে দাঁড়াচ্ছে সবল আত্মবিশ্বাসে। তাঁর কবিতা,—'সময় কবরে তাই মাঝে মাঝে কবিতার চেয়েও বড়ো মনে হয় এক একটি মানুষের মুখ / মানুষের সঙ্গ ও কথাবার্তা সোনার চেয়েও দামী মনে হয় / খুনী ও পাপী মানুষের মুখ পুণ্যে ঝলসে উঠছে। [ সময় কুকুর ]

'এক প্রবাসী কৃষকের যৌথ খামারে মানুষের শুভেচ্ছা বেঁচে থাকে / ঐক্য ও গানের মৃত্তিকায়' [ মৃগী মৃদঙ্গ ]

ইয়োরোপে বিশ দশকে প্রথম মহাযুদ্ধের উত্তরকালের হতাশাদীর্ণ পরিবেশে ওয়েষ্টল্যাণ্ডের কবি আশ্বাসের জন্য, জলের জন্য চীৎকার করেছিলেন : 'Here is no water but only rock/Rock and no water and the sandy road/The road winding above among the mountains/Which are mountains of rock without water/If there were water we should stop and drink.'

ত্রিপুরার কবি শঙ্খপল্লব আজকের আরো অন্ধকার আশাহীন ভবিষ্যতের সামনে দাঁড়িয়েও প্রত্যয়িত স্বরে উচ্চারণ করতে পারেন,—'সাথসঙ্গতের মতো সুরে শহরের কেন্দ্রীয় ৭ তলা ভবনের / ট্যাঙ্ক বেয়ে জল নামছে—শব্দ নামছে—নেমে নেমে আসছে / জল শব্দ শান্তি / [ মিনার মৃত্তিকা পর্ব ]

আগরতলাবীরবিক্রম কলেজের বিজ্ঞানের অধ্যাপক শ্রীমিহিরদেব কিছু কবিতা লিখেছেন। তাঁর একটি কাব্যগ্রন্থ 'বাংলাদেশ স্বদেশ ও আমি' সম্প্রতি প্রকাশ লাভ করেছে। তাঁর কবিতা নির্দিষ্ট বক্তব্য ও সংবাদধর্মী,

কাজেই ভিন্নতর স্বাদের অভাব। বেশীর ভাগ কবিতা অমিল পয়ারে লিখেছেন। উত্তরণ না ঘটলে তিনি ফুরিয়ে যেতে বাধ্য। তাঁর কবিতার উদ্ধৃতি: 'দীঘল কালোজলের শরীর তিতাস তুমি কেমন আছো / হয়ত তুমি ভুলেই গেছো / জল কি রাখে ধরে ছায়া / [ তিতাস তুমি কেমন আছো / বাংলাদেশ স্বদেশ ও আমি ] অথবা—

'শুনবেনা কেউ মিছে ও ডাকা / আপন ভোলার মদ গিলেছে / চোখের মণি ছানির আড়াল / পায়না দেখা আঙ্গুল দিলেও / [ নান্দী-মুখ, শরৎপর্যায় ]

পীযূষ রাউত কবিতা লিখছেন বেশ কিছুদিন ধরে। তাঁর কবিতা কিছুটা সন্ত্রস্ত ও বিভ্রান্ত। একটি সুনির্দিষ্ট জীবনদর্শন তাঁর সৃষ্টি ক্ষমতাকে ভিত্তিদান করলে ভবিষ্যতে তাঁর কাছ থেকে কিছু পাওয়া যেতে পারে। সম্প্রতি তাঁর কবিতায় সে লক্ষণও দেখা যাচ্ছে। যেমন, 'আমরা কয়েকজন কয়েকজনের জন্য / চিরকাল বাসষ্টপে দাঁড়িয়ে থাকবো। যেমন দেশের রাড়িতে / নৌকোর জন্য প্রতীক্ষমান মা ও আমি, আমি ও ছোট ভাই / নদীতীরে' [ আমরা কয়েকজন কয়েকজনের জন্য ]

প্রদীপবিকাশ রায়ও ভাল লিখছেন। নিখুঁত ছন্দ, রোমান্টিক ভাবধারা নিয়েও তিনি আকর্ষণীয়রূপে আধুনিক। যেমন, 'কথা ছিল দৃষ্টিবদল শুরু হবে গোপনতম মধ্যরাতে / তবে কেন বৃষ্টিবাদল দিকবিদিক উঁচুনীচু পাহাড়ীপথ / যাবজ্জীবন ওঠানামা পায়ের নীচে পাথরকুচি / এই কি তোমার গোপন কথা মধ্যরাতে পাগল হাওয়া / আঁচল খুঁজে উড়িয়ে দিতে নীল পতাকা হঠাৎ বাঁশী / বাজলে কি আর তোমার কাছে টিকিট পাব হাত বাড়ালে। / কথা ছিলো জ্যোৎস্নারাতে খুলে দেবে জানলা কবাট / সুদুঃস্বপ্ন বুকের ছবি গোপন সিন্দুক, তার ভেতরে / শব্দ নামক কালো পাখি চিরটাকাল উড়ু উড়ু / তাকে এবার মুক্তি দেবে আমায় তুমি সাক্ষীরেখে / কথা ছিলো মহানন্দার উপকূলে তুমি আমার মৃগনাভি / সোনারবরণ ভালোবাসা কুসুম হৃদয় সব দেখাবে কথা ছিল /

কথা ছিলো তবে কেন নতজানু হতেই আমি ভুবন জুড়ে / বৃষ্টি এলো, এলোমেলো চতুর্দিকে কালোমেঘে ঘনান্ধকার / সাগর গলে শেকল ভাঙ্গার শব্দ হলে চরাচরে / বন্ধ ঘরে সিন্দুক খুলে / আমায় তুমি কি দেখাতে মধ্যরাতে / ( কি দেখাবে মধ্যরাতে / নান্দীমুখ শরৎপর্যায় )

এই পর্যায়ের আর এক কবি মানস দেববর্মণ। তাঁর কবিতা ও প্রণিধানযোগ্য ঃ 'নষ্টশহর ঘুমের ভেতর ঢুকে পড়লে আমি জেগে উঠি আমার টহল শুরু হয় গলির ভেতর থেকে সদর রাস্তায়/পায়ের তলায় এক টিবি মাংসের ভিতর শব্দ ঢুকে পড়ে পিষ্টনের চাপে যেমন/ হাজার পিষ্টন ঢুকে যায় সিলিণ্ডারের শূন্যের ভিতর/ [ নির্বাসিতের অন্দর মহল ]

মানিক ধর বাস্তবধর্মী কবি। তাঁর কবিতা, 'মাঠে হাঁটছি কে যেন বাজাল সানাই/চিচ্চির রক্ত সব থেমে থাকল ঠায় রৌদ্রে/ক্যানিং-এর মাঠে। যাবো বন্ধুর বাড়ি, আধক্রোশ/পথ হেঁটেও ফুরোয়না, অভ্যর্থনায় কে কে আসবেন/এইসব গোপন ধারণার শলা-পরামর্শ কিছুকাল। / হঠাৎ সানাই বাজল, ক্ষিপ্রদৌড়/ থেমে গেল ছ্যাঁচা খাওয়া ইঁদুরের মতন। / বুকে শুধু এই ভয় অবিরাম এইভাবে সানাই/বাজলে হঠাৎ ঘটা করে ক্যানিংএর মাঠে/যদি বজরা ডুবে যায়/ ( দেশান্তর )

কবির ছন্দজ্ঞান যথেষ্ট তীক্ষ্ণ। কবিতার মধ্যে ছান্দিক স্বরূপ বজায় রেখেও বস্তু লক্ষণ ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা কবির লেখায়।

তাপস শীল বহুদিন কবিতা লিখছেন। তাঁর তিনটি বইও বেরিয়েছে —কবি ক্রমাগত উত্তরণে অন্বিষ্ট। অনিল সরকার সরাসরি রাজনীতির বক্তব্য ঘেষা কবিতা লিখলেও অবশ্যই তিনি তাঁর পূর্বসূরীদের ধারা অনুসরণে অনেকাংশেই ব্যর্থ ও দুর্বল। এছাড়া বিজয় দেববর্মণেরও বেশ কিছু লেখা আগরতলার কাগজে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে, খুব উল্লেখযোগ্য কিছু চোখে পড়েনা।

ত্রিপুরার কবিতা পরিক্রমা করে তিয়াত্তরের শেষে দাঁড়িয়ে

একথাই জোর করে বলা যায়—সাহিত্যের অন্যান্য শাখার তুলনায় কবিতা এখানে অনেক বেশী সম্ভাবনার আভাস দিচ্ছে। গত দশ বছরে কবিতা ত্রিপুরাকে যা দিয়েছে আগামী দশকে তার চেয়ে বেশী দেবে এ প্রতিশ্রুতি শোনা যাচ্ছে এখানকার তরুণ কবি গোষ্ঠীর কণ্ঠস্বরে। নকুল রায়, তীর্থপ্রসাদ চক্রবর্তী, কল্যাণ গুপ্ত, অনিল নাথ, তপন দাশগুপ্ত, বুলবুল রায়, রাতুল দেববর্মণ, পান্নালাল রায়, পূর্ণেন্দু গুপ্ত প্রমুখরা বেশ ভালো লিখছেন।

কয়েকটি সাহিত্য পত্র নান্দীমুখ, পৌণমী, সময়, সাঁকো, চন্দনা, দ্যুতি, প্ল্যাটফর্ম, সমকাল, ব্রততী, হাল, জ্বালা ইত্যাদি এক বিশেষ রুচিশীল মানদণ্ড সৃষ্টি করেছে; কবিতার ক্ষেত্রে, সহায়ক হয়েছে কবিতার নতুন দিগবলয় রচনায়।

এই নতুন আলোকিত বাতাসে নিঃশ্বাস নিয়েও ত্রিপুরার সীমিত পরিবেশে স্থানীয় কবিরা বিচরণের জন্য প্রশস্ত চত্বর খুঁজে পাচ্ছেন না। সাহিত্যিক জীবনের যে রসদ পশ্চিম বাংলায় আছে, ত্রিপুরায় তার যথেষ্ট অভাব। ত্রিপুরার কবিদের মধ্যে প্রচুর প্রাণশক্তি অপরাভবের প্রতিজ্ঞা, বিলুপ্তিহীন স্বয়ংবোধ আজ দৃশ্যমান; কিন্তু জনমানসের সঙ্গে তার সম্পর্ক আরও ব্যাপক হয়ে ওঠার প্রয়োজন রয়েছে। প্রয়োজন রয়েছে গ্রহণ বিনিময়ের ক্ষেত্র সম্প্রসারণের। চিরকাল সব দেশেই কবিতার পাঠক সংখ্যা তুলনামূলক ভাবে কম। কবিতার বই-এর ক্রেতা সংখ্যা আরও কম। কবিতার বিকীর্ণমান প্রাণকোষ উন্মেষের জন্য প্রয়োজন পাঠক সমালোচকের বিদগ্ধ সহানুভব, গ্রহণ বর্জনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা। এসবের একান্ত অভাব ত্রিপুরায়। তেমন কোনও সাহিত্য সংস্থা নেই, যাকে কেন্দ্র করে উল্লিখিত উপজীব্য কবিবৃন্দ সংগ্রহ করতে পারেন। 'সাহিত্য বাসর' যা ত্রিপুরার একমাত্র সাহিত্য সংস্থা হিসেবে / একদিন কাজ করেছে, আজ তা ইতিহাসের অধ্যায়ে পর্যবসিত। এছাড়া আছে ত্রিপুরার রবীন্দ্র পরিষদ। এই রবীন্দ্র কেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠানের অধ্যবসায়ের অভাব নেই। কিন্তু এর

বিস্তৃতি অনেক বেশী হওয়ায় কাব্য সংস্থার উপযোগী গোষ্ঠীজীবন বা ঘনিষ্ঠ পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছেনা, সৃষ্টি হচ্ছেনা দৈনিক আলোচনা-চক্র যার অতি আধুনিক নাম 'আড্ডা'। কবিতার প্রাণ সঞ্চারের জন্য, প্রবৃদ্ধির জন্য এই আড্ডা নামক আলোচনাচক্র অপরিহার্য। নগর জীবনের আরো পরিণতির জন্য হয়তো তা অপেক্ষা করে রয়েছে। কিন্তু ত্রিপুরার কাব্যজীবন এর অভাবে ব্যাহত হচ্ছে নিঃসন্দেহে। এছাড়া আরো সমস্যা হোলো কবিজীবন প্রস্ফুরণের আরেক সাহিত্য-নির্ভর উপজীবিকার অভাব। এখানকার পত্র-পত্রিকাগুলির এমন আর্থিক স্বয়ম্ভরতা নেই, যার ওপর কবি-সাহিত্যিকরা বহুল পরিমাণে ভরসা করে দাঁড়াতে পারেন। তাঁদের তাই অনেকক্ষেত্রে স্ববিরোধী বৃত্তি গ্রহণ করে অস্তিত্বের দ্বন্দ্বে নিরন্তর নিয়োজিত থাকতে হচ্ছে। ত্রিপুরায় তেমন প্রকাশক সংস্থা নেই যার মাধ্যমে কবিতা-গ্রন্থ যথেষ্ট পরিমাণে প্রকাশিত হতে পারে। ত্রিপুরার স্থানীয় কবিরা তাঁদের এক একটি কবিতার বই প্রকাশ করার জন্য প্রাণপাত করেন। আরও ত্যাগ স্বীকারে তাঁরা প্রস্তুত ; কিন্তু সেখানেও ত্রিপুরার নিজস্ব ক্ষেত্র তাঁদের সহায়ক হচ্ছেনা। বাংলাভাষাভাষী অন্য অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগের অভাব ত্রিপুরার আর এক অসুবিধা। এ অসুবিধা কবিতার গতিকে বিলম্বিত করছে। পশ্চিমবাংলায় প্রকাশিত কবিতা-গ্রন্থ ইত্যাদি সঙ্গে সঙ্গে ত্রিপুরার মানুষ পায়না ; অপেক্ষা করে থাকতে হয়। এই অবধারিত বিলম্বকে মেনে নিয়েই ত্রিপুরার কবিতা পশ্চিমবাংলার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে হাঁটছে। এতো তার অতিরিক্ত কৃতিত্ব। ত্রিপুরার যে একমেবাদ্বিতীয়ম রেডিয়ো-স্টেশন 'আকাশ-বাণী-আগরতলা' তা স্থানীয় কবিদের কবিতা পাঠ, কবিতা বিষয়ক আলোচনা আবৃত্তি এসব কোনও কার্যসূচী প্রচলন করছেনা। এতবড় একটি প্রচার ও জনসংযোগ মাধ্যম আকাশবাণী যদি কবি ও কবিতা পরিচিতিতে সহায়ক হোতো, তাহলে কবিতার বিস্তৃতি আরও কিছু পরিসর লাভ করতো। সব থেকে বড় যে প্রশ্ন তা

হোলো কবিদের ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন, স্বীকৃতি ও সম্মানের প্রশ্ন। স্থানীয় কোনও কবি যত ভালো কবিতাই সৃষ্টি করুন না কেন; যতক্ষণ না পশ্চিমবাংলার বিশেষ কোন পত্রিকায় তার স্থান হচ্ছে— ততক্ষণ তার কোন মূল্যই নেই। এইসব পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত কেউ ফিরেও চাইবেনা কবিতার দিকে, এমন একটা প্রথা প্রায় সংস্কারের পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে মানুষের মনে। অনেক সময় তেমন উৎকৃষ্ট না হয়েও অনেক সাধারণ সৃষ্টি শুধু এই প্রকাশের সুযোগে ভাল কবিতার উপরে স্থান পেয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে পশ্চিম বাংলার কিছু করনীয় আছে, এ দাবী ত্রিপুরা তুলতে পারে। পশ্চিমবাংলা তার নিজস্ব প্রয়োজনে বঙ্গভাষাভাষী ত্রিপুরাকে দ্বিতীয় বাংলা দেশ মনে করে গর্ব করে, ফসল তুলে নেয়। কিন্তু ত্রিপুরার কবি-লেখকদের সাহিত্যিক স্বীকৃতিতে পশ্চিম-বাংলা এখনও যথেষ্ট কৃপণ। এখন প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন পতিকাগুলোতে পশ্চিমবাংলার লেখকরাই অগ্রগণ্য, ত্রিপুরার কবি-সাহিত্যিক সেখানে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকের পর্যায়ভুক্ত। ত্রিপুরার সাহিত্য যেখানে পশ্চিমবাংলার ওপর নির্ভরশীল, সেখানে পশ্চিমবাংলার আরও উদার দৃষ্টিভঙ্গীই ত্রিপুরার কাব্যজীবন বিকাশের সহায়ক হতে পারে। আমরা আশা করে আছি ত্রিপুরার কবিপ্রাণ সমস্ত পরাজয়কে অতিক্রম করে আপন অস্তিত্বে স্থায়ী হবে। ত্রিপুরার কবিতা প্রসঙ্গে একথা নিশ্চয় বলা যায়।

# সাংস্কৃতিক বিকাশে নারীসমাজের অবদান

## গৌরী আইয়ুব

বছর দুয়েক আগে বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলনের আয়োজিত একটি আলোচনা-চক্রে যোগ দিতে এসেছিলাম এই ময়দানেই। সেদিন আলোচনার বিষয় ছিল "আমাদের জাতীয় সংহতির সাধনা।" সেই প্রসঙ্গে বলেছিলাম, "জাতীয় সংহতির সাধনায় সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কাজ হবে আমাদের এই ঐতিহাসিক নগরের কোনো এক মঞ্চে সমগ্র ভারতের সংস্কৃতিকর্মকে একত্র করা। কলকাতায় বসে শুধু বঙ্গ-সংস্কৃতির চর্চা নয়, এখন এখানে সারা ভারত সংস্কৃতির চর্চা চাই, বঙ্গসংস্কৃতির চর্চা তো সারা বাংলা দেশ জুড়ে চলেছে প্রতিদিনই।" নিশ্চয়ই এমন একটা তাগিদ আরও অনেকের মনেই জেগেছিল। তারই ফলে সমগ্র ভারতকে না হোক অন্তত পূর্বভারতকে একনীড়ে আহ্বান করা হয়েছে এখানে। এতে আমি এত বেশি উৎসাহিত ও আনন্দিত বোধ করছি যে এই বিপুল আয়োজনের সামান্যতম অংশ গ্রহণ করেও এখানে আসতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি।

তবে আমার জন্য যে আলোচ্য বিষয় নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে আজ, তা আমাকে একাধিক কারণে ধাঁধায় ফেলেছে। আপনারা সবাই জানেন—বিষয়টি হোলো, সাংস্কৃতিক বিকাশে নারী সমাজের ভূমিকা। প্রথমত সাংস্কৃতিক বিকাশ বলতে আমরা কি বুঝব? যে-কোনো সমাজে স্বল্পসংখ্যক বিদগ্ধ জনেরা সচেতন ভাবে যে-সংস্কৃতির চর্চা করে থাকেন সে বিষয়েই কি আলোচনা করব আমরা? অথবা সারা দেশে সমগ্র জনসমাজে প্রতিদিন নিজেদের অজ্ঞাতসারেই যে সাংস্কৃতিক বিকাশ ঘটে চলেছে তারই আলোচনা করব কি? আবার যে কোনো দেশেই সংস্কৃতির একটি আপনভোলা ধারাকে হয়ত বা নিরক্ষর কিন্তু গুণী কিছু ব্যাক্ত বংশপরম্পরায় ধারণ ও বহন করে

আসছেন, একে আজকাল আমরা লোকসংস্কৃতি বলি। এমনতর লোকসংস্কৃতিকে বিচার করা, সংরক্ষণ করা এবং এর ভিতর দিয়ে সভ্যতার ইতিহাসকে সংগ্রহ করা—এ সমস্তই আজ বিদগ্ধ মানুষরা করে থাকেন। আমরা কি এই লোকসংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা করব? সংস্কৃতির এই সব বিভাগগুলিই অত্যন্ত প্রশস্ত এবং কয়েক মিনিটের আলোচনায় তার সীমাসরহদ্দ ভালো করে বোঝা যাবে না।

আবার সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কেউ বা স্রষ্টা, কেউ বা শুধু বাহক। যেমন কিনা রবীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গীতের স্রষ্টা ও বাহক হলেও আজ যাঁরা রবীন্দ্রসঙ্গীত গান, যত বড় শিল্পীই হোন না কেন তাঁরা, তাঁরা রবীন্দ্রসঙ্গীতের ধারক ও বাহক মাত্র--স্রষ্টা নয়। অবশ্য যে-কোনো সমাজেই যুগ যুগ ধরে এই ধারক ও বাহকরাই সংস্কৃতিকে সংরক্ষণ করেন, বাঁচিয়ে রাখেন নিশ্চিত অবলুপ্তির হাত থেকে। নয়ত স্রষ্টার মৃত্যুতেই বহু শিল্পসৃষ্টির মৃত্যু হোতো। আমাদের কোনো কোনো শিল্পক্ষেত্রে আবার যিনি ধারক ও বাহক তিনি স্রষ্টাও, এমন নিদর্শনও আমরা পেয়েছি। আলি আকবর খান কিংবা পণ্ডিত রবিশঙ্করের মত বাজিয়েরা বহু যুগের উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতধারাকে যেমন বাঁচিয়ে রেখেছেন, তেমনি আবার নিজেরাও শিল্পসৃষ্টি করে চলেছেন। বালসরস্বতী ভারতীয় নৃত্যের ঐতিহ্যকে বহন করেছেন, উদয়শঙ্কর সেই ঐতিহ্য-পুষ্ট হয়ে আবার নতুন কিছু সৃষ্টি করেছেন। সংরক্ষণ এবং সংবর্দ্ধন—এই দুয়েরই প্রয়োজন রয়েছে সাংস্কৃতিক বিকাশে।

সংস্কৃতির চৌহদ্দি জরিপ করতে বসে আরও একটা কথা বলা দরকার মনে করছি। বাংলা ভাষায়, সম্ভবতঃ আরও কোনো কোনো ভাষাতেও, সংস্কৃতি বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি বলতে আমরা শিল্পসাহিত্য সঙ্গীত নৃত্য নাটক চিত্র চলচ্চিত্র জাতীয় নানা রকম সুকুমার কর্মই বুঝে থাকি। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যার ইংরিজি তর্জমা cultural function, তাতে নাচ গান নাটক আবৃত্তি ইত্যাদি থাকবে এটাই আমরা ধরে নিই। কিন্তু সংস্কৃতির ক্ষেত্র কি এতেই

সীমিত করা চলে ? Culture বলতে ইংরিজি সাহিত্যে যা বোঝায় অন্তত বোঝাত আগে, সে অর্থেই যদি সংস্কৃতিকে গ্রহণ করি তাহলে সেই কর্মকেই সাংস্কৃতিক কর্ম বলতে হবে যাতে করে আমাদের চিত্ত, বুদ্ধিবৃত্তি, রুচি ইত্যাদির cultivation বা কর্ষণ হয়। শুধু সৌন্দর্যবোধ নয়, সমস্ত ব্যক্তিত্বের কর্ষণকেই তো কৃষ্টি বা সংস্কৃতি বলব। যাঁরা সুকুমার শিল্পের চর্চা করেন তাঁহারাই সংস্কৃতিবান আর যাঁরা বিজ্ঞান, দর্শন বা ইতিহাসের চর্চা করেন তাঁরা সংস্কৃতিবান নন এমন কথা যদি বলি তাহলে সংস্কৃতিকে অত্যন্তই সীমিত আর স্বল্পপ্রাণ একটি বস্তু বলে সাব্যস্ত করা হবে। যে অজস্র ধারায় মানুষ নিজের চরিতার্থতা খুঁজে পায়, আত্মপ্রকাশের পথ করে নেয় সে সবই সংস্কৃতি নামে এক বিরাট নদীর শাখা প্রশাখা ; সংস্কৃতি এই সমস্ত শাখা থেকেই প্রাণপ্রবাহ আহরণ করে। তাই শিল্পচর্চা যেমন সংস্কৃতির অঙ্গ, বিদ্যাচর্চাও তেমনি। আবার এই সংস্কৃতির চর্চায় শুধু যে নাগরিক বিদগ্ধ কিছু মানুষেরই সত্বাধিকার রয়েছে তাও নয়, লোক সংস্কৃতির ধারক ও স্রষ্টারা ছড়িয়ে আছেন দেশের অখ্যাত অজ্ঞাত গ্রামে গ্রামে। বিষ্ণু দে যেমন বঙ্গসংস্কৃতির স্রষ্টা, লক্ষ্মণদাস বাউলও তেমনি বঙ্গসংস্কৃতির স্রষ্টা। শান্তিনিকেতনে বসে ছবি আঁকছেন যে বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় তিনি যেমন সংস্কৃতিবান, গোরাবাগানে বসে অঙ্ক করছেন যে সত্যেন বসু তিনিও তাঁর চেয়ে কম সংস্কৃতিবান তো নন। অতুল প্রসাদ সেন যেমন সংস্কৃতির সাধক, যদুনাথ সরকারও তেমনি সংস্কৃতির সাধক ছিলেন। কোনো সমাজের সংস্কৃতি তার দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাসচর্চা, ধর্মচিন্তা, রাষ্ট্রচিন্তা ইত্যাদিকে বাদ দিয়ে শুধু তার সুকুমার শিল্পকে নিয়েই তৈরি হয় না। অথচ অর্থ বিপর্যয় ঘটে গিয়ে সংস্কৃতি বলতে যেন আমরা শুধু শিল্পচর্চাই বুঝি আজকাল। ফলে রুচির চর্চায় আমাদের যতো উৎসাহ মনীষার চর্চায় যেন ততটা উৎসাহ নেই ; মনোহারী শিল্পচর্চা যত আনন্দ পাই আমরা, পরিশ্রমসাপেক্ষ জ্ঞানচর্চায় যেন তত আনন্দ পাই না।

তবে সংস্কৃতির এই অর্থবিপর্যয় শুধু আমাদের দেশেই নয় অন্য দেশেও ঘটেছে, যেখানে বিদ্যাচর্চার মহাযজ্ঞ চলছে সেখানেও। বছর দশেক আগে C. P. Snow নামে জনৈক লেখক, যিনি প্রধানত বিজ্ঞান কাহিনীই লিখে থাকেন, তিনি একটি প্রবন্ধ লিখে এক বিতর্কের সূত্রপাত্র ঘটান। এই মনোজ্ঞ প্রবন্ধের নাম ছিল Two Culture অর্থাৎ দুই সংস্কৃতি—তাঁর বক্তব্য ছিল যে Culture অথবা সংস্কৃতি যেন আজ দুটি রাজত্বে ভাগ হয়ে গেছে, এক আছে বিজ্ঞান ভিত্তিক সংস্কৃতি, অন্যটি হচ্ছে শিল্পভিত্তিক সংস্কৃতি। এক রাজ্যের মানুষ যেন অন্য রাজ্যের ভাষাও বুঝতে পারেন না। কোনো এক পার্টিতে একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী নাকি আর একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানীকে ডেকে বলছিলেন, "লক্ষ্য করেছ কি, আজকাল culture শব্দটা এমনভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে যেন মনে হয় আমরা কেউ cultured নয়। কবিরা physics-এর এক অক্ষর না বুঝেও cultured কিন্তু আমরা কবিতা পড়ি না বলে uncultured।" কথাটা ভাববার মতো তাই না? এই নিয়ে ভাবনা চিন্তা যে চলছে তাও ঠিক, তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে সব দেশেরই নতুন মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যসূচীতে। সব ছেলে মেয়েদেরই সংস্কৃতির দুই রাজত্বেই কিছুটা প্রবেশাধিকার দেবার চেষ্টা চলছে আমাদেরও নতুন পাঠ্যসূচীতে। এটা সুলক্ষণ।

এবার যে বিষয়ে আমাকে আলোচনা করতে বলা হয়েছে তার উত্থাপন করি। এই যে সাংস্কৃতিক জগতের একটা মানচিত্র দাঁড় করাবার চেষ্টা করলাম এতক্ষণ, এই মানচিত্রে নারী সমাজের অবস্থান কোথায়? এর উত্তর দেওয়া সহজ নয়, যেমন সহজ নয় বলা যে মানুষের সমাজটা পুরুষের তৈরি না স্ত্রীলোকের কিংবা যেমন সহজ নয় বলা যে তাজমহলের কতখানি ডান হাতে তৈরি আর কতখানি বাঁ হাতে তৈরি। তবু নারী পুরুষের কৃতিত্ব বিচারের এই কঠিন কাজে আজকাল রত হতে হয় মাঝে মাঝে কারণ নারীর আবহমানকালের ভূমিকাকে অতিক্রম করে মেয়েরা আরও নানাদিকে হাত বাড়িয়েছে। এই হাত

বাড়ানোটাকে কেউ মনে করেন চাঁদের জন্য হাত বাড়ানোর মতই বাতুলতা। কারণ প্রকৃতিই নারীকে সে দিক থেকে নাকি মেরে রেখেছে। নয়ত আজ পর্যন্ত একজনও প্রথম শ্রেণীর দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, কবি কিংবা চিত্রশিল্পী মেয়েদের মধ্যে থেকে এল না কেন। মেয়েরা নাকি Genius হতে পারে না। অন্যপক্ষে যাঁরা নারী সমাজের প্রবক্তা তাঁরা বলেন মেয়েদের সম্বন্ধে এমনতর হীন ধারণা পোষণ করার কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। সামাজিক বিবর্তনের ইতিহাসে বহু বিলম্বে এই সব নতুন ভূমিকায় মেয়েরা প্রবেশাধিকার পেয়েছে। এই অল্পকালেই তাদের কৃতিত্ব খুব কিছু নগণ্য নয়। এমন কি আমাদের দেশেও বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং উচ্চ শিক্ষার নানা বিভাগে, মেয়েরা দ্রুত গতিতে এবং বিপুল সংখ্যায় প্রবেশাধিকার পাচ্ছে। অনেকগুলি বিষয়েই আজ ছাত্রীর সংখ্যা ছাত্র সংখ্যাকে দ্রুত ছাড়িয়ে যাচ্ছে। আর শুধু সংখ্যা বিচারে নয়, গুণবিচারেও মেয়েদের জয়যাত্রা লক্ষণীয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পদ্ধতি যতই ভ্রান্ত হোক আজও তাকে মূল্য না দিয়ে আমরা পারি না। সেই সব পরীক্ষার বিচারেও দেখা যাচ্ছে মেয়েরা আজ অগ্রাধিকার অর্জন করছে, নানা প্রতিযোগিতায় মেয়েরা ছেলেদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে চলেছে। মনে রাখা দরকার যে এই কৃতিত্বের জন্য মেয়েদের বাধা অতিক্রম করতে হয় আরও অনেক বেশি। সংসারে এবং সমাজেও তারা সুখ সুবিধার ভাগাভাগির বেলায় কম অংশ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে। এমন কি টানাটানির সংসারে আজও আরামের, আহারের, সাচ্ছন্দ্যের বড় অংশটা ভাইদের জন্য ছেড়ে দিতে অধিকাংশ মেয়েই অসুখী হয় না। আমাদের এই আবহমান কালের অভ্যাসটা বজায় থাকুক তাই আমি চাই। ঐটুকু ত্যাগে অন্য ক্ষতি কিছু হয় কি না জানি না, চারিত্রিক লাভ যে অনেক খানি হয় সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই।

যাই হোক, যে কথা বলছিলাম। সংস্কৃতির প্রথম সোপান যে শিক্ষা, সেই শিক্ষায় আজ আমাদের দেশের মেয়েরা একটা বড় রকম

অধিকার পেয়ে গেছে। এর ফলে সংস্কৃতির যে বিভাগটা বিদ্যাচর্চাকে নিয়ে সে বিভাগে মেয়েরা ক্রমেই অনেকখানি আসন করে নিতে যে পারবে এ বিষয়ে আমার আর সন্দেহ নেই। পদার্থবিজ্ঞানই হোক আর দর্শণই হোক, জ্ঞান আহরণে কিংবা জ্ঞানের বিতরণে তাদের পক্ষে খুব তেমন বাধা কিছু থাকবে বলে মনে হয় না। কিন্তু মৌলিক গবেষণা এবং বড় রকম আবিষ্কারের বেলায় একটা বড় বাধা আছে একথা আমি প্রায়ই বোধ করি এবং এ থেকে মুক্তির কোনো উপায় আছে কি না জানি না। আমরা যদি ধরে নিই যে যে-মেয়ে গবেষণা কি আবিষ্কার কর্মে প্রবৃত্ত হবেন তিনি বিয়ে করবেন না বা সন্তানের জন্ম দেবেন না, তা হলে অবশ্য আলাদা। কিন্তু এই আনন্দময় এবং অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মেয়েলী ভূমিকা থেকে অধিকাংশ মেয়েই নিজেদের বঞ্চিত করতে চাইবেন বলে মনে হয় না। তা যদি হয় তাহলে মেয়েদের অনেককেই একটা বড় দ্বিধায় পড়তে হবে। জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা যে একাগ্রতা দাবি করে সেই একাগ্রতা সংসার সন্তান দিয়ে ঘেরা জীবনে আয়ত্ত করা কঠিন। প্রেম-পরিণয়-সন্তান মেয়েদের দেহমনকে গভীর-ভাবে ব্যাপৃত করে, অন্তত কিছু কালের জন্য এবং করাই উচিত। নইলে কতগুলি মহৎ অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত হব আমরা। কিন্তু এই অভিজ্ঞতাগুলি জীবনের যে অধ্যায়ে আসে সেই যৌবনেই পুরুষ এবং নারীরও বৌদ্ধিক কর্মের ক্ষমতা থাকে সবচেয়ে বেশি। একটি ভারতীয় পদার্থবিজ্ঞানী একবার বলেছিলেন যে তিনি খোঁজ করে দেখেছেন যে পদার্থবিজ্ঞানে যা কিছু যুগান্তকারী সৃষ্টি হয়েছে প্রায় সবই নাকি ঘটেছে স্রষ্টাদের বয়স ত্রিশ অতিক্রম করবার আগে। এইটাই নাকি সবচেয়ে সৃজনক্ষম বয়স। একথা সদি সত্য হয় তবে মেয়েদের বেলাতেও সত্য। অথচ এই সৃজনক্ষম বয়সেই আমাদের মানুষ-সৃষ্টির কাজটাও সেরে ফেলতে হয়, নইলে তাদের মানুষ করবার সময় যে পাব না। ফলে একটা বিরোধ না ঘটে উপায় নেই। সন্তান মানুষ করতে জ্ঞানচর্চা এবং শিল্পকর্ম থেকে কিছুটা সরে আসতে হয়ই, উপায় তো দেখি না আর।

এই জৈব বাধাটুকুও মেনে নিয়েই মেয়েদের ভূমিকা, মেয়েদের সম্ভাবনাকে বিচার করতে হবে। শিল্পকর্মের, জ্ঞানচর্চার শিখরে উঠবার মতো ক্ষমতা বা সম্ভাবনা নিয়ে মেয়েরা জন্মায় না একথা বোধহয় বলা যায় না। কিন্তু সহজাত ক্ষমতাকে কর্ষণ করার মতো যে মানসিক অবসর বা বৌদ্ধিক তন্ময়তা লাভ করা অধিকাংশ মেয়ের পক্ষেই সম্ভব হয়ে উঠে না। ফলে অত্যাশ্চর্য সৃষ্টি মেয়েরা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে খুব কিছু করে উঠবেন তার আশা বোধহয় অদূর ভবিষ্যতেও কমই। কিন্তু সংস্কৃতির যে প্রকাশ ঘটে দৈনন্দিন জীবনে, পরিশীলিত ব্যক্তিতে, যত্নকৃত সংসারচর্যায় সেই সাংস্কৃতিক বিকাশে মেয়েদের অধিকার অব্যাহত।

সংস্কৃতিসম্পন্না মায়েরা তাঁদের সংসারকে প্রত্যক্ষতঃ এবং সমাজকে পরোক্ষতঃ সাংস্কৃতিক প্রগতির দিকে চালিত করতে পারবেন এ প্রত্যাশা নিশ্চয়ই বাতুলতা নয়। সংস্কৃতির বিভিন্ন বিকাশে চমকপ্রদ কিছু সংযোজন খুব বেশি আমাদের দিয়ে হয়ত, হবে না কিন্তু সংস্কৃতিসম্পন্ন মানুষ গড়ার কাজটা হয়ত আমরা ভালই করতে পারবো এবং সেটা আমাদেরই কাজ। শিল্প কিংবা জ্ঞানের বহুবিস্তৃত রাজ্যে আমরা যত বিলম্বেই প্রবেশাধিকার পেয়ে থাকি এবং সেই প্রবেশ যতই না দ্বিধা-জড়িত পদে হোক তবু এই জগতের আলো আমাদের মনকে, বোধকে, রুচিকে যে পরিমাণে পরিচ্ছন্ন করবে সেই পরিমাণেই সে আলো প্রতিফলিত হবে আমাদের সংসারে। সাংস্কৃতিক বিকাশে নারী-সমাজের ভূমিকা মুখ্যত হবে এই প্রতিফলনের কাজ। সংস্কৃতিকে আত্মস্থ করে তা সন্তানের মধ্যে সঞ্চারিত করাই হবে আমাদের প্রধান ভূমিকা। তবে অসামান্য প্রতিভার অধিকারিণী কোনো কোনো মেয়ে নিশ্চয়ই এই ভূমিকাকে অতিক্রম করে পদার্থবিজ্ঞানে কিছু মৌলিক আবিষ্কার করবেন কিংবা দর্শনে কিছু অভিনব চিন্তা করবেন অথবা সঙ্গীতে কিছু আশ্চর্য সৃষ্টি করবেন—এমন একটা প্রত্যাশাও আমার মনে থেকে যায়। নিশ্চয়ই সেটুকু প্রত্যাশাকে পুরুষসমাজ উপহাস্য মনে করবেন না।

# আধুনিক বাংলা কবিতার গতি ও প্রকৃতি

বিমলচন্দ্র ঘোষ

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে কবিতার বিষয় বলতে হলে তার পূর্ববর্তী পঁচিশ-ত্রিশ বছরের কাব্যধারার কথাও বলতে হয়। তখন প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় ভয়াবহ। বিশেষ করে ইউরোপের বিক্ষুব্ধ ও নৈরাশ্যপীড়িত প্রবীণ ও নবীন বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে বিধ্বস্ত বড় বড় গ্রাম ও নগরীগুলির শোকাবসন্ন পরিবেশে যাবতীয় মানবিক শ্রেয়োবোধের ওপর বীতশ্রদ্ধ। ভয়াল অভিজ্ঞতার থেকে তাঁরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন ক্ষমতালোভী বর্বরদের দ্বারা শাসিত বৈষম্যকলুষ সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে লক্ষ লক্ষ নরনারীর জীবনে শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি থাকতে পারে না। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের চরম সংকটে সংস্কৃতির বিকৃতিপঙ্কে নিমজ্জিত মানবাত্মার রক্তাক্ত আর্তনাদে তাঁরা বিচলিত হয়েছিলেন। তার ফলে পাশ্চাত্য কাব্য ভারতীর শ্বেতশুভ্র বীণার সহস্রতন্ত্রীতে বেজে উঠেছিল প্রচন্ড বিক্ষোভ, তীব্র ঘৃণা ও অগ্নিগর্ভ বিদ্রোহে মুখর কাব্যঝঙ্কার। ফিনিক্স পাখি যেমন তার চিতাভস্ম থেকে পুনর্জীবন লাভ করে, তেমনি রেনেসাঁশের শতধাবিদীর্ণ সমাধিক্ষেত্র থেকে উত্থিত পিঙ্গল প্রজ্ঞার ধূমকুণ্ডলীর মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিল ইউরোপীয় আধুনিক কবিতা। যে কবিতার আত্মা, অবয়ব, রসব্যঞ্জনা, রূপকল্প, ধ্বনি ও প্রজ্ঞার গভীরতা অভূতপূর্ব, বিস্ময়কর ও অন্তর্ভেদী। যে কবিতায় জ্ঞান ছিল ভক্তি ছিল না, কাম ছিল প্রেম ছিল না, ব্যঙ্গ বিদ্রূপ বক্রোক্তি ছিল আশীর্বাদ আশ্বাস বরাভয় ছিল না।

স্বাধীনতার পঁচিশ ত্রিশ বছর আগে হাউইটজারের অগ্নিগোলা ও মুহুর্মুহু বোমা বিস্ফোরণের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না থাকলেও বৈদেশিক

শাসন ও শোষণের মধ্যে আর্থিক ও নৈতিক দিক দিয়ে বিধ্বস্ত নিত্যনূতন করভারে প্রপীড়িত, দেশব্যাপী ভয়াবহ বেকার সমস্যায় জর্জরিত আমাদের সামাজিক অবস্থাও তখন শোচনীয়। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অহিংস ও সহিংস সংগ্রামে ভারত তখন উদ্বেলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এই যুগসংক্রান্তিকালই নতুন যন্ত্রণার আলোয় দীপ্ত রবীন্দ্রোত্তর নতুন কবিতার সূতিকাগার। ভঙ্গিতে বিদ্রোহ কিন্তু অন্তরে রবীন্দ্রানুরাগী এই সময়কার চারজন কবির নাম স্মরণ করতে পারি, যাঁরা নিজ নিজ কাব্যসাধনার ক্ষেত্রে অসামান্য শক্তির স্বাক্ষর রেখে গেছেন। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও কাজী নজরুল ইসলাম—এই চারজন রবিমণ্ডলে লালিত কবি সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও সুরের প্রবর্তক। লোকায়ত চিন্তায়, বিশ্বজনীন চেতনায় এবং অপ্রচলিত মূল সংস্কৃত ছন্দগুলিকে বাংলায় রূপদানের দক্ষতায় সত্যেন্দ্রনাথ তখনকার বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে বিস্ময় সৃষ্টি করেন। অধ্যাপক কবি মোহিতলালের কবিতার আঙ্গিক ক্লাসিকধর্মী ও গুরুগম্ভীর স্পেন্সারিয়ান ছন্দের অনুরূপ হলেও তিনি তাঁর কমনীয় প্রেমানুভূতিকে কাঠিন্যের রূপ দিয়ে বাংলা কাব্যে কায়াকান্তিবাদের গোড়া পত্তন করেন। মরলোক, মানুষ ও রূপ মাধুর্যের প্রতি তাঁর হৃদয়াবেগ ছিল তীব্র। রবীন্দ্রযুগে মোহিতলাল ছিলেন অনন্যসাধারণ স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী। সম্পূর্ণ অন্যজাতের ও অন্য মেজাজের কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। যতীন্দ্রনাথের কবিতাবলীর আঙ্গিক প্রাচীন পদ্ধতি ঘেঁষা হলেও, তাঁর বিষয় নির্বাচন ও বক্তব্য বৈপ্লবিক। তিনিই সর্বপ্রথম এদেশের মান্ধাতার আমলের ঐহিক ও পারত্রিক ধ্যান ধারণার ওপর শ্লেষ-ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের নির্মম কশাঘাত করেন। নিজের বস্তুবাদী কবিসত্তাকে বিচারকের আসনে বসিয়ে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করান প্রথাসিদ্ধ সমাজের ভ্রান্ত জীবনদর্শনকে, ঈশ্বরকে, অবতারকে, নিয়তিকে, প্রগতিবিরোধী অপরাধের হাতিয়ার সাব্যস্ত করে। প্রকৃতপক্ষে যতীন্দ্রনাথই প্রাক স্বাধীনতার যুগে

বাস্তববাদী কাব্য-সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রথম নন্দীকার। এঁদেরই সমকালে সদ্য যুদ্ধফেরৎ হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম অদম্য ভাবাবেগ ও উত্তপ্ত উচ্ছ্বাসের জ্বলন্ত ভাষায় চারণধর্মী দেশপ্রেমের কাব্য রচনার দ্বারা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উদ্বুদ্ধ করেন। এই চারজনের মধ্যে একমাত্র নজরুলই জনগণের কবি। তর্ক নয়, তত্ত্ব নয়, চাতুর্য নয় সোজাসুজি প্রাণস্পর্শী আবেগ সঞ্চারে ও সহজিয়া পদবিন্যাসে নজরুল শাসক ও শোষক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। রবীন্দ্রনাথের পর শুধু দেশাত্মবোধক নয়, শাশ্বত বিরহ মিলনের প্রেম সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও নজরুল অদ্বিতীয় গীতিকার। যে কবি চতুষ্টয়ের কথা বললুম এঁদের কাব্যধারার মধ্যে বহুমুখী আঙ্গিক বৈচিত্র্য ও বক্তব্যের অভিনবত্ব থাকলেও এঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন ঐতিহ্যনিষ্ঠ সংস্কারবাদী কবি।

একালের কবিসমালোচকরা উপরোক্ত কবিদের আধুনিক বলেন না। কেন বলেন না তার সপক্ষে কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণও দেখাতে পারেন নি। আধুনিক কথাটার ব্যাখ্যাও এঁদের অস্পষ্ট। যুগধর্ম যদি আধুনিকতা হয় তাহলে উপরোক্ত কবিচতুষ্টয় নিশ্চয়ই আধুনিক। পোষাকপরিচ্ছদে সেকেলে বিদ্যাসাগর যদি দেড়শো বছর আগের সমাজে সবচেয়ে বড় আধুনিক হন, তাহলে প্রাচীন পদ্ধতি ঘেঁষা আঙ্গিকের মধ্যে বৈপ্লবিক বক্তব্য সৃষ্টির জন্যে সত্যেন্দ্রনাথ, মোহিতলাল, যতীন্দ্রনাথ ও নজরুলকে কেন আমরা আধুনিকতার প্রবর্তক বলবো না? এঁরা চারজনই ছিলেন যুগধর্মের ধারক ও বাহক। 'আধুনিকতা' ব্যাপারটা আকাশ থেকে উল্কার মতো হঠাৎ খসে পড়ে না, কিম্বা চলমান কালের গতি হঠাৎ থমকে গিয়ে আধুনিকতা নামক কোনো নিশ্চল বস্তুতে রূপ পরিগ্রহ করে না। সবচেয়ে হাস্যকর ব্যাপার হলো একশ্রেণীর অতিরিক্ত সমালোচক ইদানীং বলে থাকেন, একালের সংখ্যাগুরু কবিপ্রতিভারা নাকি দশকে দশকে যুগ টপকে গোষ্ঠীবদ্ধ উল্লম্ফনে ক্রমাগত নতুন নতুন আধুনিকতা সৃষ্টি করে চলেছেন ঐতিহ্যবিধ্বংসী পরাক্রমে! এ যেন সার্কাসী খেল! বিগত শত শতাব্দীর সাংস্কৃতিক

ইতিহাসে এ ধরনের খেল দেখা যায় নি। এই দ্রুতগতিতে যুগোত্তরণের ফলে আগের দশকের আধুনিকতাকে পরের দশকের আধুনিকতা অতিক্রম করে চলেছে অবলীলাক্রমে। এই সমালোচকরা সর্বযুগের সর্বকালের কবিসমাজকে এমন কি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকেও এই আজগবী আধুনিকতার আঘাতে নস্যাৎ করে দিতে চান! এই দশকপন্থী সমালোচকদের মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্পর্কে স্বভাবতই সন্দেহ জাগে।

এবার আমার মূল বক্তব্যে ফিরে আসি। পূর্বোক্ত চারজন বিশিষ্ট কবির পর যে শক্তিমান কবিরা এলেন তাঁরা কিন্তু বাংলা কাব্যের ঐতিহ্যের প্রতি পূর্ণশ্রদ্ধা পোষণ করেও পূর্বগামী কবিদের পথ অনুসরণ করলেন না। রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর আদর্শানুগামীদের প্রভাব অতিক্রম করার সুস্পষ্ট ঘোষণা নিয়ে তাঁরা সংযতচিত্তে বাংলার কাব্যজগতে আনলেন নতুন আলো, নতুন হাওয়া। তাঁদের এই স্বাস্থ্যকর প্রচেষ্টার মধ্যে কোনো প্রকার অসূয়া ও ঔদ্ধত্য ছিল না। তাঁরা প্রাচ্যের কিছুটা অধ্যাত্মধর্মী কাব্যজগৎ থেকে মুখ ফেরালেন প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর পাশ্চাত্য আদর্শের দিকে। গোষ্ঠিবদ্ধ হলেন নিজেদের মুখপত্র এক একটি সাহিত্যপত্রিকাকে কেন্দ্র করে। পাঁচ দশ বছরের ব্যবধানে আত্মপ্রকাশ করলো যথাক্রমে 'কল্লোল', 'কালিকলম', 'পরিচয়', 'কবিতা' প্রভৃতি পত্রিকাগুলি। এই নবাগত বলিষ্ঠ কবিদের মধ্যে একজনের সঙ্গে অপরজনের কোনো দিক দিয়েই কোনো সমধর্মিতা নেই। এঁদের মধ্যে কেউ মাইকেল মধুসূদনের মতো অমিত্রাক্ষর ছন্দ ও সনেট স্রষ্টা, অথবা রবীন্দ্রনাথের মতো সর্বতোমুখ প্রতিভার অধিকারী না হ'লেও - নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য, বৈচিত্র্য, রীতি ও প্রজ্ঞাসিদ্ধির দ্বারা এঁরা প্রত্যেকেই স্বনিষ্ঠ ও স্বরাট। ইউরোপ ও আমেরিকার প্রাক ক্ষয়িষ্ণু কাব্যাদর্শে অনুপ্রাণিত এই উচ্চশিক্ষিত কবিদের চোখের সামনে খুলে যায় বাংলা কবিতার নতুন দিগন্ত। ইয়েটস্, পাউণ্ড, লরেন্স, এলিয়ট, চেস্টারটন, বদলেয়ার, মালার্মে, হাইনে প্রভৃতি স্ব স্ব প্রধান কবিদের প্রভাব এঁদের কবিতার অবয়ব ও সত্তাকে দেয় নতুন

রূপ। এর আগে পর্যন্ত বাংলা কবিতায় ব্যক্তি ছিল নেপথ্যচারী, এঁদের কবিতায় ব্যক্তি এসে দাঁড়ালো কাব্যমঞ্চের পাদপ্রদীপের আলোর সামনে। ব্যক্তিপ্রাধান্য স্বাধীনতার পূর্ববর্তী ও পরবর্তীকালের বেশির ভাগ কবিতায় সুস্পষ্ট ও সোচ্চার।

আমি আজ এঁদের মধ্যে কয়েকজন মাত্র কবির কথা এখানে বলবো, যাঁরা প্রত্যেকে বিশিষ্টতায় অনন্য। জীবনানন্দ দাস অশ্রুতপূর্ব দীর্ঘপদী পয়ারের মন্থর ছন্দোবিন্যাসে এমন একটি ভাবগম্ভীর জীবন-তত্ত্বের গোধূলি ধূসর সুর শোনালেন যার রেশ অতি আধুনিক বহু কবির কবিতায় আজো প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। হৈমন্তীকুয়াসচ্ছন্ন ভাববাদী দার্শনিকতায় ও মৃৎস্পন্দিত দেশপ্রেমের আলোয় জীবনানন্দ আত্মা, প্রেম, পৃথিবী ও ইতিহাসের অন্তর্গূঢ় নিদিধ্যাসনে নিসর্গচারী। রবিমণ্ডলের আত্মসমাহিত কবি অমিয় চক্রবর্তী আধ্যাত্মিকতা ও মানবতার নিবিড় সমন্বয় ভাবনায় ভূমণ্ডল পরিক্রমার নিঃসঙ্গ পরিব্রাজক। জীবন ও পরিবেশকে এড়িয়ে এই ব্রাহ্মচেতনার কবি ব্যক্তিপ্রাধান্যকে প্রশ্রয় দেননি। সূক্ষ্মদর্শী প্রেমেন্দ্র মিত্র পুরোপুরি বাস্তববাদী, সমাজসচেতন ও বিজ্ঞানপ্রেমিক কবি। তাঁর বহু কবিতা সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদবিরোধী সমাজকেন্দ্রিক ভাবৈশ্বর্যে ভাস্বর। যৌবনপূজারী বুদ্ধদেব বসু নিখুঁত ভাষার ও যুগদীপ্ত রোমান্টিক অনুভূতির সাবলীল রসব্যঞ্জনায় দেহাত্মবাদী প্রেম, প্রকৃতি ও ব্যক্তিসত্তার আভিজাত্য ফুটিয়ে তোলেন তাঁর অনবদ্য লিরিকগুলির মধ্যে। স্বাধীনতার পূর্ববর্তীকালের নতুন কবিতা অন্দোলনের ক্ষেত্রে কবিতা সম্পাদক বুদ্ধদেব বসুকেই অধিনায়ক বলা যেতে পারে। সংস্কৃত, জার্মান, ইংরাজী, ফরাসী ও পালি ভাষার চিরায়ত সাহিত্য অধ্যয়নে সমৃদ্ধচিত্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত পাথরে খোদাই নিটোল আঙ্গিকের কাব্যরচনায় অনন্যসাধারণ। একাধারে কুমারিল ভট্ট, শঙ্কর, হেগেল, হোয়াইটহেডও আংশিকভাবে মার্কসীয় তত্ত্বের সংমিশ্রণ ঘটেছিল এই ক্ষণশাশ্বতবাদী কবির আপাত-নাস্তিক্যধর্মী কাব্যচিন্তায়। এ যুগের সহজিয়াপন্থা মানবতাবাদী কবি

অন্নদাশঙ্কর রায় ছন্দোগুরু প্রবোধচন্দ্র সেনের আখ্যায় 'ছড়ার রাজা'। নির্দোষ পরিহাসরসসিক্ত এঁর কতকগুলি ছড়া অত্যন্ত জনপ্রিয়। এঁদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বয়োকনিষ্ঠ অথচ সর্বাধিক সংখ্যক কবিতার রচয়িতা বিষ্ণু দের সমাজ, প্রকৃতি, ইতিহাস ও মার্কসবাদী চিন্তার গভীরতা প্রজ্ঞা ও প্রেমের সমন্বয়ে সার্থক। এঁরাই রবীন্দ্রোত্তর যুগের বহু আলোচিত 'আধুনিক' কবি। এঁদের মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু ও অন্নদাশঙ্কর রায় এই তিনজন ছোটগল্প ও উপন্যাসের ক্ষেত্রেও প্রথম সারির কথাশিল্পী।

## ॥ দুই ॥

১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের তিরোভাব হয়। ভারতসংস্কৃতির সার্বভৌম সাধনার ও সংগ্রামের আকাশে ঘনায় বিষাদের অন্ধকার। তার দু বছর আগেই ফ্যাসিষ্ট দানবরা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের নরকাগ্নিতে মানবসভ্যতা ও সংস্কৃতিকে ভস্মীভূত করার সংকল্পে উন্মত্ত। এই সর্বনাশা বিপদ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ প্রথম থেকেই সচেতন ছিলেন। স্পেনে, মাঞ্চুরিয়ায়, আবিসিনিয়ায় ফ্যাসিষ্ট আক্রমণ সম্পর্কে কবিগুরুর সতর্কবাণী নির্ভুল ভাবে ফলে যায়। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য ফ্যাসিষ্ট রণনায়ক হিটলার, মুসোলিনী ও তোজোর স্পর্ধিত যুদ্ধ পরিচালনার বর্বরনীতি ও আগ্রাসী পৈশাচিকতার বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী ও সমাজ-তান্ত্রিক শক্তিগুলি পারস্পরিক আদর্শ বিরোধ ভুলে সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধে অস্ত্রধারণ করে। সাড়া পৃথিবী জুড়ে ফ্যাসিষ্টবিরোধী কবি সাহিত্যিকরা প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলেন শান্তিকামী বিশ্ববাসীর সপক্ষে। আমাদের দেশে প্রথম ফ্যাসিষ্টবিরোধী কবি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথই প্রগতিশীল "আধুনিক" কবিতার জনক। কবিগুরুর মহাপ্রয়াণে সাহিত্যে প্রগতিশীল সাধনার অপূরণীয় ক্ষতি হয়।

কোনো বিরাট পুরুষের মৃত্যুতে কিন্তু ইতিহাসের অগ্রগতি থেমে যায় না। কবিগুরুর অভয় আশিসের আলোয় অমিত শক্তিমান নবাগত কবিরা অদম্য উৎসাহ নিয়ে প্রগতিশীল কাব্যসাধনায় আত্মনিয়োগ করলেন। বাংলা কাব্যে এলো বিচিত্রমুখী প্রাণৈশ্বর্যের জোয়ার। লোকায়ত সমাজ চেতনায় ও বস্তুবাদী শুভবুদ্ধির বাঙ্ময় ধন্যালোকে ঝলমল করে উঠলো সুস্থ মানসিকতার নব নব কাব্যরূপ। এই নতুন কালের কবিরাই গতানুগতিকতার মধ্যে আনেন বিস্ময়ের নব জাগরণ। হৃদয়রূপিণী কাব্যভারতী মানবময়ী প্রজ্ঞারূপিণীতে রূপান্তরিতা হলেন এই শক্তিমান কবিদের তপস্যায়। এঁদের প্রত্যেকের নামোল্লেখ করতে গেলে আলোচ্য প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি হবে এবং সব কবিকে খুশি করাও যাবে না। কারুর নাম বাদ গেলে স্বভাবতই তিনি ক্ষুব্ধ হবেন। এঁদের রচিত সাথক কবিতাবলীর গুণাবধারণ করতে গেলে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করতে হয়। সংক্ষেপে বলা যায় এই শক্তিমান কবিরা এঁদের আগের যুগকে সাফল্যের সঙ্গে অতিক্রম করেছেন। বিদেশ চেতনায় সজাগ হয়েও এঁরা প্রত্যেকে দেশের সুমহান জাতীয় ঐতিহ্যের অনুগামী। এই সমাজবাদী কবিরাই একালের বাংলা কবিতাকে সমৃদ্ধ করেছেন, স্বাধীনতার পরবর্তীকালের জনজীবনে জাগিয়েছেন বিপুল আশা আকাজ্ক্ষার প্রেরণা।

দুঃখের বিষয় এঁদের পর থেকেই ইঙ্গমার্কিণ ক্ষয়িষ্ণু সাহিত্যাদর্শের বিপজ্জনক প্রভাব কয়েকটি প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিবাদী স্বার্থের সংরক্ষক পত্রিকা ও প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাকাব্যে সাধনাবর্জিত, ঐতিহ্যবিমুখী, আত্মকেন্দ্রিক এবং অবলীলাক্রমে যা খুশি লেখার জোয়ার জাগিয়ে দেয় এক দল উন্মার্গগামী লেখকের ধ্যানধারণায়। বাংলাকাব্যে গুণগত পরিবর্তন না এসে, সংখ্যাগত পরিবর্তনের কোলাহল শুরু হয় শহর ও গ্রামাঞ্চলের অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলকে কেন্দ্র করে। যে কবি হাত মক্সো করার বয়সে বিশ পঁচিশটি মাত্র কবিতা লেখেন তাঁকেও

দেখি যেন তেন প্রকারেণ একখানি কাব্যপুস্তিকা বের করতে। কেউ পড়ুক বা না পড়ুক, বিক্রি হোক বা না হোক তাতে এঁরা বিন্দুমাত্রও বিচলিত হন না। আমাদের জাতীয় গ্রন্থাগারের দপ্তর থেকে সন্ধান নিয়ে জেনেছি—দেশ স্বাধীন হওয়ার বছর ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৯৫৪ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা প্রতি বছরে গড়ে ১১০ খানি। তার মানে নয় বছরে ১১০×৯=৯৯০ খানি। এবং ১৯৫৫ থেকে ১৯৭৩-এর ডিসেম্বরের মধ্যে জমা পড়ে মোট ১৯৭৩ খানি কাব্যগ্রন্থ। এই নির্ভুল তথ্য থেকে জানা যায় স্বাধীনতার পরবর্তী ২৬ বছরে মোট কাব্যগ্রন্থ বেরিয়েছে ২৯৬৩ খানি। এর মধ্যে একজন কবির একাধিক কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা শতকরা ২।৩ খানি ধরলে স্বাধীনতার পর জাতীয় গ্রন্থাগারের হিসাবে ২৯০০ জন আধুনিক কবির কবিতার বই পশ্চিমবঙ্গকে কাব্যাকীর্ণ করেছে। এ ছাড়া আরো অসংখ্য কবি আছেন যাঁরা D. B. Act অনুযায়ী এক কপি করে বই জাতীয় গ্রন্থাগারে জমা দেবার আইন সম্পর্কে অজ্ঞ। কাব্যরসিক পাঠক-পাঠিকারা একবার চিন্তা করে দেখুন এই তিন সহস্রাধিক কবিকে স্বীকৃতি ও সম্মান দেওয়া কি সম্ভব? এঁদের নামের তালিকা প্রকাশ করলে কি আপনারা এঁদের কাউকে কবি হিসাবে চিনতে পারবেন? এই ভিড়ের মধ্যে যে দু-চারজন সত্যকার প্রতিভাবান কবি আছেন তাঁদের খুঁজে বের করা সহজ নয়।

## ॥ তিন ॥

ইংরাজ শাসকরা দেশব্যাপী প্রচণ্ড বিক্ষোভে ও অগ্নিগর্ভ গণআন্দোলনের চাপে আতঙ্কিত হয়ে, দেশ শাসনের ভার আমাদের হাতে তুলে দিয়ে বিদায় নেবার পর ছাব্বিশ বছর কেটে গেছে। এই ছাব্বিশ বছরে আমরা আমাদের 'বহুজনহিতায় বহুজন সুখায়' সমাজ ও সংস্কৃতি গড়ার কাজে কতদূর এগুতে পেরেছি এবং সে

অগ্রগতি কতখানি উন্নয়নের দিকে, কতখানি অধঃপতনের দিকে এ নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করা রীতিমত শ্রমসাধ্য ব্যাপার। বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যার বাস্তব রূপায়নের ক্ষেত্রে ভারত আগের তুলনায় বহুদূর এগিয়েছে এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। কিন্তু জাতীয় সংহতি ও লোকশিক্ষার দিকে সজাগ ও সক্রিয় দৃষ্টি রেখে সংস্কৃতি গড়ার কাজে আমাদের সততা কি সর্বজন স্বীকৃত? সংস্কৃতি তো কাব্য নামক একটি মাত্র বিষয় নয়। সমগ্র জাতিকে সব দিক দিয়ে লক্ষ্মীশ্রীমণ্ডিত করার সামগ্রিক রূপই সংস্কৃতি। ইংরেজরা ভারত ছেড়ে চলে যাবার পর দেড়শো বছরের শাসন ও শোষণে সর্বস্বান্ত দেশের সমাজ ও সংস্কৃতির তখন মুমূর্ষু অবস্থা। বিদেশী শাসকদের বশংবদ বড় বড় শহরের ওপরতলার বিদ্বজ্জনমণ্ডলী অর্থাৎ অভিজাত ইনটেলেকচুয়ালরা দেশের বৃহত্তর লোকজীবন সম্পর্কে উদাসীন উন্নাসিকতায় আধুনিকতা নিয়ে যতই লম্ফঝম্প করুন, শ্রেণীসংঘর্ষে জর্জরিত অনুন্নত সমাজের বাস্তব অবস্থা তখন শোচনীয়। সেই ছন্নছাড়া হতশ্রী অবস্থার মধ্যে একমাত্র চিন্তাশীল গদ্যসাহিত্য-স্রষ্টারাই দেশের জনজীবন সম্পর্কে কিছুটা সচেতন ছিলেন। ভারতবর্ষের প্রবহমান ঐতিহ্য ও তার সঙ্গে অন্যান্য দেশের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কের গুরুত্ব বাঙালী সমাজবিজ্ঞানী ও সংস্কৃতি সাধকরাই বিগত শতাব্দী থেকে উপলব্ধি করে এসেছেন। সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশকে নতুন করে গড়ার কাজে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের সচেতন অংশে দেশকর্মী, সাংবাদিক, তত্ত্বদর্শী প্রবন্ধকার, ঔপন্যাসিক ও নাট্যকারদের মহৎ প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহেই দেশবাসীর মনে নতুন প্রেরণার সঞ্চার করেছে। দুঃখের বিষয় প্রগতিশীল ও ফ্যাসিষ্ট বিরোধী শক্তিমান কবিদের পরবর্তী উত্তরসাধক কবিরা কি এ বিষয়ে সচেতন? এই নতুন কালের স্বাধীন দেশের কাব্যধারার গতি ও প্রকৃতি বিচার করতে গেলে কি আমরা তার মধ্যে নবজাগ্রত মহাজীবনের আশা আকাঙ্খা-উদ্দীপনা-প্রেরণার অমৃতস্বাদ পাই?

একালের কজন কবি দেশবাসীর মনের মন্দিরে সেবিত হতে পেরেছেন?

একটি মাত্র আনন্দের কথা, আজো পশ্চিমবঙ্গে এমন কয়েকজন অসামান্য প্রতিভাবান কবি রয়েছেন যাঁদের বহুমুখী কাব্যসৃষ্টির ঐশ্বর্যে আমরা গর্বিত। এই সুস্থ ও সমাজ সচেতন কবিদের মুখে আর শোনা যায় না "আত্মসংস্কৃতির্বাব শিল্পানি।" আত্মসংস্কৃতির অহমিকা ও কলাকৈবল্যবাদী স্বপ্নচারিতা আজ সর্বতোভাবে পরিত্যক্ত। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন, "ওরে অহংবুদ্ধি ছাড়।" প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীও সংস্কৃতিকর্মীদের বলতেন, "নাহংহঙ্কারাৎ পরোরিপু।" আত্মকেন্দ্রিক মনোভাব শুধু কাব্য নয়, যে কোনো মানবকল্যাণমূলক সাধনার অন্তরায়। সমাজ, প্রকৃতি ও বিশ্বচরাচরকে নিয়েই কবির জীবন। কবিরাই মনুষ্যজাতির বিবেক। কবির উপলব্ধি অনুভূতি তাঁর কবিতার মাধ্যমে পাঠকের ভাবনার মধ্যে যদি রসসঞ্চার করতে না পারে তাহলে সে কবিতার কোনো মূল্য নেই। কে যেন লিখেছিল, "মনের খবর মনই রাখে/প্রাণের খবর প্রাণ//মরমিয়ার বাজলে বাঁশি/রসিক পাতে কান//" কবিতার বাঁশি শোনার জন্য রসিক পাঠক কান পেতে আছেন। অহঙ্কার দেখিয়ে, ব্যক্তি প্রাধান্যের ঔদ্ধত্য দেখিয়ে উন্মার্গগামী কবি রসিক পাঠক সমাজের কাছ থেকে সংবর্ধনা কেমন করে পাবেন? অহঙ্কৃত ব্যক্তি প্রাধান্য প্রশ্রয় পেলে আত্মভুক কবির দুর্বল চরিত্র পাশ্চাত্য অবক্ষয়পন্থী কবিদের ব্যক্তিত্বের দ্বারা রাহুগ্রস্ত হয়। ক্রিস্টোফার কডওয়েল সেজন্যেই বলেছেন: "Character must be placed in opposion to personality". ব্যক্তিত্বকে নেপথ্যে রেখে বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ উপলব্ধির দ্বৈতচেতনায় চরিত্রবান কবি রচনা করেন মনোজয়ের কবিতা। দুঃখের বিষয় একদল অতিআধুনিক কবি ব্যক্তিপ্রাধান্যকে আঁকড়ে থেকে সর্বপ্রকার সামাজিক দায়িত্ব অস্বীকার করেন। মহৎ ও সৌন্দর্যময় চিন্তার অনুধ্যান, বাক্যবিন্যাসে শব্দচাতুর্য

সৃষ্টির অভিনিবিষ্ট আয়াস এবং বিষয়ানুযায়ী রসসমৃদ্ধ ছন্দ রচনার পারিপাট্য বিষয়ে এঁরা সম্পূর্ণ উদাসীন।

দেশ স্বাধীন হওয়ার বহু আগে থেকেই লক্ষ্য করে আসছি স্কুলকলেজের ছাত্রদের পাঠ্যপুস্তকে আধুনিক কবিতার স্থান খুব কম। বেশির ভাগ আধুনিক কবিই ছাত্রদের জন্য সার্থক কবিতা লেখেন নি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগ যদি ১ম শ্রেণী থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রদের পাঠ্যপুস্তকের উপযোগী জ্ঞানোন্মেষের স্তরভেদের দিকে লক্ষ্য রেখে রচিত দশটি করে কবিতা আধুনিক কবিদের কাছ থেকে নেবার জন্য আমন্ত্রণ জানান এবং প্রতিটি কবিতার জন্য উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতে প্রতিশ্রুত হন তাহলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আধুনিক কাব্যসাধনার ক্ষেত্রে একটা গুণগত পরিবর্তন আসবে। সুস্থ হয়ে উঠবে কবিদের অসুস্থ মানসিকতা। শিক্ষাকে এড়িয়ে সাহিত্যচর্চা করা বিনা আগুনে আলো জ্বালার মতোই নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। নৈতিক শিক্ষামূলক কবিতার কল্পনা ও ভাবুকতা ছাত্রমনের অস্ফুট অপরিণত ভাব ও কল্পনাকে প্রস্ফুট করে। এ কথা জানতেন বলেই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতোই শিক্ষাদানব্রতে আজীবন ব্রতী ছিলেন।

সঙ্গীতের ক্ষেত্রও বেশির ভাগ আধুনিক কবি অনুপস্থিত। এর ফলে অকবিদের লেখা অশ্রাব্য গানগুলিতে সুরকাররা সুর দিতে বাধ্য হন। দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের পর একালের খুব কম কবিই সঙ্গীতচর্চা করেন। প্রতিষ্ঠিত কবিদের মধ্যে একমাত্র *প্রেমেন্দ্র মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র ও এই প্রবন্ধকারের* কিছু কিছু জনপ্রিয় গান আছে। আধুনিক কবিরা গীত রচনায় এগিয়ে এলে আধুনিক বাংলা গান সমৃদ্ধ হবে। শুধু তাই নয়, গানের কান আধুনিক কবিতার ক্ষেত্রে নতুন নতুন ছন্দ সৃষ্টিরও সহায়তা করে।

যাঁরা ঐতিহ্য মানেন না, যাঁরা পূর্বাচার্যদের ঋণ স্বীকার করেন না, আধুনিকতার গর্বে যাঁরা উদ্ধত, তাঁদের মনে রাখা উচিত

শিল্প হিসাবে কবিতা আধুনিক নয়। যুগধর্ম অনুযায়ী যতই তার রঙঢঙ ভাবভঙ্গি বদলাক, কবিতা মুখ্যতঃ আদিম শিল্প। নৃত্যকলা ও সঙ্গীতের মতো কবিতার বয়সের গাছ পাথর নেই। ঋগ্বেদের সূক্ত সৃষ্টির সময় থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত কবিতার দশদিগন্ত সীমাহীন। বিশেষ করে বঙ্গদেশের আপাদমস্তক কবিতায় গড়া। কবিতাই তার আত্মিক সত্তার বাকবিভূতি। কবিতা লেখেননি এমন বাঙালী খুঁজে পাইনা। গল্প উপন্যাস লেখকরাও তাঁদের লেখা শুরু করেন কবিতা দিয়ে। বৈজ্ঞানিক দার্শনিক রাজনীতিজ্ঞরাও ছাত্রজীবনে কবিতা লিখেছেন। গ্রামে গ্রামে আজো কবিয়ালরা তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে কবির লড়ায়ে মুখে মুখে অনর্গল কবিতা বানিয়ে বিস্ময়কর প্রত্যুপন্নমতিত্বের পরিচয় দেন। ঠাকুরমা দিদিমারা রূপকথা, উদ্ভটচন্দ্রিকা, হেঁয়ালি, নাতজামাই ঠকানো ছড়া কথায় কথায় আওড়ান কবিতার ছন্দে। পাঠশালা মক্তবের গুরুমশাই ও মৌলবীরাও ছাত্রদের ছন্দোবদ্ধ রচনার মাধ্যমে নানা বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। শুভঙ্করী, ব্যাকরণ, জ্যোতিষশাস্ত্র, আয়ুবিজ্ঞান এমন কি জমির মাপ জোখের পদ্ধতিও একদা পণ্ডিতরা পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে রচনা করেন। খ্রীস্টান মিশনারীরাও এই আদর্শানুসরণে কিছু কিছু পাঠ্যপুস্তক রচনা করেছিলেন। রেঃ এস বিশ্বাসের লেখা ওয়ার্ড বুকে বাল্যকালে পড়েছি :

"God ঈশ্বর Lord ঈশ্বর Ploughman চাষা।
Father বাপ Mother মা Cucumber শশা॥"

নিরস গদ্যের চেয়ে সুললিত পদ্য শুধু ছাত্ররা নয়, নিরক্ষর মজুররাও শুনে শুনে মুখস্থ রাখতে পারে। সেজন্যেই সেকালের শিক্ষাব্রতী পণ্ডিতরা পদ্যের সাহায্যে শিক্ষনীয় বিষয়গুলি রচনা করতেন। শিক্ষামূলক ও নীতিগর্ভ পদ্যগুলি ছাড়াও উচ্চাঙ্গ ভাব, কল্পনা, সৌন্দর্য, অলঙ্কার লাবণ্য, রীতি ও ছন্দোবৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ কবিতাগুলিও বাঙালীর প্রাণের সম্পদ।

কাব্যভূমি বাংলায় পাঠান রাজত্বের সময় নীতিগর্ভ ও শিক্ষামূলক লোক-কবিতার ক্রমরূপান্তর ঘটে বুদ্ধিভাস্বর কবিতায় জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়ে। যে রূপান্তরের রূপকার শ্রীচৈতন্যদেব ও মহাজন কবিরা। শ্রীচৈতন্যের বিদ্যাবৈদগ্ধ্যশীল শিষ্য শ্রীরূপগোস্বামী রচনা করেন ভক্তি-রসাশ্রিত ও জ্ঞানগর্ভ নন্দনতত্ত্বের মহাগ্রন্থ 'উজ্জ্বলনীলমণি'। যে তত্ত্বের ভিত্তিতে নরনারীর মুক্তপ্রেম, সর্বমানবের প্রতি সমদর্শিতা ও বিরহ-মিলন মান-অভিমানের গীতধর্মী কাব্যধারা সঞ্জীবিত হয়। গ্রামে গ্রামে বাউল-বৈষ্ণব-সুফী-দরবেশদের কণ্ঠে শোনা যায় মনের মানুষের, সৎ মানুষের, খেটে খাওয়া মানুষের প্রশস্তি গান। এ কালের সার্থক কবিমাত্রেই এই সুমহান ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক।

দুর্বোধ্যতা ও অস্পষ্টতা দোষদুষ্ট কবিতা কস্মিনকালেও রসিক মনকে তৃপ্ত করে না। কবি যদি রসঘন কবিতাকে প্রজ্ঞাশুদ্ধ সহজিয়া রূপ দিতে না পারেন তাহলে তাঁর কাব্যসাধনাই নিষ্ফল। কিন্তু সহজ হওয়া সহজ নয়। সুদীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি কবিমনকে সহজিয়াপন্থী করে। বাস্তবের ভিৎ শক্ত না হলে তার ওপর তত্ত্বের ও রসের সৌধ নির্মাণ করা যায় না। বস্তুসিদ্ধ কবিমনে অভীপ্সার বীজ প্রজ্ঞানুশীলিত প্রচেষ্টায় ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হয়। সেই অঙ্কুরোদ্গমের সোনালি ফসলই ছন্দিত ও ভাবগর্ভ কবিতা। সেই বীজ কখনো ব্যক্ত কখনো অব্যক্ত অবস্থার মধ্যে প্রেরণা লাভের প্রতীক্ষায় উন্মুখ থাকে। তারই মধ্যে নিহিত থাকে সৎ ও অসৎ, শ্রেয় ও প্রেয়, স্থূল ও সূক্ষ্ম। অভীপ্সাই কামনা। শাশ্বত ভারতকণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে :

"কামস্তদগ্রে সমবর্ততাধিমনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।
সতো বংধুমসতি নিরবিংদন হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা ॥"

[—ঋকদেব : ১০ম/১২৯সূ।৪র্থ মন্ত্র ]

"কামনা বিধৃত ব্যক্তমনে সেই বীজ বিদ্যমান ছিল। প্রথম ইচ্ছা কবে জেগে উঠলো? প্রথম কামনার অঙ্কুর? কবিরা

মনীষার দ্বারা কল্পনা করলেন সেখানে বিশ্ব থেকে অর্জিত সং ও অসৎ একই বন্ধনে জড়িয়ে আছে।" যে মুহূর্তে উপলব্ধি শুদ্ধচিত্তে সাবলীল উন্মেষের আবেগে কাঁপতে থাকে, তখনি তার বাঙ্ময় অভিব্যক্তি ঘটে সহজিয়া রসের বিন্যাসে। কিন্তু সহজ সহজ নয়। রবীন্দ্রনাথের উক্তি স্মরণীয়:

"সহজ সহজ কইতে নিতি কহ যে।
সহজ কথা যায় না লেখা সহজে॥"

তাঁর পাঁচ শো বছর আগে মরমী চণ্ডিদাস গভীর উপলব্ধির থেকে বলে গেছেন:

"সহজ সহজ সবাই কহয়ে সহজ বুঝেছে কে?
নিবিড় আঁধার যে হয়েছে আর সহজ বুঝেছে সে॥"

অনেক যন্ত্রণাময় বাধাবিঘ্ন, অনেক দুঃখের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে না পারলে সহজ হওয়া যায় না কালজয়ী কাব্য সৃষ্টি করাও সম্ভব নয়।

পাশ্চাত্য ক্ষয়িষ্ণু হাংরি-অ্যাংরি জেনারেশন ও বীট-পপ-হিপিদের নির্বিচার অনুসরণ অনভিজ্ঞ ও উদ্ধত তরুণমনে সৃষ্টি করে আত্মধ্বংসী ও সমাজধ্বংসী মায়া। অসঙ্গতি, স্ববিরোধ, অশিক্ষা আর আত্মম্ভরীত্বের মধ্যে এই আত্মকেন্দ্রিক উন্মত্ততার জন্ম। যার অনিবার্য পরিণতির কুফল লোকবিদ্বেষ, ঐতিহ্যবিদ্বেষ, প্রেমরিক্ত করুণারিক্ত অহংবুদ্ধি এবং মানুষকে অপমান ও জীবনকে অস্বীকার করা। এই অধোগামী কবিরা ভুলে যায় জীবনের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলে জীবন কবির মুখ ছ্যাখে না। শয়তানের দূত মেফিস্টোফেলিস আত্মকামী সত্যভ্রষ্ট ও নীতিভ্রষ্টদের নেপথ্য থেকে পরিচালনা করে অহঙ্কৃত নরকাগ্নির দিকে। ঘনীভূত সংশয়তিমিরে আত্মভুকদের অধোগামিতা প্রেমরূপা প্রজ্ঞাময়ী হেলেনার দিকে মনোযোগী হতে দেয় না। মেফিস্টোর দেওয়া চশমা নাকে এঁটে বিভ্রান্ত অতি আধুনিকরা দেখেন, —মানুষের শত শতাব্দীর ঘাম রক্ত চোখের জলে গড়া ঐতিহ্য ভাঙা কবরখানা, পূর্বসূরি কবি সাহিত্যিকরা উপেক্ষার পাত্র!

দর্শন বিজ্ঞান রাজনীতি ইতিহাস অর্থহীন মস্তিষ্কচালনার বিড়ম্বনা। যে সব অদূরদর্শী ও ভ্রান্তবুদ্ধি সমালোচক এই ধরনের সমাজ-বিরোধিতা ও অশুভ দৃষ্টিভঙ্গির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে নাস্তিক্য-ধর্মী নৈরাজ্যবাদের গহ্বরে কাব্যের কল্পিত প্রত্যয় সন্ধানী, তাঁরা নিজেরাই অন্ধ হয়ে আর একদল অন্ধকে যখন পথ দেখাবার চেষ্টা করেন তখন হাসি পায়। এঁদের কথা ভাবলেই একটি মজার ইংরাজী উক্তি মনে পড়ে যায়। উক্তিটি হলো: "A blind man in a dark room is trying to find out a black cat, which is not there." "অন্ধকার ঘরে একজন অন্ধ মানুষ একটি কালো বিড়ালকে খুঁজছে। যে বিড়ালের অস্তিত্ব নেই।" এই কালো বিড়ালটিই হলো উন্মার্গগামী কবিদের কাব্য প্রত্যয়।

কবিতা কালোত্তীর্ণ না হলে তা নিয়ে গর্ব করা চলে না। সে কবিতা কেউ মনেও রাখে না। প্রয়োজন মতো যথাস্থানে তার থেকে উদ্ধৃতিও কেউ দেয় না। যুগলক্ষণাক্রান্ত সময়সেবার কবিতা তো সাময়িক ব্যাপার। প্রথাসিদ্ধ আঙ্গিক ও বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি নতুন কালের কবিতার গতিরোধ করে। প্রথামুক্ত গতিময়তাই যুগোত্তীর্ণ কবিতার প্রাণশক্তি। চিরচঞ্চলা কাব্যলক্ষ্মী কোনো যুগের অচল আসনে এক মুহূর্ত স্থির হয়ে থাকেন না। স্নান করেন অনাদ্যন্ত কালের অবিরাম রূপান্তরের রসধারায়। রসবেত্তা কবিমাত্রেই রীতিসিদ্ধ স্বকীয়তায় স্বরাট। প্রত্যেক কবির আলাদা আলাদা স্বভাবধর্ম। বিষাদযোগ, জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ, বিভূতি যোগ ও ভক্তিযোগ—এই যোগপঞ্চকের কালাঙ্কিত রূপভেদে ও রীতিভেদের এক একটি সূক্ষ্ম প্রভাবে এক একজন কবির স্বভাবধর্ম নিয়ন্ত্রিত। তমোভিভূত জীবন যন্ত্রণার কবি বিষাদ যোগেরদ্বারা, বোধ ও বোধির সমন্বয়ে প্রজ্ঞাবান কবি জ্ঞানযোগের দ্বারা, রুদ্রতেজা অনতবীর্য সমাজবিপ্লবী কবি কর্মযোগের দ্বারা, কল্পনাপ্রবণ সৌন্দর্যপ্রেমিক কবি বিভূতি যোগের দ্বারা এবং মৈত্রী করুণা ও প্রেমের কবি

ভক্তিযোগর দ্বারা উদ্বুদ্ধ ও মন্ত্রসিদ্ধ হন। এই যোগপঞ্চকের মনস্তাত্ত্বিক উপাদানে অখিল কবি সমাজের মানসযন্ত্রটি নিয়ন্ত্রিত।

এই গূঢ়তত্ত্বটি বোঝেন না বলেই একালের একদেশদর্শী সমালোচকরা বিচারে ভুল করেন। 'ভিন্নারুচির্হিলোকাঃ'—গীতোক্ত বাণীটি মনে রাখতে পারেন না। রসবিচারের ভূমিকায় কবিদের মধ্যেও মতান্তরের অন্ত নেই। শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন: "If you send your poems to five different poets, you are likely to get five absolutely disperate and discordent estimates of them." এ মতান্তর সর্বযুগেই আছে। ব্রহ্মতত্ত্ব-নিরূপণের ক্ষেত্রে প্রাচীন ঋষিরা বলতেন. "একংসদ্বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি" —একই সংকে বিপ্ররা বহু রূপে বহুভাবে বর্ণনা করে থাকেন।

প্রাচীন অথবা আধুনিক কালে রচিত যে কোনো কালজয়ী কবিতার স্রষ্টাই ইতিহাসে অমর হয়ে থাকে না। কিন্তু কালজয়ী কবিতার সংখ্যা বড় কম। কালজয়ী কবিতায় সর্বযুগের বিস্ময় সৃষ্টিকারী তত্ত্ব ও লাবণ্যের আলো অবিনশ্বর দ্যুতি বিকিরণ করে। যে দ্যুতিকে শ্রীঅরবিন্দ বলতেন "ধ্বনির আলো"। ঋকবেদে দ্যুতিমান কবিতার স্রষ্টাই শুভস্পতি দ্রবৎপানি দ্রবৎসনি। সার্থক কবিতাই আলোকিত করে জগতো নিশেবনী রাত্রিকে। কালিদাস ছন্দায়িত করলেন তাঁর কাব্যে aesthetic beauty-কে sensuous emotion-কে। তিনি তনুমাশ্রিত রসের রসিক। আতিথ্যগ্রহণ করলেন কল্পনার কৈলাসাচলে, যেখানে ত্রিদশকামিনীরা, বিদ্যুদ্বন্ত ললিতবনিতারা থাকেন। কবি তাঁর উত্তরমেঘে বর্ণনা দিয়েছেন:

> "বিদ্যুৎবন্তং ললিত বনিতাঃ সেন্দ্রচাপং সচিত্রাঃ।
> সংগীতায় প্রহত স্মরজাঃ স্নিগ্ধ গম্ভীর ঘোষম্॥"

কালজয়ী কবিদের নৈসর্গিক সৌন্দর্য বর্ণনায় ও অপরূপ চিত্রকল্পে মন হয় পরমাবিষ্ট। বাল্মীকির রামায়ণে পাই:

"নিস্পন্দা স্তরবং সর্বে নিলীন মৃগপক্ষিনঃ।
নৈশেন তমসা ব্যাপ্তা দিশশ্চ রঘুনন্দন॥
শনৈ বিয়ুজ্যতে সন্ধ্যা নভোনেত্রৈরিবাবৃতম্।
নক্ষত্র তারা গহনং জ্যোতিভিরিব ভাস্যতে॥"

শুধু আরণ্যক তামসী রাত্রি নয়, উদিত কাকজ্যোৎস্নারও একটা বিদগ্ধরূপ আদিকবি সৃষ্টি করলেন।

সেকাল ও একাল যে কোনো চালের সার্থক কবিতাকে বলা যায় 'তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি'। রসবেত্তা পাঠক কবিতার এই ভাস্বতী রূপেরই অনুরাগী। ঋকবেদের একটি পরমাশ্চর্য হীরকদীপ্ত বর্ণনা শুনুন:

"কিং সিদ্বনং কউ স বৃক্ষ আস যতো দ্যাবা পৃথিবী নিষ্ঠ তক্ষুঃ।
সং তস্থানে অজরে ইতউতি অহানি পূর্বি রুষসো জরং ত॥"

"সে কেমন বন? সে কেমন বৃক্ষ? যা দিয়ে ঐ দ্যুলোক আর এই পৃথিবী সাজানো হলো? ঐ যে দুজনে অনাদি আলিঙ্গনে জড়িয়ে রয়েছে, কত প্রভাত কেটে গেল, কই বার্ধক্য তো ওদের জীবনে ঘনিয়ে এলো না?" পাঁচ হাজার বছর আগের কাব্যরস পাঁচ হাজার বছর পরেও অবিকৃত থাকে। কাল সর্বত্রগামী কিন্তু একমাত্র সার্থক সৃষ্টির মধ্যেই সে থমকে দাঁড়িয়ে থাকে। আইনস্টাইন বলেছিলেন— "we are living in a age of four-dimensional time-space continuum."……… ঋক্ ঋষিরা ও আমরা চলমান কালের চতুরাতনের মধ্যে রসের সমকালে বাস করছি। ঋক্ ঋষির প্রশ্ন বিশ শতকের স্বাধীনতার পরবর্তীকালের কবিচিত্তেও সমভাবে জ্ঞাতুম ইচ্ছা জাগায় বেদান্তের প্রথম সূত্রেরই মতো, অভিনব রূপায়তন, রসায়তন ও ভাবায়তনের ঐশ্বর্যে।

সর্বকালের কবিরাই আত্মমর্যাদাশীল অভিজাত। স্বাধীনতা মন্ত্রের উদগাতা। কবি কখনো কোনো সামাজিক অনুশাসন মানেন না, সমালোচকদের নিন্দায় প্রশংসায়, স্বীকারে, অস্বীকারে বিচলিত হন না,

আত্মবিক্রয় করেন না কোনো অত্যাচারী ও উদ্ধত শাসকের কাছে আনুগত্যে। রবীন্দ্রনাথ জালিয়ানাওয়ালাবাগের পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ইংরাজের দেওয়া সম্মান বিসর্জন দেন। তারও কয়েক শতাব্দী আগে পারস্য বিজয়ের পর তৈমুর লঙ মহাকবি হাফিজকে বন্দী করে এনে যখন হুকুম করলেন—"আমার প্রশস্তি-কাব্য রচনা করো, তোমাকে আমার প্রিয় নগরী সমরখন্দ ও বোখারার শ্রেষ্ঠ সম্মান দেবো।" সিংহবিক্রম কবি অগ্নিগর্ভ ভাষায় তৈমুরকে বিদ্রূপ করে বলেন :

অঁ গর্ আঁ তুর / কেঁ শিরাজী
বেদস্ত্ আরদ্ / দিলে মারা।
বঁখালে হিন্ / হুয়শ্ বখ্শম্
সঁমর্ খন্দ ও / বোঁখাঁরারা॥

ওরে তুর্কী শিরাজী, তোর সমরখণ্ড বোখারার শ্রেষ্ঠ সম্মান আমি আমার প্রিয়ার গালের ছোট্ট একটি তিলের বিনিময়ে বিলিয়ে দিতে পারি!

# স্বাধীনতার পরে মনিপুরী কবিতা

ডঃ ইরমবাবু সিং

সমৃদ্ধ ও গৌরবোজ্জ্বল অতীতের দাবিদার মনিপুরী সাহিত্য ঐতিহাসিক কারণে প্রায় দু'শ বছর ধরে একরকম দুর্বোধ্যতা ও নীরবতার মধ্যে আত্মগোপন করে ছিল। হিন্দুধর্ম ও বিশেষ করে শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত নব্য বৈষ্ণবীয় শিক্ষারীতির প্রভাব এত প্রকট ছিল যে মনিপুরের পণ্ডিতবর্গ ও লেখকেরা মূল মনিপুরী বর্ণমালা ও ভাষা ব্যবহার থেকেও নিজেদের সরিয়ে রেখেছিলেন। এই নব্য শিক্ষাধারা রাজানুকুল্যে ও রাজ প্রভাবে মনিপুরের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের গভীরে প্রবেশ করেছিল এবং তাদের মানসিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধকে পর্যন্ত রূপান্তরিত করে ফেলেছিল। সাহিত্য সৃষ্টি ও সৃজনমূলক কর্মেই যে শুধু মনিপুরীর ব্যবহার একরকম অচল ছিল তাই নয়, সামাজিক ও পারিবারিক প্রয়োজনেও বহুলভাবে এ ধর্মের ভাষা—বাংলা, মনিপুরীর স্থান দখল করে নিয়েছিল। এর ফলে দীর্ঘকাল মনিপুরের জনগণ উল্লিখিত নব্য সংস্কৃতিতে উদ্বুদ্ধ ছিল।

১৮৯১ সালে মনিপুরী সাহিত্য সংস্কৃতির উষাকাল। এই বছর যখন ব্রিটিশ শক্তি মনিপুর অধিকার করে নিল তখন থেকেই নব্য সংস্কৃতি ও সাহিত্যের নিরঙ্কুশ ক্ষমতার কার্যতঃ ভাঙন শুরু হয় এবং আধুনিক মনিপুরী সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা ও গুরুত্ব সূচীত হয়। ব্রিটিশ অধিকারের পরে বহু ভারতীয় ভাষার ক্ষেত্রে যা ঘটেছে মনিপুরী ভাষার ক্ষেত্রেও তেমনি ঘটেছে। ভৌগলিক অবস্থানের জন্য বহির্বিশ্বের সঙ্গে মনিপুরের সম্পর্ক খুবই সীমাবদ্ধ। মনিপুরবাসী একরকম গণ্ডীবদ্ধ জীবন যাপনেই অভ্যস্ত। এ অবস্থার মধ্যে, ব্রিটিশ অধিকারের পরে মনিপুরের জনগণ নতুন সংস্কৃতির সঙ্গে

পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছে। এ সময় থেকে পাশ্চাত্য প্রভাব—সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রভাব ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করেছে এবং গভীর উৎকণ্ঠায় জনগণ তা লক্ষ্য করেছে। এই পরিবেশের মধ্যে পাশ্চাত্য প্রভাবে শেষ পর্যন্ত মনিপুরের প্রাচীন ঐতিহ্য ভিত্তিক এক নতুনতর যুগের সূচনা করেছে। ঘটেছে নতুন মনিপুরের জন্ম। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের ফলে মনিপুরবাসীদের ক্ষেত্রে নতুন গুরুত্ব অরোপিত হয়েছে। পাশ্চাত্য প্রভাবের ফলে মনিপুরবাসী যেন ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছেন। নিজেদের ভাষা সম্পর্কে দীর্ঘদিনের অজ্ঞতা ও ঔদাসিন্য থেকে তাঁরা জেগে উঠেছেন এ নিজেদের হারানো গৌরব ও ঐতিহ্যকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার ব্রতে উদ্দীপিত হয়ে উঠেছেন। এ সময় তাঁরা এই ব্রত সাধনের জন্য সম্ভাব্য সব কিছু করার সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন। সাহিত্য ও সংস্কৃতির এই উষাকালে মনিপুরের কবিরা মর্মে মর্মে প্রত্যক্ষ করলেন তাঁদের হৃত গৌরব এবং দেখতে পেলেন হৃত সাম্রাজ্যের মত হৃত ঐতিহ্যকে। আর যখন তাঁরা সামগ্রিক ভাবে তাঁদের এই হৃত সম্পদ সম্পর্কে সজাগ হলেন তখনই তাঁরা তাদের কবিত্ব ও অনুভূতি প্রকাশ করতে শুরু করলেন রোমান্টিক ভাবে হারানোর বেদনায় এবং শোকগাঁথার মাধ্যমে। এ সময়ের প্রায় সব কবি—ডঃ কমল, চাওবা, আঙ্গলঘাল, নবদ্বীপচন্দ্র, দোরেন্দ্র, মিনাকেতন প্রমুখের কবিতায় এ সুরই শোনা গেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ডঃ কমলের "মেইটেই চানু" কবিতা থেকে একটি অংশ তুলে দিচ্ছি, যার মধ্যে এ সময়ের তীব্র অনুভূতি বিশেষ ভাবে ধরা পড়েছে—

> "মাতৃমন্দিরের মধুর সুবাস
> বয়ে নিক সুশীতল বায়ু
> মনিপুরের প্রতিটি ঘরে
> প্রত্যেকটি মানুষের কাছে ;
> সঞ্জীবিত করুক পুরুষত্বহীন
> মনিপুরীদের।"

কবি চাওবা-এর 'মেইটি কবি'র একটি অংশে উচ্চারিত হয়েছে এমনিতর আবেগ—

"শুধু অজ্ঞানজনই বলে
এ হলো দুর্বল ভাষা
মাটির কবি আমি
সে ভাষাতেই বলে যাব কথা।"

নব প্রভাতের নব চেতনাসম্পন্ন কবিদের কবিতায় এই আশার সুরটি ধ্বনিত হয়েছে বিভিন্ন ভাবে ও আঙ্গিকে। মূল সুরটি তীব্র দেশাত্মবোধ—মনিপুরের পুনর্জাগরণ। এ সময়ের কবিদের প্রকাশ ভঙ্গিতে বৈচিত্র্য থাকলেও এবং কারো কারো ক্ষেত্রে অতিশয়োক্তি থাকলেও মূল সুরে ছিল দেশাত্মবোধের তীব্র আকুতি।

স্বাধীনতার পরে মনিপুরের সাহিত্যে যে দেশাত্মবোধ ও প্রাণাবেগ দেখা গেছে তা কখনও চাপিয়ে দেওয়া কিছু নয়, বরং নতুন ধরনের এই কবিতার সৃষ্টি যুক্তিসঙ্গত ও স্বাভাবিক ঘটনা, প্রবীণ গোষ্ঠীর আশা-আকাঙ্খার আলোকবর্তিকা নবীনদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই স্বাধীনতা সব কবিকে উচ্চাশায় টানতে পারেনি কারণ তাঁরা দেখেছেন স্বাধীনতার পরেও পারিপার্শিক নিদারুণ অবস্থা। এই সব কবি তাঁদের উদার দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য প্রাচীনগোষ্ঠী কবিদের থেকে স্বতন্ত্র। এদের বেশীর ভাগ পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এবং সে সূত্রে এরা যুক্তিবাদী ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন। সমাজের পুরোনো গঠনরীতির ফলে জনসাধারণ এখন পর্যন্ত নানা রকমের রক্ষণশীল ও প্রাচীন ব্যবস্থা আঁকড়ে রয়েছেন এবং এদের সঙ্গে এই সব কবি যাঁরা স্বাধীন যুক্তি-নির্ভর ও বৈজ্ঞানিক চিন্তায় উদ্বুদ্ধ তাঁরা মানিয়ে চলতে পারছেন না। বিচ্ছিন্নতাকামীর প্রথম কণ্ঠস্বর এবং সংবেদনশীল কবির প্রতিবাদ ধরা পড়েছে নীলকান্ত সিং-এর 'মনিপুর' কবিতায়। ডঃ কমলের পরে কবি নীলকান্ত হলেন উদারমতালম্বী, মানবতাবাদী কিন্তু ভিন্ন ধর্মের

শক্তিশালী কাব্য ঐতিহ্যের ধারক। শক্তিশালী লেখনীতে তাঁর কবিতায় স্বাধীনতার উত্তর কালের রূপরেখা ফুটে উঠেছে :

"পথ কোথায়, কোথায় পথ—
কথা আর কাজে দুস্তর ফারাক ;
এ পথ কোন লক্ষ্যে পৌঁছায় না,
আদর্শের চেয়ে মানুষ কি তবে এতই বড় ?"

কবি নীলকান্তের এই গভীর জিজ্ঞাসা ও সন্দেহের মানসিকতা থেকে স্বভাবতই মূঢ়-ম্লান-মুক মুখের ভাষা তুলে ধরেছেন তাঁর কবিতায়। লক্ষ লক্ষ অজ্ঞাতকুলশীল মানুষদের অন্ধকার ও অর্থহীন সংগ্রামের বেদনাক্ত ভাষ্য উচ্চারণ করেছেন কবি তাঁর "মনিপুর, মনিপুর, আমার মনিপুর" কবিতায়। যেমন—

"জয় ভারত, বন্ধুত্ব, করুণা, শান্তি
ঘন ঘন উচ্চারণে মনে পড়ে
পুণ্যাত্মা ভগবান বুদ্ধ, গান্ধীজি, বিনোবার কথা।
তবু তাঁদের হৃদয়কে মনে হয় পাথরের মত কঠিন
প্রেমশূন্য, ধূর্ত অতিশয়।
বন্যতা বিরাজিছে চারদিকে
তোমার সন্তানেরা শক্তিহীন অসহায় ;
মাথার উপর হাত তুলেও শক্তিহীন,
এত আলো তবু তারা অন্ধ হয়ে খুঁজে মরে !
মনিপুর, মনিপুর, আমার মনিপুর
মাগো, আমার মা, আমি তোমারই গান গাই।

কবি নীলকান্তের কবিতায় সব সময়েই মননশীলতার পরিচয় বহন করছে এবং তাঁর কবিতার মধ্যে আধুনিক মনিপুরী কবিতার ভাবালুতা বা রোমাণ্টিক আমেজও বর্তমান। তিনি তাঁর কবিতায় প্রায়শই সংস্কৃতির বিভিন্ন সূত্রে ও নরনশীল ঐতিহ্যের সমন্বয় সাধন করেছেন, যেমনটি দেখি ইংরেজ কবি এলিয়টের মধ্যে—যাকে তিনি কোন সময়ে

সংস্কৃতির অপ স্তাবকত বলেছিলেন। নীলকান্তের সমসাময়িক আর এক কবি সমরেন্দ্র সিং ও বিভিন্ন বিষয়ে কাব্যরচনায় মৌলিক প্রতিভার পরিচয় রেখেছেন। মনিপুরী কবিতারক্ষেত্রে তিনি তাঁর ছোট ছোট কবিতায় মানুষের ত্রুটিবিচ্যুতি ও ভাগ্যের পরিহাসকে পরিহাসচ্ছলে অনুপমভাবে তুলে ধরেছেন। মানুষের ক্ষুদ্রতা ও মহত্ব দুই বলয়েই তিনি গভীর সহৃদয়তার সঙ্গে স্পর্শ করেছেন। ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপাত্মক ভাবে কবি লিখছেন—

"মোহন বলে, বিদেশী সাবেবেরা
ভাজা খেয়েছে। আর ভাজার স্বাদ পেয়ে
ভারত থেকে যেতে চায় না।
'ইসিং লাকপা' মনে মনে হাসে
এবং ইংরেজকে বলে ঘৃণ্য বোকা,
দুপুরের শো-তে সিনেমায় যায়
'সমুদ্দুর কি সুন্দরী' দেখে
তারপর মোজ করে খায় টাটকা পাকৌড়ি,
অনর্গল কথায় প্রকাশ করে
সরকারী গুপ্ত তথ্য এবং ভাষণ রাখে বেদান্তভাষ্যে,
হোটেলে খামাপিনার সময়
নেহরুর বৈদেশিক নীতিকে চ্যালেঞ্জ জানায়।

('ওইনাম মোহন')

কবি সররেন্দ্র সিং-এর কাব্যবৈশিষ্ট হলো তঁরে হৃদয়গ্রাহী সহজ প্রকাশভঙ্গী। তিনি কিছু উদ্ভট ও আজগুবি বিষয় নিয়েও এমন সাবলীল ভাবে লিখেছেন, শব্দচয়ন ও ভাবের স্বচ্ছ গতিতে এমন প্রাণাবেগ সৃষ্টি করেছেন যাতে করে তঁরে কবিতা স্বয়ংসম্পূর্ণ ও নিটোল সৃষ্টি হয়ে উঠেছে। একদিক দিয়ে দেখতে গেলে তাঁকে ইংরেজ কবি আর্ণল্ড-এর কাব্যদর্শ অনুসারী মনে হয়। কবিতা তাঁর কাছে জীবনের সমালোচনা।

ষাটের দশকের মনিপুরী কবিতা সম্পূর্ণরূপে বৈপ্লবিক ও অ-ধ্রুপদি। এ সময়ের কবিদের কবিতায় আমরা যে সুর শুনতে পাই তার উৎস হলো হতাশা, সমাজের গতানুগতিক অর্থহীন রীতিনীতি এবং সমাজের অনঢ় মূল্যবোধ। একালের কবিরা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এবং এরা সমৃদ্ধ সমাজের সুখের সঙ্গেও পরিচিত। তাঁরা এ যান্ত্রিক সমাজের ভালমন্দ সবই জেনেছেন এবং স্বাদ পেয়েছেন এর প্রসারতার। তাঁরা পাঠ করেছেন দেশবিদেশের সাহিত্য এবং স্বভাবতই তাঁরা মুক্ত মানসিক পরিমণ্ডলে নিঃশ্বাস নিতে পারছেন। কিন্তু তাঁরা স্পষ্টত জানেন যে, যে সমাজের মাটিতে তাঁরা দাঁড়িয়ে আছেন সে সমাজ যুগের ক্রান্তিকে গ্রহণ করে নি। গতানুগতিক সামাজিক মূল্যবোধ এবং বাঁচার জন্য যেখানে তাঁদের লড়তে হচ্ছে—দুই-এর মধ্যে তাঁরা কোন সম্পর্ক খুঁজে পান না। কোথাও তাঁরা প্রতিশ্রুত ও পরিকল্পিত স্বর্গরাজ্যের সন্ধান পান নি। বরং তাঁরা দেখেছেন, চারদিকে নরক গুলজার এবং যার মধ্যে পুরানো জীর্ণ সামাজিক মূল্যবোধ সব ভগ্ন-ছায়ার মত সমাধিস্থ হয়। এই জ্বলন্ত জিজ্ঞাসা ও উদ্বিগ্নতার যুগে মনিপুরী সাহিত্যের তিন প্রধান কবি শ্রীবীরেন, আর-কে-মধুবীর ও ইবপিশাক সিং তাঁদের কাব্যানুভূতিকে এক বৈপ্লবিক মাধ্যমে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন। এই আঁধারে তাঁদের পীড়িত অহং বর্তমানের গোলক ধাঁধাঁর রূপাভাস ধরবার চেষ্টা করেছে। তাঁদের কাছে চলমান এই জীবন অর্থহীন বলে মনে হয়, মানুষের অস্তিত্বকেই মনে হয় সম্পূর্ণ অসঙ্গতিপূর্ণ। 'বর্তমান ইতিহাস হলো প্রকটভাবে দৃশ্যমান বন্ধ্যা জীবনযাত্রা ও নৈরাজ্য'; এর মধ্যে এই কবিরা আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করেছেন, যদিও তাঁরা জানেন, 'এ যুগ হলো বন্ধ্যা-ভোরের ঘোর যার মধ্যে ভয়ে ভীত হয়ে যথার্থ উদ্দেশ্য এড়িয়ে চলাই যুগধর্ম'। অবক্ষয়ী এ সময়ের একটি কবিতা —

বিষ্ঠায় টইটম্বুর একটি রেকাবির কিনারে
একটি মাছি বসে ভাবছে,

'গোবিন্দ'তো কাঠের তৈরি,
তাকেতো দেবতা তৈরি করা হয়েছে
নানা রকম রঙ চঙ চড়িয়ে।" ('মাছি' : ইবপিশাক)

এই রকম আর একটি কবিতা মধুবীরের 'অন্ধকারের দিকে তাকাও'—

"অন্ধকারের দিকে তাকাও
নিশ্চিত তুমি দেখতে পাবে
খ্রীস্ট প্রাণভয়ে ছুটছে তার প্রিয় প্রাণের ভয়ে,
ছুটছে যেন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পরাজিত সৈন্যের মত,
খ্রীস্ট ছুটছে ক্রুশে বিদ্ধ হওয়া থেকে নিজেকে বাঁচাতে।
আর কৃষ্ণ? মরে কাঠ হয়ে পড়ে আছে মাটিতে
রেলপ্ল্যাটফর্মে সহস্র বিচিত্র মাছিতে আকীর্ণ হয়ে
যেমন পড়ে থাকে অসহায় ভিখারীর মৃতদেহ।"

মনিপুরের সমাজে দীর্ঘদিনের রক্ষণশীল ব্যবস্থা এবং অসার সামাজিক মূল্যবোধ সম্পর্কে এই সব কবিদের কবিতায় অশ্রদ্ধা ও হতাশার কথাই ব্যক্ত হয়েছে। ইতিবাচক অনুভূতির গভীরতর বিচ্যুতি কবিতার প্রাণধর্ম, এই সব কবি তাঁদের হতাশার আবেগে অনেক কিছু নস্যাৎ করার সঙ্গে সঙ্গে এ কাব্যাদর্শও নস্যাৎ করে দিয়েছেন। বিদেশী কবি পল ভেঁলেরির মত এঁরাও সমাজ সচেতন হয়ে প্রকাশ করেছেন ভয়ের কথা। কারণ, তাঁদের কাছে 'আমার কথা বলার চেয়ে এই অন্ধকার ও ভয়ের ভাবনাই এখন সত্য'। তাঁদের চোখের সামনে ঘটেছে দ্রুত ভাঙন এবং নিত্য অস্থিরতা। বন্ধ্যা ও ভবিষ্যৎ-প্রতিশ্রুতি বিহীন শিক্ষাদীক্ষা, সামাজিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মূল্যবোধের নিত্য অবক্ষয় যে সমাজের অঙ্গের ভূষণ, তার বিরুদ্ধে এই কবিদের কণ্ঠ সোচ্চার। ক্ষুব্ধ চিত্তে তাঁরা তো সব কিছুই ভেঙে ফেলতে চান কিন্তু এত উত্থানপতনের মধ্যে সমাজ সেই চিরাচরিত রক্ষণশীল পথ

থেকে তো সরে দাঁড়ায় নি এবং এর মধ্যে এইসব বিদ্রোহী কবিরা অস্তিবাচক কিছু সৃষ্টি করতে পেরেছেন কিনা এ এক বিরাট জিজ্ঞাসা। এদের এই ইচ্ছাকৃত অভব্যতা ও অশালীনতার পটভূমি হলো তীব্র হতাশার মানসিকতা এবং এর মাধ্যম হিসাবে 'ডাডাজিম'-এর কোন মতবাদে তাঁদের আকর্ষণ ঘটেছে কিনা এ এক প্রশ্ন।

আধুনিক মনিপুরী কবিতায় এই ধরনের ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বরের মধ্যেও কিছু নিবিষ্ট কবি আছেন যাঁরা রোমান্টিক ও গীতিময় ধারায় কাব্যসৃষ্টি করে চলেছেন। এঁরা হলেন নীলবীর শাস্ত্রী, আর. কে. সুরেন্দ্রজিৎ ও খান ইবহাল সিং। নীলবীর শাস্ত্রীর কবিতার মধ্যে গীতিকাব্য ধারায় দেশাত্মবোধক ভাবের আধিক্য ঘটেছে এবং আর. কে. সুরেন্দ্রজিৎ সিং-এর কবিতা মানবতার জয়গানের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। খান ইবহালের কবিতায় পাই ব্যর্থ প্রেমিকের কথা। প্রেমের কবিতায় ইবহাল পের্তার্কের প্রকাশ ভঙ্গিমা অনুসরণে প্রকাশ করেছেন তার প্রেমানুভূতি।

স্বাধীনতার পরবর্তী দ্বি-দশকে এই হলো মনিপুরী কবিতার মোটামুটি দিকচিহ্ন ও রূপরেখা।

বঙ্গানুবাদঃ অপূর্বকুমার সাহা

# পূর্বভারতে স্বাধীনতাপরবর্তী কবিতা প্রসঙ্গে

## সুভাষ মুখোপাধ্যায়

পূর্বভারতে ভাষা অনেক। সব ভাষা সমান স্তরে নেই। এক ভাষাভাষীর জনসংখ্যার মধ্যেও যথেষ্ট বেশকম আছে। কিছু আছে যার লিখিত সাহিত্য প্রায় হাজার বছরের পুরনো। আবার এমনও আছে যার এখনও লেখার লিপি নেই কিংবা খুব সম্প্রতি লিপিবদ্ধ হতে শুরু করেছে। জাতীয় ভাষা হিসেবে সংবিধানে এ পর্যন্ত স্বীকৃতি পেয়েছে এ অঞ্চলের মাত্র চারটি ভাষা। সাহিত্য আকাদেমি পরে আরও দুটি ভাষাকে পুরস্কারযোগ্য সাহিত্যের ভাষা বলে গণ্য করেছেন। এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্যে আরও দুটি ভাষা দাবি জানিয়েছে। সাঁওতালী ভাষা এক রাজ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তেমনি হিন্দীভাষাও বহু রাজ্যে বিস্তৃত। আর উর্দু তো উত্তরদক্ষিণ পূর্বপশ্চিম ভারতে এক কথায় সারা দেশেই ছড়িয়ে রয়েছে। অঞ্চলভেদে এইসব ভাষার আলাদা আলাদা চেহারা। হিন্দীর ক্ষেত্রে এই তফাতগুলো এতই সুনির্দিষ্ট এবং অঞ্চলবিশেষে আকারে-প্রকারে এর ভিন্নতা এত ঐতিহ্যসমৃদ্ধ যে, রাজস্থানী বা মৈথিলীর মত আরও কয়েকটি অংশ হিন্দী থেকে নিজেদের স্থানীয় ভিত্তিতে আলাদা করে নেবে কিনা জোর করে বলা শক্ত।

ভাষার কথা গোড়াতেই তোলার একটা কারণ আছে। ভাষার অগ্রগতির সঙ্গে কবিতার অগ্রগতি অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত।

স্বাধীনতার পর আমাদের দেশ একেক অঞ্চলের প্রধান প্রধান ভাষার ভিত্তিতে ছোটবড় রাজ্যে ভাগ হয়ে গেছে। ভাষাভিত্তিক এইসব রাজ্যে সংখ্যালঘুদেরও নিজের নিজের ভাষা আছে।

স্বাধীনতার আগে কী অবস্থা ছিল?

শাসক ছিল ইংরেজ। কাজেই রাজভাষা হিসেবে ইংরেজির ছিল সর্বময় কর্তৃত্ব। শুধু কাজের ভাষা হিসেবে নয়, বুকের আর মুখের ভাষা হিসেবেও একটা ছোট অংশের মধ্যে ইংরেজির খুব আদর ছিল। আর ঠিক সেই পরিমাণেই দেশী ভাষাগুলো সম্বন্ধে ছিল তুচ্ছতাচ্ছিল্য। আজও সেই অবস্থা অনেকাংশে যে বজায় আছে তার কারণ, পোষাকী গণতন্ত্রকে সামনে রেখে সেই ইংরেজীদুরস্ত ছোট অংশটি আজও দেশের সমস্ত কলকাঠি নেড়ে চলেছে।

এদেশে ইংরেজি যত দাপটেই রাজত্ব করুক, এদেশের সাহিত্যের ভাষা হিসেবে ইংরেজি কখনই শিকড় গাড়তে পারে নি। কারো কারো ইংরেজি লেখা নিয়ে আমরা এদেশে যত মাতামাতিই করি না কেন, ইংরেজি সাহিত্য কখনই তাদের মনে রাখবে না।

সবচেয়ে লজ্জার কথা, নিজেদের ইংরেজিনির্ভরতাকে ঢাকবার জন্যে আমরা শুধু যে আইন করে তাকে জাতীয় ভাষার তকমা দিয়েছি তাই নয়, তাকে ভারতের অন্যতম সাহিত্যের ভাষা বলে বরণ করে নিয়েছি।

ভাষা হিসেবে আমি ইংরেজির ভক্ত। ইংরেজির সাহিত্যের কাছে আমিও ঋণী। কিন্তু এদেশে বসে শুধু ইংরেজি কেন, অন্য কোনো বিদেশী ভাষায় কবিতা লেখাকে আমি পণ্ডশ্রম বলে মনে করি।

এই প্রসঙ্গে মাইকেল মধুসূদনের কথা মনে না পড়ে পারে না। বিশ্বজোড়া খ্যাতির সিঁড়ি হিসেবে বিদেশী ভাষায় কবিতা লেখার কথা আজও যাঁরা ভাবছেন, মধুসূদনের মতই তাঁদেরও একদিন আক্ষেপ করতে হবে, এ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই।

কবিতার কথায় যাওয়ার আগে নিজের একটি অভিজ্ঞতার কথা আমি বলে নিতে চাই।

সোভিয়েত ইউনিয়ন আমাদেরই মতন বহুজাতি এবং বহুভাষীর দেশ। সেখানে মধ্য এশিয়ার এমন কবির সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে, যিনি নিজের ভাষায় এবং সেইসঙ্গে রুশভাষাতেও উঁচুদরের

কবিতা লেখেন। এটা সম্ভব হয়েছে এই কারণে যে, রুষভাষা,সেখানে পরদেশের ভাষা নয়। স্বদেশবাসী রুশভাষা জনসংঘের সঙ্গে নিরন্তর আত্মিক আর সাক্ষাৎ যোগ থাকায় মধ্যএশিয়ার কবির পক্ষে স্বাভাবিকভাবেই রুশভাষায় নিজেকে প্রকাশ করা সম্ভব হয়।

আমাদের দেশেও এ জিনিস যেমন অতীতে ঘটেছে, তেমনি স্বাধীনতার পর আরও বেশি করে ঘটছে। আমরা জানি, শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায় এক সময় ওড়িয়া ভাষায় এমন কবিতা লিখেছেন, ওড়িয়া সাহিত্যের ইতিহাসে যা বরাবর স্থান পাবে। আমি এমন অহিন্দীভাষী অনেক লেখককে জানি যাঁরা হিন্দীভাষায় স্মরণীয় সাহিত্যের স্রষ্টা। শুধু এদেশী কেন, এদেশকে প্রায় নিজের করে নিয়ে অনেক বিদেশী পাদ্রী এদেশের ভাষায় যা লিখেছেন তা ভারতীয় সাহিত্যের সম্পদ হয়ে গেছে।

আসল কথা হল, যে ভাষায় লিখছি সেই ভাষাভাষী জনজীবনের সঙ্গে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া। জীবনের ধারা আর সাহিত্যের ধারা—এ ছুটোকে একই খাতে বহানো।

সেইজন্যেই পূর্বভারতে স্বাধীনতার পরবর্তী কবিতা সম্পর্কিত আলোচনায় এদেশের সাধারণ মানুষ আর তার মুখের ভাষার প্রশ্নটা খুবই জরুরি।

সত্যি বলতে গেলে, পূর্বভারতের সব ভাষা জানা দূরে থাকুক, সব ভাষার সঙ্গে আমার পরিচয়ও নেই। কাজেই কোন্ ভাষায় কবিতার কী অবস্থা সে সম্বন্ধে আমি আদৌ বলবার চেষ্টা করব না।

আমি বলব প্রধানত বাংলা কবিতার আজকের গতি প্রকৃতি সম্বন্ধে আমার মোটামুটি কী ধারণা। পূর্বভারতের কিছু কিছু ভাষার কবিদের সঙ্গে মাঝে মধ্যে আলোচনার সূত্রে আমার যা মনে হয়েছে তাও আমি অকপটে বলব। সেইসঙ্গে যেসব ভাষা আজও আমাদের তেমন ভাবে চোখে পড়ে না, সেইসব ভাষায় কবিতা লেখার সমস্যার কথাও আমি বলব। এসব প্রসঙ্গ আলাদা আলাদাভাবে

আলোচনা না করে পাল্টাভাবে আমার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমি অল্প কথায় বলব।

প্রথমেই আমি তুলব পাঠকের প্রশ্ন, পূর্বভারতে যত লোক কবিতা পড়ে তার চেয়ে ঢের বেশি লোক কবিতা শোনে। তার একটা কারণ অক্ষরজ্ঞানের অভাব। অন্য কারণ, পড়তে জানলেও যথাযথভাবে কবিতা পাঠ করার অক্ষমতা। শুধু নিরক্ষরতার জন্যেই আজও পূর্বভারতের অধিকাংশ লোক পাঠক সমাজের বাইরে। যে সামান্য অংশ লিখতে পড়তে পারে, তারও একটা বড় অংশের কবিতা পাঠের অভ্যাস নেই। এক তো আছে শিক্ষার দোষ, তাছাড়া কবিদের তরফেও পাঠকদের সম্পর্কে হুঁশ কম। হাতে হাত বাঁধতে গেলে দুদিক থেকেই হাত বাড়ানো দরকার।

কবিতার পাঠক তৈরির জন্যে তো বটেই, দেশ গড়বার জন্যেও নিরক্ষরতা দূর করা খুবই জরুরি।

পাঠক প্রসঙ্গে এখানে আরও একটি প্রশ্ন এসে যাবে। নতুন পাঠকেরা এমন এমন স্তর থেকে আসবে, যার সঙ্গে কবির পরিচয় এবং অন্তরের যোগ থাকতে হবে। এইসব স্তর থেকে শুধু যে নতুন পাঠক আসবে তাই নয়, নতুন কবিও আসবে।

এমন একটা অবস্থার কথা ভেবে অনেকে শঙ্কিত হতে পারেন। কবিতার মান কি তাহলে নেমে যাবে না ?

অর্থাৎ, যারা ইংরেজিদুরস্ত—পাঠকসমাজে তাদের সংখ্যা রীতিমত ভাবে কমে যাবে। কিন্তু ইংরেজি জ্ঞানকে যাঁরা শিক্ষার একমাত্র মাপ-কাঠি বলে আজও মনে করেন, তাঁদের উচিত সেইসব অগ্রসর দেশগুলোর কথা মনে করা যেখানে ইংরেজি না থাকা সত্ত্বেও জ্ঞানের বিস্তার এবং গভীরতার অভাব নেই। ইংরেজির হাত ছেড়ে দিলেই আমরা মূর্খতায় তলিয়ে যাব, এ ভয় অমূলক। শুধু বাস্তব জীবনের দিক থেকেই নয়, সূক্ষ্ম চিন্তার দিক থেকেও এ ভয়ের কোনো কারণ নেই।

স্বাধীনতার পর এদেশে বাস্তব জীবনে কী পরিবর্তন এসেছে একটু বুঝে নেওয়া দরকার। নিজেদের ভাগ্য আমরা এখন নিজেরাই হাতে তুলে নিয়েছি। আমরা চেষ্টা করছি নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে সুখে শান্তিতে বাঁচতে। তার জন্যে সমাজকে এবং উৎপাদনের সম্পর্ককে নিজেদের মত করে আমরা ঢেলে সাজাতে চাইছি। তার ফলে, অনড় অটল গ্রামবদ্ধ সমাজ আর থাকছে না। যন্ত্র দিয়ে প্রকৃতিকে আমরা মুঠোয় আনছি। আর সেই প্রক্রিয়ায় নিজেদেরও বদলাচ্ছি। সেইসঙ্গে পুরনো অভ্যাস আর পিছিয়ে থাকা ধ্যানধারণার সঙ্গে পদে পদে বিরোধ বাধছে। গতিকে রুদ্ধ করতে চাইছে জড়তা। এই বাস্তববোধ পুঁথিনির্ভর নয়, এটা এখন জীবনগোচর। চোখ খুলে তাকালেই ধরা পড়বে।

জীবনের এই বদল চিন্তার জগতেও ছাপ ফেলছে। জানা পরিচয়ের গণ্ডি ক্রমেই ছোট থেকে বড় হচ্ছে। হিসেবের মাপ বদলাছে। পুরনো মূল্যবোধের জায়গা নিচ্ছে নতুন মূল্যবোধ। বিজ্ঞান আর কৃৎকৌশলের জিনিসগুলো মানুষের দৈনন্দিন জীবনচর্যার অঙ্গ হয়ে গিয়ে আবেগের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে।

এক কথায়, আমাদের কবিতায় যে আধুনিকতা এককালে বাইরে থেকে ধার করা ছিল, সেই আধুনিকতা এখন আমাদের জীবনে এসে হাজির হয়েছে।

কাজেই ক্রমবর্ধমান পাঠক সমাজ আমাদের কবিতার মুখ পেছনে ঘুরিয়ে দেবে, এ ভয় অবাস্তব।

শিল্পের অন্য একটি শাখার দৃষ্টান্ত এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক হবে। চলচ্চিত্র যে খুবই আধুনিক শিল্প এবং সেইসঙ্গে জনপ্রিয়, একথা কেউই অস্বীকার করবে না। অথচ চলচ্চিত্রে শুধু যে আজকের জীবন ধরা হচ্ছে তাই নয়। তার নতুন ভাষা সামান্য একটু অভ্যাসেই মানুষের হৃদয়ঙ্গম হচ্ছে।

কাগজের বহুল প্রচার, রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদির সাহায্যে

আজকের নতুন কবিতাও ব্যাপক জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেবার সম্ভাবনা ঢের বেড়ে গেছে।

মনে রাখতে হবে, ভাষার ক্ষেত্রে ছোট জাত বড় জাত নেই। ভাষার গুণ ভাষাকে কাজে লাগানোর ওপর নির্ভর করে।

পূর্বভারতের কবিরা যিনি যে ভাষাতেই লিখুন, দেশ আর দশের সঙ্গে নিজেদের জুড়তে হবে। পাঠকদের টেনে তুলতে গেলে অকুণ্ঠভাবে নিজেদের হাত বাড়াতে হবে।

# ভারত-নাট্য ঐতিহ্য

## মন্মথ রায়

ভারত-নাট্য চিরদিনই জাতি এবং সমাজের পরম উপকার সাধন করেছে। একদিকে যেমন আনন্দ পরিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা এবং সংস্কৃতির প্রসার সাধন করেছে অন্যদিকে তেমনি সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অন্যায়, অনাচার এবং ব্যাভিচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতেও দ্বিধা করেনি। এই নাট্য-ঐতিহ্য পূর্ব ভারতের প্রায় সর্বত্রই সমাদৃত ও সম্মানিত ছিল। বাংলা দেশের নাট্যকর্ম এ বিষয়ে বৈশিষ্ট্যই অর্জন করেছিল। শতবর্ষ পূর্বে বাংলার সাধারণ মঞ্চ প্রতিষ্ঠাকালের প্রথম নাট্যার্ঘই ছিল বাংলার চাষীদের উপর নীলকর সাহেবদের অত্যাচার ও ব্যাভিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমূলক দীনবন্ধু মিত্রের 'নীল-দর্পণ' নাটক। সামাজিক কু-প্রথার বিরুদ্ধেও বহু বাংলা নাটক আক্রমণাত্মক ছিল। তাছাড়া পরাধীন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে জাতিকে উদ্বুদ্ধ ও প্ররোচিত করতে বাংলা নাটক ছিল সর্বদা তৎপর। এই নাট্যাভিযান সরকারী দমননীতিতে বিভ্রান্ত বা লক্ষ্যচ্যুত হয়নি। সমগ্র পূর্বভারতের নাট্যদৃষ্টিভঙ্গীতে দেশাত্মবোধক এই সুরটি নানাভাবে নানারূপে আত্ম-প্রকাশ করে গেছে। ১৯৪৪ সালে বিজন ভট্টাচার্য রচিত 'নবান্ন' নাটকে অবহেলিত, নির্যাতিত কৃষকশ্রেণীর আর্তনাদে বাংলা নাটক পুনরায় বাস্তব জীবনমুখী হয়। তদবধি আমাদের নাটকে বাস্তবতার যুগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই পটভূমিকাতেই আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় প্রণিধানযোগ্য।

প্রাক স্বাধীনতাকালে পূর্বভারতে তথা সমগ্র ভারতেই একটি সাংস্কৃতিক ঐক্যসূত্রের সন্ধান মেলে। এর মূলগত কারণ লোক

সমাজের বৃহত্তর পরিধিতে ঈশ্বরে বিশ্বাস, ধর্মীয় আচরণে আনুগত্য এবং তৎকালীন কেন্দ্রীভূত বৃটিশ শাসন। কিন্তু সনাতন ধর্ম, বর্ণাশ্রম ধর্ম এবং ঈশ্বরীয় উপাসনা পুরোহিত গোষ্ঠিদের সঙ্কীর্ণ স্বার্থপুরনের অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। সংস্কারপন্থীরা অস্পৃশ্যতা, সতীদাহ, দেবদাসীপ্রথা, কৌলিন্যপ্রথায় বহুবিবাহ প্রমুখ অনাচারগুলির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং শেষ পর্যন্ত অনেক ক্ষেত্রেই জয়ী হন। বৃটিশ জাতিও ভারতের বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানে এবং অসহযোগ অভিযানে পরাজিত হয়ে ভারতকে স্বাধীনতা দিয়ে যায় ১৯৪৭ সালে। আধুনিক এই ইতিহাস সর্বজনবিদিত।

পরাধীন ভারতে তদানীন্তন নাট্যভুক্ত বিষয়গুলি আমি উল্লেখ করেছি। জাতির ও সমাজের প্রয়োজনে শুধু যে ঐসব বিষয়গুলি নিয়েই নাট্যরচনা হয়েছে তা নয়, রামায়ণ মহাভারত এবং পুরাণ বর্ণিত দেবদেবীর মহিমা, ঈশ্বরপ্রেম ও ভক্তি, মানবীয় বিরহ-প্রেম গাথা এবং সামাজিক ব্যঙ্গ-কৌতুকও নাটকের একটি বৃহৎ অঙ্গ ছিল তাছাড়া ছিল দেশাত্মবোধ। ভারতের সব রাজ্যেই বিষয়বস্তুগুলি একমাত্র নাটকরূপেই যে পরিবেশিত হয়েছে তা নয়, বিভিন্ন রাজ্যে প্রকাশ-ভঙ্গী ভিন্নতর হওয়া খুবই সম্ভব। স্বাধীনতার পর দেশবাসী আশা করেছিল বিদেশী শাসনের দুঃশাসন এবং শোষণ ক্রমশ দূরীভূত হয়ে জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন হবে। অচিরেই সুখী ও সমৃদ্ধ ভারত গড়ে উঠবে। এ আশা নিশ্চয়ই অসঙ্গত নয় এবং দেশের রাজনৈতিক কর্ণধারগণ এরূপ প্রতিশ্রুতিও দিয়ে এসেছেন এবং এখনও দিচ্ছেন। ১৯৪৪ সাল থেকেই পশ্চিম বাংলার অপেশাদার নাট্যগোষ্ঠী জাতির দাবি এবং অধিকার সম্পর্কে সোচ্চার ছিলেন এবং এখনও আছেন। দেশের নাটক এবং নাট্যশালা স্বাধীনতার পূর্বেও জাতির এবং সমাজের প্রয়োজনে যেমন সোচ্চার ছিল, নৈরাশ্যে এবং হতাশায় এখন বরং আরও বেশী সোচ্চার হয়েছে। এটা অপ্রত্যাশিত বা অস্বাভাবিকও নয়। আধুনিককালে সমস্ত উন্নত দেশেই নাটক হয়েছে

জীবননিষ্ঠ। নিছক কল্পবিলাস নাটকে আধুনিক মানুষ আর তৃপ্ত নয়। আর্টের সংজ্ঞাও আজ পাল্‌টে গেছে। 'আর্ট ফর আর্টস শেক' আজ অচল, আজকের দাবি 'আর্টস ফর পিপলস্ শেক।' স্বাধীনতা সংগ্রামে জয়ী হয়ে শুধু পূর্বভারতের নয়, সমগ্র ভারতেরই জনসাধারণ জাতীর লক্ষ্যরূপে নির্ধারিত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রচলনের জন্য অধীর হয়ে উঠেছেন। সরকারও এ দাবি অস্বীকার করেন নি, বরং এই পথেই অগ্রসর হতে চেষ্টা করছেন স্বাধীনতার পরবর্তী এই ছাব্বিশ বৎসর।

কিন্তু নানাবিধ জটিল এবং কুটিল কারণে এই ছাব্বিশ বছরের রাষ্ট্রীয় ফসল দেশবাসীকে দুঃখ দারিদ্র্য থেকে মুক্ত করতে পারেনি। শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়, সর্বভারতেই দারিদ্র্যের বিভৎসতা। বেকারীর ভয়াবহতা, আকাশছোঁয়া দ্রব্যমূল্য এবং সর্বোপরি চোরাকারবার, মজুতদারী এবং মুনাফাবাজীর দেশদ্রোহিতা বিকটভাবে প্রকট। সরকারী প্রশাসনও দুর্নীতিমুক্ত নয়। তদুপরি এই বিষম পরিস্থিতিতে কৃষক, শ্রমিক এবং সরকারী বেসরকারী কর্মচারীরাও জীবন-যাত্রায় তাল সামলাতে না পেরে অস্থির এবং অতিষ্ঠ। এবং তারই ফলশ্রুতি এত ধর্মঘট এবং লক-আউট। সমগ্র জাতির সম্মুখে আজ অস্তিত্ব রক্ষার নিদারুণ সংকট। অপরিসীম শ্রেণীবৈষম্য দূর করে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাই এই সংকট থেকে পরিত্রাণের জাতীয় লক্ষ্য।

এই পরিস্থিতিতে আমাদের নাট্য-সাধনার লক্ষ্য সম্পর্কে আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। আমাদের প্রগতিপন্থী নাটক এ যাবৎ কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে লড়াই করে চলেছে। দেশ থেকে সাম্রাজ্যবাদ, সামন্ততন্ত্র এবং জমিদারী প্রথা প্রায় বিলুপ্ত হলেও দেশের এখন যা অপরিসীম দুর্গতি তার জন্য যারা দায়ী তাদের কপটাচার এবং ভণ্ডামীর মুখোশ আমাদের নাটক উদ্ঘাটন করেছে এবং করছে। কিন্তু সবচেয়ে দুঃখের কথা জাতীয় জীবন থেকে ক্রমশ জীবনের মূল্যবোধ

এবং মহাজীবনের আদর্শ লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। নতুন ভারত গড়তে হলে যে সততা, যে কর্মনিষ্ঠা এবং যে উত্তম আবশ্যক, আমাদের কর্মক্ষেত্রে তার অভাবও লক্ষিত হয়। দেশের গঠনমূলক কর্মকাণ্ডের মধ্যেও বহু নাটকীয় উপাদান বর্তমান, এমনি সব নাটক পরিবেশিত হলে জাতি উদ্বুদ্ধ হবে। জাতীয় জঞ্জাল ধ্বংসেরও যেমন প্রয়োজন আছে, সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় সম্পদ গঠনেরও সেইরূপ আবশ্যকতা আছে। এই সহজ সত্যটি বিস্মৃত হলে চলবে না। দুর্নীতি ও চক্রান্তমূলক সমস্ত প্রতিকুল অবস্থা জয় করে একটি গঠনমূলক কৃষি বা শিল্প প্রচেষ্টা সার্থক হল এইরূপ নাট্য-চিত্র আজ আমাদের দেশের সর্বত্র পরিবেশন করা আবশ্যক। আমাদের শ্রোতৃমণ্ডলীর সামনে উপস্থাপিত করতে হবে আমাদের আকাঙ্খিত নতুন সমাজের তত্ত্ব, তথ্য ও সম্ভাবনার বাণী—সমাজজীবনের সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য আবেগ উদ্বেল প্রয়াস এবং 'সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে'—এই নবজীবন-সঙ্গীত, নবযুগের বার্তা বহন করবে আমাদের নাটক। জীবনের সব জানালা খুলে দিতে হবে। সমাজের সব অন্ধকার দূর করতে জ্বালতে হবে নাট্য-মশাল। জনগণের যৌথ চেতনায় রূপায়িত হয়ে যৌথসংস্থার প্রাণশক্তির ধারক ও বাহকই হবে আমাদের নাটক। এতে যদি আমাদের নাট্যকলা প্রচারণাদোষে দুষ্ট হয়, হোক। পৃথিবীর সব সাহিত্যই প্রচার। যদিও সব প্রচারই সাহিত্য নয়। অজস্র প্রচারধর্মী নাটক, যেমন, রক্তকরবী, অচলায়তন, ডলস্ হাউস, মাদার, পাওয়ার অব ডার্কনেস, লোয়ার ডেপথস্, হাউ দি স্টিল ওয়াজ টেম্পার্ড, দি গুড ওম্যান অব সেজুয়ান—এ সবই প্রচার-ধর্মী নাটক—এবং শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তিও বটে। আমাদের সমাজ-তান্ত্রিক সংগ্রামী নাটকও এই ভাবেই গড়ে উঠছে এবং উঠবে।

এবং এই প্রসঙ্গে একথাও স্মর্তব্য যে, আজ আমাদের নাটক শুধু নগরে বা বৃহৎ পল্লীতে আবদ্ধ থাকলে চলবে না। নাটককে আজ নিয়ে যেতে হবে গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে জাতির জ্ঞানাঞ্জন

শলাকারূপে। আমাদের জনসংখ্যার মাত্র পঁয়ত্রিশ ভাগ আজ সাক্ষর। কাজেই, সমগ্র দেশকে জাতীয় কর্তব্যে উৎসাহিত এবং উদ্বুদ্ধ করতে হলে নাটকের এই বিপুল জনসংযোগ অপরিহার্য। সুখের বিষয়, আমাদের যাত্রাগান এই ব্যাপারে খুবই সাফল্য লাভ করেছে। তাঁরা এ বিষয়ে আমাদের থিয়েটারের চেয়ে অনেকটা এগিয়ে গেছেন। থিয়েটার এবং যাত্রাগানের নাটকের মধ্যে ব্যবধানও আজ বিশেষ নেই। সরকারের উচিত থিয়েটার এবং যাত্রার মাধ্যমে আমাদের জাতীয় লক্ষ্য সমাজতন্ত্রের ভাবধারার জমি তৈরি করা। অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশেও এইরূপ পথই অবলম্বিত হয়েছে।

পরিশেষে নিবেদন করছি আমার প্রিয় সেই সংস্কৃত শ্লোকটি—যা আমাদের সংস্কৃতির শেষ কথা—

"কাব্যং হি দর্শনম হন্তি
কাব্যং গীতেন হন্যতে
গীতম নাট্য বিলাসেন
সর্বং হন্তি বুভুক্ষতা।"

অর্থাৎ দর্শনের আসরে কাব্যচর্চা সুরু হলে দর্শনের নাশ হয়। কাব্যের আসরে সংগীত সুরু হলে কাব্যের আসর নাশ হয়। সংগীতের আসরে নাট্যাভিনয় সুরু হলে সংগীতের আসর নাশ হয়। কিন্তু দর্শন কাব্য সংগীত নাটক সবকিছুর প্রাণনাশ হয় বুভুক্ষতায়। হ্যাঁ, যে বুভুক্ষায় সমগ্র দেশ আজ ভুগছে।

বলাই বাহুল্য, এই গরিবী না হটলে আমাদের সর্ব সংস্কৃতিই বিলুপ্ত হবে।

# স্বাধীনতা-পরবর্তী মনিপুরী নাটক

ইরমবাবো সিং

স্বাধীনতালাভের পরবর্তী মনিপুরী নাটক নিয়ে আলোচনা করার পূর্বে স্বাধীনতার পূর্ববর্তী যেসব উচ্চাঙ্গের নাটক মনিপুরের মানুষ শ্রদ্ধা ও প্রীতির সঙ্গে গ্রহণ করেছেন সেসবের কথা একবার স্মরণ করা ভালো। এই শতকের গোড়ার দিকে প্রথম দশকে মনিপুরে রীতিমত রঙ্গমঞ্চ চালু হয়ে যায়। তবে ঐতিহ্যবাহী মনিপুরী লাই-হারাওবা (সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশে নিবেদিত একপ্রকার সম্প্রদায়গত নৃত্য ও পূজার্চনা) এবং পরবর্তী যুগে রাসলীলা-র (রাধা-কৃষ্ণের প্রেমোপাখ্যানের আলেখ্য) মধ্যে নাট্যরূপের উপস্থিতি সবসময়ই ছিল।

## মনিপুরী নাটকের আদিযুগ

মনিপুরী নাটকে বাস্তবিক ও আধুনিক অর্থে অনুবাদ দিয়ে শুরু। এরপর মনিপুরী ভাষায় মৌলিক রচনার সূত্রপাত। মনিপুরী ভাষায় প্রথম মনিপুরী নাটক এল. এম. ইবাঙ্গহাল সিং রচিত 'নারা সিং'। এই ঐতিহাসিক নাটকে এক মনিপুরী রাজপুত্র নারা সিং-এর বীরত্বপূর্ণ কীর্তিকলাপ বর্ণিত। উনিশ শতকে বর্মীদের নিষ্ঠুর অত্যাচারে নিপীড়িত ও শোষিত মনিপুরবাসী ত্রাণকর্তা নারা সিং-এর কাহিনী এই নাটকের উপজীব্য। নাটকটিতে স্বদেশপ্রেমের সুর সুস্পষ্ট। এবং কথিত আছে, রাজা স্বয়ং নাটকটি মঞ্চস্থ করার ব্যাপারে কায়িক ও মানসিক সহায়তাদান করেছেন একাধিকবার। এই নাটক যে গতির সঞ্চার করে তার ফলে আমরা পাই বেশ কিছু মনিপুরী নাটক, যা পৌরাণিক কাহিনী ও কিংবদন্তীর আশ্রয়ে মনিপুরবাসীর স্বদেশপ্রেমের বীরত্বগাথা মূর্ত করে তোলে।

আদি যুগের নাট্যকারদের উপজীব্য বিষয় ঐতিহাসিক, নচেৎ পৌরাণিক। এবং এঁদের রচিত নাটক খুবই প্রথাসিদ্ধ ভঙ্গিতে লেখা, আর তার সংলাপ অনিবার্যরূপে বাগাড়ম্বরপূর্ণ। মনিপুরী বিষয়বস্তুর অন্বেষণে এই নাট্যকারগোষ্ঠী একধরনের অতীতের পুনরুজ্জীবন ঘটালেন এবং সেই ধারা চলল বর্তমান শতকের ত্রিশের দশক পর্যন্ত।

**দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী অধ্যায়**

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর মনিপুরী নাটকের আমূল পরিবর্তন ঘটে। দ্বিতীয় পর্যায়ের নাট্যকারগণ শুধুমাত্র ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক বিষয়বস্তুর মধ্যে নিজেদের আবদ্ধ রাখলেন না। ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক বিষয়ের পাশাপাশি তাঁরা নতুন নতুন ক্ষেত্র আবিষ্কারের প্রয়াস চালালেন, এবং বিশ্বযুদ্ধের ফলশ্রুতিতে যে বিরাট সামাজিক ও ধর্মীয় পরিবর্তন ঘটল তার মধ্য থেকেই এই নাট্যকারেরা নাটকের মালমশলা খুঁজে পেলেন। ধর্মীয় ধ্যানধারণায় আচ্ছন্ন গোঁড়া মনিপুরী সমাজ দ্রুত পরিবর্তনের মুখে গিয়ে পড়ল। এবং সেই দ্রুত পরিবর্তনে ও নিত্য নতুন চিন্তাভাবনায় আন্দোলিত হলেও মূল কাঠামোটি কিন্তু অটুট রইল।

**পরিবর্তনের পালা**

প্রাচীনের পুনরুত্থান থেকে সরে এসে পরিবর্তনের পালা উঁকিঝুঁকি দিতে লাগল। এক নতুন নাট্যকার গোষ্ঠী, যাঁদের বলা ভালো সমাজের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ নাট্যকারগোষ্ঠী, ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নাটক রচনা শুরু করলেন। এস. ললিত সিং-এর নাটক 'সতী খোংবাং' বলতে গেলে মনিপুরী রঙ্গমঞ্চে বিপ্লব ঘটায়। তিনি শুধু একজন নাট্যকার মাত্র ছিলেন না, ছিলেন একজন অসাধারণ অভিনেতাও বটে। এই নাট্যকারদের সামাজিক নাটক সমাজের অনেক বিষয়ে রূপান্তর ও অদলবদল ঘটাতে আগ্রহী। মৃদু ব্যঙ্গ বিদ্রূপের মাধ্যমে পুরনো প্রথাজীর্ণ বিশ্বাস ও ঐতিহ্যের ধারার পরিবর্তে

নতুন আদর্শের কথা এঁরা তুলে ধরলেন। এঁরা অবশ্যই প্রথাগত সমাজব্যবস্থার নির্বুদ্ধিতা এবং সামাজিক মানুষের খামখেয়াল ও ত্রুটি-বিচ্যুতিকে আঘাত হানলেন। তবে এঁদের উদ্দেশ্য ছিল মূলত ধ্রুপদী নাট্যকারদের মতই আনন্দদানের মাধ্যমে সংশোধন ঘটানো।

**স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী অধ্যায়**

স্বাধীনতালাভের পরবর্তী প্রথম কয়েক দশকে মনিপুরী নাটক একজন অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বের দ্বারা প্রভাবিত—যিনি জনসাধারণের মনে তাদের পরিবেশ ও সমস্যা সম্পর্কে এক নতুন সচেতনতার সৃষ্টি করেন। এঁর নাম অধ্যাপক জি. সি. টোংব্রা। তাঁর সময়কার সম্ভবত একমাত্র বুদ্ধিদীপ্ত, কৌতুকপ্রবণ ও সমাজসচেতন নাট্যকার তিনিই। এই পৃথিবীর সামাজিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনীতিক প্রভৃতি আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের অস্তিত্বের নানা দিক নিয়ে ইনি পঞ্চাশেরও বেশী নাটক মনিপুরী ভাষায় লিখেছেন। জর্জ বার্নার্ড শ এবং ইবসেন, যাঁদের কাছ থেকে তিনি সচেতনভাবেই অনুপ্রেরণা পেয়েছেন, তাঁদের মতই জি. সি. টোংব্রা চেয়েছেন মানুষ নামক দ্বিপদ জীব মহামানবের ভূমিকা অর্জন করুক বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োগের দ্বারা এবং নানাপ্রকার কুসংস্কার ও যুক্তিবিবর্জিত আচরণ পরিহারের মধ্য দিয়ে। এই নাট্যকার সমাজের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে নীরবে গম্ভীরভাবে ভাবেন এবং তাঁর তীক্ষ্ণধী চেতনায় ধরা পড়ে আমাদের অনেক বিশ্বাসের ও অভ্যাসের যুক্তিহীনতা। তাঁর সমস্যা-ধর্মী নাটকের বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপে ও পংক্তিতে তিনি তুলে ধরেছেন তাঁর নতুন ভাবনা, যা প্রাচীনের স্থলে বরণ করবে নবীন যুগের মানুষকে, যে মানুষ শেলী কথিত 'মিলেনিয়াম' উপভোগের সুযোগ পাবে।

**বুদ্ধিবৃত্তি ও সরস বুদ্ধির দীপ্তি**

টোংব্রার নাটকের বৈশিষ্ট্যই হল বুদ্ধিবৃত্তি ও সরস বুদ্ধির দীপ্তির সঙ্গে উজ্জ্বল সংলাপের প্রাধান্য। পাশ্চাত্য দেশে এই ধরণের

সামাজিক কমেডি শুরু করেন বার্নার্ড শ ও ইবসেন। টোংব্রার নাট্যরচনা থেকে দুয়েকটি উদাহরণ নেওয়া যাক। যেমন, 'লুডে' মি চাংবা' ('জালের গোলকধাঁধায় আবদ্ধ মানুষ') নাটকে বিভিন্ন মতবাদের, এক্ষেত্রে বিশেষ করে সাম্যবাদ ও পুঁজিবাদের, দ্বন্দ্ব চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। টোংব্রা এই নাটকে একথাই বলতে চেয়েছেন যে, সাম্যবাদ ও পুঁজিবাদের জালে মানুষ জড়িয়ে গেছে এবং দুই মতবাদের দ্বন্দ্বে মূল উদ্দেশ্যই ভুলে গেছে, যে-উদ্দেশ্য মানুষের কল্যাণ। দুই মতবাদের গুণাগুণ নিয়ে আলোচনাতেই মানুষ মত্ত, সেই মতবাদকে বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগের দিকে কারো লক্ষ্য নেই। 'মনি মামোন' ('শাশুড়ি ও পুত্রবধূ') নামক আরেকটি কমেডি নাটকে তিনি এক বিচারকের সংসারে শাশুড়ি ও পুত্রবধূর অহংবোধের নির্বুদ্ধিতার দিকটি তুলে ধরেছেন। দুজনের ওই পারস্পরিক বিরোধে (মনস্তাত্ত্বিকরা যাকে হয়ত অধিকারবোধ হিসেবে ব্যাখ্যা করতেন) বিচারকের অবস্থা বড়ই করুণ। তাঁর নিরুপায় ও বিব্রতবোধ করা ছাড়া কিছু করার নেই। পদে পদে তিনি হাস্যকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছেন। এই নাটকটিতে ভারতীয় পরিবারের যেন একটি প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। 'ম্যাট্রিক পাশ' নাটকে জি. সি. টোংব্রা ডিগ্রিমুখী শিক্ষাব্যবস্থার তুলনামূলক গুণাগুণ নিয়ে এক চমৎকার চিত্র উপহার দিয়েছেন। এই শিক্ষাব্যবস্থায় বছর বছর হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী পাশ করে, ফেল করে। কিন্তু জীবনসংগ্রামে যুঝবার জন্যে যা প্রয়োজন তা কিন্তু অর্জন করে না। 'চেংনি খুজাই' (ভিক্ষা ভাণ্ড) নামক আরেকটি সাম্প্রতিক নাটকে টোংব্রা বৈষ্ণবপুরের (না কি, মনিপুরের?) অধিবাসীদের প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও নির্মমভাবে অত্যাচারিত ও নিপীড়িত হওয়া এবং তার ফলে তাদের হতাশা ও চিত্তবিকারের কাহিনী সহানুভূতি ও সহমর্মিতার সঙ্গে এঁকেছেন। প্রশাসনিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি বিচার করে বৈষ্ণবপুর (বা মনিপুর) নিবাসীগণ নিজেদের স্বরূপে আত্মপ্রকাশ

করতে পারেননি। পক্ষান্তরে, আয়োনেস্কোর 'গণ্ডার' নাটকের জীবজন্তুর মতই বৈষ্ণবপুরীগণ বেড়াল, কুকুর, হাতি, মোরগ প্রভৃতির রূপে উপস্থিত হয় এবং ভিক্ষাভাণ্ড ঝুলিয়ে দাবি আদায়ে এগিয়ে আসে। সরকার এঁদের দৈনন্দিন জীবনের সামান্যতম প্রয়োজনটুকুও মেটাতে ব্যর্থ হওয়ায় এঁরা বিদ্রোহ করে, কিন্তু শাসকগোষ্ঠী নির্মমভাবে সেই বিদ্রোহ দমন করে। বৈষ্ণবপুরবাসীগণ কারাগারে নিক্ষিপ্ত ও সরকার কর্তৃক চূড়ান্ত নিগৃহীত হয়। বিদ্রোহী বৈষ্ণবপুরীদের (মনিপুরীদের) পিতা ও মাতা হামেংপা (পুং ছাগ) ও হামেংমু (স্ত্রী ছাগ) পুলিশের নির্যাতনে অস্থির তাদের পুত্রকন্যাদের করুণ আর্তস্বর ডুবিয়ে দিতে তাদের দুজনের কাঁধে ঝোলানো ভিক্ষাভাণ্ড বাজিয়ে 'হরি হরয়ে নম' সুর তোলে ও তাণ্ডব নাচ নাচে। মর্মস্পর্শী এই দৃশ্য দর্শকদের অভিভূত না করে পারে না।

### আলোচনাধর্মী নাটক

টোংব্রার নাটক মূলত আলোচনাধর্মী। এখানে বিভিন্ন মতাবলম্বী কয়েকটি চরিত্র মঞ্চে উপস্থিহ হয়ে একটি সমস্যা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে। ফলত, সচরাচর চরিত্রের বিকাশ বলতে আমরা যা বুঝি এখানে তার অবকাশ নেই বললেই হয়। তবে টোংব্রার যদিও সামাজিক ও সমস্যাধর্মী নাটক লেখার হাত খুব ভালো এবং সে নাটক সবসময়ই মিলনান্তক, তৎসত্বেও তাঁর প্রায় সমস্ত নাটকেই ট্র্যাজেডির একটা অন্তঃসলিলা স্রোত অনুভব করা যায়। তাঁর নাটকের ট্র্যাজিক বোধ কিন্তু অ্যারিস্টটল কথিত চরিত্রের ট্র্যাজিক ত্রুটি থেকে উদ্ভূত নয়, সমসাময়িক পরিবেশের সঙ্গে চরিত্রের খাপ খাইয়ে নেবার অক্ষমতা থেকেই এর উদ্ভব। কাজেই একে আমরা সমসাময়িক প্রসঙ্গমূলক ট্র্যাজেডি বলতে পারি।

অতি সম্প্রতি আয়োনেস্কো, বেকেট প্রমুখ পাশ্চাত্ত্যের অ্যাবসার্ড নাট্যকারদের ধরণে মনিপুরী রঙ্গমঞ্চে নতুন বিষয়বস্তু নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন টোংব্রা।

**ভিন্ন চিত্র**

ষাট দশকের শেষার্ধে মনিপুরী নাটকের এক ভিন্ন চিত্র চোখে পড়ে। নতুন নাটক নিয়ে—বিষয়বস্তু প্রয়োগকর্ম, এবং উপস্থাপনায় নতুন—বেশ কিছু শক্তিশালী তরুণ নাট্যকার আবির্ভূত। উন্নত সমাজ সচেতনতা ও প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এঁরা নাটক রচনা শুরু করলেন। সমরেন্দ্র সিং নামে জনৈক নাট্যকার এক্ষেত্রে অগ্রণীর ভূমিকা পালন করেন। নতুন প্রজন্মের তরুণদের মনের উপর চিরাগত সমাজের হারানো মূল্যবোধের তিনি চমৎকার বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর 'তীর্থ যাত্রা' অবলম্বনে তৈরী মনিপুরী ভাষার সর্বপ্রথম চলচ্চিত্র 'মাতামগি মনিপুর'-এ ('সমসাময়িক মনিপুর') বেশ কিছু প্রাচীন ঐতিহ্যাশ্রিত বিশ্বাস ও মূল্যবোধের অর্থহীনতা এবং অপ্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরা হয়েছে। এবং নতুন প্রজন্মের কাছে যে এসবের কানাকড়ি দাম নেই সেটি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এর পরের নাটক 'দাশা'-এ ('ভাগ্য') নাট্যকার দেখিয়েছেন মানুষের চিরন্তন আত্মানুসন্ধান এবং পৃথিবীতে তার অস্তিত্বের অর্থ উদ্ধারের প্রয়াস কেমন করে ভাগ্যবাদী বিশ্বের গোলকধাঁধায় পথ হারায়। মনিপুরী রঙ্গমঞ্চের তরুণতর নাট্যকার শ্রীবীরেন, বেকেট সার্ত্রে জেনে প্রমুখের অস্তিত্ববাদ ও অ্যাবসার্ড দর্শনের দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত। তাঁর দুটি নাটিকা 'অনি' ('দুজন') এবং হালেপ্লা' ('ফেরা') দ্রুত পরিবর্তনশীল দুনিয়ায় মানুষের অস্তিত্বের সংকট এবং জনসংযোগের ব্যাপক আয়োজন ও টি. এস. এলিয়টের ভাষায় পৃথিবীর বলের তুল্য ছোট হয়ে আসা সত্ত্বেও ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতা আধুনিক যুগে যে গভীর যন্ত্রণার আকার নিয়েছে তার কথাই তুলে ধরেছে। মনুষ্য নামক যে বামন পৃথিবীতে নামের সন্ধানে নিরন্তর এবং প্রায়শ যন্ত্রণাবিদ্ধ ও দুর্দশাজর্জর অন্তরে লড়াই চালাচ্ছে সেই চিন্তা শ্রীবীরেনের মনকে নাড়া দেয়। এবং বিষয়টিকে তিনি সদাসর্বদা দরদ দিয়ে দেখেছেন ও দেখিয়েছেন।

কানহাইলাল ভালো এবং সফল নাট্যকার। নাটক রচনার

কলাকৌশলে ইনি পারঙ্গম। দিল্লীর এল·কে· জি-র স্কুলে ইনি নাট্যচর্চায় হাত পাকিয়েছেন। এঁর 'কেইবু কেইত্তইবা' ('দানব') ও 'তামনা লাই' ('ভূত') নাটিকা দুটি মনিপুরী নাটকের ইতিহাসে নতুন ধারার সৃষ্টি করে। একাধিক অর্থে এঁর নাটক অন্যের থেকে আলাদা। কানহাইলালের মূল লক্ষ্য চিরাচরিত রঙ্গমঞ্চের ধারা অনুসরণ না করে অভিনেতা ও দর্শকের মধ্যে অন্তরঙ্গ পরিবেশ রচনা করা। এই অন্তরঙ্গ পরিবেশ সৃষ্টি তথা নাটকে দর্শকের অংশগ্রহণ যাতে সম্ভব হয় সেজন্যে তিনি তাঁর নাটক রচনায় দর্শক সাধারণের কাছে বিশেষ জনপ্রিয় পৌরাণিক ও কিংবদন্তীমূলক বিষয় নির্বাচন করেন। এবং প্রতীকী ধরনে ও ভাবভঙ্গিমায় নাট্যমুহূর্ত গড়ে তোলেন। সকলেই জানেন, পাশ্চাত্ত্য দেশে গ্রটোস্কি ও রিচার্ড সেকনার এ ধরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক নাটক নিয়ে চর্চা করেন এবং জনপ্রিয় করে তোলেন। অবশ্য নাটকে দর্শকের অংশগ্রহণের বা অন্তরঙ্গতার অনুভূতি শেক্সপীয়রের নাটকেও লক্ষ্যিতব্য।

তবে আধুনিক পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক নাটকের ক্ষেত্রে তফাতটা হল, সাহিত্য পাঠের রসগ্রহণের স্থলে রঙ্গমঞ্চের প্রযোজনাকর্মের উপর জোর দেওয়া হয়। নাটক মূলত মঞ্চস্থ হবার উদ্দেশ্যেই রচিত সন্দেহ নেই. তবে সাহিত্যকর্মকে এক পাশে ঠেলে মঞ্চ-প্রযোজনার উপরই অতিরিক্ত জোর দিলে ব্যাপারটা ক্ষতিকর হবে বলেই আমার ধারণা। কানহাইলালের পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক নাটক নাট্যমাধ্যমের ক্ষেত্রে তাঁর অসামান্য দখলের উজ্জ্বল নিদর্শন। এছাড়া নাট্য প্রযোজনার প্রযোগকর্মে তাঁর কুশলতা, আর তার সঙ্গে প্রতীকী ভাবভঙ্গি ও চলাফেরা এবং বিরল সংলাপ মনিপুরী নাটকে এক নতুন দিকনির্দেশ এনে দেবে।

বঙ্গানুবাদঃ কমল গুপ্ত

# স্বাধীনতার পরবর্তীকালে বাংলা নাটকের গতিপ্রকৃতি

দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

পূর্বভারত সাংস্কৃতিক সম্মেলনের মঞ্চে স্বাধীনতার পরবর্তীকালে পূর্বভারতের নাটকের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনার জন্যে আহূত হয়ে একদিকে যেমন আনন্দ অনুভব করেছি তেমনি অন্য দিকে নিজের সীমাবদ্ধতার কথা ভেবে লজ্জিতও হয়েছি। লজ্জার কারণ প্রতিবেশী রাজ্যগুলির সাম্প্রতিক নাটক সম্পর্কে আমার অজ্ঞতা। কেবল ভাষার পার্থক্যই আমার অজ্ঞতার কারণ নয়; ঐ সম্বন্ধে আমার অনুসন্ধিৎসার অভাবই তার জন্যে প্রধানত দায়ী। দ্বিতীয় কারণ আমাদের এখন কোনো সাধারণ মিলনক্ষেত্র বা যোগসূত্র নেই যা অবলম্বন করে ভাবের পারস্পরিক আদানপ্রদান করা ও নাট্যকর্মের খোঁজখবর নেয়া সম্ভব। যে কারণেই হোক, আমার এই অক্ষমতার জন্যে গোড়ায়ই আপনাদের কাছে মার্জনা চেয়ে নিচ্ছি।

তিন দশকের অধিককাল যাবত বাংলা নাট্যকর্মের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট থেকে বিভিন্ন ধারা ও নাটকের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে যেটুকু অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি সেটুকুই আপনাদের কাছে পরিবেশনের চেষ্টা করব। আমার অনুধাবন ও মূল্যায়ন অভ্রান্ত নাও হতে পারে, তবে আমার বক্তব্য উপস্থিত করব অকপটে। তার কারণ আলোচনা কারো নিন্দা বা স্তুতির জন্যে নয়, নিজেদের ভুলভ্রান্তিগুলির পর্যালোচনা করে সঠিক পথ নিরূপণ করাই তার উদ্দেশ্য। প্রায় তিন দশকের নাটকের সম্যক আলোচনা করা এক্ষেত্রে সম্ভব নয়। তাই বিস্তারিত তথ্যের গহনারণ্যে প্রবেশ না করে আলোচ্যকালের নাটকের

প্রধান প্রধান লক্ষণগুলিই সামাজিক নিরিখে তুলে ধরার চেষ্টা করব। তা থেকেই হয়তো বাংলা নাটকের গতিপ্রকৃতি ও তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে খানিকটা আন্দাজ করা যাবে।

কোনো সমাজসচেতন নাট্যকারই ব্যক্তি জীবনের দ্বন্দ্ব-সংঘাতকে সামাজিক পটভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখতে পারেন না। সামাজিক সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন করে কেউ যদি ব্যক্তিসত্তাকে দেখার চেষ্টা করেন তবে সেই ব্যক্তিটি উপস্থিত হবে স্রষ্টার নিছক কল্পনাপ্রসূত রূপক হয়ে; চরিত্র স্বকীয় সত্তা নিয়ে দেখা দেবে না। তেমন নাটকের শিল্প সৌকর্য যতই থাক, তার সামাজিক মূল্য আছে কিনা বিচার্য বিষয়।

জাতীয় সংহতিতে নাটকের স্থান নির্ধারণ করতে হলে তার সামাজিক মূল্য অবশ্যই থাকা দরকার। কারণ সমাজ জীবনের সঙ্গতি-অসঙ্গতির ওপরই জাতীয় সংহতি নির্ভর করে। যেখানে সমাজজীবনে অসঙ্গতির প্রাধান্য সেখানে ওপর ওপর যতই চেষ্টা করা হোক সংহতি বস্তুত আসতে পারে না। সমাজজীবনের অসঙ্গতির প্রভাব ব্যক্তিজীবনে পড়তে বাধ্য। সেই কারণেই যখন কোনো ব্যক্তিকে দেখা যায় অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে তখন তারই বিরুদ্ধে আবার আর একজন প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়ায়। অন্যায়টা সামাজিক হলে স্বাভাবিক ভাবেই সেই দ্বন্দ্ব বা সংঘাত সামষ্টিক রূপ পায়। যে যাই বলুন, শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে এ ধরনের সংঘাতের মূলে যে অর্থনৈতিক কারণ থাকে তা কি অস্বীকার করা যায়? ব্যক্তি-জীবনের দ্বন্দ্ব বা সংঘাতও তা থেকে মুক্ত নয় এই কারণে যে, ব্যক্তিত্ব সমাজেরই একটি অঙ্গ আর তার ন্যায় অন্যায় বোধও তারই সঙ্গে জড়িত। ব্যক্তি যখন কোনো সামাজিক ব্যবস্থা বা রীতিনীতি তার পক্ষে পীড়নের কারণ বলে মনে করে তখন তার বিরুদ্ধে সে বিদ্রোহ করে, আবার সেই সামাজিক ব্যবস্থা বা রীতিনীতি বৈষয়িক স্বার্থ রক্ষার জন্যে বজায় রাখার প্রয়োজন যার সে সেই

বিদ্রোহীর প্রতিকূল অবস্থান নেয়। একটু স্বচ্ছ দৃষ্টিতে তাকালেই দেখা যাবে সামাজিক পীড়নের পেছনে কাজ করে অর্থনৈতিক শোষণ আর তার চরিত্র শ্রেণীগত। শোষণ যেখানে শ্রেণীগত, সেখানে তা থেকে মুক্তির জন্যে সংগ্রামও শ্রেণীগতই হতে বাধ্য; কারণ শ্রেণীগত শোষণটা ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সুতরাং বর্তমানে যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈষম্য দেখা যায় তার মূলে প্রধানত রয়েছে অর্থনৈতিক বৈষম্য যা দূর না করা পর্যন্ত নানা আপদই ভিন্ন ভিন্ন আকারে জাতীয় সংহতির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে আর তার মোকাবিলা করার জন্যে সর্বদাই আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে।

মানবপ্রেম ও দেশহিতৈষণা কারো একচেটিয়া সম্পদ নয়। যে কোনো ব্যক্তির মধ্যেই এটা থাকতে পারে। কিন্তু তা চরিতার্থ করার উপায় ক্ষেত্র বিশেষে আলাদা আলাদা। জাতীয় সংহতি সবাইর কাম্য হলেও নিজ নিজ ক্ষেত্র থেকে ভিন্ন ভিন্ন পথেই সেই লক্ষ্যের দিকে এগুতে হবে। এর আগে যে সামাজিক ও বৈষয়িক বৈষম্যের কথা বলা হয়েছে তা দূর করার প্রধান দায়িত্ব রাষ্ট্রের। রাষ্ট্র পরিচালনার ভার যাঁদের হাতে ন্যস্ত তাঁরা দেখবেন সেটা। নাট্যকারদের কর্মক্ষেত্র স্বতন্ত্র। তাঁরা মানুষের জীবনকাব্য রচয়িতা। মানুষের জীবনই তাঁদের সৃষ্টির উপাদান। কোনো রাষ্ট্রীয় বিধান যদি অগণিত মানুষের দুঃখের কারণ বা অগ্রগতির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় তবে নাট্যকারগণ স্বাভাবিক ভাবেই মানুষের কল্যাণের জন্যে সেই অকল্যাণকর রাষ্ট্রীয় বিধানের বিরুদ্ধে সোচ্চার না হয়ে পারেন না; কারণ তখন সেটা শুধু তাঁদের নিজেদের কথাই নয়, লক্ষ লক্ষ মানুষের সঙ্গে তা মিলিত কণ্ঠ হয়ে দাঁড়ায়। সমাজ সচেতন নাটকারগণ সর্বদাই মানবজীবনের সঙ্গে এভাবে মানসিকতায় নিজেদের সমীকরণের চেষ্টা করে থাকেন। সামাজিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রেই সৎ নাট্যকারগণ সচেতন ভাবে এই ভূমিকা পালনের চেষ্টা করেন।

বাংলা নাটকের প্রথমাবস্থা থেকেই বাংলা দেশের নাট্যকারদের

মধ্যে এই দায়িত্ববোধ পরিলক্ষিত হয়। প্রাকস্বাধীনতা কালের দেশহিতৈষী নাট্যকারগণ আবেগগত একটা মূল সূত্রের দ্বারা আবদ্ধ হতে পেরেছিলেন। দেশের মধ্যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ও বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে যে ঘৃণা ছিল, প্রাকস্বাধীনতাকালীন নাট্যকারগণ নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গী ও সামর্থ্য অনুযায়ী নাটক দিয়ে তাতে ইন্ধন যোগাতে সমর্থ হয়েছেন। জাতীয় ঐক্যবোধ আনয়নে সেগুলো যে যথেষ্ট সাহায্য করেছে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পরে জাতীয় দায়িত্ব যেমন বেড়ে যায় তেমনি সঙ্গে সঙ্গে আভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলিও প্রকট হয়ে ওঠে। এমন সব সমস্যা দেখা দেয় যেগুলে জাতীয় সংহতির পথে কণ্টক হয়ে দাঁড়ায়। স্বাভাবিক ভাবেই স্বাধীনতার পরবর্তীকালে কেবল সমকালীন নাট্যকারদেরই নয়, প্রাক-স্বাধীনতা কালের জীবিত নাট্যকারদেরও এমন কতগুলি জটিল প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় যেগুলো থেকে কেবল ভাবাবেগের দ্বারা উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব নয়; তার জন্যে প্রয়োজন আধুনিক মনন ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের দ্বারা সামাজিক উপাদানগুলির আপেক্ষিক অবস্থান নিরূপণ—এক কথায় যাকে বলা যায় dialectical approach.

বলতে দ্বিধা নেই যে, প্রাকস্বাধীনতা কালের যেসব নাট্যকার আবেগসর্বস্বতাকেই নাটকের প্রাণধর্ম বলে মনে করতেন এবং সেই প্রথানুসারেই নাটক রচনা করে আসছিলেন তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ এই নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারলেন না। জাতীয় প্রয়োজনে যে নতুন দায়িত্ব তাঁদের ওপর অর্পিত হলো, দায়বোধের অভাবে তাঁরা তা পালনের চেষ্টা না করে পুরনো ধ্যানধারণা নিয়েই নাটক রচনা করে চললেন। প্রবীণদের মধ্যে যাঁরা নতুন দায়িত্ব পালনে চেষ্টিত হলেন তাঁদের মধ্যেও কেউ কেউ সমকালীন ঘটনাগুলির মূল কারণ অনুসন্ধান না করে সমস্যাসমূহের বহিরঙ্গ চিত্রণের দ্বারাই আধুনিক ও প্রগতিশীল মঞ্চের শরিক হলেন। ফলে তাদের নাটক থেকে কোনো প্রকৃত নতুন মূল্যবোধ বেরিয়ে এলো না। নবাগতদের

মধ্যেও এই প্রবণতা অনেকেরই দেখা দিল। তাঁরা সামাজিক অসঙ্গতিগুলির সমালোচক হয়েই রইলেন, তার পরিবর্তনের কোনো ইংগিত দিলেন না। ফলে এ ধরনের নাটকগুলিতে যতটা ভাবালুতা, উচ্ছাস ও কষ্টকল্পনা স্থান পেল, সমাজব্যাধির মূল কারণগুলিতে আলোকপাত ততখানি দেখা গেল না। নানা সমস্যায় জর্জর মানুষের তীব্র যন্ত্রণা আছে এ ধরনের বহু নাটকে; কিন্তু সেগুলো থেকে উত্তীর্ণ হবার কোনো ইংগিত নেই—যদি কোথাও থাকে তবে তা আরোপিত, অর্থাৎ subjective conclusion—নাট্যক্রিয়ার অনিবার্য পরিণতি নয়। বলা বাহুল্য, সামাজিক উপাদানগুলির যথার্থ অবস্থান, সেগুলির যৌগিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ও লক্ষ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকাতেই এই এলোমেলো ভাব আর সেই টালমাটালের মধ্যেই কতগুলি জীবনবিরোধী ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিন্তার অনুপ্রবেশ।

এই সংক্ষিপ্ত ভূমিকা করতে হলো এই কারণে যে, উত্তর-স্বাধীনতা কালের বাংলা নাটকের গতিপ্রকৃতি অনুধাবন করার জন্যে এসব লক্ষণের দিকে দৃষ্টি রাখা একান্ত প্রয়োজন। যতদিন যাচ্ছে জাতীয় দায়দায়িত্বও ততই আমাদের ঘাড়ে চাপছে। তা এড়িয়ে বা তার প্রতি উদাসীন থেকে জাতির কথা, এমন কি একটি মানুষেরও কথা যেমন বলা যায় না, তেমনি জাতীয় সংহতির পথে অন্তরায় হয়ে কোন্ কোন্ শক্তি ও স্বার্থ কাজ করছে তা না জেনে কিছু বাক্যবিন্যাসের দ্বারাই জাতীয় সংহতি বিধানে সাহায্য করাও সম্ভব হয় না। তার সঙ্গে আন্তর্জাতিক ঘটনাপ্রবাহ এবং শক্তি বিন্যাসের প্রতিও সতর্ক দৃষ্টি থাকা দরকার। আমাদের জনজীবনের আকাঙ্ক্ষা ও জাতীয় অগ্রগতির প্রতি অনুকূল ও প্রতিকূল শক্তিগুলি সম্পর্কে সচেতন না থাকলে আমরা যেমন দেশের আভ্যন্তর জীবনে বিভেদের শক্তিগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রামও করতে পারি নে, তেমনি সমাজের positive উপাদানগুলিকেও এক লক্ষ্যাভিসারী করে বৃহত্তর ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করতে সক্ষম হই নে।

বলা বাহুল্য, স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গেই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের

কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রেই আমরা এমন কতগুলি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যাধি লাভ করেছি যেগুলো থেকে মুক্ত না হতে পারায় আজও পর্যন্ত জাতীয় জীবন ভুগছে। তার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা একটি প্রধান ব্যাধি। পরশাসিত অবস্থায় এ ব্যাধিতে আমরা প্রচণ্ডভাবে ভুগেছি। জাতীয় আন্দোলনে আঘাত হানার জন্যে বৃটিশ শাসকেরা বার বার এ অস্ত্র প্রয়োগ করেছে। তারপর রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরের আগে এটিকে ভালো করে শানিয়ে নিয়ে তারা এমনভাবে আঘাত করে যার ফলে ভারত তিন খণ্ডে বিভক্ত হয়ে যায়। উপ-মহাদেশের জাতীয় সংহতির ওপর ঘাতকের খড়্গাঘাত। সেই আঘাতে যে রক্তমোক্ষণ হয় তা থেকে আজো পর্যন্ত আমরা আরোগ্য লাভ করতে পারিনি।

পূর্বাঞ্চলে সেই আঘাতে যেমন পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা এই তিনটি পার্শ্ববর্তী ভারতীয় রাজ্য বিপন্ন হয়, তেমনি দ্বিখণ্ডিত বাংলার পূর্বাংশ অর্থাৎ যা বর্তমানে স্বাধীন বাঙলাদেশে পরিণত, তার অধিবাসীরাও কম বিপন্ন হয় না। একটা জাতিকে কৃত্রিম উপায়ে দ্বিখণ্ডিত করলে যে ইতিহাস শেষ পর্যন্ত তা বরদাস্ত করে না, স্বাধীন বাঙলাদেশ রক্তাক্ষরে তার স্বাক্ষর রেখেছে। সাম্প্রদায়িক সমস্যা সর্বভারতীয় হলেও দেশভাগের আগে ও পরে পূর্বাঞ্চলে যে তা প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় একথা বোধ হয় কেউ অস্বীকার করতে পারেন না। গর্বের সঙ্গেই বলা যায় যে, আমাদের এখানে নাট্যকারদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশই তখন সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেন এবং তীক্ষ্ণ তরবারির মতোই কয়েকটি নাটক দেন। স্বতন্ত্র রাষ্ট্রভুক্ত হলেও ওপারের বাঙালীরা এপারের নাট্যকারদের মানসিকতায় স্বাভাবিকভাবেই বিরাজিত, কারণ ভাষা ও সংস্কৃতিতে দুপারের বাঙালীই অবিচ্ছিন্ন। সুতরাং সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী সেসব নাটকে দুই বাংলারই সাধারণ মানুষ স্থান পেয়েছে।

দেশভাগেরই ফল উদ্বাস্তু সমস্যা। লক্ষ লক্ষ ছিন্নমূল নরনারীকে

চরম বিপর্যয়ের মধ্যে রেখে জাতীয় সংহতির কথা ভাবা বাতুলতা মাত্র। আমাদের নাট্যকাররা এটাকে জাতীয় বিপর্যয় বলেই মনে করেছেন আর তাই ছিন্নমূল জীবনের বেদনা প্রকাশ করেছেন তাঁদের নাটকে। অবিলম্বে ছিন্নমূল পরিবারগুলির পুনর্বাসন ও সুস্থ জীবন প্রতিষ্ঠার দাবিও সেসব নাটকে সোচ্চার। এ পর্যায়ের নাটক পুঙ্খানুপঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা প্রকাশ পেয়েছে সেগুলোতে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যার জন্যে নাট্যকাররা সাম্রাজ্যবাদকেই প্রধানত দায়ী করেছেন। বাংলাদেশের নাট্যজগতে গোড়া থেকেই যে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ভূমিকা দেখা যায়, স্বাধীনতার উত্তরকালের সচেতন নাট্যকাররা তা থেকে বিচ্যুত হন নি। প্রত্যক্ষভাবে রঙ্গমঞ্চে না থাকলেও আজো পর্যন্ত নেপথ্যে থেকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিই যে ভারতের জাতীয় জীবনকে বিষাক্ত করতে ও বিভেদ জীইয়ে রাখতে সদা সচেষ্ট, সচেতন নাট্যকাররা কখনো তা বিস্মৃত হন না। তাই ভিয়েতনাম, কিউবা, কঙ্গো, বাঙলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ প্রভৃতি অবলম্বন করে ইদানীং যেসব বাংলা নাটক রচিত ও অভিনীত হয়েছে, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বলেই সেগুলোও আমাদের জাতীয় সংহতিরই অনুকূল। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও জাতীয় মুক্তি অর্জনে সেসব দেশে যে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আমাদের দেশের জনসাধারণকে দেশী-বিদেশী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে তা নিশ্চয়ই অনুপ্রাণিত করে।

জাতীয় সংহতির দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখার জরুরী প্রয়োজন দেখা দেয় চীন-ভারত সংঘর্ষ ও পাক-ভারত যুদ্ধের সময়। সেই প্রয়োজনের সময়ও বাঙালী নাট্যকাররা পিছিয়ে থাকেন কি। তাঁরা দেশাত্মবোধক নাটক রচনা করে দেশরক্ষায় জাতিকে উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করেছেন। অবশ্য সব নাট্যকারই যে সুস্থ জাতীয়তা বোধের পরিচয় দিয়েছেন এমন নয়, কোনো কোনো নাট্যকার দেশপ্রেমের

নামে উগ্রজাতীয়তাবাদকে প্রশ্রয় দিয়েছেন ও আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি ছারিয়ে সংকীর্ণতাকেই বড়ো করে দেখিয়েছেন। সীমান্তে চীনের সশস্ত্র হটকরিতার নিন্দা করতে গিয়ে এধরনের নাট্যকাররা গোটা কমিউনিস্ট দুনিয়াকেই আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে কমিউনিজমের মুণ্ডপাত করে ছেড়েছেন। কমিউনিস্ট রাষ্ট্র সোভিয়েত দেশ যে ভারতের বন্ধু সেকথা তাঁরা বিস্মৃতই হয়েছিলেন। সেই বিস্মৃতি তখন মারাত্মক ভুলের দিকে নিয়ে গিয়েছিল আজ বোধ হয় তাঁদের অনেকেই তা স্বীকার করবেন—কারণ সোভিয়েত রাষ্ট্র যে সব দিক থেকেই ভারতহিতৈষী ও অকৃত্রিম বন্ধু, তা বোধ হয় আর প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। কেবল সোভিয়েত রাষ্ট্রই বা কেন, যে কোনো সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রই যে ভারতের সবচেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য মিত্র তাও একাধিক বার প্রমাণিত হয়েছে। দুর্দিনের বন্ধুই তো প্রকৃত বন্ধু। মনে রাখা দরকার অন্ধ আবেগের দ্বারা তাড়িত হয়ে বিচারবুদ্ধি ও স্বচ্ছ দৃষ্টিশক্তি হারালে উত্তেজনা ও বিদ্বেষ বশত মিত্রকেও শত্রুরূপে চিহ্নিত করা অসম্ভব নয়। সুতরাং জাতীয় জীবনের প্রতিটি কর্মকাণ্ডের যথার্থ মূল্যায়ন করার সময় আন্তর্জাতিক দৃষ্টিও স্বচ্ছ থাকা চাই।

যেসব ঘটনার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া জাতীয় জীবনে ব্যাপক, সামান্য সমাজচেতনা ও দায়বোধ থাকলে সেগুলো ধরা তেমন কঠিন নয়। কিন্তু সমাজের অভ্যন্তরে প্রতিনিয়ত এমন কতগুলো বিপরীত শক্তির দ্বন্দ্ব ও সংঘাত হচ্ছে, গভীর অনুসন্ধিৎসা না থাকলে সেগুলো ধরা যায় না আর বিশ্লেষণশীল মন না হলে সেগুলোর কার্যকারণও বোধগম্য হয় না। সেসব সংঘাত কোথাও আঞ্চলিক, কোথাও প্রাদেশিক, আবার কোথাও সর্বভারতীয়। অবস্থার তারতম্য অনুযায়ী সেসব ঘটনার বিস্ফোরণেও তীব্রতার পার্থক্য থাকে দাহ্য বস্তুর প্রকৃতি ও গুণাগুণ অনুযায়ী। সাম্প্রতিক কালে এ ধরনের উপদ্রব বেশ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। সাম্প্রদায়িকতা তো আছেই ; তাছাড়া দেখা যাচ্ছে প্রাদেশিকতা, উগ্র আঞ্চলিকতা, ভাষা-জেহাদ,

হরিজন নির্যাতন প্রভৃতি ঘটনাগুলির প্রাবল্য। রাজনৈতিক ইন্ধন পেয়ে নানা স্থানে নানা আকারে এগুলো আত্মপ্রকাশ করে সংহতির বদলে বিভেদকেই বাড়িয়ে তুলছে। বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যটা সেখানে শুধু মানবতার দোহাই পেড়ে ঐক্যবোধ আনা কঠিন। বিভেদ সৃষ্টির অনুকূল ক্ষেত্র তৈরি করাই ছিল বৃটিশ শাসকদের লক্ষ্য। দেশের বৃহত্তর অংশকে অনগ্রসর রেখে কেবল বৈষয়িক ক্ষেত্রেই নয়, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও বিপুল জনসমষ্টিকে পশ্চাদপদ রাখার যে ব্যবস্থা বৃটিশ আমলে হয়েছিল, স্বাধীনতা লাভের পরে গত সাতাশ বছরেও কি তা বিদূরিত হয়েছে? গ্রামাঞ্চলে সামন্ততান্ত্রিক শোষণ ব্যবস্থা আজও বিদ্যমান। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পুঁজিবাদী শোষণ। শিক্ষার অভাব সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও তারা সামন্ততান্ত্রিক ধ্যানধারণ নিয়েই আছে। তাদের ওপর প্রভুত্ব করে আসছে সমাজের শিক্ষিত ও বিত্তবান একটি ক্ষুদ্র শ্রেণী। কি বৈষয়িক ক্ষেত্রে কি সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তাদেরই আধিপত্য। তাদের স্বার্থের অনুকূল যা তাই সেখানে নিয়মকানুন বিধিবিধান। তার ব্যতিক্রম হলেই তারা রুদ্র রূপ ধারণ করে। মনুষ্যত্ব বা মানবতার কোনো মূল্য নেই সেখানে। এর বিরুদ্ধে কোথাও প্রতিবাদ হলে আর নিস্তার নেই—অমনি দণ্ডবিধানের ব্যবস্থা তা যতই নিষ্ঠুর ও নৃশংস হোক। আবার মানুষের অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কারকে মানুষের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্যে দলবদ্ধ হিংসাত্মক কাজে উস্কিয়ে দেয়া হয় গোষ্ঠী বিশেষকে। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের সাম্প্রতিক হাঙ্গামাগুলির মূল কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে সমাজের বৃহত্তর অংশের অনগ্রসরতার সুযোগ নিয়ে কায়েমী স্বার্থই এসব ঘটনা ঘটায় আর ক্ষমতার লোভে প্রতিক্রিয়াশীল ও সুবিধাবাদী রাজনৈতিক নেতারা সেগুলো হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেন।

এই বিষক্রিয়া থেকে কোনো রাজ্য মুক্ত এমন কথা হলপ করে বোধ হয় কেউ বলতে পারবেন না। দুস্তর বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক ব্যবধান যেখানে সেখানে বিভেদের বীজও নিহিত। বিভেদের

কারণগুলি বিদূরিত না করে মিলনের সেতু রচনা করা কি সম্ভব? এটা অবধারিত যে, অর্থনৈতিক মুক্তি না পেলে প্রকৃত সাংস্কৃতিক মুক্তিও নেই। আর্থিক স্বাবলম্বিতা অর্জিত না হলে শিক্ষার বিস্তার কি ভাবে সম্ভব, আর শিক্ষা না পেলে সাংস্কৃতিক উৎকর্ষই বা হয় কি ভাবে? সামাজিক ক্ষেত্রে এই ব্যবধানই আজ জাতীয় সংহতির পথে প্রধান অন্তরায়। বিষের বীজ থেকে চন্দন বৃক্ষের আশা করা বৃথা।

সমাজের এই বৈষম্য সম্পর্কে আমাদের নাট্যকারগণ অচেতন নন। এ সম্বন্ধে রাষ্ট্রযন্ত্রকে সচেতন করতেও তাঁরা সচেষ্ট। তরুণ নাট্যকারদের মধ্যে যে establishment-এর বিরুদ্ধে একটা জেহাদ দেখা যাচ্ছে তার মূলে রয়েছে সমাজজীবনে বৈষম্যজনিত পুঞ্জীভূত গ্লানি। যেখানে বাস্তব অবস্থার দাবি দ্রুত পরিবর্তন, সেখানে রাষ্ট্রযন্ত্রের শ্লথগতিতে চলা বা পৌনঃপুনিকতা স্বাভাবিক ভাবেই প্রতিকারকামী যৌবনকে চঞ্চল বিক্ষুব্ধ করে। ক্রুদ্ধ যৌবন যে অনেক সময় বিপথগামী হয় তার নজির পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক ইতিহাসেই আছে। একদল ক্রুদ্ধ নাট্যকারের রচনায়ও তার প্রতিফলন দেখা যায়। প্রতিকার সম্পর্কে তাঁদের ঐক্যমত না থাকলেও একটি বিষয়ে তাঁরা একমত—establishment-কে আঘাত করতে হবে। এক কথায় তাঁরা Shocker, Establishmentকে ভেঙে কাকে সেখানে বসানো হবে সে সম্পর্কে অনেকেরই অস্পষ্ট ধারণা, আর কারা ভাঙবে সে সম্বন্ধেও খণ্ডিত বুদ্ধি। লক্ষ্য স্থির না থাকায় অনেক ক্ষেত্রে তীব্র লক্ষ্যচ্যুতই হয়। তার ফলে একটা anarchic চিন্তা কোনো-কোনো-ক্ষেত্রে উঁকিঝুঁকি মারে। বহু নাটকেই দেখা যায় ব্যর্থ যৌবনের নিষ্ফল আক্রোশ। আবার সংগ্রামকাতর যৌবনের বিষন্নতাকেও বড়ো করে দেখান কেউ কেউ। সাম্প্রতিক একাঙ্কক নাট্যগুলিতেই এসব লক্ষণ বেশি প্রকট।

বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের চৈতন্যে উদ্বুদ্ধ নাট্যকাররা শ্রেণীচরিত্র

রূপায়নে অধিক আগ্রহী। তাঁদের নাটকে দেখা যায় কোন একটি চরিত্র অঙ্কনের সময় তার শ্রেণীগত বৈশিষ্টগুলির দিকে তাঁরা নজর রাখেন এবং সংগ্রামে কোন ব্যক্তিবিশেষকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় না রেখে সামষ্টিক পটভূমিকেই দাঁড় করান। প্রতিকূল চরিত্র রূপায়নের সময়ও তার শ্রেণীস্বার্থ সংশ্লিষ্ট উপাদানগুলির দিকে তাঁরা দৃষ্টি দেন। এর জন্যে প্রয়োজন হয় সমাজজীবনে শ্রেণী-বিন্যাসের দিকে গভীর দৃষ্টিপাত, ব্যক্তি ও সমষ্টি জীবনের উপর অর্থ নৈতিক ধর্মীয় ও সামাজিক প্রভাবের মূল্যায়ন ও উৎপাদন ক্ষেত্রে চরিত্রেব ভূমিকা নির্ণয়। তার অর্থ চরিত্রগুলি আসে সামাজিক সত্তা নিয়ে—নাট্যকারের ভাবের দাস হয়ে নয়। নাট্যকার তাঁর ভাবনার দ্বারা সেগুলি সাজিয়ে নিজের বক্তব্য উপস্থিত করেন, দেখাতে চান সমাজের অভ্যন্তরে দ্বান্দ্বিক নিয়মে কিভাবে বৈপ্লবিক প্রক্রিয়া চলেছে। এরূপ র‍্যাশনাল নাট্যকার সংখ্যায় খুব বেশি না থাকলেও বিরূপ নন। তাঁরা উত্তেজনার পেছনে না ছুটে ঐ ধরনের নাটক একটির পর একটি দিয়ে বাংলা নাট্যসাহিত্যকে জীবনের কাছাকাছিই রেখে চলেছেন। আবার ফাঁকা বিপ্লবের কৃত্রিম আবেগ সৃষ্টি করে সস্তায় বাহবা পাবার আশায় অতি বিপ্লবীয়ানাও কারো কারো নাটকে দেখতে পাওয়া যায়। হটাৎ চমক লাগিয়ে দেবার প্রবণতা তাঁদের অভ্যস্ত বেশি। সম্ভব অসম্ভব তাঁরা মানেন না। যেমন ইচ্ছে ঘটনা ঘটান, নিছের অভিলাস অনুযায়ী চরিত্রগুলিকে দিয়ে কাজ করান—সেগুলো হলো নাট্যকারের হাতের পুতুল। তাঁদের সৃষ্ট চরিত্রগুলি কোনো বিধিবিধানের ধার ধারে না, কোনো সামাজিক বা পারিবারিক বন্ধন তাদের নেই; সেজন্য চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত। শুধু উত্তেজনা ও উন্মাদনা সৃষ্টিই লক্ষ্য, জীবন সম্পর্কে ভাবিয়ে তোলার চেষ্টা নেই। নাট্যকারের নিজের motive টাই সেখানে একমাত্র নিয়ামক শক্তি - চরিত্রের নিজস্ব কোনো logic থাকে না। শ্রেণী সংগ্রামের নামে খুনের প্রবণতাও কোনো কোনো নাটকে দেখা যায়। আবার প্রতিকূল শক্তিকে

কোথাও কোথাও এমন ভয়ঙ্কর করে তোলা হয় যে তা দেখে দর্শক মনে বিভীষিকাই জন্মে যা দেখে প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের স্পৃহা দমে যাওয়া অসম্ভব নয়। কার্যত বিপ্লবের নামে এসব নাটক প্রতিবিপ্লবকেই পুষ্ট করে—তার কারণ কল্পিত বিপ্লবী চরিত্রগুলির সঙ্গে দর্শকদের আবেগগত ঐক্যবোধ আসে না—তারা নাটকীয় ঘটনাগুলি থেকে মননে বিচ্ছিন্ন হয়েই থাকে, একাত্মবোধ করে না। বাস্তব জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন বিপ্লবের আরোপিত ধারণা আত্মিক যোগ ঘটাতে অসমর্থ।

এসব ব্যত্যয় ও ব্যতিক্রম থাকা সত্ত্বেও যে সব সাম্প্রতিক বাংলা নাটক শ্রেণী-বৈষম্য দূরীকরণের দিকে অঙ্গুলি সংকেত করছে, জাতীয় সংহতি বিধানে সেগুলোর অবদান অবশ্যই স্বীকার্য। যিনি যত ব্যাখ্যাই করুন, ভেদবুদ্ধির পেছনে যে আছে বৈষয়িক অসাম্য, তা কি সজ্ঞানে অস্বীকার করা যায়? আর এই বৈষম্য টিকিয়ে রাখার জন্যে যেখানে শ্রেণীগত প্রয়াস সেখানে তার বিরুদ্ধে সংগ্রামও হবে শ্রেণীগতই। সুতরাং আজকের পাটকে যদি সমাজের এই বৈষম্যকে তুলে ধরা ও তা দূরীকরণের অভিপ্রায়ে শ্রেণী-সংগ্রাম স্থান পায় তবে আঁতকে ওঠার কারণ নেই। রূপান্তরের জন্য শ্রেণী-সংগ্রামের অস্তিত্ব যখন সমাজে রয়েছে তখন সমাজসচেতন নাট্যকারদের ওপর তার প্রভাব না পড়ে পারে না। অচেতন ভাবে যাঁদের সেদিকে দৃকপাত নেই তাঁদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু সচেতন ভাবে তা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা যাঁদের তাঁরা জাতির প্রধান সমস্যা থেকেই সযত্নে নিজেদের চিন্তা দূরে রেখে কার্যত পলায়নী মনোবৃত্তিরই পরিচয় দেন। একমাত্র তথাকথিত নাট্য যশোপ্রার্থী রূপেই তাঁদের চিহ্নিত করা চলে।

সামাজিক দায়দায়িত্ব অস্বীকার করে আধুনিকতার নামে এই বিচ্ছিন্নতার প্রবক্তা রূপে সম্প্রতি কতিপয় নাট্যকার আমাদের এখানে আসর জমিয়েছেন। তাঁদের প্রেরণাস্থল আমাদের দেশের মানুষের জীবনপ্রতিষ্ঠার দাবি নয়, পাশ্চাত্য দেশের অবক্ষয়ী চিন্তা। মানুষের ঐক্যবদ্ধ সামাজিক জীবন বা কর্মপ্রয়াসে তাঁদের আস্থা নেই,

বুর্জোয়া জগতের একঘেয়েমি ও পৌনঃপুনিকতা সেখানকার মানুষের মনে যে নৈরাশ্য, জীবনবিমুখতা, অন্তর্মুখীনতার নামে আত্মকেন্দ্রিকতা এনেছে তাই নাকি চরম সত্য; মানুষের ঐক্যবোধটা তাঁদের কাছে myth মাত্র। মানুষ যেখানে একা সেখানেই তার মুক্তি। এই কারণেই এ গোষ্ঠীর কাছে নিঃসঙ্গতা, পৌনঃপুনিকতা, বিচ্ছিন্নতাই একমাত্র সত্য—লক্ষ্যহীন পথ পরিক্রমার পর মৃত্যুর গহ্বরে পদক্ষেপই নাকি জীবনের একমাত্র পরিণতি। তাঁদের মতে সেই কারণেই মানুষ মৃত্যুভয়ে সদা সঙ্কিত ও বিষণ্ণ। ধ্বংসের আতঙ্ক সর্বদা মানুষের মনে। মানুষের এসব জীবনবিমুখ চিন্তা নাটকে আনাই নাকি আধুনিকতা। আধুনিক আখ্যায় ভূষিত এসব নাটক এক শ্রেণীর দর্শকের বাহবা পাচ্ছে। এ ধরনের চিন্তার প্রচারক হয়ে কোনো নাট্যকার যখন রাষ্ট্রীয় পুরস্কারে সম্মানিত হন তখন বিস্ময়ে চোখ বিস্ফারিতক রে ভাবতে হয়, দেশের বৈষয়িক উন্নয়নের জন্যে পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা নিয়ে সরকারের এত মাথা ব্যথা কেন? পৌনঃ-পুনিকতাই যেখানে চরম সত্য সেখানে পরিবর্তনের জন্যে এত আয়াস কিসের জন্য? নিঃসঙ্গ জীবনেই যেখানে চরম সার্থকতা সেখানে মানুষের মধ্যে ঐক্যবোধ এনে জাতীয় সংহতি বিধানের প্রয়াস চালিয়ে কি লাভ? রাষ্ট্রের কর্ণধারদের জাতীয় কর্মোদ্যোগ ও সাংস্কৃতিক ধ্যান-ধারণার মধ্যে যেখানে এমন স্ববিরোধ সেখানে শিল্প কর্মকে জাতি গঠনের উপযোগী করে তুলবার জন্যে হিতোপদেশের মূল্য কি?

এ ধরনের আধুনিকতাবাদীরা বলে থাকেন, সমকালীন বাস্তবতায় নতুন অর্থ ও নতুন দিগন্ত খুঁজে বার করাই আধুনিকতা। কিন্তু প্রশ্ন, এই নতুন অর্থ ও নতুন দিগন্ত খুঁজে বার করার পদ্ধতিটি কি হবে? নিশ্চয়ই যা হারিয়ে গেছে তা খুঁজে বার করা নয়। সমকালীন মেজাজটিকে ধরাই আসল কাজ। আমাদের দেশে সমকালীন মেজাজটিতো দেখা যায় ক্ষয়িষ্ণু প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে নব নব সম্ভাবনার সংগ্রাম। এই সংগ্রামে সৎ ও অসৎ বেছে নিয়ে

সং বস্তুটিকে বাড়িয়ে দেয়াই যদি হয় আধুনিকতা তবে আধুনিকতা, বাস্তবতা ও প্রগতিশীলতার মধ্যে কোনো প্রভেদ থাকে কি? সৃজনশীল সাহিত্যের ওপর সমকালীন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক প্রভাব সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকলেই তাকে বলা যায় আধুনিকতা। 'নতুনের জন্যেই নতুন' বললেই তা আধুনিকতা হয় না।

তথাকথিত আধুনিকতার পূজারীরা বলে থাকেন, আজকের আধুনিকতার বিশেষ লক্ষণগুলি হলো মতাদর্শে বিতৃষ্ণা, ব্যক্তি সর্বস্বতা, তার মনস্তাত্ত্বিক পরিধি, আপন ব্যক্তিত্ব স্বীকার, তার একাকীত্ববোধ এবং মৃত্যু চিন্তায় তার বিশেষ আগ্রহ। রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, মানসিক অস্থিরতা, আত্মিক যন্ত্রণা, সাংস্কৃতিক মূল্যহীনতাই নাকি আধুনিক লেখকদের প্রধান উপজীব্য। মূল্যগুলি বিনষ্টির পথে বলেই নাকি মূল্যবোধহীনতা। আরো তাঁদের বক্তব্য যে, নিঃসঙ্গতা-বোধ নাকি কোনো বিশেষ লেখকের একার নয়, শুধু নিষ্ঠুর ও কুটিল সমাজে যে কোনো অনুভূতিশীল মানুষই একাকীত্ব বোধ করে।

এসব চিন্তা ও ধারণা তো পাচনশীল পুঁজিবাদী সমাজেই আসতে পারে। সমাজতান্ত্রিক দেশের কথা ছেড়ে দিলেও কোনো উন্নয়নশীল দেশেরই পরিবর্তনকামী জনসাধারণের প্রধান মেজাজের সঙ্গে এসব নেতিবাচক ধারণা কি মেলে? বর্তমানে পুঁজিবাদী সমাজে ভাঙ্গন চলেছে, ক্ষয়িষ্ণু সমাজ কাঠামো মৃত্যুর মুখে, তার অতীত গৌরবের দিন নিঃশেষ হয়ে আসছে। সেই অবস্থায় সেসব দেশের শিল্পীদের মনে অনিশ্চয়তাবোধ, সংশয়, দ্বিধা ও হতাশা আসা খুবই সম্ভব আর তারই দরুণ এই বিচ্ছিন্নতা ও নিঃসঙ্গতাবোধ।

কিন্তু এটাই কি বিশ্বের সমকালীন সমূহ সত্য? একটি সভ্যতা যখন মরণোন্মুখ তখন তারই পাশাপাশি তো আর একটি সভ্যতার অভ্যুত্থান ও ক্রমবিকাশ দেখা যাচ্ছে। কতগুলি মূল্য যেমন

ক্ষীয়মান তেমনি কতগুলি নতুন মূল্যও তো আবার বেরিয়ে আসছে। আশাভঙ্গ হয়ে হা-হুতোশ কেন! আশা পূরণের নয়া নয়া সম্ভাবনাও তো দেখা দিচ্ছে। আকাঙ্খার দীপ নিভে যাবে কেন! অভীষ্ট লাভের সুযোগগুলি তো এখন হাতের কাছেই—চোখ খুলে হাত বাড়ালেই পাওয়া যায়। ক্ষয়িষ্ণু সমাজের দিকে চেয়ে হতাশায় নিজেকে বিচ্ছিন্ন না ভেবে বর্ধিষ্ণু সমাজের দিকে চেয়ে ঐক্যের বন্ধন দৃঢ় করতে উদ্যোগ নিলেই তো হয়।

অতীতকে বেশি মূল্য দিলেই মনের ওপর এরূপ কালো ছায়া পড়ে বর্তমানকে দেখার দৃষ্টি আছন্ন করে দেয়। হতাশায় বিহ্বল হয়ে নতুন সমস্ত সম্ভাবনাকেই অস্বীকার করার প্রবণতা জাগে। সৃজনশীল শিল্পের উদ্দীপনশক্তিতে বিশ্বাস যখন কোনো শিল্পী হারিয়ে ফেলেন তখন সব কিছুতে বিতৃষ্ণা ও হতাশাই হয় তার সম্বল—নতুন দিগন্ত আবিষ্কারের নামে তিনি আরো নৈরাশ্যের অন্ধকারেই ডুব দেন আর তখনি তাঁর কাছে একমাত্র সত্য হয়ে উঠে নিঃসঙ্গতা ও মৃত্যু। সেই অবস্থায় তিনি তাঁর নিজের subjectivity-র গণ্ডিতে বন্দী হয়ে পড়েন। জীবন তখন তাঁর কাছে মাধুর্যহীন, জীবনের অস্তিত্ব তাঁর কাছে একঘেয়েমি। মতাদর্শে তিনি আস্তা হারিয়ে ফেলেন। মতাদর্শই তো মানুষকে কর্মের প্রেরণা জোগায় ও তার মধ্যে ঐক্যবোধ এনে দেয়। সেই মতাদর্শে আস্থা হারালে নৈরাজ্যবাদী হয়ে নিষ্ক্রিয়তা ও নিঃসঙ্গতা প্রচার করা ছাড়া পথ থাকে কি?

তথাকথিত আধুনিকতাবাদীরা বলেন পচনশীল সমাজ ব্যবস্থাটা তঁারা মেনে নিতে পারেন না বলেই তার বিরুদ্ধে তাঁদের বিদ্রোহ। বিদ্রোহটা কি ধরনের? সমাজের বাইরে নিয়ে ব্যক্তিকে দাঁড় করানোটাই বিদ্রোহ? তার অর্থ বাস্তবিক জগৎ থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়া, জীবন গঠনের প্রয়োজনীয় দিকগুলিকে অস্বীকার করা। তাঁদের কাছে চূড়ান্ত আত্মকেন্দ্রিকতাই নাকি স্বাধীনতা।

সেটা তো আপন বিবরে নিজেকে আবদ্ধ করা। সমষ্টিজীবন থেকে ব্যক্তিকে বিচ্ছিন্ন করার অর্থ দাঁড়ায় মূল প্রবাহ থেকে একটি ধারাকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে ডোবায় ফেলা যেখানে জন্মাবে শুধু পাঁক, রোগবীজাণু ও দুর্গন্ধ। এটাকেই যদি বিদ্রোহ বলা হয় তবে হিপ্পিরাও তো বিদ্রোহী। তারাও তো অত্যাচারী সমাজের বিরুদ্ধে তাদের ঘৃণা প্রকাশ করছে লম্বা চুল রেখে, অদ্ভুত পোষাক পড়ে, আফিং ও হাশিস খেয়ে নেশা করে, যদৃচ্ছ যৌনাচরণ চালিয়ে ও চালচলনে অস্বাভাবিকতা দেখিয়ে।

পচনশীল সমাজ ব্যবস্থায় বীতস্পৃহ হয়ে কেউ যদি তা পরিবর্তনের জন্যে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ও সমাজকে রূপান্তরিত করার পথ খোঁজে তাতে আপত্তি করার কিছু নেই। একজন বিজ্ঞানী যেমন তার গবেষণাগারে বর্তমানকে স্বীকার করে নিয়েই ভবিষ্যতের সম্ভাবনা আবিষ্কার করেন এবং সেই গবেষণালব্ধ ফলের দ্বারা বর্তমান বাস্তবের বৈপ্লবিক রূপান্তরের জন্যে বেরিয়ে আসেন, তেমনি সমাজের গ্লানিতে কারো মনে বিদ্রোহ দেখা দিলে নির্জনতার প্রয়োজন হতে পারে সেই সমাজের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের পথ আবিষ্কারের জন্যেই। এটাকেই বলা যেতে পারে 'সকলের সঙ্গে' আবার 'সকলের জন্যেই নির্জনবাস'। শিল্পীর ক্ষেত্রে এটা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। সকলের সঙ্গে তিনি থাকেন ও তাদের সংগ্রামে অংশীদার হন। তারপর তিনি নিজেকে নির্জনতায় নিয়ে যান ও নিজের সঙ্গে সংগ্রাম করেন। অতঃপর শিল্প সৃষ্টি করে তিনি তাঁর সেই সম্পদ নিয়ে আবার ফিরে আসেন সমষ্টির মধ্যে। নির্জনে সাধনা, আর মনের দিক থেকে নিঃসঙ্গতা, এক নয়। সমষ্টির জীবন প্রবাহ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে একাকীত্বের কোটরে শূন্যতার রোগে ভোগা নিশ্চয়ই সুস্থ চিন্তার লক্ষণ নয়। সেই রিক্ত অবস্থায় হতাশা, বিষণ্ণতা ও মৃত্যুই একমাত্র সত্য বলে প্রতীয়মান হয়।

আমরা যখন জাতির ভবিষ্যৎ গড়ার কথা বলি তখন যদি

এসব জীবন-বিমুখ চিন্তা আমাদের মধ্যে স্থান পায় তবে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোনো আশা থাকে কি? অথচ সম্প্রতি নতুন কিছু করার নামে আধুনিকতার ব্যানারে এসব ধার করা বিকৃত চিন্তাই কোনো কোনো নাট্যকার তাঁদের নাটকে আমদানি করছেন এবং নবনাট্য আন্দোলনের ছত্রতলে তাঁরা প্রগতিশীল আখ্যাও পাচ্ছেন। তাঁদের আধুনিকতা আর বাস্তবের প্রগতিশীলতা যে বিপরীত পথের যাত্রী, তা অনুধাবনের প্রয়োজন আছে। এই তথাকথিত আধুনিকতার পৃষ্ঠপোষক উচ্চ মহলেও কিছু আছে আমাদের দেশে। বাইরের ইন্ধন থাকাও অসম্ভব নয়। বুদ্ধিজীবীদের বুদ্ধিভ্রংশ ঘটাবার এও হয়তো একটা কৌশল।

এই এলোমেলো চিন্তার আর একটা বিষময় ফলও দেখা যাচ্ছে ইদানিং। চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকের প্রগতিশীল নাট্য ধারাটিকে ব্যবসায়িক থিয়েটারগুলি সরাসরি গ্রহণ না করলেও তার প্রভাব থেকে একেবারে মুক্ত ছিল না। নাটক নির্বাচনের সময় তাঁরা দেখতেন খানিকটা প্রগতিশীল কথা তাতে আছে কিনা না। অবশ্য তাঁদের মতো করেই তাঁরা সে সব কথা বলাতেন। সামাজিক জীবন ও তার সমস্যা সম্পর্কে নিরঙ্কুশ অবহেলা বা ঔদাসীন্য দেখা যেত না। কিন্তু অধুনা নিছক আমোদ প্রমোদের উদ্দেশ্যে বিস্তর কদর্যতাও আমদানি হচ্ছে সেখানে। একদা যে থিয়েটারের কর্ণধার নাট্যোন্নয়নের কীর্তন গাইবার জন্যে জমকালো আসর বসাতেন তিনি এখন ক্যাবারে নর্তকী ছাড়া নাটকের কথা ভাবতেই পারেন না। নট ও প্রযোজক রূপে যিনি ক'বছর আগে প্রগতিশীল মহলে পিঁড়ে পেয়েছিলেন তিনি এখন দোর্দণ্ড প্রতাপে একটি নাটকে যৌন বেসাতির পসার জমিয়েছেন। সেই বেসাতির প্রসাদ গুণে মুগ্ধ হয়ে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, অধ্যক্ষ, অধ্যাপক, প্রধান শিক্ষিকা থেকে শুরু করে সাহিত্যিক, প্রথিতযশা প্রবীণ নাট্যকার পর্যন্ত প্রশংসা পত্র দেন তখন স্বাভাবিক ভাবেই বলতে ইচ্ছে হয়—কিমাশ্চর্যম্ অতঃপরম্। একটি মুমূর্ষু

ব্যবসায়িক থিয়েটারে সম্প্রতি যিনি মূলধন জুগিয়েছেন তিনি নাকি চেয়েছিলেন স্টেজে ক্যাবারে নর্তকী আমদানি করতে। সেই থিয়েটারের কর্মীরা আদর্শের পতাকাটা অতখানি অবনমিত করতে রাজী না হওয়ায় অগত্যা তাঁকে নিরস্ত হতে হয়। শুনেছি কোনো কোনো যাত্রার দলও ক্যাবারে নর্তকী খুঁজে বেড়াচ্ছে। সব ব্যবসায়িক থিয়েটার হয়তো অতটা নাবতে পারেনি। তবে আবরু রেখে নাচগানের জলসা বসিয়ে দর্শক টানবার প্রয়াসে কেউ পিছিয়ে নেই।

সুতরাং এই ত্রিভঙ্গ দশা থেকে উদ্ধার করে বাংলা নাটককে সুস্থ ও সবল অবস্থায় দাঁড় করাতে হলে যাঁরা মানুষের জীবনের প্রতিষ্ঠা ও প্রগতিতে বিশ্বাসী তাঁদেরই শক্ত হাতে হাল ধরতে হবে। কিন্তু মুঠোটা শিথিল হয়ে যায় যখন পায়ের তলায় জমি থাকে না। সত্যি কথা বলতে কি যাঁরা তিন দশকেরও অধিককাল যাবত নিষ্ঠার সঙ্গে নাট্য সাধনা করে আসছেন, প্রলোভন যাঁদের আদর্শ থেকে এক চুলও সরিয়ে নিয়ে যেতে পারেনি, তাঁদের দাঁড়াবার স্থান কিন্তু আজ পর্যন্ত হয়নি। না আছে তাঁদের মঞ্চ, না আছে অর্থ, না আছে সহায়সম্বল। শুধু দেশের কথা ভেবে, বঞ্চিত-নিপীড়িত সাধারণ মানুষের মুখের দিকে চেয়ে, হাজার রকমের অসুবিধে থাকা সত্ত্বেও দারিদ্র্য ও কৃচ্ছ্রতাকে জীবনের সাথী করে নিয়েই তাঁরা জনজীবনকে উদ্দীপিত করার ঐকান্তিক ইচ্ছায় নাটক দিয়ে এসেছেন এবং দিচ্ছেন। যশ-মান-অর্থের প্রত্যাশায় তাঁরা একাজ করেন নি—এটা তাঁদের জীবনের ব্রত। কিন্তু তাঁদের প্রতি স্বাধীন দেশের সরকারের কর্তব্য নিশ্চয়ই আছে। সে কর্তব্য পালন না করে, যাঁরা কুনাট্যের বদলে সুনাট্য দিয়ে অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সত্যকার সংগ্রাম করছে তাঁদের জীবনের ও নাট্যকর্মের সহায়তা না করে, কেবল 'অপসংস্কৃতি-অপসংস্কৃতি' বলে চীৎকার করলেই অপসংস্কৃতি ভয়ে পালাবে না। কুশিল্পকে কোণঠাসা করতে হলে জনরুচি পরিবর্তনের জন্যে সুশিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করা অবশ্য দরকার।

অবশেষে এমন একটি সাংস্কৃতিক মিলন মঞ্চের আয়োজন করার জন্যে আমাদের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায় ও বিভাগীয় কর্মীদের ধন্যবাদ জানিয়ে অনুরোধ করব, এখানেই যেন সমাপ্তি না হয়, এটা হোক সূচনা—অর্থাৎ বোধনেই যেন বিসর্জনের বাজনা না বাজে। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আমাদের বহু রকমের দুর্বলতা আছে। আমরা দূর দেশের সাহিত্যের খবর রাখি, কিন্তু পাশের প্রতিবেশী রাজ্যের সাহিত্যকর্ম সম্বন্ধে উদাসীন ; এমন কি নিজ রাজ্যের বিভিন্ন জেলার সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গেও তেমন পরিচয় নেই। চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে সর্বভারতীয় স্তরে একটি সাংস্কৃতিক মিলনমঞ্চ ছিল গণনাট্য সংঘ। সেখানে কাশ্মীর থেকে কন্যা কুমারিকা, গুজরাট থেকে মনিপুর পর্যন্ত সমস্ত প্রদেশ ও অঞ্চলের সাংস্কৃতিক সম্পদের পরিবেষণ ও বিনিময় হতো। পারস্পরিক মেলামেশা ও আলাপ-আলোচনার দ্বারা একে অন্যের নাটক, নৃত্য ও সঙ্গীত জানা ও বোঝার সুযোগ পেতেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় সেটি প্রায় বিলুপ্ত। এখানে-সেখানে পকেট হিসেবে দুচারটি সংস্থা এবং অল্পবিস্তর শিল্পপ্রয়াসের অস্তিত্ব থাকলেও গণনাট্য সংঘের সেই সর্বভারতীয় সংগঠন ও মঞ্চ আর নেই। আজ আমরা বিচ্ছিন্ন বললেই হয়। রাজ্য সরকার যদি উদ্যোগী হয়ে পূর্বভারতীয় সাংস্কৃতিক কর্মীদের একটি স্থায়ী মিলন-মঞ্চ করে দিতে পারেন, আমরা ধন্য হব। নিজস্ব একটি সেমিনার হল পেলে মাঝে মাঝে আমরা মিলিত হয়ে পারস্পরিক আলোচনার দ্বারা মত বিনিময় ও বিভিন্ন রাজ্যের শিল্পসাহিত্যের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে নিজেদের অবহিত করতে পারি। আদান-প্রদানের দ্বারা সাংস্কৃতিক মানোন্নয়নে তা হবে সহায়ক। আমি আশাবাদী। তাই সরকারের কাছে এই আরজি রেখে এবং সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়েই বক্তব্য শেষ করি। জনগণ অমর, আর শিল্পও অমর।

# ত্রিপুরায় নাট্য আন্দোলন

ডঃ রণেন্দ্রনাথ দেব

ত্রিপুরা পূর্বভারতে অবস্থিত একটি অঙ্গরাজ্য। এর তিনদিক ঘিরে রয়েছে বাংলাদেশ। অপরদিকটি আসাম ও মিজোরামের সন্নিহিত। একদা অখণ্ড বাংলার একপ্রান্তে ছিল ত্রিপুরা। স্বাধীনতার পর দেশ দ্বিখণ্ডিত হল। ভৌগোলিক দিক থেকে ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্ট হল। কিন্তু চিন্তার দিক থেকে, ভাবের দিক থেকে ত্রিপুরার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের যোগ কখনো ছিন্ন হয় নি।

ত্রিপুরা ছিল নৃপতিশাসিত স্বাধীন রাজ্য। উনিশশো সাতচল্লিশ সালের পর তার রাজনৈতিক পটভূমি দ্রুত পাল্টে যায়। আটচল্লিশ সালে ত্রিপুরার ভারতভক্তি সম্পূর্ণ হয়। গত পঁচিশ বছরে ত্রিপুরার জনজীবনে বিপুল পরিবর্তন এসেছে। বর্তমানে ত্রিপুরার জনসংখ্যা ষোল লক্ষের অধিক। এরমধ্যে দশলক্ষ ব্যক্তি বাংলাভাষী। কিন্তু বাঙালিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও ত্রিপুরায় আরো বহু উপজাতির বাস। সুপ্রাচীন কাল থেকে এখানে বাস করছেন ত্রিপুরী, রিয়াং, জমাতিয়া, নোয়াতিয়া, হালাম, চাকমা প্রভৃতি অনেক উপজাতি। এঁরাও উন্নত সংস্কৃতির অধিকারী। এঁদের সবাইকে নিয়ে ত্রিপুরার বিচিত্র বিমিশ্র সাংস্কৃতিক জীবন গঠিত।

বাংলা ভাষার প্রতি ত্রিপুরার মহারাজদের অনুরাগের ফলে এখানে দীর্ঘকাল ধরে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের চর্চা চলেছে। বাংলা ভাষা ছিল এখানকার রাজকার্যে ব্যবহৃত ভাষা। আজো সেই ভাষা অনুকরণযোগ্য। মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য কিশোর কবি রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার সমাদর করে তাঁকে স্বরাজ্যে আহ্বান করেছিলেন। পরবর্তী মহারাজগণ— রাধাকিশোর, বীরেন্দ্রকিশোর, বীরবিক্রম—সেই কবি

সমাদরের ঐতিহ্য সযত্নে রক্ষা করেছেন। এঁদেরই প্রচেষ্টায় হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বৃত্তিলাভ করেন; দীনেশচন্দ্র সেনের "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হবার সৌভাগ্য লাভ করে। রবীন্দ্রনাথও ত্রিপুরার দ্বারা কতখানি প্রভাবিত হয়েছিলেন তা "রাজর্ষি" উপন্যাসে, "বিসর্জন" নাটকে স্বপ্রকাশ।

এটা খুব স্বাভাবিক যে ত্রিপুরায় নাটকের যেটুকু চর্চা হয়েছে তা বাংলা নাটকেরই চর্চা। বাংলাসাহিত্য ছিল ত্রিপুরনৃপতিদের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়। বাংলা নাটকেও তাঁরা যথোচিত উৎসাহ দিয়েছিলেন। বাংলা রমঙ্গঞ্চের বয়স হল এক শতাব্দী। এই শতবর্ষের ইতিহাস বৈচিত্র্যপূর্ণ। এর বিচিত্র অভিঘাত সুদূর ত্রিপুরাকেও অনুভূত হয়েছে। মহারাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় ত্রিপুরায় বরাবরই ভালো অভিনেতাদের উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। বাংলার শ্রেষ্ঠ নাটকগুলির অভিনয় হয়েছে ত্রিপুরার রঙ্গমঞ্চে।

গত পঁচিশ বছরে নাটকের অভিনয়ক্ষেত্রে যে জিনিসটি সর্বাগ্রে চোখে পড়ে তা হল এর ব্যাপক প্রসার। একসময় অভিনয় ছিল রাজপ্রাসাদ কেন্দ্রিক। অভিজাত ব্যক্তিদের উপভোগের বস্তু। আজ তা সর্বসাধারণের আয়ত্তে। ভালো মঞ্চের অভাবে অভিনেতারা বহু অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছেন এতদিন। সাধারণতঃ বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয়গুলির ক্যাম্পাস-হল ছাড়া অভিনয়োপযুক্ত মঞ্চ ছিল দুর্লভ। কিছুকাল পূর্বে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ হওয়াতে অভিনেতাদের পক্ষে তা হয়েছে আশীর্বাদস্বরূপ। অভিনয়প্রিয় জনসাধারণের কাছে রবীন্দ্রভবনের দ্বার উন্মুক্ত হওয়াতে নাট্যচর্চায় নতুন জোয়ার এসেছে বললে অত্যুক্তি হবে না।

যে সকল নতুন সংস্থা গত কয়েক বছরে অভিনয় দক্ষতার জন্যে সুখ্যাতি লাভ করেছেন তাদের মধ্যে নাম করতে হয়—রঙ্গম, রূপম, রূপারোপ, নেপথ্য, ঘরোয়া, তিয়াস, মুখোস, নির্মোক, অনামী, রূপায়ণ, লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপ প্রভৃতির। এগুলি প্রত্যেকটিই শক্তিশালী

অভিনেতা-অভিনেত্রী সমন্বয় গঠিত। বলাবাহুল্য ত্রিপুরায় কোন পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ নেই। উপরোক্ত দলগুলি সৌখিন অভিনেতৃ সঙ্ঘ। কিন্তু সৌখিন দল বললে এঁদের অভিনয় কৃতিত্বকে খর্ব করা হয় না। গতযুগে সবচেয়ে নামকরা অভিনেতা ছিলেন ত্রিপুরেশ মজুমদার, শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বর্তমানে কৃতী অভিনেতাদের মধ্যে বিখ্যাত হয়েছেন আশিস চক্রবর্তী, সুবোধ দে, সুধীর দাস, মানস গাঙ্গুলী, জলধর মল্লিক, অমরেন্দ্র রক্ষিত, রামপদ মুখোপাধ্যায়, শক্তি হালদার প্রভৃতি। আরো বহু দক্ষ অভিনেতা রয়েছেন। এঁদের সবার নাম স্বল্প পরিসরে উল্লেখ করতে পারলাম না বলে দুঃখিত। একজনের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। ইনি শ্রীহেমেন্দুশঙ্কর রায়চৌধুরী। ব্যক্তিগত জীবনে ইনি প্রখ্যাত শল্যচিকিৎসক। ইনি ও শ্রীমতী রায়চৌধুরী কর্মব্যস্তার ফাঁকেও অভিনয়ের মান-উন্নয়নে প্রচুর পরিশ্রম করে থাকেন।

সাধারণতঃ ত্রিপুরায় অভিনয়ের জন্যে উৎপল দত্ত, বাদল সরকার, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, রতনকুমার ঘোষ প্রভৃতি আধুনিক নাট্যকারদের নাটক নির্বাচিত হয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথের "রাজা" নাটকের অভিনয়ও হয়েছে কিছুদিন পূর্বে। "বিসর্জন" তো সর্বকালের প্রিয় নাটক। একটি দল—"রূপম" আধুনিক অ্যাবসার্ড নাটকেরও অভিনয় করেছেন। স্যামুয়েল বেকেটের একটি নাটকের বঙ্গানুবাদ সার্থকভাবে অভিনীত হয়েছে ত্রিপুরায়।

ত্রিপুরায় অধিবাসীদের মধ্যে যাঁরা মৌলিক নাটক রচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে স্মরণ করতে হয় দুজনের কথা—শ্রীগোপাল দে ও শ্রীঅজিত মজুমদার। এঁদের রচিত নাটকও কয়েকবার অভিনীত হয়েছে। আজকাল কোনো কোনো নাট্যসম্প্রদায় নিজেরাই বিদেশী নাটকের অনুবাদ করে নিচ্ছেন, অথবা কোন বিখ্যাত কাহিনীকে নাট্যরূপ দান করেছেন। এঁদের এই প্রয়াসও প্রশংসিত হবার যোগ্য।

লক্ষ্য করতে হবে, অভিনেতারা মুখ্যতঃ কলকাতার নাট্যকারদের

উপরেই বেশি নির্ভরশীল। বাংলা নাটকের অভিনয়ে এটা বোধহয় অপ্রতিরোধ্য। কলকাতায় বাংলা নাটকের যে বলিষ্ঠ ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে তার প্রভাব থেকে মুক্ত থাকা বঙ্গভাষী আর একটি এলাকার পক্ষে প্রায় অসম্ভব। তবে অভিনয়ের ক্ষেত্রে অভিনেতারা অনেক-ক্ষেত্রেই স্বাতন্ত্র্য প্রদর্শন করেছেন। তাঁরা হুবহু কলকাতার মঞ্চের অনুসরণ করেন নি। নাট্যরচনায় না হলেও নাট্য প্রযোজনায় এঁরা স্বকীয়ত্বের ছাপ রেখে গেছেন।

এই প্রসঙ্গে তথ্য ও প্রচার দপ্তরের লোকরঞ্জন শাখার উল্লেখ করাও কর্তব্য। এঁদের লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট, পরিধি সীমাবদ্ধ। সুতরাং অন্যান্য অভিনেতৃসঙ্ঘের সঙ্গে এঁদের তুলনা করা সঙ্গত হবে না। সুতরাং লোকরঞ্জন শাখার অভিনীত দুয়েকটি নাটক অনেকের মনে দাগ কেটে গেছে। বিশেষতঃ স্বল্প সঞ্চয় পরিকল্পনা নিয়ে রচিত "তিলোত্তমা" নাটকটির কথা না বললে অন্যায় হবে।

ত্রিপুরার সাম্প্রতিক নাট্যচর্চার কথা খুব সংক্ষেপে আপনাদের কাছে উপস্থিত করলাম। ত্রিপুরার জনসংখ্যার আয়তন অনুপাতে অভিনয়কারীদলের সংখ্যাপ্রাচুর্য ও বৈচিত্র্যের প্রতি উন্মুখতা যে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই পটভূমিকায় আমি দুয়েকটি বিষয়ের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

বর্তমান সম্মেলনে পূর্বভারতে নাট্যচর্চার কথা বিশেষতঃ জাতীয় সংহতিরক্ষায় নাটকের অবদানের কথা আলোচিত হবে। পূর্বভারত বহুভাষা ও বহু জনসমষ্টি নিয়ে গঠিত। ভারতের আর কোনো প্রান্তে এত বিচিত্র জনজাতি, এত বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতির সমাবেশ দেখা যায় না। সেইজন্য এককথায় পূর্বভারতে নাট্যচর্চার পরিচয় দেওয়া কারো পক্ষে সুসাধ্য নয়। অসমীয়া অথবা মনিপুরী অথবা খাসিয়া ভাষা আমাদের অতি নিকটবর্তী এলাকার ভাষা হলেও এদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় অতি ক্ষীণ। আসামে, মনিপুরে, মেঘালয়ে নাট্যচর্চা কতদূর উন্নতি লাভ করেছে তা আমাদের অজ্ঞাত। যদি পূর্বভারতের বিভিন্ন

অঞ্চলের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগসূত্রটিকে আরো দৃঢ় করতে হয় তাহলে ভ্রাম্যমাণ অভিনেতৃসঙ্ঘকে রাজ্যান্তরে অভিনয় প্রদর্শনের সুযোগ দেওয়া বাঞ্ছনীয়। ভাষার ব্যবধান এখানে বড় প্রতিবন্ধক নয়। বাংলা রঙ্গমঞ্চের বিকাশ ইতিহাস যাঁরা পাঠ করেছেন তাঁরাই জানেন একশো বছর আগে সুদূর পাঞ্জাবে বাংলা নাটকের অভিনয় হয়েছে ও তা জন-সমাদর লাভ করেছে। নাটকের সু-অভিনয় ভাষার প্রাচীরে রুদ্ধ হয় না। অসমীয়া, অথবা মনিপুরী, অথবা খাসিয়া অথবা মিজো ভাষায় যে নাটক রচিত হচ্ছে তা দেখলে বাঙালি দর্শকেরাও আনন্দিত হতে পারবেন, যেমনভাবে তাঁরা আনন্দিত হন আসামের বিহুনাচ কিংবা মিজোদের বাঁশনৃত্য দেখে।

দ্বিতীয় কথাটি এই যে নাটক জাতীয় জীবনের সঙ্গে অতি নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ এবং জাতীয় জীবনের বৈশিষ্ট্য নাটকে অনিবার্যতঃ প্রতিবিম্বিত হয়। সাহিত্যের অন্য কোনো শাখা নাটকের মতো জাতীয় চরিত্রের নিয়ত অনুগামী নয়। পূর্বভারতে নতুন নতুন নাট্যকার অভ্যুদয় হলে এঁরা জাতীয় বৈশিষ্ট্যের নব নব আলেখ্য তুলে ধরতে পারবেন নাটকের মধ্য দিয়ে। এখানে একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। বছর দুয়েক পূর্বে ত্রিপুরা সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত একটি নাট্যরচনা প্রতিযোগিতায় বিচারকরূপে দাখিল-করা কয়েকটি নাটকের পাণ্ডুলিপি পাঠ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। এদের মধ্যে দুচারটি নাটকের কথা আজো আমার মনে আছে। অপরিচিত ও অপেক্ষাকৃত তরুণ নাট্যকারদের রচনায় ত্রিপুরার সাম্প্রতিক জীবন ও সমস্যাদি কোথাও কোথাও এত নিপুণভাবে রূপায়িত হয়েছিল যে পাঠকালে আমি একটি নতুন ধরনের নাট্যবিষয়ের আস্বাদে পরিতৃপ্ত হয়েছিলাম। তরুণ নাট্যকারদের অভ্যুদয়ের জন্য আমরা সাগ্রহে অপেক্ষমান। এরা পূর্বভারতের জীবন-কথা অকৃত্রিমভাবে উপস্থাপিত করে নাটকের দিগন্তকে বহুদূরে প্রসারিত করতে সক্ষম হবেন।

পূর্বে বলেছি, ত্রিপুরার জনসংখ্যার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ বঙ্গভাষী হলেও এখানকার মাটি সু-প্রাচীনকাল থেকে বহু জনজাতির দ্বারা অধ্যুষিত। এই সকল জনজাতির সকলের ভাষা সমানভাবে বিকশিত হয়নি। কিন্তু একটি জনজাতি যতই ক্ষুদ্র হোক তার নিজস্ব সংস্কৃতির বিকাশের জন্য তার ব্যাকুলতা থাকবেই। ত্রিপুরা রিয়াং প্রভৃতি ভাষায় জনসাধারণের সুবোধ্য নাটক রচনা করা খুব কঠিন নয় বলে আমাদের ধারণা। নতুন মৌলিক নাটক রচিত না হওয়া পর্যন্ত অন্যভাষা থেকে নাটক রূপান্তরিত করে এ সকল ভাষায় প্রদর্শিত হলে জনসাধারণের অন্তরের একটি সু-চিরপোষিত কামনা চরিতার্থ হবে। একাজে তথ্য ও জনসংযোগ দপ্তর অগ্রণী হয়ে নাট্যরচয়িতা তথা নাট্যানুবাদকের উৎসাহ দিতে পারেন।

প্রায় ত্রিশ-বত্রিশ বছর আগে জাতীয় জীবনের আরেক আলোড়ন মুহূর্তে বাংলা নাটক গতানুগতিকতার পথ ছেড়ে নতুন পথে যাত্রা করেছিল। সে পথ ধরে আবির্ভূত হয়েছিল "নবান্ন", "জবানবন্দীর" মত গণচেতনায় উদ্বুদ্ধ নাটক। তখনকার বিশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতির জন্য ত্রিপুরায় নবনাট্য-আন্দোলনের প্রভাব প্রসারিত হতে পারে নি। "নবান্নে"র মতো দুর্জয় প্রাণবেগচঞ্চল নাটকের অভিনয় দর্শন থেকে ত্রিপুরাবাসীরা ছিলেন বঞ্চিত। আমরা আশা করবো নতুন উদ্দীপনা নিয়ে ত্রিপুরার তরুণ নাট্যকারেরা জনজীবনের কাছাকাছি এসে দাঁড়াবেন। তাঁদের সৃষ্টি শুধু ত্রিপুরার রসিকচিত্তকে নন্দিত করবে না, সমগ্রভাবে পূর্বভারতের সাংস্কৃতিক জীবনকেও করবে সমৃদ্ধ।

# স্বাধীনতার পরবর্তীকালে পূর্বভারতে নাটকের অগ্রগতি

তরুণ রায়

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে নাটকের অগ্রগতির বিষয় আলোচনা করতে হলে স্বাধীনতার আগের দিনের কথা কিছুটা বলে নেওয়া দরকার। আরও বিশেষ করে এই জন্যে যে, সে সময়টা ছিল একটা সন্ধিক্ষণ। অভিনেতা প্রধান যুগের সমাপ্তি, আর গোষ্ঠী থিয়েটারের সূচনা।

বাংলা থিয়েটারের ধারাবাহিকতার দিকটা দেখতে গেলে মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা যায়।

(১) গিরিশ যুগ, বা নাট্যকার প্রধান যুগ। দ্বিতীয় হল, শিশির যুগ বা অভিনেতা-প্রধান যুগ আর, তৃতীয় হল নবনাট্য আন্দোলন-বা গোষ্ঠী-থিয়েটার যার বিস্তৃতি স্বাধীনতার পর। অর্থাৎ আগের দুটি যুগ হল স্বাধীনতার আগে। সংক্ষেপে এই নিয়ে আলোচনা করা দরকার।

প্রথম হল গিরিশ যুগ, কারণ সে সময় যতগুলি রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হয়েছিল বলতে গেলে প্রায় সব গুলিরই সৃষ্টি কর্ত্তা গিরিশচন্দ্র। তিনি যদি নাটক লেখবার জন্য কলম না ধরতেন, বাংলা রঙ্গমঞ্চ-দীর্ঘ জীবী হত না। প্রয়োজনের তাগিদে একশ'রও বেশী নাটক তিনি লিখেছেন, কারণ তখনকার দিনে নাটক আজকাল কার মত বহু রাত্রি অভিনীত হত না। নাটুকে দর্শক অত ছিল না। তার উপর রাজ-রোষ তো ছিলই। ইংরাজ সরকার হঠাৎ হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে কোন কোন নাটকের অভিনয় বন্ধ করে দিত। কিন্তু তাই বলে রঙ্গশালা বন্ধ হত না। দু-একদিনের মধ্যেই নতুন নাটক লিখে গিরিশচন্দ্র

মঞ্চস্থ করতেন। সেইজন্যে বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে কোন ছেদ পড়েনি। একটার পর একটা নতুন থিয়েটার জন্মেছে, হয়তো একটা থিয়েটার ভেঙ্গে আরও দুটো থিয়েটার হয়েছে, যেরকম ন্যাশানাল থিয়েটার ভেঙ্গে হয়েছিল হিন্দু ন্যাশানাল থিয়েটার বা পরে গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটার। কিন্তু ধারাবাহিকতা ভঙ্গ হয়নি।

গিরিশ যুগের অপর একটি নাম দেওয়া যায় নাট্যকার প্রধান যুগ, দীনবন্ধু মিত্রের নাটক দিয়েই সাধারণ রঙ্গালয়ের যাত্রা সুরু হয়। সঙ্গে সঙ্গে মধুসূদনের নাটক অভিনয় হতে থাকে, রাম নারায়ণ তর্করত্নের প্রহসন-ও নাট্যশালাকে পুষ্ট করে। হরলাল রায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যার, যতীন্দ্রনাথ ঠকুর, সকলের নাটকই বিভিন্ন মঞ্চে মঞ্চস্থ হয়েছে, এঁরা ছাড়া গিরিশচন্দ্রের সমসাময়িক আরও যাঁরা স্বনামধন্য নাট্যকার ছিলেন তাঁরা হলেন, অমৃতলাল বসু, রাজকৃষ্ণ রায়, মনমোহন বসু, কৃষ্ণ মিত্র, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও ক্ষিরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ। এঁরা বিভিন্ন রসের নাটক লিখে বাংলার নাট্য সাহিত্যকে যথেষ্ট পরিমাণে পুষ্ট করছেন।

গিরিশ যুগের পর শিশির যুগে আসার মাঝখানে প্রথম মহাযুদ্ধ। এসময় বাংলা থিয়েটারে কিছুটা ভাঁটা পড়েছিল কিন্তু শিশির-কুমারের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আবার তা প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। শিশির যুগের অপর নাম, অভিনেতা-প্রধান যুগ। এ সময় আমরা দেখতে পাই স্বনামধন্য অভিনেতা এবং অভিনেত্রীদের। দুর্গাদাস বন্দোপাধ্যায়, অহীন্দ্র চৌধুরী, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, নরেশ মিত্র, তিনকড়ি চক্রবর্তী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, যোগেশ চৌধুরী, বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, প্রমুখ অভিনেতা এবং তারাসুন্দরী, প্রভাদেবী, রাণীবালা প্রভৃতি অভিনেত্রীরা বিভিন্ন মঞ্চে অভিনয় করেছেন।

শিশির যুগে নাট্য প্রযোজনায় আরও যত্ন নেওয়া হত। দৃশ্যপট, রূপসজ্জা, বেশভূষা আগের দিনের চেয়ে বেশি মাত্রায় বিজ্ঞান সম্মত ছিল।

কিন্তু যা ছিল না তা হল নাটক। নাট্যকারের অভাব ছিল বলেই পুরোনো নাটকগুলি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অভিনয় করা হত। আর নয়ত বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের লেখা উপন্যাসের নাট্যরূপ। এই যুগের সংযোজন ঘূর্ণায়মান মঞ্চ। দৃশ্যের পর দৃশ্য ঘুরিয়ে উপন্যাসের নাট্যরূপ মঞ্চস্থ করা হত। ফলে মৌলিক নাটক, আগের যুগের মত আর লেখা হলনা। সেইজন্য মনে হয় এই ঘূর্ণায়মান মঞ্চ বাংলা থিয়েটারের ক্ষতিই করেছে।

আজও আমাদের পেশাদার মঞ্চ কলু'র চোখ-বাঁধা বলদের মত এক জায়গাতেই ঘুরে যাচ্ছে, এগুচ্ছেনা এক পাও।

এ যুগে যাঁরা নাটক লিখেছেন বলতে গেলে তাঁরা সকলে প্রায় ফরমাশ মত লিখতেন। দুর্গাদাস, অহীন্দ্র, রাণীবালাদের সামনে রেখে, তাঁদের যাতে অভিনয় করার সুবিধে হয়, সেই মত ফরমাশী নাটক এঁরা লিখতেন। সবগুলিই প্রায় মঞ্চসফল নাটক। কিন্তু ঐ অভিনেতারা মঞ্চ থেকে সরে যাবার পর ঐ সব নাটকের অভিনয় আর হয়না।

কল্লোল যুগের শক্তিমান লেখকরা শিশিরকুমারের কাছে যাতায়াত করতেন, একথা আমরা পড়েছি। কিন্তু শিশিরকুমার তাঁদের নাটক লেখার জন্যে উৎসাহ দেননি। এটা বাংলা থিয়েটারের দুর্ভাগ্য।

শিশির যুগের শেষের দিকে দ্বিতীর মহাযুদ্ধ, এই সময়ে আবার বাংলা থিয়েটারে ভাঁটা পড়ে। এই হল নবনাট্য আন্দোলনের সূচনা। অর্থাৎ গোষ্ঠী প্রধান যুগ। 'নবান্ন' যার মাইল স্টোন। এর মূলে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের অবদান অনস্বীকার্য। কিন্তু একই নিশ্বাসে এ কথাটাও বলে নেওয়া দরকার যে, গণনাট্য বাংলা থিয়েটারের যত না উপকার করেছে, তার চেয়ে বোধ হয় অপকার করেছে বেশী। নাটকের মধ্যে রাজনীতির ইনজেকশান দিতে শিখিয়ে এমন সব উদ্ভট নাট্যকারের সৃষ্টি করেছে যাদের লেখা নাটক দেখতে সত্যিই আতঙ্ক হয়। নাটকে রাজনীতি নিশ্চয় থাকবে, কিন্তু তা যদি স্রেফ্ ময়দানের

বক্তৃতা হয়ে দাঁড়ায়, তবে আর তাঁকে নাটক আখ্যা দেওয়া কেন? মার্কস সাহেব তো ভাল ভাল কথাই বলেছেন এবং তার উপর ভিত্তি করে ব্রেখ্‌ট্‌-এর অতুলনীয় নাটকও তো আমরা পেয়েছি। কিন্তু কাঁচা হাতে পড়ে ঐ কথাগুলোই যে কত নীচু স্তরের শ্লোগানধর্মী নাটকে পরিণত হতে পারে তার উদাহরণ বহু নামকরা গোষ্ঠীর অভিনীত নাটকে দেখতে পাচ্ছি।

এবার আসছে স্বাধীনতার পরবর্তী যুগের কথা। কিন্তু তার আগে আর একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা হওয়া দরকার। এই তো সেদিন সাতই ডিসেম্বর বাংলা পেশাদার থিয়েটারের একশ বছর পূর্ণ হল। আমরা দেখলাম অনেকে ঐ দিনটি স্বাগত জানালেন, আবার অনেকে ঐ দিনটির বিশেষ গুরুত্ব দিলেন না, মুখ ফিরিয়ে নিলেন—তাঁদের মত—বাংলা থিয়েটারের কোন ঐতিহ্য নেই।

প্রশ্নটা এইখানে।

মনে হয় এ বিষয় নিয়ে খোলাখুলি, সহজ ভাষায় একটা আলোচনা হওয়া দরকার।

সত্যিই কি বাংলা থিয়েটারের কোন ঐতিহ্য নেই। এ নিয়ে বলার আগে ঐ ঐতিহ্য শব্দের মানেটা পরিস্কার করে নেওয়া উচিৎ। যা কিছু ঘটছে, আগে ঘটেছে, তা হল ইতিহাস। কিন্তু এই ইতিহাসই যখন ভবিষ্যতের কর্মধারাকে উৎসাহিত করে, অনুপ্রেরণা যোগায় তখন তা হয় ঐতিহ্য। যদি বাংলা থিয়েটারের ঐতিহ্য না থাকত তাহলে কলকাতা আর কলকাতা থাকত না (নাট্যমোদীদের কাছে), দিল্লী হয়ে যেত। দিল্লীতে আলকাজীর মত প্রতিভাধর প্রযোজকের রসোত্তীর্ণ হিন্দী নাটকের প্রযোজনা এখনও পর্যন্ত বেশি দর্শক আকর্ষণ করতে পারে না। কারণ হিন্দী থিয়েটারের কোন ঐতিহ্য নেই। অথচ বাংলা, মারাঠি, গুজরাটি থিয়েটারের বেলা একথা সত্য নয়। এসব ভাষায় অভিনীত নাটকের দর্শক আছে। কারণ বাংলা মারাঠি গুজরাটি ভাষার থিয়েটারের ঐতিহ্য আছে।

জানি এই খানেই ইংরাজী ভাষার পণ্ডিতরা আপত্তি তুলবেন। তাঁরা তুলনা করবেন ইংরাজী থিয়েটারের ঐতিহ্যের সঙ্গে। এ তুলনা করা উচিত নয়, কারণ ইংরেজী থিয়েটারের পেছনে রয়েছে গ্রীক থিয়েটার, রোমান থিয়েটার। স্বয়ং শেক্সপীয়র চারশ' বছর রাজত্ব করে চলেছেন সারা পৃথিবী জুড়ে। যে বৃটিশ সাম্রাজ্য সূর্য অস্ত না যাওয়ার গর্ব করত, সে-তো এখন অন্ধকারে দিন কাটাচ্ছে, অথচ ঐ ভদ্রলোকের পরমায়ু দিন দিন বাড়ছে। সেই ইংরাজী থিয়েটারের ঐতিহ্যের সঙ্গে বাংলা থিয়েটারের নিশ্চয় তুলনা করা চলে না।

একথা ঠিক সংস্কৃত নাটকের সঙ্গে বাংলা থিয়েটারের বিশেষ কোন যোগ নেই। তেমনি যাত্রার পালাগানের সঙ্গে সম্পর্ক শিথিল। কিন্তু রামনারায়ণ তর্করত্নের, 'কুলীন কুল সর্বস্ব' থেকে সুরু করে এখন পর্যন্ত যে সব নাটক লেখা হচ্ছে, এই সবের মধ্য দিয়েই প্রবাহিত হচ্ছে বাংলা নাটকের ধারা।

বিবর্তন আছে। গিরিশ যুগ থেকে শিশির যুগ আবার শিশির যুগ থেকে নবনাট্য আন্দোলন। এই আন্দোলন কথাটাই আসত না, যদি না বাংলা থিয়েটারের ঐতিহ্য থাকত। যদি ঐতিহ্য না থাকে, তাহলে আন্দোলন করছি আমরা কার বিরুদ্ধে। আন্দোলন করে আমরা ঐতিহ্যকে শুদ্ধ করে নিতে চাই। যা বাহ্য তাকে ফেলে দিতে চাই, নতুন অর্থ, নতুন ব্যঞ্জনা দিতে চাই। সেইজন্যই আন্দোলনের প্রয়োজন হয়, তাই 'নবান্ন'-র সময় থেকে নাট্য আন্দোলনের প্রয়োজন হয়েছিল। কিন্তু যারা আন্দোলনের জয়গান করতে বাংলা থিয়েটারের ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে, তারা যুক্তির উপর নির্ভর করে বলে মনে হয় না। পিছনে এই ঐতিহ্য না থাকলে "নবান্ন"—নাটকের প্রযোজনা সম্ভব হত না।

স্বাধীনতার পর থেকে গত পঁচিশ বছরে বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে বিভিন্ন গোষ্ঠী আত্মপ্রকাশ করেছে। যেমন, বহুরূপী, লিটল থিয়েটার, থিয়েটার সেণ্টার, রূপকার, শৌভনিক, নান্দীকার

প্রভৃতি। দলের নামগুলি পাশাপাশি সাজিয়ে দেওয়া হলেও মুড়িমিছরীর একদর বলছিনা। এদের প্রযোজিত নাটকের মানের যথেষ্ট তারতম্য আছে। তবে সামগ্রিক ভাবে দেখলে বোঝা যায় এরা জোর দিয়েছে টীম ওয়ার্কের উপর। বিজ্ঞানসম্মত আলোর ব্যাবহার, সেই মত মঞ্চ সজ্জা। যতদূর সম্ভব স্বাভাবিক অভিনয়।

নাট্যকার হিসেবে এরা নতুন করে আবিষ্কার করেছে রবীন্দ্রনাথকে, যাঁর নাটক আজ বাংলা থিয়েটারের গর্ব। এরা অনুবাদ করেছে বিদেশীনাট্যকারদের যুগধর্মী নাটক। অনেক সময় তার স্বার্থক রূপান্তরও ঘটিয়েছে।

অবশ্য এ থেকে খারাপ ফলও যে হয়নি তা নয়। অনেক নাট্যগোষ্ঠী আজও মনে করে বিদেশী নাটকের কঙ্কালের উপর দিশী গল্পের চামড়া পরিয়ে দর্শকের কাছে পরিবেশন করতে পারলে বদনামের আশঙ্কা অনেক কম। ফলে অনেকগুলি তৃতীয় শ্রেণীর বস্তা পচা বিদেশী নাটক বাংলা থিয়েটারে আমদানী করা হচ্ছে।

তবে একথা সত্যি এই সব নাট্যগোষ্ঠীর সুষ্ঠু প্রযোজনা ঝিমিয়ে পড়া পেশাদার মঞ্চকে যথেষ্ট ঝাকুনি দিয়েছে যেমন দিয়েছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আমাদের অর্থ নৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনকে। তার সূচনা আমরা দেখতে পেলাম 'ষ্টার'-থিয়েটারের শ্যামলী নাটকে। আগের তুলনায় অনেক ছিমছাম প্রযোজনা, বয়স অনুযায়ী চরিত্র অভিনয়, বুড়োরা আর যুবক সাজল না। যুবক, যুবতীদেরই নায়ক নায়িকার চরিত্র দেওয়া হল। নাটক চলল পাঁচশ রজনী। এরপর থেকে দেখা গেল রঙমহল, বিশ্বরূপা সব থিয়েটারেই রৈ রৈ করে নাটক চলছে। নাট্যগোষ্ঠী থেকে অনেক শিল্পী, পরিচালক নাট্যকার পেশাদার মঞ্চে সাময়িক ভাবে যোগ দিয়েছে। কোন কোন নাট্য-গোষ্ঠী নিজেদের দল নিয়ে পেশাদার মঞ্চে নিয়মিত থিয়েটার করেছে এবং অসামান্য সাফল্যও পেয়েছে। এ সময় থিয়েটার রাতের পর রাত

দর্শক টেনেছে। এমন কি হাজার রাত্রিরও উপর নাটকের অভিনয় হয়েছে, অবশ্য কিসের জন্য নাটক চলেছে তা বলা শক্ত। কোথাও দেখা গেছে আলোর খেলা, জল বা ট্রেনের ইলিউশন, কোথাও বা চিত্রাভিনেতার বক্স-ড্র, কোথাও বা দ্বৈত ভূমিকার ম্যাজিক। এ সবের সঙ্গে হয়তো নাটকও ছিল, হয়ত অভিনয়ও ছিল কিন্তু হলফ করে বলা শক্ত কিসের জোরে নাটক চলেছে। অনেকটা 'রথ ভাবে আমি দেব, পথ ভাবে আমি'র অবস্থা।

পেশাদার থিয়েটারের একশ বছর পূর্ণ হবার সঙ্গে সঙ্গেই নবনাট্য আন্দোলনেরও বয়স পঁচিশ বছর হয়ে গেল। এতদিন পর্যন্ত ছিল এই নাট্য আন্দোলনের বাহবা পাবার যুগ। কিন্তু এখন আত্ম সমালোচনার সময় এসেছে। এই নতুন যুগে আমরা কী পেয়েছি তার হিসেব করলে দেখব, নিঃসন্দেহে পেয়েছি খুব উঁচু দরের কয়েকটি নাট্য প্রযোজনা, পেয়েছি জন কয়েক চিন্তাশীল নির্দেশক, বেশ কিছু শক্তিশালী শিল্পী, কয়েকটি গর্ব করার মত মৌলিক নাটক আর অগণিত বোদ্ধা দর্শক। পঁচিশ বছরের হিসেবে এটা কম পাওয়া নয়। কিন্তু এই আন্দোলনের সুরুতে যে সব অতি উৎসাহীরা বাংলা থিয়েটারের ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে শুধু বর্তমানের ওপরই ভরসা করতে চেয়েছিলেন তাঁরা আশাকরি এতদিনে নিজেদের ভুলটা বুঝতে পেরেছেন। আবার উল্টোদিকে যাঁরা এই নাট্য আন্দোলনের মাধ্যমে কী পাইনি তার হিসেব মেলাতে বসে নৈরাশ্যবাদীদের খাতায় নাম লিখিয়েছিলেন, তাঁরাও আশাকরি এতদিনে বুঝতে পেরেছেন যে এভাবে ইতিহাসকে অগ্রাহ্য করলে তাঁরা ভুলই করবেন।

স্বাধীনতার পরবর্তী যুগে কয়েকটি নতুন নাট্যশালা হয়েছে যার ফলে নাট্য প্রযোজনার সুবিধা হয়েছে অনেক। বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য রবীন্দ্রসদন এবং কলামন্দির। মোটামুটি সবরকমের নাটকই এ-দুটি মঞ্চে অভিনয় করা চলে, দর্শকদের পক্ষেও যাতায়াতের

সুবিধা আছে। এদের চেয়ে কিছু ছোট হলেও এই অঞ্চলে আকাদেমি মঞ্চ এবং উত্তর কলকাতায় রঙ্গনা দুটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। বহু নাট্যগোষ্ঠী এই দুটি মঞ্চে নিয়মিত অভিনয় করছে। পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে দক্ষিণ কলকাতার মুক্ত-অঙ্গন এবং ক্ষুদে রঙ্গমঞ্চ থিয়েটার সেণ্টার ছোট ছোট নাট্যগোষ্ঠীদের যথেষ্ট সুযোগ করে দিয়েছে।

সরকারের পক্ষ থেকেও সহযোগিতা পেয়েছে এই নাট্যগোষ্ঠিগুলি প্রমোদকর থেকে অব্যাহতির মাধ্যমে। আগে কেবল মাত্র পেশাদার মঞ্চরাই এই সুযোগ পেত, কিন্তু প্রায় একযুগ হল, পশ্চিমবঙ্গ সরকার নাট্যদলগুলিকেও প্রমোদকর থেকে রেহাই দিয়েছেন। একথা আরও এইজন্য উল্লেখ করছি ভারতের অন্য অনেক প্রদেশে নাটকের উপর প্রমোদকর দিতে হয়।

আজকের বাংলা থিয়েটার তো রম্ রম্ করে চলছে। পেশাদার মঞ্চে রাতের পর রাত হাউসফুলের প্লাকার্ড ঝুলছে। শক্তিশালী নাট্য-গোষ্ঠীদের নাটক বহুরাত্রি অভিনীত হলেও দর্শকদের অভাব হচ্ছে না। আজ শহর কলকাতায় যে কোন সন্ধ্যাতেই দেখা যাবে—বিভিন্ন জায়গায় নাটক হচ্ছে। কতরকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা। কত ভিন্ন স্বাদের নাটক।

এ সবেরও সমালোচক আছে। তাঁরা বলবেন—ধ্রুপদী নাটকের পাশে চলছে সেক্স্ সর্বস্ব নাটক। আবার কোথাও বা নীচু স্তরের হালকা আমোদ প্রমোদ। এ সহাবস্থানে লাভ কি? উত্তরে বলব—এ বোধহয় এই শহরের বৈশিষ্ট্য। হাওড়া ব্রীজে দাঁড়ালে দেখা যায় মাল নিয়ে লরী যাচ্ছে, তার পাশে টেম্পো, আবার ঠেলাগাড়ীও। ওদেশে, শুনেছি, গাড়ীর নতুন মডেল বার হলে পুরোনো মডেলের গাড়ী আর কেউ চড়ে না। তাকে বাতিল করে দেয়। আর এখানে ঝক্ঝকে নতুন গাড়ীর পাশে ধুঁকতে ধুঁকতে চলেছে যুদ্ধের আগের মডেলের গাড়ী। এমন কি ঘোড়ায় টানা গাড়ী, মানুষে টানা গাড়ী, কোনটাকেই আমরা ফেলতে পারিনি।

ঠিক সেই রকম—থাকনা সবরকমের থিয়েটার, যা ভাল তা ঠিকই টিঁকে যাবে। আর যা মন্দ তা আপনা থেকেই খসে পড়বে।

আর যারা দর্শকদের মূল্যায়ন বোধ সম্বন্ধে আস্থা হারাচ্ছে তারা অন্ততঃ এইটুকু ভেবে সান্ত্বনা পাবে, প্রায় সব দেশের সাধারণ দর্শক থিয়েটার দেখতে গিয়ে টিকিটের কাউন্টার ফয়েলের সঙ্গে নিজের বুদ্ধিটাও গেট-কীপারের হাতে জমা রেখে তবে প্রেক্ষাগৃহে ঢোকে। অতএব এ নিয়ে হা-হুতাশ করার কি আছে? বক্স্ অফিস নির্ভর পেশাদারী মঞ্চের পাঁচ-মিশেলা নাটক এবং অ-পেশাদার গোষ্ঠীর পরীক্ষামূলক নাটক এ দুই মিলিয়ে বাংলা থিয়েটার। একটাকে বাদ দিয়ে আর একটা নয়। এই দুই-র সমন্বয়ে ঘটবে এক নতুন থিয়েটারের বিবর্তন—যার সার্থক রূপ দিতে পারে একমাত্র জাতীয় নাট্যশালা। যে নাট্যশালা বক্স্ অফিসের উপর নির্ভর করে চলবে না। যেখানে আমরা দেখতে পাব বাছাই করা প্রথম শ্রেণীর শিল্পীদের, একজন দক্ষ নির্দেশকের পরিচালনায় অভিনয় করতে। যেখানে নির্ভয়ে মঞ্চস্থ হবে আজকের দিনের মৌলিক নাটক—যা তুলে ধরবে সমস্যা জর্জ্জরিত বর্তমান সমাজের ছবি, যা বুঝিয়ে দেবে আমরা কি হয়েছি। যেখানে থাকবে পুরোন নাটকের পুনরাভিনয়ের ব্যবস্থা, যা দেখিয়ে দেবে আমরা কি ছিলাম। যেখানে দেখতে পাব বিদেশী বা অন্য প্রদেশের নাটকের অনুদিত রূপ- যা আমাদের জীবনেব জানলা দরজাগুলো খুলে দেবে, যেখান দিয়ে ঢুকবে বিভিন্ন সংস্কৃতির আলো এবং হাওয়া। যেখানে থাকবে গবেষণা করার সুযোগ তবেই না আমরা খুঁজে পাব বাংলা থিয়েটারের আসল চেহারা।

# আধুনিক মণিপুরী উপন্যাসের গতিপ্রকৃতি

অধ্যাপক শ্রীনীলকান্ত সিং

পূর্বভারতের এই অনন্য সম্মেলনে আমাদের প্রতি কলকাতার সুধী সমাজের সম্মাননায় অনুপ্রাণিত হয়েই আমি সমসাময়িক মনিপুরী উপন্যাস ও ছোটগল্প প্রসঙ্গে আপনাদের সঙ্গে মত বিনিময়ে উদ্যোগী হতে সাহসী হয়েছি।

আধুনিকতা তত্ত্বটি বহুমুখীন। গুণ ও গভীরতার বিভিন্ন রূপাবয়ব এর অঙ্গীভূত। এ তত্ত্ব কালানুক্রমিক বিন্যাস সম্ভবতঃ অনুসরণ করে না। সমসাময়িক লেখক বলেই তিনি আধুনিক হবেন, এমন কোন কথা নেই। একটি অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা করার অনুমতি নিয়ে বলছি, গতকাল আধুনিক বাংলা কবিতা বিষয়ক অধিবেশনে প্রবীণ ও নবীন কবিদের মধ্যে আলোচনায় উত্তেজনা ও বিপরীতধর্মিতার প্রাবল্য ও বৈশিষ্ট্য আমাকে মুগ্ধ করেছে। প্রবীণ (বয়সের হিসেবে বলেই নয়) ও নবীনদের মধ্যে প্রতিষ্ঠা বনাম প্রতিষ্ঠাবিরোধী সে সংগ্রাম চলেছিল আক্ষরিক অর্থেই। রবীন্দ্রসাহিত্য থেকেও উন্নত ধারা প্রবর্তনে সচেষ্ট, স্বীয় যুগের মাপকাঠিতে বিপ্লবী কল্লোলপন্থীদের আন্তরিকতা সম্পর্কে 'এ্যাংরি' নব্য কবিগোষ্ঠীর চ্যালেঞ্জের মুখে তাঁদের সহসা সাবেকী হয়ে যাওয়ার দৃশ্যটি উপভোগ্য হয়ে ওঠে। এখানেই কলকাতার শ্রেষ্ঠত্ব—অসংগতিভরা এই নগরীতে দারিদ্র্য ও মালিন্যের পাশাপাশি চলেছে বুদ্ধিজীবীদের গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বান্বেষণ, বর্তমান পৃথিবীর বিভিন্ন চিন্তাশৈলীর প্রবাহ ও প্রতিপ্রবাঁহ বয়ে চলেছে এই ক্ষুদ্র জগতে। ১৯৭১ সালে প্যারী নগরীতে মূর্ত (কংক্রিট) কাব্য-আন্দোলনপন্থী

এক ফরাসী কবির সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। তাঁর চিন্তাধারা ও প্রকাশশৈলীর এক আশ্চর্য প্রতিধ্বনি শুনলাম গতকালের অধিবেশ-নাস্তিক কবি-সেনা বৈঠকে তরুণ কবিদের মূর্ত কবিতার আবৃত্তিতে। সত্যিই এ এক অসামান্য তাৎপর্যময় সমসাময়িক ঘটনা। যদি বলা যায়, প্রজন্মের ব্যবধান ('জেনারেশন গ্যাপ') ও নৈতিক মানের ব্যবধান থেকেই এই অসংযোগের সৃষ্টি হয়েছে তাহলে সেটা নিশ্চিতই এক সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় এবং কোন ব্যক্তি তার নিজ যুগের, এমন কি তার সমসাময়িক কবিতার মর্ম সত্যিই উপলব্ধি করতে পারছে কিনা সে-সম্পর্কেও সে কখনও সুনিশ্চিত নয়। গতকাল কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রবীণ ও নবীন কবিদের থেকে সবদূরত্বে অবস্থানের এক তত্ত্ব বেশ দ্বিধাভরেই উপস্থাপন করলেন। ঐ একই কথা আমার সম্পর্কেও প্রযোজ্য কিনা, সে সম্পর্কে আমি সন্দেহাতীত নই।

তাহলে আধুনিকতা কি? বিষয়টির আরও একটা দিক আছে। আধুনিকতা তত্ত্বটি কালানুক্রমিক বা সমসাময়িক যুগভিত্তিক কোন বিষয়বস্তু নয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী এর পরিধি বিস্তৃত। এই চিরন্তন ও নিত্যনূতন রূপটি কি শিল্পের চিরায়ত আবেদনে নিহিত নয়—যে রূপটি পাঠক বা দর্শকের সম্মুখে প্রতিবারই বিচিত্র বর্ণে প্রতিভাত হয়। শেক্সপিয়রের অন্তর্দ্বন্দ্ব-মথিত হ্যামলেট চরিত্রটি কি আধুনিক নয়? প্রখ্যাত বাঙালী পণ্ডিত আবু সয়ীদ আইয়ুব সম্প্রতি তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিকতা' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আধুনিকতার সন্ধান পেয়েছেন। জীবন সায়াহ্নে 'প্রথম দিনের সূর্য' শীর্ষক কবিতা রচনা করে রবীন্দ্রনাথ কি উৎকৃষ্ট আন্তরিকতাধর্মী কবিতা রচয়িতা সমকালীন কবিদের থেকে বেশী আধুনিক বলে পরিগণিত হননি? ইউরোপীয় কবিতার আলোচনায় প্রশ্ন জাগে যে, দুই কাব্য-যুগের স্রষ্টা কবি এলিয়ট কোন যুগে বেশী আধুনিক? 'ওয়েস্টল্যাণ্ড'-এর লেখক এলিয়ট—না, বিচক্ষণতা ও আত্মনিবেদনের ভঙ্গিতে ক্যাথলিক ধর্মমত গ্রহণকারী 'ফোর কোয়ার্টেস্'এর লেখক এলিয়ট? আমার

বক্তব্য হল, আধুনিকতা ধারণা ও অনুভূতির বস্তু, কালানুসারী বা যুগভিত্তিক নয়; মূল্যবোধের বস্তু, শতাব্দীভিত্তিক নয়—এ এমনই এক চিরন্তন প্রশ্ন প্রতিটি যুগকেই যা উত্থাপন করতে হবে। কি জাতীয় প্রশ্ন তিনি উত্থাপন করছেন ও সে প্রশ্নের গভীরতাই লেখকের আধুনিকতার নিরিখ হবে। 'আমার আত্মারই যদি অবমাননা ঘটল, তাহলে সারা পৃথিবী আমার পদতলে লুটিয়ে পড়লেই বা কি?'—ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যকে মৈত্রেয়ীর এ প্রশ্নটি এ যুগের প্রশ্ন—'আমি যদি আমার ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীনতাই হারাই, তাহলে ঐশ্বর্যশালী সমাজের সমস্ত ধন-সম্পদ নিয়েই বা আমি কি করব?'র মতই আধুনিক। 'ঈশ্বর মৃত' বলার মধ্যে আধুনিকতা কিছু নেই, চার্বাকপন্থীরা আগেই একথা বলে গেছেন। মানুষের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় ঈশ্বর তার হৃদয়ে মৃত কিনা—আঁদ্রে জিদের ফরাসী সাহিত্যে তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিঃসন্দেহে আধুনিক। ঈশ্বর মৃত—জঁা পল সার্ত্রের অভিমতানুসারী এ তত্ত্ব প্রমাণ করার সংগ্রামে জিদ্ নিরন্তর অন্তর্বেদনা বোধ ও অন্তহীন নির্যাতন ভোগ করেছেন।

আধুনিকতার প্রশ্নে আমি বিমূঢ় হয়ে পড়েছি। প্রসঙ্গটি প্রায় সীমা ছাড়িয়ে গেছে। এবার আমি আধুনিক মনিপুরী ছোটগল্প ও উপন্যাস প্রসঙ্গে ফিরে আসছি। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও কালীপ্রসন্ন ঘোষের ঐতিহ্য-লালিত আধুনিক মনিপুরী সাহিত্যের বয়স প্রায় আশী বছর। পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রভাব ত এ সাহিত্যে সুস্পষ্ট। আমি আপনাদের উপর নামের বোঝা চাপিয়ে দেব না। তথাপি ডঃ কমল, খ চাওবা, হিজৈন, ঔগঝঞলা সিং, ডোরেন্দ্রজিৎ সিং, নবদ্বীপচন্দ্র ও এস মুরেকেতন সিং প্রমুখ কবি ও লেখকদের নাম বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। স্বভাবতঃই এঁরা রোমান্টিক ঐতিহ্যপন্থী এবং এঁদের পর স্বল্প সংখ্যক লেখক যতটুকুই উন্নতি সাধন করে থাকুন-না-কেন, সে-সবই নয়া রোমান্টিক ঐতিহ্য প্রসূত। মনিপুরী সাহিত্যে বাস্তবতা অতি

আধুনিক ঘটনা। এটা প্রধানতঃ ত্রিশ থেকে চল্লিশ বছর বয়সী তরুণ লেখকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং তাঁরা সকলেই মোপাসাঁ, শেকভ, প্রেমচাঁদ ও শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে অনুপ্রাণিত। এঁদের মধ্যে সাধারণ মানুষের জন্য প্রগাঢ় অনুভূতিপ্রবণ এম কে বিনোদিনী দেবী, প্রবল সর্বহারা প্রেমিক এস নীলবীর শাস্ত্রী, বিষণ্ণতাবাদী খ্ প্রকাশ সিং, কিছুটা মতভেদ সত্ত্বেও প্রাচীন মূল্যবোধে বিশ্বাসী এ আনো সিং, উদার প্রাকৃতিক পরিবেশে পল্লী জীবনের সৌন্দর্যাবিষ্কারক ঈ রজনীকান্ত সিং, খণ্ডবিখণ্ড সমাজের একঘেয়েমি ও হতাশাবোধে ক্লীষ্ট এন শ্রীরীরেন সিং প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে এঁদের অধিকাংশই প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

১৯৬০ সাল থেকে একদল এগংরিই শুধু নয়—হাংরিও বটে, লেখকের আবির্ভাবে একটা নূতন প্রবণতার সৃষ্টি হয়েছে। এঁরা প্রতিষ্ঠিত গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানালেন তাকে ভাঙতে প্রয়াসী হলেন, লাভ করলেন শূন্যতা—আর কিছু না হোক, তাঁদের হৃদয়ে শূন্যতা সঞ্চারিত হল। এঁরা প্রকাশ ভঙ্গির স্বাধীনতা গ্রহণ করে দুর্বোধ্য ও অশালীন শব্দ চয়ন করলেন অভিঘাত-চিকিৎসা প্রয়োগের একমাত্র উদ্দেশ্য চরিতার্থতার জন্য। জীবন ও সমাজের কোন মূল্যই এঁরা খুঁজে পান না এবং ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কেও নিশ্চিত নন। সমসাময়িক যুগের অনিষ্টপ্রবণতার সমস্যা এঁদের চেতনায় আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং স্বীকৃতি লাভের আশায় এঁরা বাস্তুহারা বা 'হিপ্পিদের' মত ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু আমি সানন্দে জানাচ্ছি যে, সমালোচক ও জনগণ এঁদের বেশ কয়েক জনকেই স্বীকৃতি দিয়েছেন। সমসাময়িক কাব্য ও কবি-সেনা আন্দোলনপন্থী কতিপয় প্রতিভাধর ও তরুণ বাঙালী কবির ভাগ্য এক্ষেত্রে, এঁদের তুলনায়, বিশেষ সুপ্রসন্ন নয়। এর কারণ খুবই সরল, মনিপুরী সাহিত্য ক্ষেত্রে বর্তমানে জি সি টংব্রার মত পঞ্চাশ বা ষাটের কোঠার দু-একজন ছাড়া কবি বলে গণ্য হতে পারেন এমন কেউ

তরুণ লেখকদের রচনায়ই আমরা সামাজিক পরিস্থিতির অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় খুঁজে থাকি। মনিপুরী সাহিত্যে প্রথম আকাদেমি পুরস্কার পেয়েছেন ১৯৭৩ সালে ত্রিশের কোঠার এক তরুণ ঔপন্যাসিক। এ থেকেই মনিপুরী সাহিত্যের সাম্প্রতিক প্রবণতার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে।

লেখকের নাম লয়েটংবাম পচা মীটেই। ইনি 'পচা' নামেই লিখে থাকেন। প্রথম রচনা একখানি ছোট উপন্যাস—হায়াদ বেগম। এ উপন্যাসে জীবন ও প্রেমের অর্থ সম্পর্কে গভীর ভাবে প্রশ্ন করা হয়েছে। এ উপন্যাসে ভিন্ন স্বাদের রোমান্স পরিবেশিত হয়ে কয়েক বছর আগে জনমানসে বিরাট প্রভাব সঞ্চার করে। তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস 'না তাথী বা অহল অমা।' ইম্ফল নগরীর পটভূমিকায় রচিত এ উপন্যাসে বুর্জোয়া মূল্যবোধের অবক্ষয় ও অপদার্থতা বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বিচার করা হয়েছে। স্ট্রিম অব কনসাশনেস-এ অভিষিক্ত এ উপন্যাসে একজন যুবকের একটি রাত্রির অভিজ্ঞতা বর্ণনা করা হয়েছে। দেশবাসীর প্রতি গভীর প্রীতি সত্ত্বেও শুধু একঘেঁয়েমি ও অবক্ষয়ের পটভূমিকায় নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করা ছাড়া সে আর কিছুই করতে পারেনি। কাজেই নিজেই এর উপসংহার করেছেন এই ভাবে: এক বধির বৃদ্ধ। এটাই উপন্যাসখানির আক্ষরিক অর্থ। এক দেশপ্রেমিকের নৈশ অভিযানের নৈরাশ্যজনক পরিসমাপ্তি। তিনি শব্দে অসংবেদী এবং নিতান্ত একা ও একেবারে অসহায়।

মনিপুরী সমাজের নীচতা ও দুর্নীতিতে পচার এই বিরূপতা ও অসহায়তার মনোভাব তাঁর আকাদেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত 'ইম্ফাল অমযুংযাগ ঈশিং মুংশিংজী বারী' (ইম্ফল ও তার জলবায়ুর কাহিনী) উপন্যাসে আরও বেশী সোচ্চার। মনিপুরের বাইরে বসবাসকারী মনিপুরীদের কাছে রাজধানী ইম্ফল রূপ ও রসে বিস্ময়কর, নৃত্য ও সঙ্গীতে মুখর— তাঁদের কাছে এই মনিপুর

এক তীর্থস্থান। পাশের জেলা কাছাড় থেকে এক তরুণ মনিপুরী অধ্যাপক তীর্থযাত্রীর যষ্ঠি হাতে ইম্ফল শহরে এলেন, শহরের কেন্দ্রস্থলে এক হোটেলে রাত্রিবাস করলেন। এখানে তিনি কি দেখতে পেলেন? তিনি দেখলেন যে, কালোবাজারীরা জীবনের বিয়োগান্ত ঘটনাবলী ভুলে থাকার জন্য নারী ও সুরায় আসক্ত, একটি সুন্দরী বালিকা ও তার মা মাত্র ৫০টি মুদ্রার বিনিময়ে আত্মবিক্রয় করছে, অভিজাত মহিলারা তাদের স্বামীদের পদোন্নতির উদ্দেশ্যে উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের দেহদান করছে আর আমলাতন্ত্র পদদলিত করছে জনগণের স্বাধীনতা। এসব কিন্তু ঘটছে না আনন্দোচ্ছল তদ্গতচিত্ততায়, চলেছে এই দুর্নীতিময় সমাজে নিছক প্রাণরাখার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টার প্রয়োজনে। অধ্যাপক যে নিছক একঘেঁয়েমি ও শোচনীয় একাকীত্ব আবিষ্কার করেছিলেন, লেখকের নিখুঁত ও সংযমী রচনাশৈলীর বৈশিষ্ট্যে তা উপস্থাপিত হয়ে পাঠকের উপর নিঃসন্দেহে অসামান্য প্রভাব বিস্তার করেছে। তীর্থযাত্রী অধ্যাপকের সমস্যা হয়ে দাঁড়াল এই যে, তাঁর যেসব বন্ধু সৌন্দর্য ও গর্বের দেশ, তাঁদের এই মাতৃভূমির গৌরবের বার্তার জন্য শিলচর বিমানবন্দরে অপেক্ষমান তাঁদের তিনি কি বার্তা পরিবেশন করবেন? তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিবরণ দানে তিনি লজ্জিত বোধ করবেন—সে বিবরণ তাঁদের কাছে হবে অত্যন্ত বেদনাদায়ক। কাজেই তিনি ইম্ফল নগরীর প্রকৃত তথ্য বাদ দিয়ে কেবল জলবায়ু, ভৌগোলিক অবস্থান, উচ্চতা, লোকসংখ্যা প্রভৃতির বিবরণই কেবল তাঁর বন্ধুদের প্রদান করবেন। উপন্যাসের শেষ অংশ অত্যন্ত হৃদয় বিদারক: লেখক এক মহান বাঙালী কবির কয়েকটি পঙ্‌ক্তির উদ্ধৃতি দিয়েছেন, যার মর্ম হল: জননী, তোমার অপরূপ কণ্ঠের জন্য রচনা করব একখানি বেদনার মালা; সেখানি গাথা হবে আমার অশ্রুবিন্দু দিয়ে।—সত্যিই এ ছাড়া আর কিই-বা তিনি করতে পারেন।

মনিপুরী সাহিত্য প্রসঙ্গে ব্যাপক আলোচিত বিষয় হল, দেশের মাটির

সঙ্গে সম্পর্ক বর্জিত একদল লেখকের এ সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রবেশ— যাঁদের ললাটে দুঃখ ও হতাশার চিহ্ন পরিস্ফুট। এসব বহিরাগত সম্পর্কে আরও প্রশ্ন ওঠেঃ এঁরা কি এঁদের নিজ নিজ মনিপুরী অভিজ্ঞতার আলোকে লিখছেন—না, পশ্চিমী সাহিত্য থেকে ধার করা সংবেদনশীলতা এঁদের রচনার উপজীব্য, যার কোন মূল প্রোথিত নেই তাঁদের আপন ঐতিহ্যে? এঁরা কি প্রকৃত মনিপুরী ভাব ভাবনা প্রকাশ করছেন—না, পশ্চিমী দৃষ্টিভঙ্গি ও অনুভূতির অক্ষম বাহক রূপে নিজেদের তুলে ধরছেন? এই মুহূর্তে বাঙালী লেখকদের সম্পর্কেও সম্ভবতঃ এরূপ প্রশ্নই প্রযোজ্য।

আমি এই তরুণ লেখকদের সমঝদার—একথা বললে আমার পক্ষে ধৃষ্টতা হবে। কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সমদূরত্ববাদ আমার মনেও সাড়া জাগায়। কিন্তু আমি এটাও অনুভব করি যে, এসব তরুণ লেখককে নগ্ন সত্যের মুখোমুখী হবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা উচিত নয়—সে সত্য হল, সমাজ টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ছে; গীতায় যাকে 'অনিত্যম, অসুখং লোকম্ ইদম্' বলা হয়েছে সেই জীবন নামক যন্ত্রণাদায়ক অস্তিত্বে অর্থ সঞ্চার করার উদ্দেশ্যে পুনর্গঠিত হবার প্রত্যাশায় সে সমাজ কাঠামো ধ্বংসপ্রাপ্তের জন্য অপেক্ষমান। কাজেই ব্রেশ্‌ট্ তাঁর–বহু নাটকে যেমন দেখিয়েছেন, বর্তমান সমাজে ভাল করা বা ভাল হওয়া অত্যন্ত কঠিন। বাংলার বিভাগোত্তর দিনগুলোর কথা বলতে গিয়ে বিশিষ্ট বাঙালী লেখক অন্নদাশঙ্কর রায় বলেছেন যে, 'আয়োনেস্কো' না পড়লে লেখক অবাস্তব হয়ে পড়েন। বাঙালী সমাজ না চাইতেই অধিবাস্তববাদ সে সমাজের উপর নেমে এসেছে। এসব তরুণ লেখকরা ধারকরা সংবেদনশীলতা বা সমসাময়িক পশ্চিমী সাহিত্য পাঠের ভিত্তিতেই কেবল লিখছেন বলে অভিযোগ করলে হয়ত অবিচার করা হবে। তাঁরা যদি স্বপ্ন দেখতে না-ও চান, কল্পনা করার অধিকার তাঁদের অবশ্যই আছে।

এহেন সুধীজন সম্মেলনে এখন বলে যাওয়ার নেশায় মেতে উঠতে অভিলাষ জাগে। কিন্তু ছেদ তো আমাকে টানতেই হবে। যে আধুনিকতা নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করেছি, উপসংহারে সে সম্পর্কেই একটি প্রশ্ন তুলে ধরব। কবি, সে অর্থে লেখকদের ভবিষ্যৎদ্রষ্টা—ক্রান্তদর্শী—বলা হয়ে থাকে। তাঁরা সত্যদ্রষ্টা। কিন্তু কে সত্যের উত্তম দ্রষ্টা -প্রাচীন ঋষি, না আধুনিক ঋষি? বাংলা সাহিত্যের সুকান্ত, না অরবিন্দ আশ্রমের নিশিকান্ত? আধ্যাত্মিক দৃষ্টিসম্পন্ন শ্রীঅরবিন্দ, না মূর্ত কাব্য-আন্দোলনের ভট্টাচার্য চন্দন? আধ্যাত্মিক মূল্যবোধে আস্থাশীল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, না শোচনীয় একাকীত্বে মগ্ন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়? আলোর বিচ্ছুরণে ধ্বংস হয়ে গেলেও গ্যেটের মত আলো, আরো আলো বলে আমাদের চিৎকার করতে হবে। কিন্তু আলো কোথায়? কোন পথে? প্রশ্নটি আপনাদের কাছে তুলে ধরে বিদায় নিচ্ছি।

বঙ্গানুবাদ : ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত

# স্বাধীনতা-উত্তর ত্রিপুরায় উপন্যাসের গতিপ্রকৃতি

## ডঃ কার্তিক লাহিড়ী

বালাদেশের সঙ্গে ত্রিপুরার যোগ বহুদিনের। কেবল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়েই নয়, ভাষা ও সাহিত্যের মধ্য দিয়ে উভয় রাজ্যের যোগাযোগ প্রায় পাঁচশ বছরের কাছাকাছি। ত্রিপুরার রাজ-পরিবার, ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, তাঁদের সংস্কৃতি ও আদালতের ভাষা হিসেবে বাংলা গ্রহণ করেছিলেন পঞ্চদশ শতাব্দীতে। ত্রিপুরা আদিবাসীদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ তিপ্রা ও বিয়াংদের ভাষা ভোট-বর্মীর অন্তর্গত বড়ো পরিবারভুক্ত। এসব ভাষার লিখিত রূপ নেই, ফলে ত্রিপুরার অধিবাসীদের রাজার ভাষা বাংলা ভাষা-ই গ্রহণ করতে হয়েছিল, অন্যপক্ষে ভারত স্বাধীন হবার বহুপূর্বেই স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্যের সরকারী ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষা মর্যাদা পায়, তাই বিশেষ ঐতিহাসিক কারণে ত্রিপুরা বাংলাদেশের সভ্যতা, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও ভাষার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় বহুদিন আগে থেকে, বিশেষ করে বাংলা ভাষার চর্চা এই সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করে তোলে। সেজন্য ত্রিপুরায় স্বাধীনতা-উত্তর গল্প-উপন্যাসের গতি প্রকৃতি সম্পর্ক আলোচনা করতে গেলে বাংলা গল্প-উপন্যাসের গতি-প্রকৃতির সাধারণ আলোচনা অনিবার্য হয়ে পড়ে, কারণ ত্রিপুরার সাহিত্য বাংলা সাহিত্যের অন্তর্গত, এবং মোটামুটি ভাবে মূল ধারা অনুসরণ করেই সমৃদ্ধ হচ্ছে।

বাংলা উপন্যাস ও ছোট গল্প তার জন্মক্ষণ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধ পর্যন্ত যেভাবে বিকশিত হয়েছে তাতে দেখা যায় যে লেখক ও পাঠক উভয়ের মধ্যে সংযোগ সেতু সুদৃঢ়ই ছিল। গল্প-উপন্যাসের নায়ক-নায়িকার সুখ দুঃখে পাঠক হেসেছেন, কেঁদেছেন এবং তাদের ভাল-মন্দ নিজেদের ভাল-মন্দর সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছেন।

সমাজ তখন অনেক বেশী সুস্থিত ছিল, সাধারণ লোকে যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক জগতে বাস করতো তা মোটামুটি অন্তত শাহরিক মধ্যবিত্তর পক্ষে দুঃসহ হয়ে ওঠেনি, যদিও তখন দুঃখ কষ্টের অন্ত ছিল না, আর বাংলা উপন্যাসের লেখক ও পাঠক এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত, তাই লেখকও পাঠক সমাজের সুখ দুঃখের অংশীদার ছিলেন, ফলে উভয়ের মধ্য ব্যবধান তৈরি হবার অবকাশ ছিল কম। তার উপর জাতীয় আন্দোলনের দুর্মর স্রোত নিজেদের অনেক আভ্যন্তরীণ সমস্যাকে মাথা চারা দিয়ে উঠতে দেয়নি, সেজন্য ভেতর ও বাইর বা মানসিক ও শারীরিক জগতের মধ্যে বিভেদ প্রচণ্ড হয়ে ওঠেনি। লেখক ও পাঠক উভয়েই যেন নিজ নিজ অবস্থান অটুট রাখার পক্ষপাতী ছিলেন এবং তাঁরা যে জগতের বাসিন্দা ছিলেন, সে জগত এখনকার তুলনায় অনেক গণ্ডিবদ্ধ ও সরল ছিল। অন্যদিকে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা তীব্র ছিল ব'লে প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে যে সংকট তীব্র হতে থাকে এবং ত্রিশের বিশ্বের অর্থনৈতিক মজ্জার মধ্যে যা প্রকট হয়ে ওঠে সে সংকটের স্বরূপ তখনও আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি, যদিও বাংলা কবিতায় সেই সংকটের রূপ ত্রিশের গোড়া থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। গল্প-উপন্যাসে কয়েকজনের লেখায় সেই সংকট প্রচণ্ড ভাবে ছাপ ফেললেও সাধারণ ভাবে গল্প উপন্যাস সেই সনাতন খাতে কাহিনী-গল্পের জাঁকজমকে লোমহর্ষক পথেই এগিয়ে যায়।

লেখক ও পাঠকের জগতের মধ্যে যখন স্থিতাবস্থা বজায় থাকে তখন উপন্যাসের ঘটনা বা চরিত্রের হেরফের ঔপন্যাসিক যেন পাঠকের সম্মতি নিয়ে ঘটিয়ে থাকেন এবং এমন কিছু লেখেন না পাঠকের পক্ষে যা মিলিয়ে নিতে অসুবিধে হয়। তাই এসময়ে গল্প উপন্যাসে বাইরের ঘটনার প্রতি জোর পড়ে বেশী এবং পাঠকের কৌতূহলও জাগিয়ে রাখতে হয়, যদিও এ নিয়মের প্রচণ্ড ব্যতিক্রম ঘটে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি উপন্যাসে কিংবা ত্রিশ দশকের কয়েকজন মননশীল

ঔপন্যাসিকের রচনায়। লেখক পাঠকের সম্পর্ক নিবিড় থাকার ফলেই বোধহয় শরৎচন্দ্রর উপন্যাস আমাদের মনহরণ করে অতি সহজে।

কিন্তু ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ একটা বিরাট গুণগত পরিবর্তন আমাদের পক্ষে তা বলা বাহুল্য। স্বাধীনতার ফলে একটা জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবার সুযোগ পায় স্বচ্ছন্দে এবং সেই জাতি এক অর্থে নতুন জীবন লাভ করে। আমাদের স্বাধীনতা পাওয়ার মধ্যে আনন্দের সঙ্গে বিষাদের ভাগও কম ছিল না। দেশ বিভাগের ফলে লক্ষ লক্ষ গৃহহারা ছিন্নমূল মানুষকে আবার করে তাদের গৃহ ও মূল খুঁজতে হয় এবং সেই খোঁজা যে অত্যন্ত মর্মন্তুদ তা ভুক্তভোগী-মাত্রই জানেন, বিশেষ করে নিজের দেশ যখন এক ধর্মীয় কারণে পরবাস বলে মনে হয় এবং সেই কারণে চলে আসতে হয় অন্য দেশে। ফলে এতাবৎ-স্থিত সমাজের ভারসাম্য আর ঠিক থাকে না উদ্বাস্তুদের আগমনে ও তাঁদের গৃহ ও মূল অন্বেষণের চেষ্টায়। অর্থনীতির উপর বেশী চাপ পড়ায় ও লোকসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে এবং অন্যদিকে দেশের ধনসম্পদ ক্রমে মুষ্টিমেয়র কুক্ষিগত হওয়ায় যে জাতীয়তা বোধ এতদিন নানা বিভেদের মধ্যে ঐক্য বজায় রাখে, সেই বোধ এখন কার্যকরী হয় না। ছোট খাটো বাদবিসংবাদ ক্রমে বড় হয়ে ওঠে এবং অবশেষে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংকটকে সার্থক করে তোলে। অবশ্য এই সংকটের স্বরূপ সকলে সমানভাবে উপলব্ধি করতে পারেন না। তাই কখন অগোচরেই হয়ত লেখক-পাঠকের জগতের মধ্যে ব্যবধান তৈরি হতে থাকে, এই ব্যবধান সংকুচিত হবার বদলে বরং বেড়েই চলে।

আগের সুস্থিত সমাজ দেশ-বিভাগজনিত দুর্দশা ও নানা সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে বিপর্যস্ত হয়, বিশ্বাস করার জায়গায় ক্রমে সংশয় দানা বেঁধে ওঠে। একটি সাধারণ বিশ্বাস না থাকার ফলে অথবা একটি সাধারণ বিশ্বাস যা এতদিন ভারসাম্য বজায় রাখে তা সরে যাবার ফলে এই সংশয় ক্রমশ তীক্ষ্ণ হতে থাকে।[১] আগের সমাজ কয়েকটি মূল্য-বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং তাদের আশাবাদ ছিল অকৃত্রিম ও

বলিষ্ঠ, সেজন্য সংশয় চোরা গোপ্তা রাস্তা বেয়ে সমাজের ভিত টলাতে পারে নি, অবশ্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কিছু আগে থেকেই বাঙালী লেখকদের রচনায় পুরনো মূল্যবোধ ও আশাবাদ সম্পর্কে সংশয় ও সন্দেহ জাগে, তাই তখন থেকে গল্প-উপন্যাসে বিশেষ করে কবিতায় এই সংশয় ও সন্দেহকে বিশ্বব্যাপী সংকট, সংশয় ও সন্দেহের সঙ্গে মিলিয়ে দেখার চেষ্টা হয়, যদিও স্বীকার্য সাধারণ লোক এই সব পরিবর্তন যথেষ্ট মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করেন নি, হয়ত পরিবর্তন লক্ষ্য করেও সেই সনাতন জীবন যাপনের আপাত শান্তিতে আশ্রয় নেন। একদিনে গতানুগতিক চিন্তা ও জীবনযাপন, অন্যদিকে পুরনো মূল্যবোধের প্রতি সংশয় এর মধ্যে বাঙালী সাহিত্যিকদের সোজাসুজি আপাত বাস্তবের অন্তরে যে বাস্তব যা সংকটে সংশয়ে জর্জরিত, তার মুখোমুখি হতে হয় শিল্পের কারণে। অবশ্য গতানুগতিক জীবন ও নতুন জগতের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা যে চলে নি তা নয়, তবে সে চেষ্টা সার্থক হয় নি, এবং সেই চেষ্টা প্রায় সময় প্রকৃত তাৎপর্য হারিয়ে লঘু তরল ভঙ্গিতে প্রবাহিত হয় জন রঞ্জনের খাতে। পুরনো ও নতুন দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের জন্যই লেখক ও পাঠকের জগৎ আলাদা হয়ে যায়, এবং গল্পকার ও ঔপন্যাসিকদের নতুন দৃষ্টিভঙ্গি আয়ত্তে আনার জন্য নতুন পথ খুঁজতে হয় কিছুটা নিজের তাগিদেও বটে, আর স্বাভাবিক ভাবে এই অন্বেষায় কলাকৌশল বা রীতির দিকে ঝোঁক পড়ে। কারণ যে নতুন বোধ ও আবেগ এবং সমস্যার নিরন্তর জটিলতা লেখককে অস্থির করে তোলে, সেই বোধ, আবেগ ও বিষয়কে পুরনো রীতিতে তুলে ধরা সম্ভব নয়। তার মানে এই নয় যে নতুন ধরনের গল্প-উপন্যাস আগেকার গল্প-উপন্যাসের চেয়ে সফল ও সার্থক। আমরা শুধু এইটুকু বলতে পারি যে নতুন পরিস্থিতি ও পরিবেশ উত্থিত সমস্যা ও সংকট তুলে ধরার জন্য নতুন ভাবনা চিন্তার ও সেই ভাবনা চিন্তাকে সুষ্ঠুভাবে পরিবেশন করা অনিবার্য হয়ে পড়ে। তাই গল্প উপন্যাসে প্লটের দৌরাত্ম্য কমে যায়, আর

কাহিনীর জটিলতা কমার সঙ্গে সঙ্গে সরল রেখায় চরিত্র চিত্রণের ভাবনা অগ্রাহ্য হতে থাকে। গল্প উপন্যাসের প্রথাসিদ্ধ রীতি সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করা হয়, তাই নতুন লেখকদের সঙ্গে তাঁদের পূর্বসূরিদের ব্যবধান বাড়তে থাকে, যদিও নবীন ঔপন্যাসিকদের রচনা পাঠ করলে ত্রিশ দশকের মননশীল ঔপন্যাসিকদের সঙ্গে তাঁদের আত্মীয়তা খুঁজে বের করা অসম্ভব নয়। নবীন লেখকরা অবশ্য য়ুরোপীয় লেখক যেমন প্রুস্ত, জয়েস, কাফকা, কামু, সার্ত্র প্রভৃতির রচনা পাঠ করে শিক্ষা-গ্রহণ করেন যথেষ্ট, হয়ত এঁদের রচনা অনেকের প্রেরণাস্থলও বটে; তা ভাল কি মন্দ সে বিচার যোগ্য লেখক করবেন; আমরা মাত্র এই বলতে পারি যে প্রথাসিদ্ধ রচনার পাশাপাশি নতুন লেখার ঝোঁক ক্রমে প্রবল হয়ে ওঠে, আর নতুন লেখার চাপে অনেক প্রতিষ্ঠিত লেখকও তাঁর পূর্বতন রচনারীতি বদলান।

ভর্জিনিআ উলফ যেমন ওয়েলস গলসওয়ার্দি প্রমুখ লেখকের উপন্যাসের তীব্র বিরোধীতা করেন, নবীন ঔপন্যাসিকেরা তেমন তীব্র বিরোধীতা না করলেও প্রথাসিদ্ধ রচনায় বাস্তব যেভাবে প্রতিফলিত, তার বিরুদ্ধাচারণ করেন। তাঁরা মনে করেন ঐসব ঔপন্যাসিক পাঠকদের 'sense of character' দিতে পারেন নি, প্রতিষ্ঠিতেরা যে চিত্র দিয়েছেন তা যেন মিলিয়ে দেখার ব্যাপার, অথচ সঠিকভাবে দেখলে তার উল্টোটাই স্বাভাবিক মনে হয়। নবীনদের ঝোঁক পড়ে ব্যক্তির উপর—ব্যক্তির সংবেদনশীলতা ও তার প্রতিক্রিয়ার উপর, এর ফলে পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে ব্যক্তিকে মিলিয়ে দেখার ঝোঁক কমে আসে, হয়ত এজন্য আধুনিক উপন্যাসে নায়ক-নায়িকাদের অনেক সময় বায়বীয় বলে মনে হয়।

যাই হোক নতুন ঝোঁক হচ্ছে প্রথাসিদ্ধ রচনার বিপরীত মুখে, এবং পূর্বসূরিদের কাছে যে সমাজ প্রায় অমোঘ বলে বিবেচিত ছিল, সেই ধারণা নবীনদের তুষ্ট করে না, কারণ তাঁরা সমাজে এমন কিছু লক্ষ্য করেন যার সঙ্গে পূর্ব ধারণার কোনই মিল নেই। সেজন্য তাঁদের

নতুন পথ ও রীতি অন্বেষণ করতে হয়—চেতনা-প্রবাহ, অন্তর্মুখী ভাষণ, গদ্য-পদ্যের ভেদ লুপ্ত করার চেষ্টা, প্রতীকের বহুল ব্যবহার বা সমগ্র রচনাকে প্রতীক করে তোলা, ব্যক্তিকে খণ্ড খণ্ড করে তীব্র আত্ম-বিশ্লেষণ প্রভৃতি ও অন্যান্য শিল্প ও বিজ্ঞান থেকে অপহৃত রীতির সাহায্যে ঔপন্যাসিকেরা নতুন পরিস্থিতি উদ্ভূত নতুন বাস্তবতা তুলে ধরতে সচেষ্ট হলেন, অবশ্য এইসব প্রচেষ্টা সর্বদা সুষ্ঠু হয়েছে এমন বলা চলে না, কিন্তু এ ধারা বা ঝোঁক-কে অস্বীকার করা অসম্ভব।

ত্রিপুরার অবস্থা পশ্চিমবঙ্গের প্রায় অনুরূপ না হলেও এবং ত্রিপুরার নিজস্ব কিছু সমস্যা থাকলেও পশ্চিম বাংলায় যে সমস্যা ও সংকট তীব্র হয়ে ওঠে তার তীক্ষ্ণতা এখানেও অনুভূত হয়। ত্রিপুরা ভারতের পূর্বপ্রান্তের একটি ক্ষুদ্র রাজ্য, এবং ভারতের অন্যান্য প্রান্ত থেকে প্রায় সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, কেবল উত্তর খণ্ডে নাতি-প্রশস্ত এক ভূমিখণ্ড দিয়ে আসামের সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু যে সংস্কৃতির সঙ্গে ত্রিপুরা অচ্ছেদ্য-ভাবে যুক্ত, সেই সংস্কৃতির মূল কেন্দ্র থেকে ত্রিপুরার ব্যবধান বহু যোজনের। এই ব্যবধান ও যোগাযোগের অসুবিধার জন্য ত্রিপুরাবাসীর মনে এক অন্তরণবোধ ( sense of isolation ) লুকিয়ে থাকে। এই বোধের সঙ্গে উদ্বাস্তুমনসিকতা যুক্ত হয়ে যে দোলাচলতা সৃষ্টি করে, সেই দোলাচলবার জন্য ত্রিপুরা এখনও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে স্ব-নির্ভর হয়ে উঠছে না। উপরন্তু আদিবাসী সমাজের সঙ্গে কোথাও ছেদ ঘটায় বা আদিবাসী সমাজ নানা দ্বন্দ্বে বিদীর্ণ হওয়ার ফলে ত্রিপুরা সংস্কৃতির যে বিশিষ্ট চেহারা ছিল কারুশিল্প ও চারুশিল্পের আঙিনায় তা ক্রমে লুপ্ত হতে চলেছে। হয়ত ভবিষ্যতে সেই বিচ্ছেদ মুক্ত হলে ত্রিপুরা তার বিশিষ্ট সংস্কৃতি নিয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, ততদিন বিচ্ছিন্নতা ও অন্তরণ-বোধ ত্রিপুরার লেখকদের সৃষ্টির পথ কণ্টকাকীর্ণ করে রাখবে সন্দেহ নেই।

মূল সংস্কৃতি কেন্দ্র কলিকাতা থেকে দূরে থাকার ফলেই হয়ত স্বাধীনতার পর পর ত্রিপুরার লেখকগণ বাংলাসাহিত্যে যে সব পরিবর্তন

ঘটে, তা লক্ষ্য করার মত অবকাশ কম পেয়েছেন, তাই পঞ্চাশ দশকের লেখকরা প্রচলিত বিষয় ও রীতিতে লিখে চলেন নিশ্চিন্তভাবে। ছোট-খাটো যে পরিবর্তন নজরে আসে, তা-ও তাঁরা ফুটিয়ে তুলতে পারেন নি, এমন কি স্বাধীনতার পর ত্রিপুরায় যে গুণগত পরিবর্তন দেখা দেয় ত্রিপুরার ভারত অন্তর্ভুক্তি ও উদ্বাস্তু আগমনের ফলে, সেই পরিবর্তনের রূপরেখাটি সম্ভবত তাঁদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়, যেমন এড়িয়ে গেছে আদিবাসী জীবন। ফলে এঁরা পুরনো বিষয় ও রীতি আঁকড়ে থাকেন, যে বিষয় ও রীতি তৎকালীন বাস্তবতার অনুযায়ী নয়। তবু এর মধ্যে বিমল চৌধুরী, সুবিমল রায়, সুখময় ঘোষ প্রমুখ কয়েকজন প্রচলিত বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসতে সচেষ্ট হয়েছেন।

অবশ্য ষষ্ঠ দশক থেকে অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে থাকে। এতদিনে লেখকরা সামাজিক পরিবর্তনের বিষয়টির দিকে যেন তাকিয়ে দেখার সুযোগ পেলেন। ত্রিপুরার সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে সংকট তীব্রতর হয়ে ওঠে, যুব সমাজ আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে অবশেষে হতাশায় পীড়িত হয়ে চঞ্চল হয়ে ওঠেন। অন্যদিকে নানা আন্দোলনের ফলে এতদিনের তথাকথিত শান্ত সমাহিত জীবন আলোড়িত হয় দারুণ ভাবে। ফলে পঞ্চাশের লেখকদের সঙ্গে ষষ্ঠ দশকের লেখকদের দৃষ্টিভঙ্গি তফাৎ হয়ে পড়ে, অবশ্য এই পার্থক্য-র জন্য কলকাতার সাহিত্য-শিল্প আন্দোলনের ঢেউ অনেকখানি দায়ী। পুরনো মূল্যবোধকে সম্পূর্ণ বাতিল না করলেও নতুন মূল্যবোধ জাগায় ত্রিপুরার লেখকদেরও অবশেষে নতুন রীতি ও পদ্ধতি গ্রহণ করতে হয়। ষষ্ঠদশকের প্রথম থেকেই তাই ত্রিপুরায় নতুন ভাবে লেখালেখির জোয়ার আসে, সে ধারা আজও অব্যাহত। এই সব লেখকদের মধ্যে ঋতেন চক্রবর্তী, অনিল সরকার, ভীষ্মদেব ভট্টাচার্য, কালীপদ চক্রবর্তী, কল্যাণব্রত চক্রবর্তী ভূপেন্দ্র দত্ত ভৌমিক ও মানসদেব বর্মণের নাম উল্লেখযোগ্য। এঁরা প্রত্যেকেই নিজস্ব ধরনে আধুনিক ও নতুন রীতিতে বাস্তবকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। এদের পথেই অগ্রসর হয়েছেন

অসিত পাল, পীযুষ রাউত, অরুণোদয় সাহা, মানিক চক্রবর্তী, অমিত শংকর দাশগুপ্ত, বিমল দেব, সুজয় রায় প্রমুখ লেখকগণ।

ত্রিপুরার লেখকদের মূল্যায়ন করা বর্তমান প্রবন্ধের লক্ষ্য নয়, আমরা কেবল স্বাধীনতা-উত্তর ত্রিপুরায় গল্প-উপন্যাসের গতি প্রকৃতির কিছু সংবাদ দিতে চেষ্টা করেছি, যদিও বলা ভালো যে ত্রিপুরায় এখনও তেমন উল্ল্যেখযোগ্য উপন্যাস কেউ লেখেন নি।

ত্রিপুরায় সাহিত্য প্রচেষ্টাকে বাংলা সাহিত্যের মূলধারার অন্তর্গত করে তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে, এবং আমরা আশা করবো সেই দিন দূরাগত নয় যেদিন ত্রিপুরায় আদিবাসীদের ভাষা কগবরক লিখিত রূপে উত্তীর্ণ হবে এবং ঐ ভাষায় গল্প উপন্যাস কবিতা আমাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে নানা ভাবে সমৃদ্ধ করবে।

# পূর্বভারতে আধুনিক চিত্রের গতিপ্রকৃতি

## সুমঙ্গল সেন

যে কোনো প্রবণতার মধ্যেই কি দ্বৈতভাব থাকে? যে কোনো বিচারের মাপকাঠি কি সম্পুর্ণ আলাদা ছুটি দৃষ্টিকোণে বাঁধা? জীবনটাকে কি হাসি ও কান্না—এই ছুটি অনুভূতির মধ্য দিয়ে দেখতে হবে? এবং পরিশেষে সমগ্রতা?

গোড়া থেকে দেখতে গেলে ভেবে দেখুন, ছবি আঁকা হচ্ছে আলো আর ছায়া দিয়ে, কালো আর সাদার ভাবনায়, রেখা আর রঙের সীমা ও বিস্তারে, তুই আর তিন ডাইমেনশনে, প্রাচীন ঐতিহ্য ও আধুনিক চিন্তাধারার ঘাত-প্রতিঘাতে। মূর্ত ও বিমূর্ত শিল্প প্রবল দ্বন্দ্বে লিপ্ত। লোকশিল্প ক্লাসিকাল আর্টের প্রতিদ্বন্দ্বী। এবং সবশেষে আর্টের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে দ্বৈতভাব।

এইসব প্রবণতা কিন্তু আমাদের পূর্বভারতে আধুনিক চিত্রকলার জগতে বিগত বছরগুলিতে দেখা গেছে। অনেকদিক থেকেই গুরুত্বপূর্ণ এই বছরগুলি। পাওয়া ও হারানো—তুদিক থেকেই। কাদের হারিয়েছি দেখুন। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল, যামিনী প্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বসন্ত গঙ্গোপাধ্যায়, যামিনী রায়। আরও অনেককে হারিয়েছি এই পূর্বভারতে। আর্ট যে কোনো দেশেই এঁদের হারিয়ে দরিদ্র হয়।

আমি কিন্তু একটু পিছিয়ে শুরু করব। অবনীন্দ্রনাথ যখন ভারতীয় চিত্রকলার পুনরুজ্জীবন ঘটালেন, তখন অত্যন্ত কঠোর-ভাবে শুধুমাত্র পাশ্চাত্য টেকনিকে "এখানকার আর্টস্কুলে ছবি আঁকা হচ্ছিল। ইউরোপের ইমপ্রেশনিজ্‌ম্, কিউবিজ্‌ম বা অন্য কোনো আধুনিকতার হাওয়া এসে তখনও পৌঁছয় নি। অবনীন্দ্রনাথ দেখলেন,

ভাবে ও বিষয়বস্তুতে ভারতীয় মহাকাব্যের ছবি আঁকা হচ্ছে, অথচ মানুষের আদল সমকালের মানুষকে বসিয়ে, সমকালের জীবনকেও আড়ষ্টভাবে আঁকা হচ্ছে, কল্পনার অবকাশ নেই—একে তো ভাঙ্চুর করতে হয়। খোঁজা হোল অতীতের ভাণ্ডারে। অতীতের বিষয়-বস্তু, বর্তমানের বিষয়বস্তু অতীতের টেকনিকে আঁকতে গিয়ে অতীত ও বর্তমান উভয়ের টেকনিকই এলো, চীন জাপানের মিষ্টি তুলি এলো। অতীতকে খোঁজার মধ্য দিয়ে হাওয়া বদল। অবনীন্দ্রনাথের কোন্ ছবিটি অতীতে ছিল? ওমর খৈয়াম, পথচলার অবসান, শ্বেতময়ুর, রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি—কোন্টি? তা নয়। আসলে হাওয়া বদল। এই যে হাওয়া বদল, এই যে "learn the technique and lay it aside"—অবনীন্দ্রনাথের মূলমন্ত্র, এতেই ভারতের, এবং বিশেষ করে পূর্বভারতের শিল্পচর্চার ক্যানভাস্ অনেক চওড়া হয়ে গেল।

অবনীন্দ্রনাথের হাতে ভারতীয় শিল্পের, পুনরুজ্জীবন বলতে সেজন্যই পুরনো জিনিসকে আঁকড়ে থাকা হোল না, যেটা হোল, তা হচ্ছে—প্রবহমান গতিপ্রকৃতিকে আলিঙ্গন ও গ্রহণ ও পুরনোকে রক্ষা করার মধ্য দিয়েই ভারতের চিরন্তন চরিত্রের পুনরুজ্জীবন। নয়ত মুঘল চিত্রকলা অতীতে কী করে এসেছিল? এজন্যই অশোক মিত্র অবনীন্দ্রনাথকে আধুনিক ভারতীয় চিত্রের জনক বলেছেন।

ব্যঙ্গ চিত্রগুলির কথা বাদ দিলে গগনেন্দ্রনাথের দুঃসাহসিক মৌলিকতায় কোনো বিপ্লবের কথা সজ্ঞানতঃ ছিলনা - ছিল অত্যন্ত আত্মমনস্ক মিষ্টিমধুর বর্ণিকাভঙ্গ। রহস্যময় ঘোড়সওয়ার, রহস্যের মায়াপুরী, প্রহেলিকা—স্বপ্নপুরীর ছবিগুলি আধুনিকতার পথ চওড়া করে দিল। আজকের আধুনিক চিত্রধারায় রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই স্বপ্ন নিয়ে এলেন, কিন্তু তাতে ডিজাইন ও ফর্মের ভাঙাচোরার আনন্দই হয়ত প্রধান ছিল। তাঁর লোকজন, তাঁর জীবজন্তু, মুখোশ, লতাপাতা—এরা সবাই তাঁর হস্তাক্ষরের মতই আশ্চর্যজনক ডিজাইনের

মক্‌সো হতে হতে কোথাও অপূর্ব বলিষ্ঠ ফর্ম এনেছে, কোথাও রঙে রঙে স্বপ্নময় দিগন্তের ইশারায় চমকে দিয়েছে।

আশ্চর্যের এবং আনন্দের কথা, অবনীন্দ্রনাথের শিষ্য-প্রশিষ্যগণ যাঁরা নতুন যুগের নান্দীগান গাইতে ছড়িয়ে পড়লেন দেশের নানাদিকে, তাঁরা কিন্তু অধিকাংশই এই পূর্বভারতের। নন্দলাল শান্তি নিকেতনে, অসিত হালদার লক্ষ্ণৌতে, সমরেন্দ্র গুপ্ত লাহোরে, শৈলেন দে জয়পুরে, সারদা উকিল ও পরবর্তীকালে রমেন চক্রবর্তী দিল্লিতে, প্রমোদ চট্টোপাধ্যায় দক্ষিণে মসুলিপট্টমে, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী মাদ্রাজে। পুলিনবিহারী দত্ত বম্বেতে, মুকুল দে কলকাতায়।

এই হচ্ছে স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত ভারতের পূর্বপ্রান্তে চিত্রচর্চার রঙ্গমঞ্চের বিস্তৃত পর্দা। এরই ভেতরে ভেতরে অন্তঃসলিলা নদীর মত লোকশিল্প চলেছিল নির্বিকার নিরুচ্ছ্বাস ভঙ্গিতে। ওদিকে পাটনার চিত্রশৈলী, মধুবনী চিত্র, বিহারের পুঁথিচিত্র। ওড়িশার চিত্রকলা— যার নিদর্শন কেবলমাত্র স্থানীয় সংগ্রহে নয়, অন্ধ্রপ্রদেশ সংলগ্ন শিল্পশৈলীতেও ছড়িয়ে আছে মনে করতে বাধা নেই। তালপত্রে রেখাপাতের দ্বারা সৃষ্ট ছবি রেখায় রেখায় বলিষ্ঠ। উত্তর বিহারের নেপাল সংলগ্ন ও তারই পার্শ্ববর্তী মৈথিল অঞ্চলের চিত্রকীর্তি কোথাও কোথাও হারিয়ে গেল যেন। বাংলার কোচবিহার ও তারই সংলগ্ন বিস্তৃত প্রাচ্যভারতের আসাম, নাগাভূমি, মিজোরাম, মনিপুর, অরুণাচল প্রদেশ, আর মেঘালয় জুড়ে শোলার কাজ, বর্ণাঢ্য তাঁত বস্ত্রের বলিষ্ঠ ডিজাইন, কোথাও বা কাঠের পুঁথির মলাট, অগর বৃক্ষের বল্কল, সাঞ্চীপাত, বিভিন্ন ধরনের কাগজ, তুলট, তালপত্র, নাগেশ্বর বা 'নাহর' বৃক্ষের পাতা এবং শিবসাগরে ব্রহ্মদেশীয় পুঁথি-সদৃশ অধিক লাক্ষা অরোপিত পুঁথি। আবার দেখতে পাই লোক-শিল্প স্থানীয় হলেও নিতান্তই স্থানীয় নয় সর্বাংশে। পূর্বভারতের চিত্রকলায় যেমন বিহার ও বাংলায় গড়াতে গড়াতে রাজস্থানের

ছাপ এসেছে, মেদিনীপুরের পাটায় ধরা পড়েছে ওড়িশার ছাপ। ওড়িশার ছবিতে পশ্চিম ভারতের ছাপ। মুঘল ধারার অপভ্রংশ, ইউরোপীয় প্রথায় মিশ্রিত ছবি এসে পড়েছিল কালীঘাটের পটে, পাটনার ছবিতে। ত্রিপুরায় লোকশিল্পচর্চায় অন্যতম প্রধান হচ্ছে বাঁশের কাজ আর শোলার পট। কিন্তু ওতে পার্শ্ববর্তী বঙ্গের ছাপ কেই বা অস্বীকার করে ?

এইভাবে আসে হাওয়া। বদলের হাওয়া, পালা বদলের পালা। আকাশের রঙের সঙ্গে পৃথিবীর রং বদলায়। ভূমির সীমা আছে, আকাশ সীমাও আজকাল ধরা হয়, কিন্তু হাওয়ার সীমা কই ? সাতচল্লিশে স্বাধীনতার তারিখে যখন দৃশপট উন্মোচিত হোল, তখনকার এই পটভূমিকাকে পেছনে রেখে প্রাচ্যভারতে অবনীন্দ্রনাথ তখনও আপন মহিমায় উজ্জ্বলন্ত, ওদিকে নন্দলাল, বিনায়ক মাসোজী, রামকিংকর, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় শান্তি নিকেতনে, কলকাতায় অতুল বসু, বসন্ত গঙ্গোপাধ্যায়, যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, যামিনী রায়, দিলীপ দাশগুপ্ত, জয়নুল আবেদিন প্রভৃতি। জয়নুল ও সফিউদ্দিন প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঢাকায় চলে যান, তবু কিছুকাল আগেই তেরণ' পঞ্চাশের মৃত্যুমিছিলের সত্যনিষ্ঠ স্কেচ্ করে রেখে জয়নুল প্রাচ্যভারতের শিল্পকে অনেকটাই সমকালীন করে রেখে যান।

সাতচল্লিশের সময় রেখায় যাঁরা সবচেয়ে বস্তুনিষ্ঠ, তাঁদের মধ্যে কলকাতা আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ অতুল বসু, উপাধ্যক্ষ সতীশ সিংহ, অধ্যাপক বসন্ত গঙ্গোপাধ্যায়, আর কলেজের বাইরে যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, হেমেন মজুমদার, দিলীপ দাশগুপ্ত প্রভৃতি। এখনকার জীবিত শিল্পীদের মধ্যে বস্তুনিষ্ঠ রূপায়ণে অতুল বসুর প্রতিকৃতি—বিশেষতঃ বেশ কিছুকাল আগে আঁকা স্যার আশুতোষের খালিগায়ে পৈতে গলায় সেই "বাংলার বাঘ" মূর্তিটি যেটি অতুল বসু চারকোল দিয়ে মাত্র কয়েক মিনিটে এঁকেছিলেন—ভুলে যাবার নয়। ইংলণ্ডের বাকিংহাম প্যালেস্ থেকে সর্বত্র তাঁর নাম প্রসারিত। বসন্তবাবু

ও দিলীপবাবু—গুরু ও শিষ্য—দেশ বিদেশে অজস্র পুরস্কার পাওয়া শিল্পী—কী জলরঙে কী তেলরঙে কী প্যাস্টেলে—বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব দুটি। বলতে গেলে প্রাচ্য ভারতের, এমন কী সমগ্র দেশের বস্তুনিষ্ঠ চিত্রকলার শিক্ষক উল্লিখিত এই ক'জন।

ওদিকে শান্তিনিকেতনে নন্দলালকে কেন্দ্র করে সুরেন কর বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, বিনায়ক মাসোজী, রামকিংকর বেইজ প্রভৃতি শিল্পী অবনীন্দ্রপ্রথার অঙ্গনতলে ব্যক্তিগত পরীক্ষায়-নিরীক্ষায়, জীবনবোধ ও প্রকাশভঙ্গি নিয়ে বাস্তব ও বাস্তবভাঙা শিল্পের ধারাবেগকে পরিপুষ্ট করেছেন। কলকাতায় তখন মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত, সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায়, চৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়, ইন্দ্র দুগার প্রভৃতি। মুকুল দে সবেমাত্র কলকাতা ছেড়েছেন। মনীষী দে বম্বের দিকে। যামিনী রায় বহু আগেই পাশ্চাত্য টেকনিক ছেড়েছেন, কালীঘাটের পটের ধারার আঙ্গিক তিনি নিলেন এবং সঙ্গত কারণেই তাঁকে সমকালীন শিল্পী বলা হোল। ইন্দ্র দুগারের পিতা হীরাচাঁদ দুগার তখন মন্দিরের গায়ে ফ্রেস্কো অঙ্কনের প্রখ্যাত শিল্পী। ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মণ ত্রিপুরায়। রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী দিল্লিতে। কিছুদিন পরেই তিনি কলকাতায় অধ্যক্ষ হয়ে এলেন।

মনেট, ম্যানেট, রেনোয়া, দেগা, ভ্যানগঘ্, লুত্রেক, সিজান, গগাঁ আর পিকাসোর ঢেউ প্রাচ্য ভারতেই প্রথম গড়িয়ে এসে পড়ল। প্রাচ্যভারতেই রথীন মৈত্র, গোপাল ঘোষ, পরিতোষ সেন, সুনীল মাধব সেন, হেমন্ত মিশ্র, মাখন দত্তগুপ্ত, প্রাণকৃষ্ণ পাল, শীলা অড়েন প্রভৃতি শিল্পীদের অনেকে মিলে কিছু আগেই 'ক্যালকাটা গ্রুপ' সৃষ্টি করলেন। ভারতে তথাকথিত মডার্ণ আর্টের প্রথম প্রবক্তা যদি কোনো দলকে বলতে হয় তাহলে নিঃসন্দেহে 'ক্যালকাটা-গ্রুপ'-এর নাম প্রথমে মনে আসবে। রথীন মৈত্র বসন্তবাবুর ছাত্র, কিন্তু তিনি ভাঙচুর করতে এগিয়ে গেলেন অনেকটাই যামিনী রায়ের পথ ধরে। তাঁর Reconciliation যদিও একই সঙ্গে প্রতীকধর্মী ও

বর্ণনাধর্মী, তবু পটের ধারা ও ফর্মের সহজীকরণের জন্য ওই ধারাতেই ওঁকে চিন্তা করা যায়। গোপাল ঘোষ বাস্তব বিষয় নিয়ে মিষ্টি উজ্জ্বল রঙে ও দ্রুত সঞ্চারী রেখায় সর্বদাই ছবি এঁকেছেন। তথাকথিত মডার্ণ আর্টকে অনেকে তখন পর্যন্ত খুব সোনার চোখে দেখেননি। সমকালীন একটি মাসিকপত্রে তখন লেখা হয়েছিল মনে পড়ছে, "গোপাল ঘোষ, গোপাল ঘোষ, আঁকছো গোরু, হচ্ছে মোষ।" আধুনিক শিল্প চর্চার পেছনে লোকশিল্পের নীরব ধারা কতটা প্রেরণা যুগিয়েছে, সুনীলমাধব সেনের এবং শীলা অডেনের ছবিগুলি দেখলে বোঝা যায়। মাখন দত্তগুপ্ত কমার্শিয়াল আর্টের ছাত্র এবং প্রহ্লাদ কর্মকার ও সতীশ সিংহের প্রভাবে প্রভাবিত কিন্তু তিনি রিয়ালিষ্টিক পেন্টিং থেকে বিমূর্তশিল্প পর্যন্ত অবলীলাক্রমে বিচরণ করে থাকেন। তাঁর প্রিয় ছবিগুলিতে অবশ্য দেগা-র প্রভাব বেশি। এই পর্যায়ে পূর্বভারতের হেমন্ত মিশ্রর নাম অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য এবং ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় একটি বিশিষ্ট নাম।

হিমালয়ের দিকের তীর্থযাত্রী ও জীবনযাত্রার অনেক ছবি আগে এঁকেছিলেন প্রমোদ চট্টোপাধ্যায়। ইদানীং আধুনিক ধারায় এঁকেছেন কনোয়াল কৃষ্ণ ও সত্যেন ঘোষাল। দুজনেই কলকাতার ছাত্র। কনোয়াল কৃষ্ণ এখন দিল্লীতে আছেন। সত্যেন ঘোষাল কলকাতা আর্ট কলেজে অধ্যাপক। সমকালীন জলরঙের ছবিতে যাঁরা দিকপাল তাঁরা হচ্ছেন বসন্ত গাঙ্গুলী ও তাঁর ছাত্রগণ—দিলীপ দাশগুপ্ত, জয়নুল আবেদিন, কনোয়াল কৃষ্ণ, বীরেন দে ও রণেন আয়ান দত্ত। কনোয়াল কৃষ্ণর স্ত্রী দেবযানী কৃষ্ণ লোকশিল্পের ঢঙে ছবি আঁকেন।

ভাঙাচোরার কাজ আরম্ভ হোল যেমন এই প্রাচ্য ভারতেই, তেমনি আগেই বলেছি, তথাকথিত ইণ্ডিয়ান আর্ট এবং পাশ্চাত্য বস্তুনিষ্ঠ শিল্পচর্চা—সব মিলিয়ে এই তিনটি স্রোতের ত্রিবেণীও কিন্তু এই পূর্ব-রাজ্যগুলিতেই। এ এক অপূর্ব সহাবস্থান—এবং অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে। বৈচিত্র্যের সীমা নেই, রঙের শেষ নেই, কল্পনার আকাশেতে প্রান্ত নেই।

এই ধারাতেই গত ছাব্বিশ বৎসর পরিপুষ্ট হয়েছে। একই দেবকুমার রায়চৌধুরীকে দেখেছি একই হাতে বিস্ময়কর নিষ্ঠায় বাস্তব ছবি আঁকতে—তেলরঙে, জলরঙে, এচিং-এ লিথোতে। বিদেশ প্রত্যাগত দেবকুমার বাবু ওরই পাশে পাশে প্রবলভাবে ইতালীয় ধারায় ছবি আঁকলেন। এবং এই ছাব্বিশ বছরের মধ্যেই।

গত আড়াই দশকে আরও একটা বৈশিষ্ট্য চোখে পড়বে। উত্তরে, দক্ষিণে, বা পশ্চিম ভারতে যতটা বিমূর্ত শিল্পের বা অন্যান্য ইজমের প্লাবন এসেছে, যে-প্লাবনে অন্যান্য বাস্তবতা বা তথাকথিত ভারতীয় চিত্রকলা অনেকটাই চোখের আড়ালে চলে গিয়েছে, এই প্রাচ্য ভারতে কিন্তু ততটা নয়। ছবি আঁকার ক্ষেত্রে অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় বিমূর্তশিল্প বা অন্যান্য ইজম্ ওড়িশা, বিহার, বাংলা বা পূর্বপ্রান্তের রাজ্যগুলিকে সম্পূর্ণ অভিভূত করেনি। অবশ্য ভাঙাগড়া হবেই এবং তা মনের আনন্দেই হবে, একথা তো আগেই বলেছি।

অবশ্য একটি কথাও মনে রাখা দরকার। এদেশেই পঞ্চাশ বছর আগে যে বাস্তবতাকে বাস্তবতা বলা হোত, এখন তার চেয়ে অনেক বেশী impressionistic ছবিকে বাস্তব বলা হয়। এখন ম্যানেটের ছবি রেণোয়ার ছবি দেগা-র ছবি বাস্তব। তেমনি দিলীপবাবুর ছবির সঙ্গে মনেটের ছবির মিল পাওয়া যাবে, মাখনবাবুর ছবির ওপর দেখা যাবে দেগা-র প্রভাব। বাস্তবতা সেই বাস্তবতা নেই,—হাওয়া বদলের হাওয়া—আমি চাই বা না চাই—কখনো মৃদু, কখনো ঝড়ের বেগে বয়েই যাবে।

শিল্পকলার চর্চার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকে আর্ট কলেজ, আর্ট গ্যালারি, আর প্রদর্শনীর জন্য সংগঠিত বৃহৎ প্রতিষ্ঠান সমূহ—যেমন আকাদেমি অব ফাইন আর্টস্। তার সঙ্গে বাণিজ্যিক পরিবেশও জড়িত থাকে। গুজরাটের চিত্রকলার বৃদ্ধি ও পুষ্টির জন্য গুজরাটের বাণিজ্যকে ধন্যবাদ দেওয়া হয়। কলকাতায় গভর্ণমেণ্ট কলেজ অব আর্ট শতাব্দীর ওপর প্রাচীন। শান্তিনিকেতনে কলাভবনের অর্ধ

শতাব্দী কেটে গেল। কলকাতায় বেসরকারী ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজ বেশ পুরনো। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে ফাইন আর্ট বিভাগ খোলা হয়েছে ইদানীং। এছাড়াও কিছু কিছু বেসরকারী প্রতিষ্ঠান আছে। দিলীপ দাশগুপ্তর 'ষ্টুডিও'তে শিক্ষিত হয়েছেন আধুনিক কালের অনেক প্রখ্যাত শিল্পী। কলকাতার আকাদেমি অব ফাইন আর্টস্-এর নিজস্ব ভবন বহুকাল ছিল না—কলকাতার যাদুঘরে সর্বভারতীয় প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে আকাদেমি কর্তৃপক্ষ শীতের মরশুমে সারা দেশকেই উন্মুখ করে রেখেছিলেন। এখম আকাদেমির নিজস্ব ভবনে তাঁদের আয়োজিত সর্ব ভারতীয় প্রদর্শনী ছাড়াও বহু শিল্পীর ও শিল্পী-গোষ্ঠীর চিত্র প্রদর্শনী হচ্ছে। ব্যক্তিগতভাবে প্রদর্শনী করার জন্য আগে এ রকমের হলঘর .একমাত্র আর্টিস্ট্রি হাউস ছিল। আর যতদূর মনে পড়ে, ১ নম্বরের চৌরঙ্গী টেরেসের বাড়ীটি গৃহস্বামীর সহৃদয়তার জন্য বিনা মূল্যেই পাওয়া যেত। এখন প্রদর্শনী ভবন অনেক হয়েছে।

আধুনিক চিত্রকলার প্রসঙ্গে যাঁদের কথা বলেছি, তাঁদের ছাড়া অথবা তাঁদের অব্যবহিত পরেই মনে পড়ে যায় কলকাতার হরেন দাস, কিশোরী রায়, জগদীশ রায়, সোমনাথ হোড়, জীবেন সেন, চন্দ্রনাথ দে, অরূপ দাসের কথা। বীরেন দে-র কথাও মনে পড়ে। আর্ট কলেজের পাঠ অসমাপ্ত রেখে দিল্লী গিয়ে খ্যাতি অর্জন করেছেন। ইতিপূর্বে অন্য একজন বীরেন দে'র কথা বলেছি—তিনি অপেক্ষাকৃত প্রবীন ও জল-রং-এরশিল্পী। সোমনাথ হোড় জলরঙে প্রতিকৃতি আঁকতেন চমৎকার। ইদানীং গ্র্যাফিক্ আর্টে প্রতিষ্ঠিত। গ্র্যাফিক্ আর্টে একালে সবচেয়ে সম্পুর্ণভাবে নিবেদিন শিল্পী হরেন দাস। আকাদেমির স্বর্ণপদক বহুবার পেয়েছেন এবং কলকাতায় বিগত ছাব্বিশ বছর ধরে গ্র্যাফিক আর্টে রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর নামের পাশেই তাঁর নাম উচ্চারিত হয়েছে। কিশোরী রায়.ও জগদীশ রায় তেলরঙের প্রতিকৃতিতে প্রতিষ্ঠিত শিল্পী। আল্পনা শিল্পে ও ডিজাইনকে ব্যবহারিক শিল্পে প্রয়োগের ক্ষেত্রে

শান্তিনিকেতনের গৌরী ভঞ্জ ও শিশির ঘোষের নাম মনে পড়বে। শান্তিনিকেতনে তেমনি আছেন রাধা বাগচী। চোখের সামনে ততক্ষণে ওড়িশার মুরলীধর টালি, লক্ষ্মীধর দাস, বিচিত্রানন্দ মহান্তি, উপেন্দ্র মহারথী, দীননাথ পাটীর ছবি। মুরলীধর টালি ও লক্ষ্মীধর দাসের পেন্সিল স্কেচের কথা সমকালীন কলকাতা ভুলতে পারবে না। ওদিকে এই সময়েই কলকাতায় রথীন মিত্র পাশ্চাত্য প্রথায় অথচ ফ্ল্যাটরঙে মোটা রেখার সাহায্যে 'শিলং বাজার' আঁকছেন, শানু লাহিড়ি expressionist ছবি আঁকছেন, হৈমন্তী সেনের জলরং ও তেলরঙে দিলীপ দাশগুপ্তর সুস্পষ্ট প্রভাব পড়েছে। শীতেশ দাস ও তাপস দত্ত ভারতীয় শিল্প বিভাগের ছাত্র হয়েও পাশ্চাত্য ও জ্যামিতিক ফর্ম আনছেন। সম্পূর্ণ ভারতীয় প্রথায় কলকাতায় ধীরেন্দ্র ব্রহ্ম ও শান্তি মুখার্জি ছবি আঁকছেন তখন। তেমনি নির্মল দত্ত। ভালো ড্রয়িং রবীন্দ্র দাসের। শান্তি দাস এসেছিলেন প্রবল সম্ভাবনা নিয়ে স্কেচে। দারিদ্র্যের কষাঘাতেই চলে যেতে হয় বম্বেতে। সেখানে তিনি প্রখ্যাত আর্ট ডিরেক্টর চলচ্চিত্র জগতে।

ওড়িশার প্রসঙ্গে আসি। বিচিত্রানন্দ মহান্তি ডেকোরেটিভ কাজে খ্যাতনামা। দেশবিদেশের শিক্ষা নিয়ে প্রখ্যাত শিল্পী অজিত রায়। ওড়িশার শিল্পীদের মধ্যে খুবই প্রভাবশালী শুনেছি উপেন্দ্র মহারথী। দীননাথ পাটী, অনন্ত পাণ্ডা, হরিশ সিংহ, বংশীধর পাত্র, গোপাল কানুনগো—এঁরাও ওড়িশার প্রখ্যাত শিল্পী। ওড়িশার খাল্লিকোটে আর্ট কলেজ। ওদিকে বিহারে পাটনা আর্ট কলেজ বেশ পুরনো। পাটনার কথা বলতেই পাটনাই কলমের কথা মনে হয়। আধুনিক চিত্রকলার কথা বলতে গিয়ে ধান ভানতে শিবের গীত। তবু যখন মনে পড়েই গেল, তখন বলেই ফেলি। পাটনাই ঘরাণার কিছু শিল্পীকে শেষ দিকে রায় দুর্গানারায়ণ পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো হাত ছিল মহাদেব লালের ( ১৮৬০ ?—১৯৪২ )। পাটনা আর্ট স্কুলের প্রিন্সিপাল রাধামোহনকে তিনি শেখান। ঈশ্বরী

প্রসাদ মথুরার রাজার মাইনে করা শিল্পী ছিলেন। ১৯০৪ সালে কলকাতা আর্ট স্কুলে তিনি অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পরে ভাইস প্রিন্সিপালও হয়েছিলেন। ঈশ্বরীপ্রসাদকে পাটনাই ঘরাণার শেষ শিল্পী বলা হয়।

পাটনা কলেজে পাণ্ডে সুরেন্দ্রর নাম আছে। বিহারের ছেলে পুলক বিশ্বাস রিয়ালিষ্টিক ও অতি আধুনিক দুই ধারাতেই প্রখ্যাত। প্রণব মজুমদার ভাস্কর্য এবং রিয়ালিষ্টিক ও নিও-রিয়ালিষ্টিক—দুই ধরনের ছবিই আঁকেন। এঁদের আগেকার সময়ে জামসেদপুরের এল, পি, শিকদার ও সত্য বসু প্রথাগত শিল্পে দুই দশক আগে বেশ ভালো কাজ করেছেন।

পূর্বভারতের পূর্বপ্রান্তের রাজ্যগুলির কথা বলেছি কিছু। ছবি আঁকার জগত সম্পর্কে বেশি পুঁথিপত্র নেই,—সব বইয়ে সব কথাও নেই, সকলের কথাও নেই। জীবন ও শিল্প সংগৃহীত ইতিবৃত্তের চাইতে বেশি গতিবান হয়ে গেছে সেজন্যই। আসাম, মেঘালয়, মনিপুর নাগাভূমি, অরুণাচল প্রদেশ, মিজোরাম আর আমাদের ত্রিপুরার কথা ভাবলে অন্য রকমের ছবি ভাসে চোখে। কী উজ্জ্বল, কী বর্ণাঢ্য সাজ-সজ্জা আর উৎসব অনুষ্ঠান! আসামের হেমন্ত মিশ্রর কথা বলেছি। তাঁর ছবিকে সমালোচকরা রিয়ালিষ্টিক, বিমূর্ত, সম-বিমূর্ত, এক্সপ্রেশনিস্ট - কোনো দলেই না ফেলে একটা পৃথক নিজস্ব শ্রেণীর দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করেছেন। বলতে হয় শক্তি রায় বর্মণের কথা –আসামের অধিবাসী। প্যারিশে এখন খুবই সুনাম অর্জন করেছেন। ভবানী ভট্টাচার্যের কথা বলতে হয়, বলতে হয় বস্তুনিষ্ঠ শিল্পী কমার্শিয়াল আর্টিস্ট ত্রৈলোক্যনাথ দত্তের কথা। এ রকমেরই শিল্পী বীরেন চৌধুরী। মেরিনা চৌধুরী ভারতীয় ধারাকে খানিকটা ভেঙে নিজস্ব ধারা করেছেন মনিপুর বিচিত্র বর্ণ-সমুজ্জ্বল ওড়না-ঘাগড়া, বয়নশিল্পের অপূর্ব নিদর্শনের ভূমি। নাসিকাগ্রে চন্দনের রসকলি থেকে শুরু করে জীবনের অণুপরমাণুতে শিল্প জড়ানো মনিপুরীদের। প্রসিদ্ধ

শিল্পী অনেকে। যেমন কে. পিসাক সিংহ। প্রবাসী মনিপুরীদের মধ্যে বাণী সিংহ।

এদিকে রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মণকে শান্তিনিকেতনের বা কলকাতার শিল্পী হিসেবে ধরলেও আসলে ওঁদেরকে আমরা ত্রিপুরার শিল্পী বলেই বলব। রমেন্দ্রনাথের বহুবিচিত্র কর্মজীবন যদিও দীর্ঘস্থায়ী নয়। বেশি তিনি বাঁচেন নি। ভারতীয় ধারায় শিখেছেন নন্দলালের কাছে, বাস্তব ও অলঙ্কারিক ছবি এঁকেছেন, বিদেশে গিয়ে দিক্‌পালদের কাছে শিখেছেন এচিং, ড্রাই-পয়েন্ট ও কাঠখোদাইয়ের কাজ। কলকাতা আর্ট কলেজে অধ্যক্ষ হয়ে তিনি ক্যালকাটা গ্রুপের কয়েকজন প্রখ্যাত শিল্পীকে অধ্যাপকমণ্ডলীর মধ্যে গ্রহণ করেন। দিল্লী থেকে আনেন সত্যেন ঘোষালকে। তিনি একাই যে তিনটি ধারার প্রতিই শ্রদ্ধাশীল—একথা নীরবে তখনই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। ভারতে গ্র্যাফিক্ আর্টের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান হয়ত একক ভাবেই অপরিমেয়। ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মণ শান্তিনিকেতনে অসিত হালদার ও নন্দলালের ছাত্র। পরে একসময়ে ওখানেই অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। ফ্রেসকোয় সিদ্ধহস্ত একসময়ে ইণ্ডিয়া হাউসে ফ্রেসকো আঁকতে গিয়েছিলেন। প্রবীণ শিল্পীদের মধ্যে নলিনী মজুমদার ক্ষিতীশ মজুমদারের শিষ্য ও ললিতকলা আকাদেমির সদস্য। মিন্টি ওয়ানের ছবিতে গুরুর ছাপ। প্রবীণ শিল্পীদের মধ্যে কিছুকাল আগে পরলোকগমন করেছেন তৈলচিত্রশিল্পী শ্যামাচরণ চক্রবর্তী—আগরতলায় শ্যামাচরণ পেন্টার নামে বিখ্যাত—রাজপুরীতে বহু তৈলচিত্র তাঁর হাতের আঁকা। সদ্য পরলোকগত শৈলেশ দেববর্মা নন্দলালের ছাত্র এবং নিষ্ঠাবান ভারতীয় ধারার শিল্পী। সুরেশ দেববর্মা ও মানস ভট্টাচার্য প্রবীণ তৈলচিত্রশিল্পী। হৃষীকেশ দেববর্মণ ভারতীয় ধারায় ওয়ালের ছবি আঁকেন। বিজন চক্রবর্তী মূলতঃ ভাস্কর্য ও মৃৎশিল্পের ছাত্র হলেও আলঙ্কারিক ছবি আঁকেন ভালো। বিমল কর উজ্জ্বল রঙে বিমূর্ত ও সমবিমূর্ত ছবি আঁকেন। প্রশান্ত সেনগুপ্ত বাস্তব এবং

খানিকটা ভেঙেচুরে চমৎকার আধুনিক তৈলচিত্র করেন। প্রভাত সেন প্রায় সব মাধ্যমেই মিষ্টি ছবি আঁকেন এবং প্রথা ভাঙার মধ্যেও ডিজাইনটি বজায় থাকে সুন্দর। সত্যেন চক্রবর্তীর কোলাজ বিখ্যাত। এ ছাড়া আছেন স্বপন নন্দী, বিমল দেব, সংঘমিত্রা দত্ত, চিন্ময় রায় ও পার্থ দেব। আছেন কলকাতা প্রবাসী ধর্মনারায়ণ দাশগুপ্ত। লোক-শিল্পের উজ্জীবনে রাজকুমারী কমলপ্রভা দেবী আছেন। আছেন শক্তি হালদার ও সলিল দেববর্মন।

কিন্তু শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীত-সংস্কৃতির দিক থেকে দেখতে গেলেও কলকাতাকে কলিতীর্থ বলা যায়। এই কলকাতা কত বিচিত্রভাবে অসীম ধৈর্য ও সহানুভূতি নিয়ে কত অসংখ্য ধারায় শিল্পচর্চাকে পৃষ্ঠ-পোষকতা করছে দেখুন। গত দুই দশকে পূর্বভারতে কলকাতার প্রদর্শনীগৃহ বেড়ে গেছে। এই গৃহগুলি পূর্ব-রাজ্যগুলির সর্ববিধ শিল্পের বিকাশে সহায়ক হয়েছে। এই ঘরগুলির দেয়ালে দেয়ালে আমরা শুধু কলকাতার শিল্পীদের ছবিতো দেখিনি; সারা দেশের, বিশেষতঃ প্রাচ্যভারতের স্নিগ্ধ বর্ণিকাভঙ্গ পরিশীলিত বিন্যাস, সঠিক ড্রয়িং ও ড্রয়িং ভাঙার সুপরিকল্পিত রেখার গতি, উজ্জ্বল ও দীর্ঘস্থায়ী আনন্দের প্রতিশ্রুতি দেখেছি। একজনের ছবি দেখে অন্যের মনে রং লাগে। একজনের ছবি থেকে গড়িয়ে রং তার ক্যানভাসকে ছাড়িয়ে যায়। লক্ষ্মীধর দাস, দেবব্রত রায়চৌধুরী আর শান্তি দাসের স্কেচ দেখতে না দেখতে, আর হৈমন্তী সেনের জলরং-তেলরং-এর রং শুকোতে না শুকোতে এলো অজিত চক্রবর্তীর গ্রাফিকের কাজ, সলিল ভট্টাচার্যের ড্রয়িং। সনৎ কর গোড়া থেকেই কিছুটা ড্রয়িং ভেঙেছিলেন, অরুণ বসু প্রথমে প্রথাগত জলরং নিয়ে, পরে ভাঙার পথে চললেন। সুনীল দাসের ঘোড়ার ড্রয়িং কলকাতায় চমক আনল। নিখিল বিশ্বাসের অতি ক্ষণস্থায়ী জীবন আধুনিক ছবিতে ভরপুর। তেমনি দীপেন বসু ভারতীয় ধারার শিল্পী, কিন্তু জীবনটা ওঁর নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী। সন্তোষ রোহতগী মহিলাশিল্পী হিসেবে সুপরিচিতা—

বিমূর্ত, ইঙ্গিতপ্রধান, অলঙ্কারিক ছবি—তাঁর প্রদর্শনীতে সবই আছে। রেখা ও রঙের ইমেজারি আজকাল চিত্রকলাকে আধুনিক ইঙ্গিতপ্রধান কবিতার পর্যায়ে তুলেছে। ছবির মূল বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আধুনিক শিল্পে রং ও রেখাকে কী সুকৌশলে ব্যবহার করা হচ্ছে। গণেশ হালুই, গণেশ পাইন, নির্মাল্য নাগ, পুলক বিশ্বাস, প্রদীপ বসু, শঙ্কর নন্দী, মনোরঞ্জন সাহা, বিনোদ দাম, হরভূষণ মাল, অজু চৌধুরী, কৌশিক চক্রবর্তী—এঁরা কিছু কিছু বাস্তবতাকে ভেঙে আজকের পক্ষে অভ্যস্ত অথচ গতদিনের পক্ষে ব্যঞ্জনাময় ছবি আঁকেন। সুকুমার দাসের ছবিতে আসে মিশরীয় প্রভাব। সত্যেন চক্রবর্তী আর স্বপন নন্দীর ছবি মূলতঃ বাস্তব। প্রশান্ত সেনগুপ্তর ছবি বাস্তব ও খানিকটা ভেঙেচুরে আঁকা আগেই বলেছি। বিমল কর, পার্থ দেব ও চিন্ময় রায়ের ছবি বিমূর্ত ও সম-বিমূর্ত ধারায় আঁকা এবং একই ছবিতে অনেক সময় বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহার করা হয়েছে। ভবাণী ভট্টাচার্য, ত্রৈলোক্য দত্ত, রজত বড়ুয়া, পুলক বিশ্বাস, রথীন দত্ত, কে. পিসাক সিংহের ছবি কলকাতার প্রদর্শনীর দেয়ালে। অমৃত শেরগিলের ছাপ পড়েছে সরমা ভৌমিকের ছবিতে। প্রতীক-প্রধান ছবি আঁকলেন মঞ্জরী দত্ত। কাঁটা-পেরেক-নাট বল্টু ইত্যাদি বিচিত্র মাধ্যম ব্যবহার করা থেকে শুরু করে বিমূর্ত, সম-বিমূর্ত ও অনেকটাই বাস্তব ছবি আঁকলেন সরিৎ নন্দী। অপেক্ষাকৃত নতুন শিল্পী সংস্থাগুলির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে সোসাইটি অব ওয়ার্কিং আর্টিস্টস্। ওই দলে আছেন নীরেশ পোদ্দার, অনিমেষ সেনগুপ্ত, সলিল ভট্টাচার্য, কমলা ঘোষ প্রভৃতি। সমকালীন যুগের অশান্ত তরুণ সম্প্রদায়ের মুখের প্রতীক হিসেবে নিজের প্রতিকৃতিকে বারবার ব্যবহার করেছেন নিখিলেশ দাস। বিমূর্ত ও লোকশিল্প ভিত্তিক জলরঙে সুকুমার দত্ত। অনেক নাম, অনেক মুখ – ভারতের এই পূর্বপ্রান্ত ছবিতে ছবিতে ছয়লাপ। ওদিকে আকাদেমির গ্যালারিতে কিছুদিন আগেই কলাভবনের অধ্যাপক সোমনাথ হোড়ের গ্রাফিক ষ্ট্রীমের ছাত্রছাত্রী শান্তনু ভট্টাচার্য, মনোহর লাল, শর্মিলা রায়,

চিত্রা মহান্তি, তড়িৎ ভট্টাচার্য ও অপূর্ব সাউ-এর যৌথ গ্রাফিক চিত্র-প্রদর্শনী হয়ে গেল। একটু আগেই বলেছি শিল্পীদের অনেক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। সোসাইটি অব কনটেম্পোরারি আর্টিস্টস্ তাদের মধ্যে সুপরিচিত। এই প্রতিষ্ঠানে বিকাশ ভট্টাচার্য ও সোমনাথ হোড় আছেন। আর আছেন অনিলবরণ সাহা, লালুপ্রসাদ শা, শৈলেন মিত্র, সুহাস রায়, শ্যামল দত্ত। শ্যামল বসু লক্ষ্মীধর দাসের সমকালীন এবং বাস্তব ছবি আঁকেন। মহিম রুদ্র সম্পূর্ণ এ্যাবস্ট্রাক্ট। অসিত পাল হয়ত মধ্যপন্থী। চিত্রনিভা চৌধুরীর আলপনা ও কুলোচিত্রণ বিখ্যাত।

তারচেয়ে শেষ পর্যন্ত ভাবছি নামগুলি উল্লেখ না করলেই ভালো ছিল। কত নাম, কত রং, কত বৈচিত্র্য—সব জানিও না। কোনো রাজ্য বেশ কিছুটা যদিবা অন্তরঙ্গ, কোনো রাজ্যকে আবার ততটা জানতে পারিনি। সে অপরাধ আমার। কোনো শিল্পীর নাম, কোনো প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করতে গিয়েই নিজের অজ্ঞতার খোঁচা নিজেই অনুভব করি। সাহিত্য কীর্তি বা অন্যান্য বিষয়ে কিছু কাজ হলেই-সে খবর ছাপার অক্ষরে পাওয়া যায়। শিল্পীর ছবি বা শিল্পীর ছাপার কালিতে বেরোবে এমন কথা নেই। তার খোঁজ এত সহজে ছড়ায় না। পূর্বপ্রান্তে কুমারী নীরা ভাটিয়া ছবি আঁকছেন। North-Eastern Affairs পত্রিকায় সে খবর দেখলাম বলে জানলাম। স্বাধীনতার রজত-জয়ন্তী উপলক্ষে সেখানে যে প্রদর্শনী হয় তাতে একশ' জন শিল্পী অংশ গ্রহণ করেছিলেন। সে খবর নেহাৎ ওই কাগজটায় পাওয়া। পূর্বভারতে কলকাতার বাইরে যে প্রদর্শনীগুলো হচ্ছে, যে শিল্পীরা ওতে অংশ গ্রহণ করছেন, তাদের খবর নিতান্তই স্থানীয় থাকছে একই কারণে। দু'দিন পরে লোকে ভুলছেন।

পূর্ব-ভারতের আধুনিক চিত্রকলার গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে যে কথাগুলো আমি বলতে চেয়েছিলাম সেগুলো আশাকরি আমার

অসম্পূর্ণ তথ্য থেকেও স্পষ্ট হয়েছে। আমি বলতে চেয়েছি, পূর্ব-ভারতে আধুনিক শিল্প তিনটি ধারায় প্রবহমান শিল্পের আশ্চর্য সহাবস্থান। এই তিনটি ধারা হচ্ছে—পুনরুজ্জীবিত ভারতীয় শিল্পাধারা, আধুনিক পাশ্চাত্য রিয়ালিষ্টিক শিল্পধারা ও বিভিন্ন ইজ্‌ম্ ও ভাবনা প্রভাবিত তথাকথিত 'মডার্ণ আর্ট'। এবং বলতে চেয়েছি, এই তিনটি ধারার এমন সশ্রদ্ধ সহাবস্থান অন্য কোথাও খুজে পাওয়া যাবেনা।

এই প্রসঙ্গেই আধুনিক শিল্পের উপকরণের কথাও বলতে হয়। উপকরণ জীবনধারার ওপর নির্ভরশীল, বাজারের ওপর নির্ভশীল ও টেকনিকের ওপর নির্ভরশীল। ভারতীয় ধারায় ছবি আঁকতে জলরং, টেম্পারা। কখনো তেলরং ও প্যাণ্টেলের ব্যবহার। পাশ্চাত্য বস্তুনিষ্ঠ ছবিতে জলরং (স্বচ্ছ ও অস্বচ্ছ), তেলরং, প্যাস্টেলের ব্যবহার বেশি এবং অবিমিশ্র—অর্থাৎ মিডিয়ামগুলো পৃথকভাবে আলাদাজাত হিসেবেই ব্যবহৃত। এছাড়া রয়েছে চারকোল ক্রেয়ন ইত্যাদি। গ্রাফিকে লিথো, কাঠখোদাই ও এচিঙের সরঞ্জাম। অতি-আধুনিক শিল্পকলায় অনেক বিপ্লব এসেছে, দ্বি-মাত্রিক ছবিতে ত্রি মাত্রা এসেছে। মোম, পাথর, কাঁকর, বালি—এমনকী স্ক্রু, পেরেক, নাট, বলটু এসে গিয়েছে। উপকরণের বন্ধন ছিন্ন হয়েছে বিমূর্ত ও সম-বিমূর্ত শিল্পে। বিদেশী জলরং, তেলরং, তুলি, কাগজ, ক্যানভাস এখন পাওয়া সহজ নয়, দেশে আমরা এখনও সেই মানের জিনিস তৈরি করতেও পারছিনা। অনেক শিল্পী উপকরণ পাল্টাচ্ছেন। স্বচ্ছ জলরং—হোয়াটম্যান বা ডেভিডকক্স কাগজে আঁকা বিরল দৃশ্য এখন। উপকরণের অবাধ স্বাধীনতা এসেছে, তবে সব স্বাধীনতার মতই এতেও সঙ্কট আছে সঙ্গত কারণেই।

এর চেয়েও বড় সঙ্কট একটা আছে। ভাবনার সঙ্কট—শিল্পধর্মের সঙ্কট। দেশ সাপ্তাহিকের শিল্প সমালোচক লিখছেন—"আমাদের দেশের সমসাময়িক সাহিত্যে সমকালীন জীবন তথা সমাজের পরিচয় পাওয়া

যায় চিত্রকলার বিষয়ে ঠিক একথা বলা চলে না। অর্থাৎ সাহিত্যের মত চিত্রকলাক্ষেত্রে সমকালীন যুগের বৈশিষ্ট্যের ওপর এখনও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।"

প্রাচীন শিল্পে শিল্পীর ব্যক্তিসত্তাকে স্বীকৃতি দেওয়া হোত না। ভারতশিল্পের পুনরুজ্জীবনের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পীর ব্যক্তিগত রুচি ও অনুভূতি প্রকাশের অধিকার স্বীকৃত হোল। কিন্তু এই পুনরুজ্জীবনে সমকালীন জীবনযাত্রা ও সমকালীন চিন্তাধারার প্রতিফলনও জরুরী বলে বিচেচিত হয়েছিল। পাশ্চাত্য বস্তুনিষ্ঠ ধারায় যাঁরা দিক্‌পাল, তাঁরা কেউ দুর্ভিক্ষ, কেউ কয়লাখাদ, কেউবা বস্তির জীবন, কেউ বা অন্তরঙ্গ সৌন্দর্য, হাসিকান্না ফুটিয়েছিলেন। সে ধারা এখনও আছে আগেই বলেছি। তবে পর্যাপ্ত কিনা সেটাই কথা।

এখন অতি আধুনিক ছবিতে ব্যঞ্জনা, সঙ্কেত, বর্ণ ও রেখার ইমেজারি। এখন অনেক ছবিই আধুনিক ইঙ্গিতপ্রধান কবিতার পর্যায়ে উত্তীর্ণ। ব্যাকরণের বন্ধন, উপকরণের বাধ্যতা এখন উঠে গেছে। শিল্প এখন নিশ্চয়ই 'mirror of contemporary tastes', কিন্তু অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে 'mirror held up to nature' কিনা সেকথা সর্বদা হয়ত বলা যাবে না।

তবু শিল্পের প্রসার হয়েছে অনেক, ব্যাপ্তি হয়েছে ঢের। বহু-বিচিত্র প্রকাশভঙ্গি হয়েছে। ত্রিপুরায় বাঁশের কাঠি তাঁতে বুনে পট তৈরী হয়, ওতে আজকাল তেলরঙের ছবি আঁকা হচ্ছে। ত্রিপুরার মণ্ডপে, সরকারী বিক্রয় কেন্দ্রে দেখতে পাওয়া যাবে। আষাঢ় মাসে বর্ষার ঢল নামে, পাহাড়ের মাথায় মাথায় মেঘ জমে, বিদ্যুৎ চমকায় নীচে কেয়াফুলের গন্ধে বনভূমি মাতোয়ারা হয়, ঘরে ঘরে পাহাড়ী মেয়েরা ছোট ছোট তাঁত নিয়ে বসে, পরনের মেখলা বোনে—রিয়া—পাছড়া। কত বিচিত্র ডিজাইন তাতে ওঠে। চৈত্র মাসে জুম চাষের জন্য বনে আগুন লাগানো হয়, চৈত্র সংক্রান্তি থেকে সাতদিন ধরে চলে গইড়া পূজা। বাঁশ চেঁচে ফুল, বাঁশের

আগা কেটে ঠাকুর বানিয়ে চোঙে করে মঞ্চে বসানো হয়। 'মাইলুমা খুলুমা' দেবতার ঘট বসে। জীবনের মধ্যে ছবি। পূর্বভারতের সর্বত্রই তেমনি বিনা। বাংলা বারো মাসে তের পার্বণ, পটের গান, শোলার পট। বিহারে পূর্ণিয়ায় বিষহরির ছবি কাগজের ঝুড়ির গায়ে, আসামের গোয়ালপাড়ায় কালীর মুখোশ, চমৎকার ঝিলমিলে চারদিকে ছড়ানো নাগাদের মুকুট, মিজোদের রং-বেরঙের উৎসবের সাজ, মাথায় পালকের মুকুট, আর 'পুয়ান্ত' মেখলার কত বিচিত্র বর্ণময় কারুকার্য। পূর্বপ্রান্তের সর্বত্রই রঙে রঙে প্রায় রামধনু হয়েছে— অরুণাচল প্রদেশ, মনিপুর, মেঘালয়। শিল্পকলা সর্বপ্রকার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে জীবনের সর্বপ্রকার বৈচিত্র্য নিয়ে এগিয়ে আসছে। আশা করবো, শিল্পকলা জীবনের হাসি তুলিতে ফুটিয়ে তুলবে, কান্নাকেও ফোটাবে, জীবনের বিশ্বস্ত প্রতিচ্ছবি ও ব্যাখ্যাতা হয়ে দাঁড়াবে এবং সমকালীন সমাজের চলচ্ছবিকে চিরকালের খাতায় লিখে রাখবে।

# স্বাধীনতার পরবর্তী বাংলায় শিশু সাহিত্যের অগ্রগতি

**আশা দেবী**

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে বাংলা শিশু সাহিত্যের পূর্ণতা এসে গিয়েছিল। বিশিষ্ট শিশু সাহিত্যিকেরা প্রায় সকলেই তখন সাহিত্যের আসরে এসে গিয়েছেন।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই একটি দুঃসাহসী পদক্ষেপ দেখা গেল শিশু সাহিত্যে। আমাদের দেশে স্বাধীনতা আসে ১৯৪৭ সালে। নতুন আশা আকাঙ্ক্ষা আর উদ্দীপনার জোয়ার সাহিত্যকেও স্পর্শ না করে পারেনি সে প্রাণবন্যা। এরই ফল দেখা গেল শিশু সাহিত্যেও। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ৪ঠা এপ্রিল শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্রের সম্পাদনায় একটি কিশোর দৈনিক প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির নাম "কিশোর"। "ছোটদের আসর" নামেও একখানি সাপ্তাহিক প্রকাশিত হয়। কিন্তু এ দুটির একটিও দীর্ঘায়ু নয়। কিন্তু এ দুটি সংবাদপত্র শিশু সাহিত্যে একটি নতুন দিক খুলে দিল এবং 'সে পথ বাহিয়া' নব নব সাহিত্য প্রয়াসের ধারা শিশু সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে চলল।

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় শিশুসাহিত্যে ভুরিভোজের আয়োজন হয়ে চলল। আনন্দবাজার পত্রিকার আনন্দমেলায় শ্রীবিমল ঘোষ (মৌমাছি) এবং যুগান্তরে ছোটদের পাততাড়িতে (স্বপন বুড়ো) শিশুসাহিত্যকে মাতিয়ে তুললেন। ক্রমে ক্রমে শিশুসাথী, মৌচাক, রামধনু, মশাল, শুকতারা, জয়যাত্রা, কিশোর ভারতী, জয়ধ্বনি প্রভৃতির মাধ্যমে শিশু সাহিত্যের জয়যাত্রার রথ অগ্রসর হয়ে চলল।

বিভিন্ন পত্রপত্রিকা এবং প্রকাশিত পুস্তকাদি হতে শিশু সাহিত্যের দুই প্রধান ধারা লক্ষ্য করা যায়। একটি ছড়া ও কবিতা, অপরটি গল্প ও উপন্যাস।

কবিতা আর ছড়ার ক্ষেত্রে যাঁর নাম সর্বাগ্রে মনে পড়ে তিনি সুনির্মল বসু। তাঁর কবিতার ছন্দ এবং ছবিটি এমন অপূর্ব যে একবার পড়লে আর ভোলা যায় না। চাঁদ, জ্যোৎস্না ও আকাশের হাজার তারা নিয়ে অগনিত কবিতা লেখা হয়। শিশুরা পড়ে এবং ভুলে যায় কিন্তু:

চাঁদটা যেন সত্যিকারের আলোরি মৌচাক
দুষ্টু ছেলের ঢিলটা লেগে হঠাৎ হলো ফাঁক
আজকে রে তাই সাঁজের বেলায়
আলোর মধু সব ঝরে যায়
হাজার তারা মৌমাছিরা উড়লো ঝাঁকে ঝাঁক
নীল আকাশের নিতল নীলে উড়ল ঝাঁকে ঝাঁক

(মৌচাক—সুনির্মল বসু)

কিংবা

তালুকদারের ভালুক গেল সালুক খেতে পুকুরে
অমনি তারে করলো তাড়া বিরাট সে এক কুকুরে
সেই তাহারে করলে ধাওয়া
আর হলো না শালুক খাওয়া
ছুটলো কুকুর ঘরের পানে সেদিন বেলা দুপুরে॥

কিংবা

গোলক বাবু ঢোলক বাজায় নোলক নাকে দিয়ে
ব্যাপার দেখে ট্যাপার বাবা বললে: ব্যাপার কিহে
গোলক বলে বাগিয়ে ঘুঁষি করবো যা হয় আমার খুশি
আমার নিজের পাঁঠাটিকে কাটবো আমি ল্যাজের দিকে।

এইসব কবিতা একবার পড়লে আর ভোলা যায় না। অথচ

"আমলকি বনে আজ নামল কি ছায়া ভাই, চল চল সেখানেই যাই" প্রভৃতি কবিতা শিশু সাহিত্যে আজও অতুলনীয়।

এ গতানুগতিক চাঁদ ও জ্যোৎস্না বর্ণনা নয়। কবি কল্পনার স্পর্শ লেগে সব কিছুই একটা নূতন তাৎপর্য ও সৌন্দর্যে ভরে উঠেছে এবং সেই সঙ্গে শিশুর কল্পনাকেও জাগিয়ে দিয়েছে। কবির হাতে শরতের বর্ণনা এই রকম :

"স্থলপদ্মের পোষাক পরা গলায় কমলহার
কর্ণমূলে কুরুবকের বীরবৌলি তার।
নামলো এসে হিরণ কিরণ চতুর্দোলায় চড়ে
সোনার গুঁড়ো ছড়িয়ে দিলে ঝর্ণাধারার তোড়ে।"

(শরৎ—নিশিকান্ত সেন)

কর্ণমূল, কুরুবক, বীরবৌলি অবশ্য কঠিন গম্ভীর শব্দ। কিন্তু সামগ্রিক চমৎকার ছবিটির সঙ্গে কী আশ্চর্যভাবে মিলে গিয়েছে। শিশুর মন সঙ্গে সঙ্গে দেখছে অপরূপ সাজে কে যেন শরতের আলোর রথে চড়ে পৃথিবীতে নেমে আসছে, আর মুঠো মুঠো করে সোনার রেণু ঝরণার জলে ছড়িয়ে দিচ্ছে।

এই ধরনের কবিতাই শিশুমনে স্থায়িত্ব লাভ করে। তার মনে যে কবি আছে তাকেও জাগিয়ে দেয়। এই জগতে প্রবেশ করতে হলে প্রতিভাই যথেষ্ট নয়, শিশুহৃদয়ে প্রবেশ করে তারই চোখ ও মন নিয়ে জগতকে দেখতে হয়। এ দৃষ্টি ও মন না থাকলে প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যপ্রতিভা থাকলেও শিশুমন জয় করা যায় না।

ছড়া এবং কবিতার কথা বলতে গেলে যাঁর কথা এর পরেই মনে পড়ে তিনি অন্নদাশঙ্কর রায়। কি ছোট, কি বড় সর্বক্ষেত্রে তাঁর সদা জাগ্রত মনটি শিশুরাজ্যে ছড়ায় যে ছবি এঁকেছে তার তুলনা নেই। আনন্দের মাধ্যমে ছোটদের রাজনৈতিক এবং সমাজনৈতিক চেতনাকে জাগ্রত করবার ক্ষেত্রে তাঁর,

তেলের শিশি ভাংলো বলে খোকার 'পরে রাগ কর।
তোমরা যে সব বুড়ো খোকা ভারত ভেঙ্গে ভাগ কর।
তার বেলা ?

স্বাধীনতা এল দেশকে ভাগ করে, ছোটদের মধ্যে এই ভাগাভাগির গ্লানি একটু চোখের জলে মিশিয়ে নরম করে তিনি পরিবেশন করেছেন। আবার দেশের অর্থ নৈতিক সংকট এবং জনগণের তার জন্য কষ্টের একটি সুন্দর ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন অন্য ছড়ায়ঃ

"কী খেয়েছ ? কী খেয়েছ ?
বল আমায় সত্য
আর তো কিছুই যায় না পাওয়া
তাই খেয়েছি আজব খাওয়া
মা ঠাকুমার রেখে যাওয়া
কাঁঠালের আমসত্ত্ব।
খেলে কি সে ? খেলে কি সে ?
বল আমায় খাঁটি।
বাসন যত ছিল ঘরে
বিকিয়ে গেছে ওজন দরে
বাকী আছে খাবার তরে
সোনার পাথর বাটি।"

আবার কখনও খেয়ালী ছড়াও অন্যমনস্ক ভাবে এঁকেছেন—

"চক খড়ি চক খড়ি চক
এইবার আঁকছি বক"

কিংবা ছোট্ট ঝগড়াটে মেয়ে মাথায় খোঁচা খোঁচা কদম ছাঁট চুল—ছিটের রং ওঠা ফ্রক, তার পিঠ খোলা রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে যখন বন্ধুকে উদ্দেশ্য করে নাচতে নাচতে কলা দেখিয়ে "বেড়াল না ফেড়ালটা"র ছড়া কাটে তখন তার যে অঙ্গভঙ্গি হয় অন্নদাশঙ্কর রায় যেন তাঁর ছড়ার ছন্দে আর ছবিতে তার নিখুঁত চিত্রটি ধরে রেখেছেন।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটদের কবিতাও মনে রাখিবার মতই সুন্দর :

নোংরা কাজে থাকবে না
মাঠের কাদা মাখবে না।
চূড়ান্ত সাধ মিটিয়ে শুধু
স্বপন গড়ই গড়বে।
... ... ... ...
চূড়ায় গিয়ে চড়বে।

অথবা —

এক দৌড়ে শরীর গরম
দুই দৌড়ে ক্ষিদে
তিন দৌড়ে রাস্তা খোলা
যাও না চলে সিদে
কিন্তু যাবে কোথায় ?

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটদের লেখার হাতের বুঝি তুলনা নেই। কি ছোটদের রাজ্যে, কি বড়দের মনে তাঁর আসন চিরদিন অটুট থাকবে। ছড়ার ছবিতে ছন্দে তিনি শিশু মনে নূতন রং ধরিয়ে দেন।

"রাগের চোটে চণ্ডী খুড়ে—
ছিঁড়তে থাকে দাড়ি
খুড়ি তখন খুড়োর মাথায়
চড়ায় ভাতের হাঁড়ি
খুড়ো যতই উঠছে চটে
খুড়ির মুখে হাস্য ফোটে
চটবে যত ভাতটা তত ফুটবে তাড়াতাড়ি।"

অথবা

"হাতে নিয়ে তরোয়াল 'মার মার-কাট-কাট'—
ছেড়ে ঘোর হুঙ্কার
বীররসে মত্ত,
কী হলো সে তারপর

খট্ খট্ মড়্ মড়্
স্টেজ ভেঙ্গে চিৎপাত
হারাধন দত্ত।"

অমিতাভ চৌধুরী ইতিমধ্যেই তাঁর ছড়ার অভিনবত্বে এবং নূতন সুরের রেশে শিশুমনে আসন পেতে বসেছেন।

"আকাশে যেই উড়িয়ে দিলাম ঘুড়ি
না না—না না থুড়ি
ঘুড়ি তো নয় বেলুন।
তার সঙ্গে খেলুন
সূর্যি মামা এবং চাঁদের বুড়ি
চলুক ওরা উড়ি।
ভুল বলেছি বেলুন ওটা নয় ঘুড়ি"

খ্যাতিমান চিত্র পরিচালকের দক্ষতা সত্যজিৎ রায়ের ছড়ার ক্ষেত্রেও অপূর্ব স্বাতন্ত্র্য এনেছেন। তাঁহার শিল্পী হাতের ছোঁয়ায় লিমেরিক তার মেজাজ অক্ষুন্ন রেখে সুরে ছন্দে চমৎকারিত্বে শিশুমনের রাজ্যে নূতন অনুরণন জাগিয়েছেন—

"কুমীর পিঠে বাঘটাকে দেখে
বদ্যি বুড়ো বললে তারে ডেকে,
'বলছি বাপু তোমায় সোজা
ওর হাবভাবেতে যাচ্ছে বোঝা
ভোরের দিকে দেখবে তোমায় চেখে।'
বললে বুড়ো বোঝো ব্যাপার খানা
একটা মোরগ চারটে শালিক ছানা
দুই রকমের হুতোম পেঁচা
একটা বোধ হয় হাঁড়িচাঁচা
দাড়ির মধ্যে বেঁধেছে আস্তানা।"

ছোটদের ছড়ার ক্ষেত্রে সুখলতা রাও-এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বিখ্যাত কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ও ছোটদের জন্য সুন্দর সুন্দর ছড়া লিখছেন। নির্মলেন্দ গৌতমের ছড়া এবং গল্প দুইয়েরই হাত ভাল। জ্যোতিভূষণ চাকীর ছড়া প্রতিটি শিশুরই ভাল লাগে।

গল্প ও উপন্যাসের ক্ষেত্র আরো পরিসর। এ ক্ষেত্রেও সর্বাগ্রে খগেন্দ্রনাথ মিত্রের নাম করা যায়। তাঁর বাবুর কাণ্ড, সত্যি ভূত? প্রভৃতি গল্প উল্লেখযোগ্য। তাঁর কিশোর উপন্যাসও ইতিপূর্বেই কিশোর চিত্ত জয় করেছে।

শিশু সাহিত্যের ক্ষেত্রে ধীরেন্দ্রলাল ধরকে সব্যসাচী বলা চলে। তিনি জীবনী, উপন্যাস, ছোটগল্প, ঐতিহাসিক গল্প, নাটক সব ক্ষেত্রেই অপ্রতিদ্বন্দ্বী। হুন সম্রাট মিহিরগুলের অনাচারের প্রতিরোধ কাহিনী এক সময় বাংলা দেশের শিশুদের মাতিয়ে তুলেছিল। তাঁর রচিত "নিখিল ভারত ফেল করা ছাত্রবৃন্দে"র কাহিনী যে একবার পড়বে সে আর ভুলতে পারবে না। এ ছাড়া ভারতীয় মনীষীদিগের জীবনকাহিনী শিশুচরিত্র গঠনের পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয়। সুতরাং জীবনী লেখার গুণে অত্যন্ত কৌতুহলোদ্দীপক হয়ে শিশু চরিত্রের বনিয়াদ গড়ে উঠতে তাঁর লেখা অসামান্য কৃতিত্বের পরিচায়ক।

জগদানন্দ রায়ের সার্থক উত্তরসাধক ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, তাঁর বিজ্ঞান ভিত্তিক রচনাগুলির তুলনা বিরল। এ ধরনের রচনার একমাত্র তিনিই বাংলা শিশুসাহিত্যের লেখক। এদিক থেকে তাঁকে জগদানন্দ রায়ের উত্তরসাধক বলা চলে।

বাংলা শিশুসাহিত্যে দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একটি স্মরণীয় নাম। বিখ্যাত সুসম্পাদিত "কিশোর ভারতী"র সম্পাদক তিনি এবং অনেক উল্লেখযোগ্য কিশোর উপন্যাসের তিনি লেখক। তাঁর বিজ্ঞান ভিত্তিক গল্পের বই, বিভিন্ন ধরনের সংকলন, অথ ভারত কথকতা, জয় ডঙ্কা বাজে, নীলঘূর্ণি প্রভৃতি উপন্যাস ইতিমধ্যেই জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। তাঁর লেখায় কাহিনীগত দিকের অভিনবত্ব, চরিত্র চিত্রণের অপূর্বতা ও রচনা শৈলীর বৈশিষ্ট্য একবার পড়লে আর ভোলা যায় না।

আশাপূর্ণা দেবীর ছোটদের কাহিনীর একটি বৈশিষ্ট্য জীবে দয়া করা। ছোটদের চরিত্র অনেক সময় বড়দের দোষত্রুটির প্রভাবে কলুষিত হয়ে যাওয়ার সুন্দর নজির তিনি গল্পের মাধ্যমে আনন্দ সহযোগে পরিবেশন করেছেন। তাঁর হাসির গল্পের হাতটিও শিশু মনোরঞ্জন উপযোগী। ছোট বড় উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর সমান অধিকার।

লীলা মজুমদারের শিশুসাহিত্য লিখবার কলমটি অনুকরণীয়, বর্ণনায় তিনি যখন কারো লেখনী-চিত্র অঙ্কিত করেন তখন বুঝি তার তুলনা নেই। যে মানুষটি তার লেখায় নায়ক তার হাত পা ছাঁটা গোঁফ, গোঁফের বাঁ দিকে দুটি চুল পাকা এবং নাকের পাশে আঁচিলটি পর্যন্ত তাঁর নিখুঁত তুলিতে আঁকা হয়ে যায়। তাঁর পদি পিসির বর্মী বাক্স, টং লিং প্রভৃতি লেখা এবং অসংখ্য ছোট গল্পে তাঁর রাজ্যে তিনিই অধিশ্বরী।

শিশু সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক নিঃশ্বাসে যে তিনটি নাম মনে আসে সে নাম তিনটি—শিবরাম চক্রবর্তী, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। শিবরাম চক্রবর্তীর গল্প ভালোবাসেন না এমন লোক বোধ করি নেই। তাঁর লেখার "প্লানিং" এবং চরিত্র চিত্রণে যে বৈচিত্র্য লক্ষিত হয় তা তাঁর হাতেরই একক সৃষ্টি। তাঁর 'বাসাই থেকে ঝালাই' গল্পের ভাষার একটু নমুনা দেওয়া যাক—"সেইজন্যেই তো তার ঝালাই হওয়া দরকার—তাই না? গোবরা জানায়ঃ প্রায়ই তোমায় বলতে শুনি যে আমার বুদ্ধিশুদ্ধি কম। তোমারও দাদা ঐ বস্তুটি তথৈবচ। যদিও আমি মুখ ফুটে বলিনে তুমি মনে কষ্ট পাবে বলে, কিন্তু জানি তো বুদ্ধিশুদ্ধি দুজনেরই একটু কম। এমন কিছু তার ইতর বিশেষ নেই। তবে ওরই ভিতর আমি হয়তো ইতর তুমি হয়তো বিশেষ।" তাঁর শুঁড়-ওয়ালা বাবা থেকে সুরু করে হর্ষবর্দ্ধন গোবর্দ্ধন, চোরের পাল্লায় চকরবরতি, আমার ভালুক শিকার সক্কাহিনী সর্বজনপ্রিয়।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের ঘনাদা কিশোরদের কাছে একটি প্রিয় নাম। তাঁর ময়ুরপঙ্খী, মকরমুখী, সাগরদাঁড়ী, গল্প আর গল্প, ড্রাগনের

নিঃশ্বাস শুক্রে যারা গিয়েছিল, সাদা ঘোড়ার সওয়ার প্রভৃতি বিখ্যাত বই।

তাঁর 'বেড়াজালে ঘনাদা'র আরম্ভটি এইরূপ—"চালের ছাদে কিসের আওয়াজ? কিসের আর, এক জোড়া বিদ্যাসাগরী চটির। বিদ্যাসাগরী চটির আওয়াজ তারপর চিলের ছাদের ওপর থেকে গোলা সিঁড়ি বেয়ে দোতলায়। চটির আওয়াজ গোড়ার দিকে যা ছিল নিচে নামবার সঙ্গে সঙ্গে তার চেয়ে আস্তে হয়ে আসবে? বারান্দায় এসে তা একেবার থেমে যাবে কি?" কবি হাতের লেখা বলেই সে মনোমোহন তা নয়, লেখায় এমন একটি প্রসাদগুণ আছে যা সার্বজনীন।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের "টেনিদা" শিশু রাজ্যে একচ্ছত্র সম্রাট বলা চলে। পটলডাঙ্গায় বাড়ির সেই খড়্গানাসা বাজখাই গলার লোকটির চরিত্র মন্ত্রপুত লেখনী দিয়ে লিখে যেন লেখক এবং লেখা উভয়েই অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর চারমূর্তি, চারমূর্তির অভিযান, সবার প্রিয় টেনিদা, ঘণ্টাদার কাবলু কাকা, জয়ধ্বজের জয়রথ প্রভৃতি গল্প এবং উপন্যাস বিশেষ বিখ্যাত।

বাংলা সাহিত্যে ভাষা সৌন্দর্যের খ্যাতি তাঁর আছে। আবার শিশুদের ক্ষেত্রে ছোটবেলায় ফিরে যাওয়া দিনগুলির যে ছবি তাঁর সাহিত্যে পাওয়া যায় তার তুলনা বিরল। তাঁর 'ওস্তাদের মার' নামক গল্প থেকে খানিকটা উদ্ধৃত করা যাক—"রেলগাড়ির সঙ্গে ভুঁড়ির যে এমন আড়াতাড়ি সম্পর্ক, এর আগে কোনদিন সেটা টেরও পাননি শিবুমামা। ঝটাং ঝট্—ঝটাং ঝট্ দিল্লী মেল ছুটছে। সেই সঙ্গে ছুটছেন শিবুমামাও। নামবেন হাথরাসে, সেখান থেকে বেড়াতে যাবেন মথুরায়। কিন্তু ঢুলুনির চোটে সন্দেহ হচ্ছে, সশরীরে নয় অশরীরী হয়েই তাঁকে মথুরায় পৌঁছুতে হবে। চিৎ হয়ে পড়লেন—ভুঁড়িটা অ্যাটলান্টিকের মতো দুলতে লাগলো। কাত্ হয়ে শুলেন পেটের মধ্যে সোডার বোতলের মতো ঝাঁকাতে লাগলো। উপুড়

হয়ে গেলেন—সারা শরীর বলের মতো লাফাতে লাগলো। নাঃ —অসম্ভব।"

তাঁর লেখায় জাদু ছিল যা আবালবৃদ্ধ বনিতাকে মাতিয়ে তুলতে সমর্থ।

সুকুমার রায়ের সার্থক উত্তরসাধক তাঁর কৃতী পুত্র সত্যজিৎ রায় তাঁর 'প্রফেসার ও গরিলা' বা 'মঙ্গলগ্রহে যাত্রার কাহিনী' পড়তে পড়তে "হেঁসোরাম হুসিয়ারের" কাহিনী স্মরণ করিয়ে দেয়। বান্দাকুশ পর্বতের সেই হ্যাংলা থেরিয়াম, চিল্লানোসেরাসের কথা মনে পড়ে যায়। তাঁর গোয়েন্দা ফেলুদার রহস্য অ্যাডভেঞ্চার কিশোর সাহিত্যে একটি নূতন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। তাঁর ভাষার একটু নমুনা দেওয়া যাক— "—ফেলুদা বলল, এই যে গাছপালা মাঠবন দেখে চোখ জুড়িয়ে যাচ্ছে, এর বৈজ্ঞানিক কারণটা কী জানিস? কারণ, আদিম কাল থেকে হাজার হাজার বছর ধরে গাছপালার মধ্যে বসবাস করে সবুজের সঙ্গে মানুষের চোখের একটা স্বাভাবিক স্বাস্থ্যকর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। আজকাল ক্রমে শহর থেকে সবুজ লোপাট হতে চলেছে, তাই শহর ছেড়ে বেরোলেই চোখটা আরাম পায়, আর তার ফলে মনটাও হালকা হয়ে ওঠে। যত চোখের ব্যারাম দেখবি শহরে। পাড়াগাঁয়ে যা, কি পাহাড়ে যা, দেখবি চশমা খুঁজে পাওয়া ভার।"

ডিটেকটিভ লেখক নীহাররঞ্জন গুপ্তের "কালো ভ্রমর" প্রভৃতি পুস্তক কিশোর সাহিত্যে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।

অধুনা শিশু সাহিত্যে বয়স্ক সাহিত্যের লেখকগণও লেখনী ধারণ করেছেন—কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের বিখ্যাত বিলাতী ইঁদুরের গল্প একবার পড়লে আর ভোলা যায় না। শ্রীযুক্ত সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, গৌরকিশোর ঘোষ, মতি নন্দী, গৌরী বীতপালের লেখা শিশু সাহিত্যে অত্যন্ত সমাদৃত রচনা। দক্ষিণারঞ্জন বসুর কাহিনী কিশোর কেন বয়স্কদেরও অত্যন্ত প্রিয়।

কোন সাহিত্যই এক সঙ্গে স্থিতিশীল নয়। সকল সাহিত্যই গতিশীল। সুতরাং দেশের অর্থনৈতিক, সমাজনৈতিক, রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিশুসাহিত্যের রূপরেখার নিশ্চয়ই বদল হচ্ছে কিন্তু অগ্রগতির পথ অপ্রতিহতই রয়েছে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। এবং উত্তরোত্তর জয়রথ সম্মুখের দিকেই অগ্রসর হয়ে শিশুসাহিত্যের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করবে এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

---

# শিশুসাহিত্য

## অমিতাভ চৌধুরী

বাংলা শিশুসাহিত্য যে শিশুদের জন্য নয়, মূলত বড়দের জন্যে, আমার এই পূর্বসিদ্ধান্তের আর একটি নি:শ্চিত প্রমাণ পেলাম এই আলোচনা-চক্রে এসে। এখানে শিশুসাহিত্যের আসরে শিশুদের সংখ্যা যৎসামান্য, এসেছেন তাদের মা বাবা—বড়োরা। তার মানে শিশুসাহিত্য বলে আমরা যাকে অভিহিত করি তা আসলে শিশুদের যতটা মনোরঞ্জন করে, বেশি করে বড়দের। যত বয়স বাড়ে, ততই শিশুসাহিত্য নামধারী রচনাবলী আমাদের বেশি আকৃষ্ট করে। হ য ব র ল, আবোলতাবোল, খাপছাড়া গল্পসল্প কিংবা শিবরাম চক্রবর্তীর রচনা ছোটবেলায় আমার যত ভাল লাগত, তার চেয়ে বেশি ভাল লাগে এই বয়সে।

স্বাধীনতার পর বাংলা শিশুসাহিত্যের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনার আগে, আমার বক্তব্য, শিশুরা শিশুদের কথা শুনতে চায় না। চাইলে রামায়ণ মহাভারত তাদের কাছে এত জনপ্রিয় হতো না। বাস্তব জীবনে শিশুরা ছোট ছেলে বা মেয়ে সব সময় বড়র ভূমিকায় অভিনয় করে। ছেলে নকল করে তার বাবার, ফাইল বগলে গোঁফ লাগিয়ে অফিস যাওয়ার মহড়া দেয়। আর ছোট মেয়ে পুতুল নিয়ে এমন ভাবে খেলে, যেন সে মা, আর পুতুলগুলি তার ছেলে বা মেয়ে। ঠিক তেমনি তাঁদের জগতটা ওই বড়দের নিয়ে। সে বড়দের কথা শুনতে চায়, বড়দের কথা জানতে চায়। তাই এডভেন্চার তার এত প্রিয়। রবীন্দ্রনাথ যখন লেখেন 'আমি আজ কানাই মাষ্টার তুমি আজ পোড়ো' তখন তিনি শিশুদের মনের কথাই ঠিক ঠিক বলতে পারেন।

তাছাড়া একথাও বলা দরকার শিশুসাহিত্য নাম দিয়ে আমরা যা চালাই, তা শিশুদের বোধগম্যই নয়। অন্নদাশংকর রায় যখন লেখেন 'তেলের শিশি ভাঙলে পরে খুকুর পরে রাগ করো, তোমরা যে সব বুড়ো খোকা ভারত ভেঙে ভাগ করো,' তখন সেটার সমঝদার বড়রা, ছোটরা নয়। সুকুমার রায়ের আবোলতাবোল যা বাংলা শিশুসাহিত্যের যুগপৎ বেদ ও বাইবেল, তা ছোটরা পড়ে মজা পায় বটে, কিন্তু রস বেশি পাই আমরা, বড়রা। আমি নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে বলতে পারি ছোটবেলায় পড়ে যতটা আনন্দ পেয়েছি, তার চেয়ে বেশি আনন্দ পাই এখন 'আবোল তাবোল' পড়ে। আমার বক্তব্য, শিশুসাহিত্য বলে আলাদা কিছু নেই। রচনাদি দু' রকম—সাহিত্য এবং শিশুসুলভ সাহিত্য বা অপকৃষ্ট রচনা। এই শিশুসুলভ সাহিত্য বড়দের রচনাতেই বেশি। যে রচনা শুধু বড়দের পড়ার কথা তাদের একটি শ্রেণী, আর একটি শ্রেণী আছে, যা ছোট বড় সবাই পড়তে পারেন এবং পড়ে আনন্দ পান। সেই শ্রেণীতেই পড়ে রবীন্দ্রনাথের সে খাপছাড়া, গল্পসল্প, শিশু, শিশু ভোলানাথ, সুকুমার রায়ের হযবরল, আবোল তাবোল, পাগলাদাশু, দক্ষিণারঞ্জনের ঠাকুরমার ঝুলি, অবনীন্দ্রনাথের শকুন্তলা, রাজকাহিনী, হেমেন্দ্রকুমাররায়ের এডভেনচার, লীলা মজুমদারের গল্প প্রভৃতি। এবং তার পাঠক ছোটদের চেয়ে বড়রাই বেশি। সুতরাং শিশুসাহিত্য রচনা করতে গিয়ে শুধু শিশু জীবন নিয়ে লিখলে হবেনা। লিখলে শিশুরা তাতে যোগ দেবেনা। একালে খ্যাতিমান শিশুসাহিত্যিক নামধারী লেখকরা তা করেন না বলেই সকলের কাছে তারা এত জনপ্রিয়। পঞ্চাশের কাছাকাছি এসে এখনও আমার প্রিয়তম লেখকদের একজন শিব্রাম চক্রবর্তী। খগেন্দ্রনাথ মিত্র, ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, ধীরেন্দ্রলাল ধর, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রেও একথা সত্য।

এবারে স্বাধীনতা-উত্তর শিশুসাহিতের অগ্রগতির কথা। আমার

মতে এই পর্বে বাংলাসাহিত্যে এই শ্রেণীর রচনার অগ্রগতি তেমন হয় নি। তার একটি কারণ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে বাদ দিলে একালের কোন বড় লেখক ছোটদের জন্য লেখেন না। অথচ আগে তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, আশাপূর্ণা দেবী, বিভূতি মুখোপাধ্যায়, হেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখেরা ছোটদের জন্য অনববত লিখে গিয়েছেন। আর সত্যি কথা বলার অধিকার যদি দেন, তাহলে বলব শিবরাম চক্রবর্তী, খগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রমুখ দিকপাল সাহিত্যিকেরা তাঁদের শ্রেষ্ঠ রচনা স্বাধীনতার আগেই লিখে গিয়েছেন। যদিও এখনও তাদের কলম অবিশ্রান্ত গতিতে চলেছে।

# পূর্বভারতের চলচ্চিত্রের সমস্যা ও অগ্রগতি

নির্মলকুমার ঘোষ ( এন্‌-কে-জি )

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের উদ্যোগে কলকাতায় যে বিরাট পূর্বভারত সাংস্কৃতিক সম্মেলনের অনুষ্ঠান তার মূল উদ্দেশ্যটি নিঃসন্দেহে শুধু মহৎই নয়, সুচিন্তিতও। সেটি হল, ভারতের ভৌগোলিক অখণ্ডতা ও সংহতির কথা মনে রেখে পূর্বভারতের সকল ভাষাভাষী জাতি, উপজাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের এক রাখিবন্ধন রচনা। এখানে, এই মিলনমঞ্চে পূর্বভারতের চলচ্চিত্রের সমস্যা ও অগ্রগতি নিয়ে যে আলোচনা-চক্রের আয়োজন আজ, সেটি গভীর চিন্তাপ্রসূত। কেননা, গোটা পূর্বভারতীয় শিল্পসংস্কৃতির ক্ষেত্রে ভাবের একটি অটুট ঐক্য রচনায় চলচ্চিত্রের দান ও স্থান অসামান্য।

ভারতের গোটা পূর্বাঞ্চলের প্রত্যেক বিভিন্ন ভাষাভাষী অঞ্চলের অখণ্ড সংহতি ও অগ্রগতির আদর্শ পালনে চলচ্চিত্রকে জনমানসের রাজপথ বললে অত্যুক্তি হয় না। জনচিত্তকে সে শিক্ষা, আনন্দ ও নন্দনরস বিতরণ করে। কি করে এই মহৎ শিল্পটির জনকল্যানমূলক বিরাট সম্ভাবনাকে সার্থকতা দেওয়া যায়, সে কথা চিন্তা করতে গেলে আগে ভাবতে হবে সে পথে তার দুর্লজ্ঘ্য বাধাবিপত্তি, সমস্যা কি-কি। সাধ্যানুযায়ী লোকরঞ্জনী সেবায় ব্রতী এই শিল্পটি আজ প্রবল অর্থনৈতিক সঙ্কটের নিষ্পেষণে মুমূর্ষুপ্রায়। কি করে কোনক্রমেও টিকে থাকা যায়, তার হাজার হাজার কর্মির নিরন্ন পরিবারকে দুমুঠো অন্ন জোগান যায়, সেই চিন্তায় আজ সে অন্তরে থাকুন, বাইরের সবকিছু চাকচিক্যের অন্তরালে। সুখের বিষয়, পশ্চিমবঙ্গ সরকার আজ এই মৃতপ্রায় শিল্পটিকে নতুন করে সঞ্জীবিত করবার

দায়িত্ব নিয়েছেন। তারই পটভূমিতে এই মিলনী আলোচনা সভা।

নিছক বেঁচে থাকবার সমস্যা ও তার সমাধানের তাগিদ পূর্বভারতের সকল ভাষাভাষী অঞ্চলের চলচ্চিত্রশিল্পের পক্ষেই প্রায় এক। হয়তো বা এদের সকলের কর্মকাণ্ডের প্রাণকেন্দ্র কলকাতা মহানগরীতে বলেই পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্র শিল্পের সমস্যাই সর্ববৃহৎরূপে প্রথমেই চোখে পড়ে।

যদি প্রশ্ন ওঠে, চলচ্চিত্রের সমস্যা ও তার সমাধানের পথ প্রত্যেক পূর্বাঞ্চলের পক্ষেই কি করে এক, তার সহজ উত্তর এই যে ঠিক পশ্চিমবঙ্গেরই মতো অন্যান্য যে পূর্বভারতীয় ভাষাভাষী চিত্রনির্মাণের অঞ্চল,—যেমন আসাম, মনিপুর, ওড়িশা, ত্রিপুরা এবং বিহারের ভোজপুরী-মৈথিলী ভাষাভাষী অংশ—তাদের প্রত্যেকেরই ব্যবসায়িক প্রদর্শনের ক্ষেত্র করুণভাবে সীমিত শুধু নিজস্ব এলাকার মধ্যে। সে সীমানার মধ্যে সর্বভারতীয় চাহিদার পরিপোষক ছবিগুলির অসমরূপে শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা ভুললে চলবে না। এই বিরাট প্রতি-যোগিতার কি করে মোকাবিলা করে টিঁকে থাকা যায় ও আপন পুষ্টিসাধনের প্রয়াস পাওয়া যায়, সেই ভাবনায় আজ সমগ্র পূর্বভারতের চলচ্চিত্রশিল্প কণ্টকিত। এই জীবনমরণের সমস্যার সমধানচিন্তাই আজ আমাদের পূর্বভারতীয় চিত্রশিল্পের কাছে বিভীষিকার মতো।

আমি মনে করি, এর একমাত্র সমাধান নিহিত আছে, আমাদের গোটা পূর্বাঞ্চলের সমস্ত চলচ্চিত্রশিল্পগুলির ভাবনার ও কর্মের অখণ্ড সংহতি সাধনের মধ্যে। যে কর্মসাধনের উদ্যোগকে বিশ্বাস করি এই সম্মেলন প্রভূত প্রেরণা যোগাবে। আর এ ব্যাপারে একটা বিশেষ আশার কথা এই যে পূর্বভারতীয় বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন মাতৃভাষার রীতি ও গতিপ্রকৃতির মধ্যে তাদের প্রকাশভঙ্গির এক আশ্চর্য সৌসাদৃশ্য ফুটে ওঠে। যার মধ্যে শুভ সন্ধান মিলবে—ভিন্নতার মধ্যে ঐক্যের। এই সূত্রটিকে আশীর্বাদের মতো প্রয়োগ করে

আমাদের ভাবমূলক ঐক্যসাধনের মহৎ আদর্শের অনেকখানি বাস্তব-রূপায়ণ সম্ভব মনে করি। এই ব্যাপারে পূর্বভারতের চলচ্চিত্রশিল্পের ব্যবসায়গত সংগঠন-সংস্থা যে ইস্টার্ণ ইণ্ডিয়া মোশান্ পিক্‌চার এশোসিয়েশান—তার ভূমিকা সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

আমাদের যে চরম লক্ষ্য জাতীয় ভাব-সংহতিসাধন, সে লক্ষ্যে এক্ষেত্রে পৌঁছুতে গেলে সর্বাগ্রে যে ভার নিতে হবে তা হল পূর্ব-ভারতের প্রত্যেক অঞ্চলের নিজস্ব মাতৃভাষাকে এবং তার পরেই প্রতিবেশী রাজ্যগুলির মাতৃভাষাকে প্রাধান্যদান, তাদের বিস্তারলাভের অকুণ্ঠ সুযোগদান, আপন বৃহত্তর মঙ্গলের জন্য। তার কারণ এই যে আমাদের নিজ নিজ রাজ্যের মধ্যে একই ভাষাভাষী সম্প্রদায়ের পরস্পরের সঙ্গে নিজস্ব মাতৃভাষায় ভাবের আদানপ্রদানের ঠিক পরেই নিতে হবে আরএকটি দায়িত্ব। সেটি হল প্রতিবেশী রাজ্যের ভাইবোনদের সঙ্গে সেই একই ভাবের বৃহত্তর ও মহত্তর সম্প্রসারণ—আন্তরিক ভ্রাতৃত্ববোধ দিয়ে। এতে করে গোটা পূর্বাঞ্চলের শিল্প ও সংস্কৃতিমূলক ঐক্য-সাধনের একটা পরিণত, সম্পূর্ণ রূপায়ন সাধ্যায়াত্ত হবে। ভাবমিলনের এই উজ্জ্বল সমাজের শীর্ষ থেকেই আমরা এগুতে পারব আমাদের চরম জাতীয় লক্ষ্যের দিকে, যা হল সমগ্র ভারতের ভাবস্পন্দনের একাত্মসাধন।

পূর্বাঞ্চলের কোটি কোটি অধিবাসীদের ভ্রাতৃত্বের ভাবধারার বন্ধনে বাঁধতে গেলে চলচ্চিত্রই যে প্রধান মাধ্যম, এ সম্পর্কে বোধ করি আজ আর কারুর দ্বিমত থাকবে না। তাই সহজেই বলা যায়,—প্রত্যেক ভারতীয় পূর্বাঞ্চলের আজ প্রধান চিন্তা হওয়া উচিত, তাদের এই অফুরন্ত সম্ভাবনাময় শিল্পের পুষ্টিসাধন—গভীর মমতা ও দূরদৃষ্টির সঙ্গে। প্রত্যেক পূর্বরাজ্যকে এগুতে হবে নিজেদের মধ্যে সমচিন্তা, সহযোগিতা ও সৌহার্দের পথে। তাতেই হবে তাদের সাধারণ সমস্যাগুলির সমাধান, তাদের শিল্পগুলির অগ্রগতি। পূর্বাঞ্চলের চিত্রশিল্পগুলির এই যে কঠিন ব্যবসায়িক প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকার সমস্যা,—

সুখের বিষয়,—ই-আই-এম্-পি-এ সেই সমস্যাসাধনের গুরুদায়িত্বপালনে অনেকখানি এগিয়ে এসেছেন, ঐ শিল্পগুলির প্রতিনিধি সংস্থারূপে। তাঁরা আজ আসামে অসমীয়া ছবির ও ওড়িশার ওড়িয়া ছবির যোগ্য মুক্তিদানের জন্য অগ্রাধিকার দিয়ে একটা সহজ সমাধানের সূত্র প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন। এবং তাঁরা তীক্ষ্ণ লক্ষ্য রেখেছেন যাতে এই আচরণে কোনপ্রকার ব্যতিক্রম না ঘটে। কিন্তু সেই সঙ্গেই গভীর দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে এতো বড়ো শিল্পপ্রতিনিধি সংস্থা ওড়িশা ও আসামের ব্যাপারে যে শুভ পন্থা উদ্ভাবন করেছেন, পশ্চিমবঙ্গে চিত্রের মুক্তির ব্যাপারে অনুরূপ কোন বাস্তব প্রচেষ্টা আজও তাঁরা সম্ভব করতে পারলেন না।

কেন পশ্চিমবঙ্গে অনুরূপ ব্যবস্থা করা যাবে না, এখানকার তৈরী চিত্রগুলির মুক্তিকে অগ্রাধিকার দিয়ে, সে প্রশ্ন নিশ্চয় তাঁদের সামনে রাখতে পারেন পশ্চিমবঙ্গের চিত্রকল্যাণকারীরা ও তার সরকার। এই সংস্থার ওপর নিশ্চয় পশ্চিমবঙ্গের একটা বিশেষ নৈতিক দাবী আছে, এই কারণে যে কলকাতা মহানগরীই তাঁদের প্রতিষ্ঠানের কর্মকেন্দ্র। তাঁরা নিশ্চয় জানেন পশ্চিমবঙ্গের এই শিল্পের বর্তমানে নাভিশ্বাসের কথা এবং সেই শিল্পের কর্মিদের নানাভাবে আন্দোলনের কথা শুধু বাঁচবার তাগিদে।

এর পরেই অপরিহার্যরূপে এসে পড়ে এবিষয়ে আসামের রাজ্য-সরকারের বিশেষ দায়িত্ব ও সক্রিয় ভূমিকার কথা। এ রাজ্যের সরকার নিশ্চয় জানেন যে আসাম সরকার অসমীয়া ছবির উন্নতির পৃষ্ঠ-পোশকতা কল্পে আসামে ঐসব ছবির প্রদর্শন থেকে প্রমোদকর বাবদ লব্ধ মোট অর্থের অর্ধাংশ সরাসরি প্রত্যেক প্রযোজককে প্রত্যর্পণ করছেন। এ কর সম্পূর্ণভাবে রাজ্য সরকারের, সকলেই জানেন এবং এই ধরনের একটা কল্যাণমূলক নীতি গ্রহণ করে আমাদের মৃতপ্রায় শিল্পকে বেঁচে ওঠার একটা ন্যায্য সুযোগদানের জন্য করুণ আবেদন বহুদিন যাবৎ পশ্চিমবঙ্গের শিল্প করে আসছে সরকারের কাছে।

শুনেছি, ওড়িশা সরকারও অনুরূপ নীতি গ্রহণের কথা চিন্তা করছেন ওড়িয়া চিত্রের উন্নতিকল্পে। তাহলে এ প্রশ্ন নিশ্চয় রাখা যায় যে মনিপুরী ছবির জন্য মনিপুর সরকার, পশ্চিমবঙ্গের ছবির জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও ভোজপুরী—মৈথিলী ছবির জন্য বিহার সরকার কেন একই ব্যবস্থা নিতে পারেন না নিজ নিজ চিত্রশিল্পকে উৎসাহ দিতে ?

অবশ্য সুখের কথা, পশ্চিমবঙ্গের নতুন ফিল্ম ডেভেলপ্‌মেণ্ট বোর্ড সম্প্রতি এ ব্যাপারে সক্রিয় হয়ে উঠেছেন। বোর্ডের কাছে তাঁদের ত্রুটিবিচ্যুতি স্বীকার করেও নানা কল্যাণমূলক যে প্রস্তাবগুলি, তা কার্যকরী করার জন্য সরকার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এই প্রমোদকর প্রত্যর্পণের ব্যাপারটিও তার মধ্যে পড়ে। এই অর্থের অর্ধেকও ফেরৎ পেলে এ রাজ্যের মৃতপ্রায় প্রযোজকেরা আবার নতুন ছবি করার জন্য নতুন উদ্যমে বুক বাঁধতে পারেন। রাজ্যসরকার কর্তৃক এই নীতি অনুসৃত হলে অবশ্যই পশ্চিমবঙ্গের চিত্র নির্মাণসংখ্যা বহুলাংশে বাড়বে। এবং ই-আই-এম্-পি-এ যদি সেইসব ছবির অগ্রাধিকার স্বীকার করে ছবির মুক্তির ব্যবস্থা করেন, তবে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ, চিত্রশিল্প ও সরকারও তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ হবেন। কেননা, এই উভয়বিধ নীতির সাহায্যে রাজ্যশিল্পের শৈল্পিক মান, মর্যাদা ও আয়ু বহুগুণ বেড়ে যাবে। আশা করব এই উভয় শুভনীতিই যথাস্থানে গৃহীত হবে।

এই গুরুত্বপূর্ণ আসর যে বিরাট শুভ সূচনা করল পূর্বভারতের সুসংহত ও গোটা চিত্রশিল্পের বৃহৎ জাতীয় ও শৈল্পিক সম্ভাবনার, তাতে আমরা আশা করব যে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক রাজ্যশিল্প, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পও নিজেদের ঐক্যভূত চিন্তার সম্প্রসারণ করতে পারবে। এই উদ্দেশ্যে কতকগুলি বাস্তব পন্থা অবলম্বনের কথা মনে আসে। সংক্ষেপে বলি :—এই কলকাতায় পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যের তৈরী ছবিগুলি দেখাবার যোগ্য ব্যবস্থা করতে হবে। সেই সঙ্গে পূর্বভারতের অন্য সব রাজ্যও আমাদের ও

সম্পর্কিত অন্যরাজ্যের তোলা ছবিগুলি দেখাবার অনুরূপ ব্যবস্থা করতে হবে তাঁদের সরকারের। তার ফলে, আশা করা যাবে যে, এইসব অঞ্চলের সরকার যেমন নিজ রাজ্যে তাঁদের ছবির প্রমোদকরের অর্ধাংশ প্রত্যর্পণের ব্যবস্থা করেছেন বা করবেন, পূর্বাঞ্চলের প্রতি-রাজ্যের ছবির জন্যও তাঁদের রাজ্যেও সে সবের প্রদর্শন অন্তেও তাঁরা সেই একই উদার দৃষ্টান্ত স্থাপিত করবেন। এর ফলে এই এতগুলি প্রতিবেশী রাজ্য নিয়ে গঠিন এই পূর্বভারতীয় চত্রচ্চিত্রশিল্পের মাধ্যমে এই রাজ্যগুলির এক আশ্চর্য মিলনসেতু গড়ে উঠবে। যাতে আমাদের অনেক কুশ্রী সমস্যাও আপনি মিলিয়ে যাবে। এই সেতু রচনায় কিন্তু এ রাজ্যের প্রত্যেক চলচ্চিত্রকর্মিরও এক বিরাট নৈতিক দায়িত্ব আছে।

এই কলকাতা মহানগরীর ফিল্ম্ ষ্টুডিও ও ল্যাবরেটরিগুলি গোটা পূর্বভারতীয় ছবিগুলির প্রয়োজনার প্রাণকেন্দ্র। সেখানেই কাজ করতে আসেন প্রতিটি প্রতিবেশী রাজ্যের চিত্রপ্রযোজনার কলাকুশলী গোষ্ঠি। এতগুলি ভিন্নরাজ্যের কর্মিরা এ কাজ করতে আসেন আমাদের মমত্ববোধ ও সহযোগিতার উপর নির্ভর করে। তাই তাঁদেরকে আমাদের গ্রহণ করতে হবে একই পরিবারভুক্ত আপনজনের মত। দেখতে হবে একটি দিনের তরেও তাঁরা যেন অবহেলিত বোধ না করেন। তাহলে কিন্তু এই মিলন সেতু ভেঙ্গে পড়বে। সবশেষে অনেক আশা নিয়ে একটি প্রস্তাব করি। এখন থেকে আসুন আমরা প্রতি বছর আমাদের পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির শ্রেষ্ঠ চিত্রসম্ভার নিয়ে একটি পৃথক চিত্রমহোৎসব সম্ভব করে তুলি,—যেটা অনুষ্ঠিত হবে এক এক বছর এক এক পূর্বাঞ্চলের রাজ্যে। এর দ্বারা আমাদের সংবিধানের মহৎ আদর্শই প্রাণ পাবে।

পরিশেষে এই সভার সুষ্ঠু আয়োজনের জন্য পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রি-সভার তরফ্ থেকে চলচ্চিত্রবিষয়ের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায়কে অন্তর থেকে ধন্যবাদ দিই, আর ধন্যবাদ দিই, তাঁদের মন্ত্রিসভাকে। যথার্থ শিল্পপ্রেম ও দেশপ্রীতি দিয়ে এই অনুষ্ঠানের উদ্যোগ ঘটেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক। এই উদ্যম ফলে ফুলে ভরে উঠুক।

# পূর্বভারতে চলচ্চিত্রশিল্পের সংকট ও তার সমাধান

**শ্যাম শর্মা**

পূর্বভারতের চলচ্চিত্রশিল্পে এখন সংকটের কাল চলছে। সমস্যা অনেক। চলচ্চিত্র নির্মাণের ব্যয় বেড়েছে, কাঁচামালের অপ্রতুলতা, চিত্রগৃহ পাওয়ার অসুবিধা, সরকারী সহানুভূতির অভাব, আমলাবর্গের অকরুণ দৃষ্টিভঙ্গি, সর্বোপরি হিন্দিফিল্ম-এর আধিপত্য।

আঞ্চলিক চলচ্চিত্রে সেই অঞ্চলের সংস্কৃতির প্রতিফলন ঘটে। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের জনগণের সহানুভূতিপূর্ণ মনোভাব এবং ভালবাসাই কেবল তাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে। আঞ্চলিক চলচ্চিত্র যদি যেখানকার মানুষের আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে অসমর্থ হয় তাহলে তার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যায় এবং তার পক্ষে অস্তিত্ব বজায় রাখাও সম্ভব হয় না। বর্তমান সামাজিক ও রাষ্ট্রনীতিক পরিস্থিতিতে দেশের ভগ্নমনোরথ সাধারণ মানুষ রূঢ় বাস্তব থেকে পলায়ন করে অবাস্তব দিবাস্বপ্ন দেখতেই উৎসাহবোধ করেন। কাজেই যে ধরনের চলচ্চিত্রে তাঁদের বাস্তব জীবনকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে সে সব ফিল্ম তাঁরা এড়িয়ে যেতে চান এবং দেখতে চান সেই ছবি যাতে আছে তাঁদের দিবাস্বপ্নের রূপায়ণ। কিন্তু আমরা জানি যে, জনগণ কখনও ভুল করে না। তাঁরা নির্বোধ নন। তাঁরা যা চান তা আমাদের দিতে হবে। তাঁদের পছন্দ অনুসারে আমাদের পরিবেষণ করা চাই। তবে, কথা হল, আমাদের জানা দরকার যে জনসাধারণের চাওয়ার মধ্যে বিভিন্নতা আছে। শুধু দিবাস্বপ্নের রূপায়ণ দেখেই খুশি হন না এমন দর্শকও আছেন। এবং চিত্রনির্মাতাকে

সেই শ্রেণীর দর্শকের উপযোগী চলচ্চিত্র তৈরি করতে হবে। আঞ্চলিক চলচ্চিত্র নিশ্চয় সাধারণ হিন্দি ছবির মতো হওয়ার বা তার বাজার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করবে না। সেটা সম্ভব নয়। তা ছাড়া অর্থহীনও বটে। এদিক দিয়ে মহৎ দৃষ্টান্ত হল মাননীয় সত্যজিত রায়, মৃণাল সেন, ঋত্বিক ঘটক প্রমুখের নির্মিত চলচ্চিত্রসমূহ। আঞ্চলিক চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা এবং বিশেষ অসুবিধা দুই-ই ভাল ভাবে জেনে নিয়ে কাজে নামতে হবে।

আজ আঞ্চলিক চলচ্চিত্রের এই সংকটক্ষণেই মনিপুর ও তার নিজস্ব সৃষ্টি নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে। মনিপুর একটি ক্ষুদে রাজ্য এখানে মনিপুরীভাষীয় সংখ্যা ছয় থেকে সাত লক্ষের বেশি নয়। এই মনিপুরী-ভাষীর মধ্যে বড়জোর এক লক্ষ লোক চলচ্চিত্রের দর্শক। চিত্রগৃহ আছে মাত্র পাঁচটি। ভারতে অথবা বলা যায় সারা পৃথিবীতে, হয়ত এমন আর কোনও রাজ্য আঞ্চলিক চলচ্চিত্র নির্মাণের ধৃষ্টতা করত না। আমাদের ছবির জন্য সকল কলাকুশলী নেওয়া হয় কলকাতা থেকে, সরঞ্জাম ভাড়া করতে হয়। বহির্দৃশ্য তোলা হয় মনিপুরে আর অন্তর্দৃশ্য কলকাতার ষ্টুডিও-তে। এইসব ছবির জন্য নির্মাণ ব্যয় কত পড়ে তা যে কেউ অনুমান করতে পারেন। পশ্চিমবঙ্গের সিনেমা শিল্প আমাদের কোনও সুবিধা দেন না। কোনও ক্ষেত্রেই কোনও ছাড় আমাদের ভাগ্যে জোটে না।

মনিপুরী চলচ্চিত্র প্রথম নির্মিত হয় ১৯৭১-৭২ সালে। 'মাতঙ্গী মণিপুর' ছবিটি আঞ্চলিক পুরস্কারও লাভ করে। শ্রীচাঁদ সিং ও একটি ছবি করেন। এখন তিনটি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের মনিপুরী চলচ্চিত্র নির্মীয়মান অবস্থায় রয়েছে। মনিপুর সবকার এই প্রথম একটি রঙিন তথ্যচিত্র নির্মাণে উদ্যোগী হয়েছেন।

প্রথম মনিপুরী চলচ্চিত্র তৈরির সময় থেকেই আমরা ছবির প্রমোদকর সংশ্লিষ্ট প্রযোজককে ফেরৎ দিয়ে তাঁকে সাহায্য করার জন্য সরকারের কাছে অনুরোধ করে আসছি। আসামে এই রীতি

চালু আছে। কিন্তু মনিপুর সরকার রাজি হন নি। তাঁরা মনে করেন মনিপুরী ছবি কোনও কালেই আর্থিক ভাবে লাভজনক হতে পারবে না। তাই তাঁরা মৃত ঘোড়াকে ছোটাবার শ্রমস্বীকার করতে অনিচ্ছুক। ওদিকে চলচ্চিত্র অর্থসংস্থান কর্পোরেশনও মনে করেন যে মনিপুরী ছবির জন্য ঋণ দিলে সেই টাকা পরিশোধের সম্ভাবনা নেই। তাছাড়া মনিপুরী ভাষা তালিকাভুক্তও নয়।

কাজেই প্রশ্ন হল, মনিপুরী চলচ্চিত্র নির্মিত হওয়া উচিত কি না। এর উত্তরে জোর গলায় বলব : হ্যাঁ, উচিত। মনিপুরীতে ছবি করাটা কোনও বিলাস নয়, এটা প্রয়োজন। মনিপুরী জনগণের এক গৌরবময় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রয়েছে এবং তাঁদের গভীর শৈল্পিক প্রেরণার ফলেই বিভিন্ন মাধ্যমে তার অভিব্যক্তি ঘটবে। এ ছাড়া আমাদের প্রচুর পেশাদার নাট্যগোষ্ঠী রয়েছে যাঁরা তেমন আর্থিক লাভ ব্যতিরেকেই নিয়মিত অভিনয়ের অনুষ্ঠান করে থাকেন। আমার ত মনে হয় যে পূর্বভারতে পশ্চিমবাঙলার পর মনিপুর রাজ্যেই এত মঞ্চ এ অভিনয়ের ব্যবস্থা। চলচ্চিত্রের অভিনেতারা সকলেই এসেছেন মঞ্চ থেকে। তাই আমার বিশ্বাস, ভবিষ্যতে অনেক মনিপুরী চলচ্চিত্র নির্মিত হবে।

পশ্চিমবাঙলার চলচ্চিত্র শিল্পের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। এঁদের সাহায্য ছাড়া মনিপুরী ছবি নির্মাণ করা সম্ভব হত না। তবে পশ্চিম-বাঙলার চলচ্চিত্র শিল্পের প্রতি আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ এই যে বাঙলা ছাড়া অন্য আঞ্চলিক চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে কিছু কিছু ছাড় ও সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা হোক। আঞ্চলিক ছবির ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট এলাকার কলাকুশলীদের অধিক সংখ্যায় কাজ করতে দেওয়া উচিত। নতুন নতুন লোককে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। চলচ্চিত্রশিল্পে আজ মনিপুরের আত্মপ্রকাশ ঘটছে, অচিরেই নাগাভূমি, মেঘালয়, মিজোরাম ও অন্যান্য রাজ্যও আসবেন। তাঁরাও এই পশ্চিমবাঙলার শরণ নেবেন সহায়তা ও পরামর্শের জন্য।

পশ্চিমবাঙলা যেহেতু পূর্বাঞ্চলে চলচ্চিত্র নির্মাণের কেন্দ্রস্থল সেহেতু পশ্চিমবাঙলার দায়িত্ব শুধু বাঙলা ছবির ক্ষেত্রেই নিবদ্ধ নয়; পরন্তু মনিপুর ও অন্যান্য ছোট ছোট রাজ্যে চলচ্চিত্র শিল্প গড়ে তোলায় তার বিশেষ ভূমিকা রয়ে গেছে।

পরিশেষে আমি প্রস্তাব রাখতে চাই যে প্রতিবছর পূর্বাঞ্চলের ছবির একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা দরকার। আঞ্চলিক ভিত্তিতে পুরস্কারপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র দেখবার বা দেখাবাব সুযোগ পর্যন্ত আমরা পাইনা। এরকম প্রদর্শনী আয়োজিত হলে পূর্বাঞ্চলের চলচ্চিত্রের পক্ষে খুব ভাল হবে।

আঞ্চলিক চলচ্চিত্র দীর্ঘজীবী হোক।

অনুবাদ: অমিতাভ মুখোপাধ্যায়

# পূর্বভারতের চলচ্চিত্রের সমস্যা ও অগ্রগতি

## অসিত চৌধুরী

প্রথাগত গৌরচন্দ্রিকা থাক। সরাসরি বিষয়বস্তুতে আসা যাক। আমরা সকলেই জানি যে আঞ্চলিক চলচ্চিত্রশিল্প বহুদিন থেকে নানা সমস্যায় জর্জ্জরিত। পূর্বভারতের পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ। বিস্ময়ের কথা, এই শ্বাসরুদ্ধ পরিবেশের মধ্যেও অগ্রগতি দেখা গিয়েছে কয়েকটি ক্ষেত্রে। পূর্বাঞ্চলের অনেকগুলি ছবি বিশ্বজনের প্রশংসা অর্জন করেছে। পৃথিবীর মানচিত্র জয় করেছে সম্মানের আসন। যে সব প্রতিভাধর স্রষ্টা আমাদের ছবিকে তথা ভারতীয় ছবিকে শ্রেষ্ঠতার মাল্যে অভিষিক্ত করেছেন তাঁরা আমাদের নমস্য। ধন্যবাদ প্রাপ্য সেই সব সাহসী প্রযোজকদের যাঁরা আর্থিক বিপদের ঝুঁকি নিয়েও আঞ্চলিক ভাষা ভিত্তিক ছবি তৈরী করে যাচ্ছে এমনকি রঙীনচিত্র তৈরী করছেন পশ্চিম বঙ্গে, এমন কি আসামে পর্যন্ত। এ সব সত্বেও কিন্তু শিল্পের জটিলতা ও দূরবস্থা দূর হয়নি। বস্তুতঃ হওয়া সম্ভবও নয়। কারণ সব উদ্যোগই হয়েছে একক – হয় ব্যক্তিগত, নয় অঞ্চলগত। পূর্বভারতের চলচ্চিত্র কেন্দ্রগুলি তাই বিচ্ছিন্ন—বিভ্রান্ত তো বটেই। আশার কথা, আজ প্রত্যেক রাজ্য সরকার এগিয়ে আসছেন আঞ্চলিক শিল্পকে সাহায্য করার জন্য, উন্নত করার জন্য। ভুললে চলবে না, সরকারী এই চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করেছে অগণিত চলচ্চিত্রসেবীর নিরলস সাধনা, শত বাধা যাঁদের পরাস্ত করতে পারে নি, অসহ অবস্থার মধ্যেও যাঁরা সঙ্কুচিত শিল্পকে সঞ্জীবিত করে রেখেছেন। রাজ্যসরকারদের বর্তমান প্রয়াসের সঙ্গে যুক্ত হওয়া উচিত একটি বৃহত্তর কর্তব্য। তা হোল, অঞ্চলে অঞ্চলে সংযোগ গড়ে তোলা, সংহতি স্থাপন—ব্যবসায়িক প্রয়োজনে তো বটেই, মহৎ প্রয়োজন আত্মিক ঐক্যসাধন, যা সকল

সঙ্কীর্ণতা দীর্ণ করে পূর্বদেশীয় ঐতিহ্যের সামগ্রিক রূপটিকে তুলে ধরবে। এই পূর্বভারত সাংস্কৃতিক তথা সংহতি সম্মেলন সেই বিরাট কার্যক্রমের সূচনা করছে। এমন একটি উৎসব শুধু অভিনব নয়, সময়োচিতও বটে।

পূর্বভারতের পাঁচটি রাজ্য—আসাম, ওড়িশা, বিহার, মনিপুর ও পশ্চিমবঙ্গ—চলচ্চিত্র নির্মাণে প্রত্যক্ষভাবে উদ্যোগী। মনিপুর অবশ্য যাত্রা সুরু করেছে মাত্র দুবছর আগে। ছবি উৎপাদনের সংখ্যাও সর্বত্র সমান নয়। প্রতি বছরে আসামে প্রস্তুত হয় সাত-আটটি ছবি, ওড়িশায় তিন-চারটি, পশ্চিমবঙ্গে পঁচিশ-ত্রিশটি, মনিপুরে এ পর্যন্ত তিনটি। বিহারের উল্লেখ করলাম না দুটি কারণে। প্রথম, ভোজপুরী বা মৈথেলী ভাষায় ছবি তৈরীর উৎসাহ বিশেষ দেখা যাচ্ছে না, দ্বিতীয়, সর্ব-ভারতীয় ছবিগুলিই ভাষাগত কারণে বিহারে বহুলাংশে স্বীকৃত। সব কটি পূর্বরাজ্যেই, বিহারে আংশিকভাবে, একটি-ই মূল সমস্যা। বোম্বাই-মাদ্রাজের চটুল ছবির সর্বাত্মক আক্রমণ। অপরিমিত আর্থিক সামর্থ্যই শুধু নয়, এ সমস্ত ছবিতে আছে রঙের চটক আর প্রায় সবগুলিতেই স্থূল রস, তাৎক্ষণিক প্রমোদ ও উত্তেজনার নানা উপাদান। অসম এই প্রতিযোগিতায় পূর্বাঞ্চলের প্রতিটি চিত্রকেন্দ্র বিপর্যস্ত। আরও ক্ষোভের বিষয়, স্থানীয় দর্শকের কাছেও আপন ভাষার ছবি অবহেলিত, উপেক্ষিত। শিয়রে শমনকে দেখেই বোধ হয় আমরা আপন প্রাণ বাঁচাতে এমনই ব্যস্ত-ত্রস্ত যে ঐক্যবদ্ধ কোন সমাধানের কথা চিন্তা করছি না বা করতে পারছি না। অথচ যৌথ প্রয়াস ছাড়া তথাকথিত সর্বভারতীয় ছবির আগ্রাসী কবল থেকে আঞ্চলিক কোন চলচ্চিত্রশিল্পকেই রক্ষা করা যাবে না—সাময়িক সুবিধা দিয়েও নয়, নয় বিধিনিষেধের বেড়া তুলে। এ তত্বটি আমাদের অজানা নয় যে ছবির বাজার সম্প্রসারিত করতে না পারলে আঞ্চলিক চিত্রের অগ্রগতি অসম্ভব, কি গুণগত, কি ব্যবসায়গত। অসমীয়া, ওড়িয়া, মনিপুরী, বাংলা ছবি আসমুদ্র হিমাচলে সাধারণতঃ প্রদর্শন

সুযোগ পাবে না। ব্যতিক্রম অবশ্য অতি-উন্নত শিল্প-শোভন চিত্রগুলি ; অবাধ প্রচারের সম্ভাবনা আছে পূর্বভারতে। অল্প আয়তনের মধ্যে আমাদের আঞ্চলিক চিত্রনির্মাণ কেন্দ্রগুলিকে কি ভাবে সবল ও সতেজ রাখতে হবে সেই উপায়েরই সন্ধান করতে হবে।

রাজ্য চলচ্চিত্রশিল্পের উন্নয়নকল্পে আসামে ও পশ্চিমবঙ্গে স্থাপিত হয়েছে ফিলম ডেভেলপ্‌মেণ্ট বোরড, ওড়িশাতে এমনই একটি সংস্থা আসন্ন। জানি না বিহার ও মনিপুরে সরকারী কোন উদ্যোগ চলছে কি না। অন্যান্য পূর্বরাজ্যেও আশা করি প্রতিষ্ঠিত হবে চলচ্চিত্র নির্মাণ কেন্দ্র। ইতিমধ্যে আসাম সরকার প্রযোজককে ফিরিয়ে দিতে আরম্ভ করেছেন তাঁর ছবি থেকে সংগৃহীত প্রমোদ করের অর্ধাংশ। শোনা যাচ্ছে, এমনই প্রকল্প ওড়িশা সরকারের বিবেচনাধীন। পশ্চিমবঙ্গ বোরড-ও কয়েকটি কল্যাণমূলক কার্যসূচীর মধ্যে অনুরূপ একটি ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব করেছেন। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, পূর্বভারতের প্রযোজক—পরিবেশক—প্রদর্শকদের একমাত্র ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, ইসটারণ ইনডিয়া মোশান পিকচার এসোশিয়েশন-এর একটি সুবিবেচিত সিদ্ধান্ত। নিজ-অঞ্চলে প্রস্তুত চিত্রগুলি সেই রাজ্যে বোম্বাই-মাদ্রাজের সর্বভারতীয় ছবির তুলনায় সহজ ও শিথিল সর্তে চিত্রগৃহগুলিতে মুক্তি পাবে—এই নির্দেশ জারী করেছেন ই-আই-এম-পি-এ আসামে ও ওড়িশায়—পশ্চিমবঙ্গে নয়। অথচ যে কারণে এই সিদ্ধান্ত, তা হোল বোম্বাই-মাদ্রাজে তৈরী ছবির দাপট, যা পশ্চিমবঙ্গে অন্য রাজ্য অপেক্ষা কম তো নয়ই, বরং উগ্রতর সংহার মূর্তিতে প্রকট। ই-আই-এম-পি-এর নির্দেশ আরও বিস্ময়কর এই কারণে যে পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্র কর্মীরা নানা আন্দোলনের মাধ্যমে, বিশেষ করে চলচ্চিত্র সংরক্ষণ সমিতির ঐতিহাসিক সংগ্রামে, আঞ্চলিক চিত্রের জন্য সুযোগ—সুবিধার দাবী তো তুলে ধরেছেন বার বার। তবু কেন পশ্চিমবঙ্গ ই-আই-এম-পি-এ-র শুভদৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হোল? আশা কোরব, ভুলটি তাঁরা শীঘ্রই

শুধরে নেবেন—আঞ্চলিক ছবি-মুক্তির সহজ সর্ত পশ্চিমবঙ্গেও প্রসারিত হবে।

রাজ্য সরকারগুলিকে সমস্যার আরও গভীরে প্রবেশ করতে হবে। এই অভিযানে ই-আই-এম-পি-এ-র সহযোগিতা অবশ্যই প্রয়োজন। বিভিন্ন অঞ্চলের ছবি যাতে অক্লেশে ও অবাধে সারা পূর্বভারতে প্রদর্শন সুযোগ পায় এমন একটি অত্যাবশ্যক কর্মধারা তাঁরা অবিলম্বে আরম্ভ করে দিন। এবং নির্দেশ দিন, ছবি-মুক্তি ও ছবি-প্রদর্শনের বিশেষ সর্ত ও সহায়তা সারা পূর্বাঞ্চলে একই নিয়মে পালিত হবে। বক্তব্যটি আর একটু স্পষ্ট করা যাক। আপন রাজ্যের প্রযোজককে আসাম সরকার সংগৃহীত প্রমোদকরের অর্ধেক ফিরিয়ে দিচ্ছেন। রাজ্য সরকারের কাছে ঠিক এই সুপারিশ করেছেন পশ্চিমবঙ্গ ফিল্ম ডেভেলপ্‌মেন্ট বোরড। আশা করি সরকার তা অনুমোদন করবেন। অনুরূপ সাড়া অন্যান্য রাজ্যেও নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। বৃহত্তর কল্যাণে ও পারস্পরিক স্বার্থে এই আর্থিক আনুকূল্য ও অনুপ্রেরণা রাজ্য নিরপেক্ষভাবে প্রযুক্ত হওয়া উচিত। যে রাজ্যের ছবিই হোক না কেন, প্রমোদ-কর প্রত্যর্পণের সুবিধাটি সারা পূর্ব-ভারতে যেন সমস্ত প্রযোজকই লাভ করেন। তবেই সফল হবে সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ণের প্রচেষ্টা, একই সঙ্গে উজ্জীবিত হয়ে উঠবে আঞ্চলিক চলচ্চিত্র।

প্রশ্ন হওয়া স্বাভাবিক, এই ব্যবস্থায় কি সব অঞ্চল উপকৃত হবে? হবে। কিভাবে, সেই কথা বলি। পূর্বভারতের প্রতি অঞ্চলেই অন্য রাজ্যের বহুলোক বাস করেন। তাঁদের আপন ভাষার ছবি দেখার জন্য তাঁরা স্বভাবতঃই আগ্রহী। বৃহত্তর কোলকাতাকেই ধরা যাক। শহর ও শহরতলীর বিভিন্ন অংশে উৎকলবাসী আছেন অসংখ্য। তাঁদের এলাকার চিত্রগৃহতে নিয়মিত ওড়িয়া ছবি প্রদর্শন অবশ্যই একটি লোভনীয় পরিকল্পনা। আর তা যথেষ্ট লাভজনক করা যেতে পারে রাজ্য সরকারদের প্রত্যক্ষ সাহায্যে, ই-আই-

এম-পি-এ-র ব্যবস্থাপনায়। আসাম, মনিপুর ও উত্তর বিহারের প্রবাসীদের জন্যও রবিবারে ও ছুটির দিনে দেখানো যেতে পারে তাঁদের অঞ্চলের ছবি। যেমন তামিল, তেলুগু, মালায়ালম চিত্র নিয়মিত প্রদর্শিত হচ্ছে দক্ষিণ ভারতীয়দের উৎসাহে। বৃহত্তর কোলকাতা একটি উদাহরণ মাত্র। প্রতি রাজ্যেই প্রবাসীদের জন্য এমনই চিত্র-প্রদর্শন প্রথার প্রচলন করা উচিত। উপার্জনের এমন পথ বর্তমান, অথচ এতদিন এই ক্ষেত্রটি অনাবাদী রয়ে গেছে। হয় উদাসীনতার কারণে, নয় যোগাযোগের অভাবে। এখনই এমন বাস্তব চিন্তাটিকে রূপদানের জন্য সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার তৎপর হোন।

বলা বাহুল্য, ছবি-প্রদর্শনের প্রেরণা ও পরিধি উন্মুক্ত হলেই শিল্পের প্রতি স্তরে প্রাণের সঞ্চার হবে, বলিষ্ঠতর উদ্যোগে অনুপ্রাণিত হবেন চিত্রনির্মাতারা। বহিরাগত ছবির যে রঙ আজ মোহজাল বিস্তার করেছে সেই রঙেই রঙীন হয়ে উঠবে আঞ্চলিক চিত্র। আর তা হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। রঙের আকর্ষণ অনস্বীকার্য। দর্শক সমাজের উচ্ছাস দেখেই তার চাহিদা অনুমান করা যায়। বোম্বাইতে আছে প্রায় সাতটি রঙীন ছবি তৈরী করার ল্যাবরেটরী, মাদ্রাজে তিনটি। পূর্বাঞ্চলের চিত্রশিল্প নিয়ে আমরা এত গর্বিত—সঙ্গতকারণে যদিও—তবু এখন একটি ল্যাবরেটরী আমরা প্রতিষ্ঠা করতে পারলাম না। যাতে পারি এমন উদ্যম আমাদের এখনই সুরু করা উচিত। ভাবপ্রবণতার কারণে নয়, ব্যবসায়িক উন্নতির জন্যই রঙীন ছবি তৈরীর কাজে আমাদের এগোতেই হবে। আমার বিশ্বাস, সরকারী আনুকূল্যের অভাব হবে না।

সরকারী সহযোগিতা মিলনে আঞ্চলিক চলচ্চিত্রও যে অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করতে পারে, তামিলনাড়ু ও অন্ধ্র প্রদেশ তার উজ্জ্বল উদাহরণ। বাধা-বিপত্তি সেখানেও আছে, তবু এ দুটি রাজ্যে স্থানীয় ভাষায় ছবি-উৎপাদনের সংখ্যা তো কমেই নি বরং দিন দিন বাড়তির পথে। মুখ্য কারণ, ছবি-প্রদর্শনের বাধা-হীন সুযোগ, শুধু শহরে নয়,

প্রতি গ্রামে। সিনেমা হল নির্মাণ সংক্রান্ত বিধি-বিধান রাজ্যসরকার আলগা করে দিয়েছেন, সেই সঙ্গে মুক্তহস্তে লাইসেনস দিয়ে উৎসাহিত করছেন অস্থায়ী, ভ্রাম্যমান সিনেমা উদ্যোগকে। ফলে রাজ্যের প্রতি গ্রামে, জনপদে পৌঁছে গেছে নিজেদের ছবি, ছবি দেখা ও দেখানোর ক্ষেত্র হয়েছে অবারিত, বিস্তৃত। পশ্চিমবঙ্গে তথা পূর্বভারতের অন্যান্য রাজ্যে এমন দূরদর্শিতা আশ্চর্যজনকভাবে অনুপস্থিত। সদ্যনির্মিত ছবি-মুক্তির যন্ত্রণাময় সমস্যা তো পশ্চিমবঙ্গে আছেই। অথচ কোলকাতায় ও শহরতলীতে নতুন চিত্রগৃহস্থাপনের পথে বাধা রাজ্য সরকারের অতিপ্রাচীন, অতি কঠোর আইনকানুন। এই সব নিয়ম-নিষেধের শিথিলতা তো চাই-ই, তার সঙ্গে চাই বাজার বিস্তারের জন্য আরো অনেক অস্থায়ী সিনেমা যেগুলি রাজ্যের প্রতিপ্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে তৈরী করবে নতুন নতুন গ্রাহকগোষ্ঠী। অস্থায়ী সিনেমার ক্ষেত্রে তাই একবছর মেয়াদী লাইসেনস অবাস্তব। মেয়াদ দীর্ঘতর করা হোক। উল্লেখ্য, সরকারের কাছে এই মর্মে সুপারিশ করেছেন পশ্চিমবঙ্গ বোরড।

আঞ্চলিক চলচ্চিত্রশিল্পের অগ্রগতি বিষয়ে কয়েকটি রাজ্য অনুকরণ-যোগ্য। প্রথমেই মনে আসছে ক্ষুদ্র আয়তনের কেরালার কথা—যার লোকসংখ্যা পশ্চিমবঙ্গের অর্ধেক—মাত্র তিনখানা ছবি দিয়ে যাত্রা সুরু করে এখন প্রতি বছরে উৎপাদন করছে ত্রিশটি ছবি, পশ্চিমবঙ্গের মত মুমূর্ষু হয়ে নয়, সজীব ও সতেজ ভঙ্গীতে। কর্ণাটকের চিত্রও সাফল্যের অনেকাংশ দাবি করতে পারেন সেখানকার দর্শকসমাজ। আঞ্চলিক ছবির প্রতি যেমন তাঁদের মমত্ব, তেমনি আছে সপ্রাণ আনুগত্য। এর পাশে পূর্বভারতের রূপটি শুধু লজ্জার, শুধু রুচি-হীনতার। "ভূষণ" ভেবে যে আগ্রাসী ছবিকে আমাদের দর্শকেরা মণিহার করেছেন, তাই-ই যে "গলার ফাঁসি" হয়ে দাঁড়িয়েছে—এ চেতনা তাঁদের কোথায়? নিজ ভাষার ছবির প্রতি তাঁদের যে নৈতিক দায়িত্ব আছে, অপ্রিয় হলেও এই সত্যটি তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিই।

এতক্ষণের আলোচনায় আশা করি একথা বোঝাতে সক্ষম হয়েছি যে একক প্রচেষ্টার দিন বিগত—বিশেষ করে পূর্বভারতে। ব্যবসায়িক ও সমন্বয়ের সাফল্য তখনই সম্ভব যখন পূর্বাঞ্চলের চলচ্চিত্রসংস্থাগুলি একজোটে, এক আদর্শে উদ্বুদ্ধ ও গ্রথিত হবে। আপন রাজ্যের ছবিকে একটি নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে আবদ্ধ রাখলে এবং অন্য রাজ্যের ছবিকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে দিলে না হবে শিল্পের অগ্রগতি, না উন্নীত হবে চারু ও কারুশিল্পের মান, ধ্যান-ধারণা বিনিময় তো হবেই না। তাৎক্ষণিক সুযোগ-সুবিধায় অভিভূত না হয়ে আমরা যেন ব্যাপক ও চিরকালীন কল্যাণ সম্বন্ধে সচেতন হই। আমাদের চিত্ত হোক আরও একটু উদার, দৃষ্টি আরও স্বচ্ছ, সর্বনাশের পদধ্বনি মনের আরও গভীরে অনুভূত হোক।

সর্বনাশ কিভাবে আঞ্চলিক চিত্রকে ধীরে ধীরে গ্রাস করছে, পশ্চিমবঙ্গ তার করুণ উদাহরণ। বিগত তিন দশকে কোলকাতায় বন্ধ হয়ে গিয়েছে ন'টি স্টুডিও, বাৎসরিক ছবির সংখ্যা নেমে এসেছে পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন থেকে পঁচিশ-ত্রিশে। এ সবই বাজার-বন্ধের ফল। প্রথমে দেশবিভাগ, পরে বিভিন্ন রাজ্যের আত্মকেন্দ্রিক বাধা-নিষেধ। পরিস্থিতিটি যদিও কোলকাতার এবং মনে রাখতে হবে কোলকাতা পূর্বভারতের একমাত্র না হলেও বৃহত্তম কেন্দ্র—বোধ করি সমগ্র পূর্বাঞ্চলের এইটি-ই প্রতীকী চিত্র। পঞ্চাশোর্ধ প্রবীণ বাংলা ছবির যখন এই দৈন্যদশা আধুনিক কালের নবীন আঞ্চলিক ছবির অবস্থা সহজেই অনুমেয়।

প্রতিকূল এই অবস্থার মধ্যেও কিন্তু পূর্বদেশীয় রাজ্যগুলি ছবি নির্মাণে বিরত হয় নি। তার কারণ, এই বিস্তৃত ভূখণ্ডে কত না ভাষা, লোকসংস্কৃতির কত অমূল্য সম্পদ, যুগযুগান্তের কি অপূর্ব ঐতিহ্য। চলচ্চিত্র অবশ্যই এই সমৃদ্ধ সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ প্রচার-মাধ্যম। কিন্তু শিল্পের ব্যবসায়িক সাফল্য ব্যতিরেকে চারুতার বিকাশ সম্ভব নয়। চলচ্চিত্র যদিও "ইনডাসট্রি" ও "আর্ট"-এর সার্থক সংমিশ্রণ, তবু "ইনডাসট্রি"

না বাঁচলে "আর্ট"-কে বাঁচানো যাবে না—কৃষ্টির যত বড় প্রবক্তা আমরা হই না কেন।

এতক্ষণ শুধু হতাশার বৃত্তান্ত শোনালাম। স্বভাবতঃই প্রশ্ন হতে পারে—তবে কি পূর্বভারতীয় চলচ্চিত্রশিল্পের কোন উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নেই? আগেই বলেছি, বিভিন্ন রাজ্যে সরকারী বোরড, করপোরেশন বা অনুরূপ সংস্থা স্থাপনের কথা। আরও কয়েকটি প্রতিশ্রুতিপূর্ণ উদ্যমের উল্লেখ করি। আসামের একটি মাত্র স্টুডিও আবার প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে, ওড়িশার চিত্রনির্মাতারা পাচ্ছেন সরকারী অনুদানের কল্যাণে আধুনিক যন্ত্রপাতি, পশ্চিমবঙ্গে সূচিত হচ্ছে নানাপ্রকল্পের প্রাথমিক কাজকর্ম। এই প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের সদ্যপ্রচারিত পরিকল্পনাটি প্রভূত সহায়ক হবে। ঘোষণা করা হয়েছে প্রস্তাবিত ফিলম কাউনসিল আঞ্চলিক ছবিকে ডাবিং বা প্যারা-ডাবিং-এর জন্য আর্থিক সাহায্য দেবে। আশা কোরব, পূর্বরাজ্যগুলি তাদের প্রাপ্য অংশ থেকে বঞ্চিত হবে না এবং রাজ্যসরকারেরাও এ ব্যাপারে তৎপর হবেন। ছবির আন্তঃ-আঞ্চলিক আদান-প্রদানের যেমন একটি আর্থিক দিক আছে, তেমনি আছে মানবিক দিক। ডাবিং, প্যারা-ডাবিং-এর সহায়তায় এক অঞ্চলের ছবি অন্য ভাষাভাষী অঞ্চলে সহজেই গৃহীত হবে যার ফলে অজানাকে যাবে জানা, বন্ধুত্বের বন্ধ দরজাগুলি ক্রমশঃ খুলে যাবে।

পরস্পরকে চেনা ও জানার সুযোগ অন্য একটি ক্ষেত্রেও বর্তমান। স্টুডিও, ল্যাবরেটরী, স্কোরিং-এর কয়েকটি বিশেষ কাজের জন্য আসাম, ওড়িশা, বিহার ও মনিপুরের চিত্রনির্মাতারা প্রায়ই কোলকতায় আসেন। ব্যবসায়িক সংযোগ ছাড়িয়ে তাঁদের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক কদাচিৎ গড়ে ওঠে। কিন্তু গড়ে ওঠা উচিত। আশা-আকাজ্ক্ষা, ব্যথা-বেদনা তো প্রায় অভিন্ন। তবে কেন আমরা অপরিচিত প্রতিবেশী হয়ে থাকছি, কেন পারছি না অন্তরঙ্গ হতে? এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ চলচ্চিত্রকর্মীদের এগিয়ে আসতে হবে। বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিলে অপর দিক থেকে উষ্ণতার স্পর্শ মিলবেই।

ভারতীয় জীবনধারার সঙ্গে মেলার একটি অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে। যেখানে মেলা, সেখানে উৎসব, যেখানেই দূরাগত জন, কেমন করে জানি না, আপন হয়ে যান খোলা প্রাণের পরিবেশে। চলচ্চিত্রের এমনই মেলা আয়োজিত হোক প্রতি বৎসর পূর্ব ভারতের এক একটি রাজ্যে। সেই মেলাকে কেন্দ্র করে বসুক আলোচনা-চক্র, সভা-সমিতি যার কার্যক্রম থাক গুরু-গম্ভীর বিষয়ের বিচার আর ব্যক্তিগত আলাপনে প্রীতির উপহার। বাৎসরিক উৎসব ছাড়াও মিলিত হবার বহু অবকাশ আছে—থাকা উচিত কারণ এমন নৈকট্যই সমস্ত ভুল বোঝাবুঝি, উদ্দেশ্য-প্রণোদিত অশান্তির অবসান করতে পারে।

সমস্যা সমাধানের কয়েকটি সম্ভাব্য পথ নির্দিষ্ট করার চেষ্টা করলাম। আলোচনার ভিড়ে পাছে মূল বক্তব্য হারিয়ে যায়, এই আশঙ্কায় প্রস্তাবগুলি আর একবার উপস্থিত করছি যাতে এক লহমায় সম্পূর্ণ চিত্রটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

১। ই-আই-এম-পি-এ প্রবর্তিত আঞ্চলিক চিত্র-মুক্তির শিথিলীকৃত সর্তগুলি শুধু আসাম, ওড়িশায় নয়, পশ্চিমবঙ্গেও প্রযুক্ত হোক এবং প্রয়োজন হলে অন্য রাজ্যেও।

২। রাজ্য সরকার সমূহের উদ্যোগে এবং ই-আই-এম-পি-এ-র সহযোগিতায় আঞ্চলিক চিত্রগুলি সারা পূর্বভারতে অবাধে প্রদর্শিত হোক।

৩। প্রযোজককে প্রমোদ-করের অর্ধাংশ ফিরিয়ে দেবার যে নীতি আসাম সরকার গ্রহণ করেছেন এবং যা অদূর ভবিষ্যতে অন্যান্য রাজ্যেও গৃহীত হবে বলে আশা রাখি, সেই সুস্থ নীতি রাজ্যনিরপেক্ষভাবে সমগ্র পূর্বাঞ্চলে প্রচলিত হোক।

৪। প্রবাসী পূর্বদেশীয়দের জন্য তাঁদের ভাষার ছবি ব্যবসায়িক ভিত্তিতে নিয়মিত প্রদর্শিত হোক সমস্ত রাজ্যে এবং প্রকল্পটি সফল করার জন্য রাজ্য সরকার এবং ই-আই-এম-পি-এ সচেষ্ট হোন।

৫। পূর্বাঞ্চলে অন্ততঃ একটি কালার ল্যাবরেটরী স্থাপিত হোক যার ফলে অতি আবশ্যিক রঙীন ছবি প্রস্তুত করা সম্ভব হবে।

৬। আঞ্চলিক চিত্রগুলির সহজ মুক্তি এবং তাদের বাজার-সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে ব্যাপক প্রদর্শন—দুটি ব্যবস্থা সম্পূর্ণ সফল করার জন্য নতুন চিত্রগৃহ নির্মাণ সম্পর্কিত বিধি-নিষেধ আলগা করা হোক এবং সেই সঙ্গে অস্থায়ী চিত্রগৃহের লাইসেনস একবছরের পরিবর্তে আরও দীর্ঘসময়ের জন্য দেওয়া হোক। উৎসাহ দেওয়া হোক নতুন ট্যুরিং সিনেমা উদ্যোগকে।

৭। কেন্দ্রীয় সরকার প্রস্তাবিত ডাবিং ও প্যারা ডাবিং-এর জন্য সহায়তা পূর্বরাজ্যের আঞ্চলিক চিত্রের ক্ষেত্রে উদার হস্তে দেওয়া হোক এবং সমস্ত রাজ্য সরকার এ বিষয়ে সক্রিয় হোন।

৮। প্রতি বৎসর একটি চলচ্চিত্র মেলা অনুষ্ঠিত হোক পূর্বভারতের এক একটি কেন্দ্রে এবং সেই উপলক্ষ্যে আয়োজিত হোক শিল্পের সমস্যা ও অগ্রগতি সম্বন্ধে সভা ও আলোচনা-চক্র।

প্রস্তাবগুলি কার্যকর করার জন্য, বলা বাহুল্য, সমস্ত রাজ্য সরকারকে এবং চলচ্চিত্রসেবীদের একটি মহান ব্রতে উদ্দীপিত হতে হবে। বিশেষ ভাবে প্রয়োজন একটি আন্তঃরাজ্য সংগঠনের। প্রত্যেক রাজ্য সরকারের প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত হোক একটি উপদেষ্টা-গোষ্ঠী যাঁরা আঞ্চলিক ছবিগুলির স্বচ্ছন্দ আদান-প্রদান পর্যবেক্ষন করবেন এবং মুক্তি ও প্রেরণা দান বিষয়ে প্রবর্তিত নিয়মগুলি যাতে সমান সর্তে প্রতিটি রাজ্যে পালিত ও প্রযুক্ত হয় সেদিকেও দৃষ্টি রাখবেন। প্রয়োজন হলে সুযোগ নেবেন ই-আই-এম-পি-এ-র মূল্যবান অভিজ্ঞতার।

পূর্ব ভারত সাংস্কৃতিক সম্মেলন একটি আনন্দ-মেলা মাত্র নয়, এর

তাৎপর্য বিরাট, সম্ভাবনা সুদূরপ্রসারী। শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায়কে অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি—তাঁর নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ এমন একটি অনবদ্য ও ইঙ্গিতময় অনুষ্ঠান সার্থকভাবে আয়োজন করেছেন। এই সুযোগে আমার ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতাও নিবেদন করে নিই। বহুদিনের সঞ্চিত জিজ্ঞাসাগুলি এমন একটি সুধী সমাবেশে উপস্থিত করার অবকাশ পেয়ে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। গৌরবান্বিতও বটে কারণ সংহতি-সাধনের জাতীয় প্রয়াসে চলচ্চিত্রের অনন্য ভূমিকাটি আজ সর্বজনস্বীকৃত। চলচ্চিত্রসেবী আমাদের সমবেত প্রয়াসে এ সম্মেলনের মহান উদ্দেশ্য সার্থক হোক। সে প্রয়াস, আশা কোরব, এই সভাতেই নিঃশেষিত হয়ে যাবে না, যে দীপটি আজ জ্বলল তা যেন আমাদের শিল্পের অন্ধকারকে দূর করে দেয়।

ভাব-কল্পনা নয়, ইতিহাস সাক্ষ্য দেবে, এই পূর্ব দিকেই ভারতীয় চলচ্চিত্রসূর্যের প্রথম সার্থক প্রকাশ। তার বিপুল বৈভব সারা দেশের মানুষকে আপ্লুত করেছিল। আবিষ্কৃত হয়েছিল সংস্কৃতির নূতন দিগন্ত। সে সূর্য এখন পশ্চিমগগনে। তবু পূর্বাকাশের আলোক-উদ্ভাসন এখনও ক্ষণে ক্ষণে চমক দিয়ে যায়, তার দ্যুতি দেশের সীমা অতিক্রম করে বিশ্বমনে সাড়া জাগায়। আশা রাখব, আবর্তনের অমোঘ নিয়মে পূর্বদিগন্ত আবার ভাস্কর হয়ে উঠবে নতুন আশার বাণী নিয়ে। সে শুভক্ষণের প্রত্যাশায় যেন নিশ্চেষ্ট হয়ে না থাকি আমরা। তাকে আবাহন করে নিয়ে আসি আমাদের সংকল্প ও সাধনা দিয়ে, নিষ্ঠা ও সততা দিয়ে, দ্বিধা ও বাধার সকল দ্বন্দ্বে উত্তীর্ণ হয়ে।

# বাংলা চলচ্চিত্রের সমস্যা ও অগ্রগতি প্রসঙ্গ

## সেবাব্রত গুপ্ত

বাংলা চলচ্চিত্রের সমস্যার কথা আমরা জানি। কী ভাবে তার অগ্রগতি সম্ভব সে-সম্পর্কেও দু'চার কথা হয়ত বলতে পারি। কিন্তু পূর্বভারতের চলচ্চিত্রের সমস্যা ও অগ্রগতির কথা আমাদের পক্ষে বলা কঠিন। কারণ অন্য রাজ্যের চলচ্চিত্রশিল্পের সমস্যার কথা সঠিক জানা নেই। অবশ্য আঞ্চলিক চলচ্চিত্রের সমস্যা সব রাজ্যেই প্রায় এক। আঞ্চলিক ভাষায় ছবিই আঞ্চলিক চলচ্চিত্র। হিন্দীচিত্র আঞ্চলিক ছবি নয় এই কারণে যে, হিন্দী সর্বভারতীয় ভাষা। হিন্দীচিত্রের ব্যবসা ক্ষেত্রেও সারা ভারতে পরিব্যাপ্ত, ভারতের বাইরেও হিন্দীচিত্র চলে। আঞ্চলিক ভাষার ছবির বাজার বিশেষ অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। কোন অঞ্চলে যদি হিন্দীচিত্র তৈরি হয় তবে কি তাকেও আঞ্চলিক চলচ্চিত্র বলব? ভাষা-ভিত্তিক সংজ্ঞা অনুযায়ী অবশ্য তাকে আঞ্চলিক চিত্র বলার জো নেই। তবু সেটা আঞ্চলিক চিত্র কারণ আঞ্চলিক চিত্রের সমস্যাগুলিও এক্ষেত্রে বিদ্যমান। আঞ্চলিক চিত্রের পরিচয় তার ভাষাই নয়, সীমিত প্রদর্শনী-ক্ষেত্রেও বটে। আঞ্চলিক ছবি, অন্য অর্থে, এমন ছবি যার, প্রদর্শনের সীমা অতি সীমিত। অবশ্য বড় স্টার নিয়ে বড় বাজেটের হিন্দীছবি যদি মাদ্রাজ বা কলকাতায় তৈরি হয় তবে সেটাকে আমরা আঞ্চলিক চিত্র বলব না। ওই চিত্র বিশেষ অঞ্চলের দর্শকদের জন্য নয়, সারা ভারতের দর্শকের জন্য। সে কারণে মাদ্রাজ, বোম্বাইয়ের বড় স্টার নিয়ে তৈরি বড় বাজেটের ছবিকে কেউ মালয়ালম, কানাড়া, তেলুগু বা তামিল চিত্রের সমগোত্রীয় মনে করবেন না।

আঞ্চলিক চিত্রের সংজ্ঞাটি আশা করি এখন অনেক পরিষ্কার। এবং তার সমস্যাও সব রাজ্যেই মোটামুটি এক রকম। আঞ্চলিক চলচ্চিত্রের প্রদর্শনের সমস্যাই বড়। অন্য সমস্যাও আছে। এমন কোন অঞ্চল নেই যেখানে হিন্দীচিত্রের সাম্রাজ্য বিস্তৃত নয়। পূর্ব ভারতে হিন্দী ছবির আধিপত্য যথেষ্ট। হিন্দী ছবি দেখা অনেকটা নেশার মতো। সাধারণ হিন্দীচিত্রে প্রমোদের এমন সব উত্তেজক উপকরণ থাকে যেগুলি দর্শককে বেশ কিছুক্ষণের জন্য সম্মোহিত করে রাখে। কমারশিয়াল হিন্দীছবিতে অসুস্থ যৌন উপাদানের ছড়াছড়ি। তা ছাড়া এ-জাতীয় ছবির অপরিহার্য অঙ্গ হল ক্রাইম। এই সব ছবির সম্মোহনী যাত্নকে সংখ্যাগরিষ্ঠ দর্শকরা উপেক্ষা করতে পারেন না। আঞ্চলিক ছবিতে তাদের মন ভরে না।

আঞ্চলিক চিত্রের একটি বড় সংকট এইখানেই। হিন্দীচিত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় আঞ্চলিক চিত্র পরাস্ত। সেকস বা ভায়োলেনস-এর পথ দিয়ে হিন্দীচিত্রকে কাবু করার ত্নর্মতি সাধারণভাবে আঞ্চলিক চিত্রে দেখা যায় না। বেশির ভাগ পরিচালক এক্ষেত্রে কোন আপস মেনে চলতে নারাজ। সৎ চলচ্চিত্র তৈরির সৎ প্রচেষ্টাই বোধহয় আঞ্চলিক চিত্রের একটি সমস্যা। অন্তত বাংলা চলচ্চিত্রের কথা জানি যেখানে এই সততাই এখন মস্ত বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মনে হয় ওড়িয়া বা অসমীয়া চিত্রেরও এটাই মস্ত বিপদ। সব অঞ্চলের চলচ্চিত্রেরই একটি নিজস্ব চরিত্র আছে। সেটাকে বিসর্জন দেওয়া যায় না। কোন প্রযোজক বা পরিচালক ত্নর্বুদ্ধিবশতঃ হিন্দীচিত্রের অনুকরণ করতে গেলে হাতেনাতেই ফল পান। ওই ধরনের আঞ্চলিক ছবি দর্শকরা দেখতে গররাজী, কারণ মনের মতো ক্রাইম বা ক্যাবারে বা ভায়োলেনস তাঁরা হিন্দীচিত্রেই পেয়ে যান।

তা ছাড়া হিন্দীচিত্রে টেকনিক্যাল কাজের জৌলুষ থাকে। বোম্বাইয়ের স্টুডিওর অবস্থা ভাল, সাজ-সরঞ্জাম অতি আধুনিক। রঙিন বাংলা ছবি বানাতে হলে প্রযোজককে ছুটতে হয় বোম্বাইয়ে বা

মাদ্রাজে। কলকাতায় কালার ল্যাবরেটরি নেই। সম্ভবত পূর্বাঞ্চলেও নেই। কলাকৌশলের পরিপাট্য, ছবির একটি মস্ত বড় দিক। পূর্বাঞ্চলের কিছু কিছু ছবি দেখেছি। অসমীয়া ও ওড়িয়া ছবিও দেখা। এই সব ছবিতে কলাকৌশলগত সৌষ্ঠব অল্পই নজরে পড়েছে। আঞ্চলিক ছবির তবু একটি বিশেষ কৌলিন্য আছে। সেটা বিষয়ের কৌলিন্য। কমারশিয়াল হিন্দীচিত্রে যে অবাস্তবতা আখছার পাওয়া যায় আঞ্চলিক ছবিতে তা সৌভাগ্যবশত অনুপস্থিত। আঞ্চলিক ছবি যে প্রায়শই সর্বোচ্চ জাতীয় পুরস্কার পাচ্ছে বিষয়ের অভিনবত্বই তার কারণ।

আগেই বলেছি আঞ্চলিক চিত্রের ব্যবসাগত সমস্যা অনেক। তার মধ্যে প্রধান হল মার্কেটিং সমস্যা। দ্বিতীয় প্রধান সংকট হল হিন্দী-চিত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতা। আঞ্চলিক চলচ্চিত্র এই দ্বিতীয় সংকট সহজেই কাটিয়ে উঠতে পারে। রসোত্তীর্ণ এবং শিল্পোত্তীর্ণ ছবি তৈরির ক্ষমতা আঞ্চলিক চলচ্চিত্রকারদের আছে। বিষয়ের অভিনবত্ব এবং সুখভোগ্যতা দিয়ে দর্শকদের আকৃষ্ট করা সম্ভব। চলচ্চিত্রের বিনোদনী শক্তি তার উপভোগ্যতায়। সুস্থ প্রমোদ-উপাদান দিয়ে দর্শকের মন জয় করা যায় অতি সহজেই। তা ছাড়া, ফিলম আর্ট নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা আঞ্চলিক চিত্রেই দেখা যায়। আজকাল অবশ্য নতুন ধরনের হিন্দীচিত্রও তৈরি হচ্ছে। এক্সপেরিমেন্টাল হিন্দীছবিও এখন দেখতে পাই। সে-সব ছবি যে সব সময়েই বক্স-অফিসে অনাদর পায় তা নয়। বরঞ্চ বোম্বাইয়ে হিন্দীচিত্রে কমারর্শিয়াল ছবির পাশাপাশি এখন যে নতুন ধারা এসেছে তাকে সকলেই স্বাগত জানাচ্ছেন। এই আন্দোলন পূর্বাঞ্চলের চলচ্চিত্রে আরও সক্রিয় হতে পারত। আরও আগেও দেখা দিতে পারত। কারণ সত্যজিৎ রায়ের মতো চলচ্চিত্রকার বাংলা চলচ্চিত্রে "পথের পাঁচালি" নিয়ে এলেন পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি সময়ে। উনি আজও ছবি করে যাচ্ছেন। তাঁর সম-সাময়িক আরও কয়েকজন গুণী চলচ্চিত্রকারও ছবি বানালেন। বাংলা

চলচ্চিত্রের একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হল। ষাট দশকের মাঝামাঝি কাল অবধি, হয়ত তারও কিছুটা পরে, আমরা বাংলা ছবিতে একটি নতুন ধারার পরিচয় পেয়েছিলাম। কিন্তু কা অনিবার্য কারণে জানি না বাংলা ছবিতে আবার গতানুগতিক নাটক ও উপকরণ ঘুরে-ফিরে আসতে লাগল। বোম্বাইয়ে মুষ্টিমেয় কয়েকজন সাহসী পরিচালক যে আন্দোলনের সৃষ্টি করেছেন কলকাতায় তা দেখা গেল না। পূর্বাঞ্চলের অন্য চলচ্চিত্রেও নয়। সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্রকর্ম পূর্বাঞ্চলের ছবিকে আরও নিবিড়ভাবে প্রভাবিত করতে পারত। সেটা যে হল না তাই বোধহয় আর এক সমস্যা।

বাংলা ছবিই হোক কিংবা অসমীয়া বা ওড়িয়া চিত্রই হোক, সুস্থ প্রমোদর প্রতিশ্রুতি সব ছবিতেই অতি জরুরী। এক্সপেরিমেণ্টাল ছবি হলেও আপত্তি নেই। তবে ছবি সুখভোগ্যও হল না, এক্স-পেরিমেণ্টালও হল না—সেটাই বিপদের কথা। অতি হাল আমলের অসমীয়া বা ওড়িয়া ছবি দেখিনি। তবে বাংলা ছবি সম্পর্কে একথা বলতে পারি যে এখানকার অধিকাংশ পরিচালক যেন কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত। কী হলে যে দর্শকদের খুশি করা যাবে সে-সম্পর্কে তাঁদের ধারণা স্পষ্ট নয়। কাজেই চিরাচরিত ব্যাপারগুলি বার বার ছবিতে ঘুরে আসে।

চলচ্চিত্রের অগ্রগতি এভাবে আসতে পারে সে বিচারের আগে জানতে হবে অগ্রগতি বলতে কী বোঝায়। সে কি ব্যবসার অগ্রগতি? নাকি চারুকলার অগ্রগতি? ফিলমে এই দুই অগ্রগতি অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। অবশ্য বোম্বাইয়ের কমারশিয়াল হিন্দীচিত্রের দিকে তাকালে একথা বলবার উপায় নেই। যেখানে ফিলম আর্ট বা চারুকলা ধূলিসাৎ, কিন্তু ব্যবসা চলছে খুব ভালই। তাকে অগ্রগতি বলে না। ফিলম মূলত ফিলমই, তাকে একটি বিশেষ আর্ট-মিডিয়াম হিসাবে সার্থক হতে হবে। আর্ট তৈরির সুযোগ বা ক্ষমতা যদি না থাকে তবে চলচ্চিত্রকে অন্তত বিনোদক হতে হবে। ছবি দেখে যদি আনন্দ মেলে তবে অন্য সমস্যাগুলিও সুরাহা সম্ভব। পূর্বাঞ্চলের চলচ্চিত্রের

সামনে এখন একটিই বড় সমস্যা—হিন্দীচিত্রের আধিপত্য অথবা প্রতি-যোগিতা। হিন্দীচিত্রের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামতে হলে যে অর্থ ও যান্ত্রিক সরঞ্জাম দরকার পূর্বাঞ্চলের চলচ্চিত্র তা থেকে বঞ্চিত। তবে পূর্বাঞ্চলের ছবি একটি সম্পদে সমৃদ্ধ। সে রসের সম্পদ, সততার সম্পদ। এই সম্পদ যার আছে তার কখনই রিক্ত হবার কথা নয়। তবু যদি রিক্ততা দেখা দেয় তবে গভীর ও কঠোর আত্মসমালোচনার প্রয়োজন। আঞ্চলিক চিত্রে তার স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত থেকেই অগ্রগতির পথটি বেছে নিতে হবে। বাঁচার জন্য পরোধর্ম বা বোম্বাই-রীতি অবলম্বন আঞ্চলিক চিত্রের পক্ষে ভয়াবহ। এই সত্যটা মেনে নিলে আঞ্চলিক চিত্র সকল সমস্যা অতিক্রম করার শক্তি পাবে।

# অরুণাচল প্রদেশে পরিকল্পনার সমস্যাবলী এবং পরিকল্পিত অর্থনীতির অগ্রগতি

এম. পি. হাজারিকা

সারা ভারতের প'রকল্পনা নিয়ে আলোচনা করব না, বরং আমি অরুণাচল প্রদেশে পরিকল্পনার সমস্যা এবং পরিকল্পিত অর্থনীতির অগ্রগতির ব্যাখ্যাতেই নিজেকে নিয়োজিত রাখব। আমার উদ্দেশ্য হল, দেশের পূর্বতম প্রান্তে অবস্থিত একটি অঞ্চলে, বিশেষ করে বিভিন্ন পরিকল্পনা ও কর্মসূচী প্রণয়ন এবং সার্থক রূপায়ণের ক্ষেত্রে আমরা যে সব অসুবিধার সন্মুখীন হচ্ছি তার একটা বিবরণ দেওয়া। সামরিক গুরুত্বের দিক থেকে এটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ অঞ্চল এবং ভূ-রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও এটি বেশ অসুবিধাজনক জায়গা। বোধ হয় এই কারণেই পরিকল্পিত অর্থনীতি সম্পর্কে অর্থনীতিবিদের সাধারণ তত্ত্বগুলি, বিশেষ করে এই ধরণের ভূ-রাজনৈতিক পরিবেশে, সব সময় প্রযোজ্য নাও হতে পারে।

পরিকল্পনা কমিশন প্রণীত এবং পরবর্তীকালে জাতীয় উন্নয়ন পরিষৎ অনুমোদিত 'পঞ্চম পরিকল্পনার আভাস পত্রে'র মূল বিষয়-বস্তুতে এদেশে দারিদ্র্যের ছুটি মূল, কঠিন বাধার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। সেগুলি হল, অনগ্রসরতা ও অসাম্য। অরুণাচল প্রদেশের ক্ষেত্রে পশ্চাদপদতাই হল কঠিনতর বাধা এবং এই পশ্চাদ-পদতা নির্মূল করার উদ্দেশ্যেই এই সামরিক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল থেকে দারিদ্র্য উচ্ছেদে সমস্ত প্রচেষ্টা সংহত করতে হবে।

আমার মনে হয় এখানে অরুণাচল প্রদেশ নামে অভিহিত এই সামরিক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলের ভৌগোলিক পরিবেশ ও জনগণ সম্পর্কে

এবং এই অঞ্চলে সর্বশেষ যে সব সামাজিক-রাজনৈতিক উন্নয়ন ঘটেছে, সে সম্পর্কে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হবে। অরুণাচল প্রদেশ নামে পরিচিত, ভারতের সামরিক গুরুত্বপূর্ণ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত বরাবর বিস্তীর্ণ ৮৩,৫০০ বর্গ কিলোমিটার ব্যাপী এই এলাকা সম্প্রতি একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মর্যাদা পেয়েছে। গত ২০ জানুয়ারি (১৯৭২) তারিখে প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এই অঞ্চলটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল রূপে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করার মধ্য দিয়ে এই অঞ্চলের সামনে এক নতুন ও গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা হল, কারণ এই রাজনৈতিক পরিবর্তনের একটি সামাজিক ও আর্থনীতিক তাৎপর্যও আছে। এই অঞ্চল শতাব্দীব্যাপী বিচ্ছিন্নতার গণ্ডি থেকে বেরিয়ে এসেছে এবং বর্তমানে দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পুনর্গঠনে বৃহত্তর ও আরও অর্থবহ ভূমিকা পালনে এ অঞ্চল প্রস্তুত। বস্তুতঃ এই অঞ্চলের ৪৬,৭০০ অধিবাসী এখন এই অঞ্চলকে আর্থ-নীতিক সমৃদ্ধি ও জাতীয় ঐক্যের লক্ষ্যাভিমুখে এগিয়ে নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর।

অরুণাচল প্রদেশের উন্নয়নের কাহিনী চিরাচরিত প্রাচীন (আদিবাসা) বিনিময় প্রথায় ব্যবসাভিত্তিক অর্থনীতি থেকে টাকার মাধ্যমে ব্যবসাভিত্তিক আধুনিক অর্থনীতিতে রূপান্তরের কাহিনী। সুতরাং অনগ্রসরতার আদিম অবস্থা থেকে উন্নয়নের আধুনিক পর্যায়ে রূপান্তরের এই পদ্ধতি অর্থনীতির দ্রুত অগ্রগতির পথে খুব বেশি সহায়ক হয়নি, কারণ নতুন নতুন পরিবর্তনের ফলে আদিবাসীদের জীবনযাত্রার ছন্দ যাতে ভঙ্গ না হয় সে জন্য সামাজিক-আর্থনীতিক রূপান্তর আনয়ন করতে হয়েছে এমন ভাবে যাতে তুলনামূলক ভাবে অসুবিধা অনেক কম হয়। সৌভাগ্যবশতঃ অরুণাচল প্রদেশে এই পরিবর্তন সূচিত হয়েছে আনুপাতিক হারে অনেক কম অসুবিধার মধ্য দিয়ে, কারণ বোঝাপড়া ও সহযোগিতার মনোভাব নিয়েই এখানকার জনসাধারণ নিজেদের এই রূপান্তরের প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত করেছেন।

অরুণাচল প্রদেশের ভূ-সংস্থান বহুবিচিত্র এবং দুর্গম ভূ-প্রকৃতির জন্য স্বল্প দূরত্বের মধ্যেই জলবায়ু ও আবহাওয়াও পরিবর্তিত হতে দেখা যায়। পাহাড় ঘেরা উপত্যকা, পর্বত পাদ দেশ ও পর্বত-শীর্ষের মধ্যে তাপমাত্রার খুব বেশি তারতম্য দেখা যায়। বৃষ্টিপাতের মাত্রায় তারতম্যও যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয় এবং সুবনসিরি, সিয়াং, ডিবং ও আসামের দিকে প্রবাহিত লোহিত নদের উপত্যকা ও পর্বতমূলগুলিতে প্রবল বারিপাত হয়—৩৮০০ মি. মি. থেকে ৪৫০০ মি. মি. পর্যন্ত, পক্ষান্তরে কামেং ও সুবনসিরির কিছু কিছু এলাকায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৮৯০ মি. মি. থেকে ২১৫০ মি. মি. পর্যন্ত। সুউচ্চ পর্বতশিখর ও সবুজ উপত্যকা-ভরা এই অঞ্চলের ভেতর দিয়ে বয়ে গেছে অসংখ্য ছোটবড় নদী। এখানে বাস করে বেশ কয়েকটি বর্ণাঢ্য ও প্রাণবন্ত জনগোষ্ঠী। কথ্য ভাষার বৈচিত্র্যের দিক থেকে এরা বহুভাষী। কিন্তু এই সব গোষ্ঠীর সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনের উপর সর্বময় প্রভাব বিস্তার করেছে সর্বব্যাপক এক সাধারণ সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই অঞ্চল শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অবহেলা ও বিচ্ছিন্নতার কবলে পড়েছিল। ফলে এই শতাব্দীর পঞ্চম দশকের প্রথম দিক পর্যন্ত এ অঞ্চল আর্থনীতিক দিক থেকে অনগ্রসর ছিল, উৎপাদন ক্ষমতাও ছিল অত্যন্ত নিচু স্তরে।

## আর্থনীতিক বিকাশ

অরুণাচল প্রদেশে আর্থনীতিক বিকাশ অনেকগুলি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। আগেই আমি উল্লেখ করেছি যে অরুণাচলে পরিকল্পনার সমস্যা একেবারেই নিজস্ব এবং সে কারণেই এ এলাকার ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে পরিকল্পনা ও কর্মসূচী প্রণয়নের উদ্দেশ্যে যথেষ্ট উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। কারণ এখানকার উন্নয়নের পথে সবচেয়ে বড় বাধা হল এখানকার বন্ধুর ও দুর্গম ভূ-সংস্থান, যার ফলে উন্নয়ন কর্মসূচীর রূপায়ণ একেবারেই সহজ-

সাধ্য নয়। দ্বিতীয়তঃ রাস্তাঘাট ও যোগাযোগ ব্যবস্থার মত মৌলিক সুযোগ সুবিধাগুলি এখনও উন্নয়ন করা বাকী, যদিও চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষ নাগাদ মোট ৪৬০০ কি.মি. রাস্তাঘাট নির্মিত হওয়ার কথা। এটাও সারা ভারত মানের চেয়ে অনেক কম।

তৃতীয়তঃ এই এলাকা প্রধানত "ঝুম" চাষের মত পুরানো পদ্ধতির চাষের উপর নির্ভরশীল, যদিও কৃষি উন্নয়নের পরিস্থিতি পরিবর্তনের আধুনিক পদ্ধতির চাষ-আবাদ ধীরে ধীরে চালু করা হচ্ছে।

তা ছাড়া লগ্নীর পরিবেশ নিয়েও চিন্তা করবার আছে। এখানে যাঁদের হাতে মূলধন আছে তাঁরা তা খাটাতে খুব আগ্রহী নন। উৎপাদন করে এখানে ফল পাওয়া যায় না, আর উৎপাদন করেও এমন কোন লভ্যাংশ পাওয়া যায় না যা আবার লগ্নী করা যেতে পারে। এই এলাকা মূলতঃ 'উৎস এলাকা' রূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, এখানকার কাঁচা মাল দেশের অন্যান্য স্থানে অবস্থিত শিল্পগুলিতে চালান যায়।

এই এলাকায় কোন কার্যকরী শিল্পোন্নয়ন পরিকল্প প্রণয়নের উদ্দেশ্যে মোটামুটি সাধারণ নীতিগুলির মধ্যে আছে, বিভিন্ন কারিগরী, সামাজিক ও অর্থনীতিক সমস্যার পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত অনুশীলন এবং বিভিন্ন সম্পদের একটি তালিকা প্রণয়ন ও আর্থনীতিক সম্ভাব্যতার মূল্যায়ন; উৎপাদনের কয়েকটি বহিরাগত কারণ যদি সম্পূর্ণ রূপে অনুকূল নাও হয়, তবুও উন্নয়নের অগ্রগতি যাতে ব্যাহত না হয় সেজন্য ঘরোয়া প্রয়োজন মেটানোর উদ্দেশ্যে শিল্প ক্ষেত্রে লগ্নীর বৃহদংশ খাটাতে হবে; শিল্প ও কৃষি উন্নয়নের মধ্যে সমতা বজায় রাখতে হবে, কারণ যে অঞ্চলে জন সংখ্যার ৮০ শতাংশেরও বেশি কৃষির উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল সেখানে এটা খুবই প্রয়োজন, শিল্পোন্নয়নের সুফল যতদূর সম্ভব প্রকল্পের আর্থনীতিক সম্ভাব্যতা বিঘ্নিত না করে স্থানীয় জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়া উচিত; কোন শিল্পজাত মূলধন, যতদূর সম্ভব, অন্যান্য ক্ষেত্রে স্থানীয়

অর্থনীতির উন্নয়নার্থে আবার লগ্নী করা প্রয়োজন; সম্পদ নিয়ন্ত্রণের কাজে সমাজের ব্যাপৃত থাকা উচিত, যাতে স্থানীয় জনসাধারণের মনে অধিকার বোধ তথা স্থানীয় শিল্পোদ্যোগী শ্রেণীকে সাহায্য করার মনোভাব জেগে উঠতে পারে।

আরও একটি বিষয় মনোযোগ আকর্ষণ করে তা হল পরিবর্তনের প্রশ্ন। আমার নিজের মনে হয় যে পরিবর্তন যদিও হওয়া উচিত দ্রুত, কিন্তু শিল্পোন্নয়নের তরঙ্গাভিঘাতে সুশ্যাম বনানী ঘেরা এই উপত্যকার প্রশান্তি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাওয়া উচিত নয়। বরং নানা ব্যবস্থার মাধ্যমে এই আঘাতের তীব্রতা কমিয়ে দেওয়া দরকার এবং স্থানীয় জনসাধারণের উদ্ভাবনী শক্তি ও মনোভাবের প্রতি শ্রদ্ধা দেখানোর এটাই নীতি হওয়া উচিত। স্বর্গত পণ্ডিত নেহরুও এই মতই পোষণ করতেন।

অরুণাচলে পঞ্চায়েতি রাজ ও সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের পদক্ষেপ হিসাবে এক ত্রিস্তর পঞ্চায়েতি রাজ প্রথা গড়ে তোলা হয়েছে। পরিকল্পনা প্রকল্প সম্পর্কিত কমিটির (অনুশীলনী) সমীক্ষা দলের সুপারিশ গ্রহণ করা থেকেই এই লক্ষ্য উদ্ভূত হয়েছে। প্রতিটি গ্রাম, ব্লক ও জেলা স্তরে এগুলিই হওয়া উচিত প্রশাসনিক আধিকারিক এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে যোগসূত্র। সুতরাং, স্থানীয় জনসাধারণের নিজেদের উপর প্রত্যেকটি পরিকল্পনার দায়িত্ব অর্পণ করার প্রয়োজন থেকেই পঞ্চায়েতি রাজের সৃষ্টি। সেজন্য অরুণাচলে কোন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার প্রতি, তা সে শিল্পভিত্তিক বা কৃষি-ভিত্তিক যাই হোক না কেন, ত্রিস্তর কাঠামোর দৃষ্টিভঙ্গী থাকা উচিত। সৌভাগ্যবশতঃ, অরুণাচলে, জনসাধারণের জীবনের মূল চিরাচরিত গণতান্ত্রিক জীবন যাত্রার মধ্যে প্রোথিত, সুতরাং, যে কোন ধরনেরই গণতান্ত্রিক পরিকল্পনা এবং তার রূপায়ণের কাজ এঁদের কাছে মোটেই কঠিন নয়।

প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য হেতু এই অঞ্চলের আছে প্রভূত উন্নয়ন সম্ভাবনা। অরুণাচল প্রদেশের মোট ভৌগোলিক এলাকার

৬০ শতাংশের বেশি বনাকীর্ণ, অরণ্যসম্পদে তা পরিপূর্ণ। সুতরাং, অরুণাচল প্রদেশে আর্থনীতিক পুনর্গঠন কর্মসূচীর সবচেয়ে সম্ভাবনাময়, বিষয়গুলির অন্যতম হচ্ছে বনাঞ্চলের উন্নয়ন। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কালে এই প্রদেশের এতাবৎ অনধিগম্য বনসম্পদ প্রদেশের একেবারে অন্তঃপুর থেকে আহরণ করে আনার কাজ সম্প্রসারিত করার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে এবং এতদঞ্চলের আর্থনীতিক উন্নয়নের জন্য বনভিত্তিক শিল্প স্থাপনের উদ্দেশ্যে অরণ্য সম্পদ ব্যবহারের সম্ভাবনার দিক থেকে যে সব শিল্পের কথা মনে হয় সেগুলি হল: কাগজের মণ্ড ও কাগজ কল, দেশলাই কারখানা, প্লাইউডের কারখানা, ফাইবার বোর্ড ও হার্ড বোর্ড উৎপাদন কারখানা, টিম্বার ট্রিটমেন্ট ও সিজ্‌নিং কারখানা এবং রঞ্জন ও তার্পিন কারখানা।

তিরাপ জেলায় বনবিভাগ এমন একটি কাজ শুরু করেছেন যা এ দেশে প্রথম। সেটি হল অরণ্যভিত্তিক সামবায়িক একটি শিল্প। এই শিল্পটি নরোত্তম সমবায় শিল্প লিঃ নামে পরিচিত। এর লক্ষ্য কাষ্ঠভিত্তিক শিল্পোন্নয়নের উদ্দেশ্যে একটি পদ্ধতি উদ্ভাবন, এতে তিরাপ জেলার প্রত্যেকটি আদিবাসী পরিবারের সক্রিয় অংশ গ্রহণের ভূমিকা থাকবে বেশ কটি কাষ্ঠভিত্তিক শিল্প স্থাপনের মধ্য দিয়ে। এর মধ্য দিয়ে চাকরির সুযোগ সুনিশ্চিত হবে না, আর্থনীতিক প্রতিষ্ঠাও আসবে না, কিন্তু এর দ্বারা অরণ্যাঞ্চল সংরক্ষণে ও তার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে লোকে উৎসাহিত হবে।

অরণ্যাঞ্চলের ব্যবস্থাপনা এবং পঞ্চায়েতি রাজ ও সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজগঠনের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সামবায়িক প্রচেষ্টা ভিত্তিক এক ধরনের শিল্প সৃষ্টির একটা পদ্ধতি উদ্ভাবনের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা যখন শুরু হয়েছে, সে সময় কামেং বিভাগে, বন দপ্তর এ দেশে অন্যতম বৃহত্তম মণ্ড ও কাগজ শিল্প স্থাপনের সম্ভাব্যতা বিচার করে দেখেছেন। এই শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতা প্রথম দিকে

থাকবে দৈনিক ২০০ টন কাগজ, পরবর্তী কালে এর উৎপাদন ক্ষমতা বাড়িয়ে দৈনিক ৪০০ টন পর্যন্ত করার ব্যবস্থাও থাকবে।

এ অঞ্চলের শিল্পায়নের লক্ষ্যে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। কারণ পরিকল্পনা চলা কালে এ অঞ্চলের কয়েকটি সম্ভাব্য স্থানে প্লাইউড, দেশলাই কাঠি, করাত কল, যন্ত্রচালিত কাঠ কল ইত্যাদি পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বেশ কটি কাষ্ঠভিত্তিক শিল্প স্থাপন করা হবে। অরুণাচল প্রদেশের আর্থনীতিক সমৃদ্ধি বাড়ানোর উদ্দেশ্যে এবং প্লাইউড মিল, কাগজ ও কাগজ মণ্ডের কল, পার্টিকল্‌স্ বোর্ড ইণ্ডাস্ট্রি, রজন সংগ্রহ শিল্প ও করাত কলের মত চালু শিল্পগুলির চাহিদা যাতে মেটানো সম্ভব হয় সে জন্য বনসম্পদের সর্বাধিক সদ্ব্যবহার সুনিশ্চিত করার লক্ষ্য সামনে রেখে অঞ্চলের একেবারে ভেতরে অরণ্যসম্পদ আহরণের কাজ সম্প্রসারিত করাই হল পঞ্চম পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য। পঞ্চম পরিকল্পনায় অরণ্যভিত্তিক অর্থনীতি ও সেলুলোজ সম্পদ বাড়ানোর উপরও জোর দেওয়া হবে। প্রশাসনের তরফ থেকে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের উপরও যথোচিত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং সারা অরুণাচলে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থাদিও ইতিমধ্যেই গ্রহণ করা হয়েছে। এখানকার বর্ণময় ও সমৃদ্ধ উদ্ভিদ ও প্রাণিকুল সংরক্ষণার্থে প্রশাসনের পক্ষ থেকে যে সব ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, সেগুলির মধ্যে আছে তিরাপ জেলায় একটি বন্যপ্রাণী বিভাগ ও একটি অভয়ারণ্য স্থাপন।

অবশ্য এখানে শিল্পোন্নয়নের প্রধান ভিত্তিই হবে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমূহ। এগুলির মধ্যে কাঠের কাজ, বাঁশ ও বেতের কাজ, বাঁশের চাঁছ, ইনস্যুলেসন বোর্ড উৎপাদন, পেন্সিল উৎপাদন ইত্যাদি শিল্প স্থাপন করলে যথেষ্ট লাভই হবে। অরুণাচলের ঐতিহ্যময় কুটির শিল্প হল হস্তচালিত তাঁত। গুণ ও নক্সার মানোন্নয়ন করে, উৎপাদন ব্যয় কমিয়ে এবং প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীনে বিপণনের

ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করে এই শিল্পকে খুব লাভজনক শিল্প হিসাবে গড়ে তোলা সম্ভব, এর দ্বারা গ্রামীণ অর্থনীতি বিকাশের পক্ষে খুবই সুবিধা হবে। যে সব গাছ থেকে মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় তেল পাওয়া যায়, অরুণাচল প্রদেশের এক বিরাট এলাকা জুড়ে সে সব গাছের চাষ হয়ে থাকে।

## পরিকল্পনার আওতায় অরুণাচল

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গে এই অঞ্চলে অর্থনীতিক ও সামাজিক পুনর্গঠনের কাজ শুরু হয়। সূচনা একেবারে সাধারণ ভাবে হলেও এর তাৎপর্য ছিল সুদূরপ্রসারী। এই পরিকল্পনার আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৫ কোটি টাকার মত, কিন্তু প্রকৃত ব্যয় হল ২ কোটি ১ লক্ষ টাকা। বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে ভাল মতই ব্যয় করা হয়েছিল, বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল যোগাযোগ ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য ও কৃষির উপর। এই সব ক্ষেত্রে ফলও পাওয়া গেল ভালই। প্রায় ২২৯ মাইল সারা বছরে ব্যবহারযোগ্য রাস্তা এবং ৩০০০ মাইল মালবাহী কুলিদের হাঁটাপথ নির্মিত হল। জনস্বাস্থ্যের দিক থেকে ৩০টি হাসপাতাল, ১৭টি ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা কেন্দ্র, ৩০টি ম্যালেরিয়া নিরোধক কেন্দ্র এবং ২টি কুষ্ঠ স্বাস্থ্যনিবাসের দ্বারোদ্ঘাটন করা হয়েছে। ১৮০০ একর জমির উন্নয়ন করা হয়েছে এবং খাদ্য উৎপাদনেও যথেষ্ট সাড়া পাওয়া গেছে। শিক্ষার প্রসারও ঘটল খুব দ্রুত। সর্বমোট ১৭০টি বিদ্যালয় স্থাপন করা হল।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাল শক্তি সংহত করার কাল। সুতরাং বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যয়ের ব্যাপারে অদলবদল করা হল সামান্যই। মোট ব্যয় হল ৩ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকার মত। এই পরিকল্পনা জাত ফলাফলও বেশ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল গ্রামাঞ্চল পুনর্গঠনের জন্য জাতীয় পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে সমষ্টি

উন্নয়ন কর্মসূচী প্রবর্তন। এই কর্মসূচী অনুযায়ী ১৪টি ব্লক স্থাপন করা হল।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ৭ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা বিনিয়োগের কথা বলা হয়েছিল। আগের পরিকল্পনাগুলির তুলনায় এর লক্ষ্যমাত্রা একটু বেশিই ধরা হয়েছিল। মূল বিনিয়োগের চেয়ে প্রকৃত ব্যয় বেশি হল—মোট ৭ কোটি ২৭ লক্ষ টাকার মত। গুরুত্ব থাকল একই রকম, কিন্তু কাজ হল বহুমুখী। শিল্পের কাজকর্মে, সামান্য হলেও, সাড়া জাগল। উন্নয়নকর্মমুখী সুসংহত পদ্ধতির পথ পরিষ্কার করার জন্য কেন্দ্র ও জেলা স্তরে উন্নয়ন সমিতিসমূহ স্থাপন করা হল। সমষ্টি উন্নয়ন/ জাতীয় সম্প্রসারণ কর্মসূচী রূপায়ণের জন্য ব্লক উপদেষ্টা পর্ষদসমূহ গঠন করা হল। আদিবাসী জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ যে গ্রাম পরিষদ, সেগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করা হল, তাদের উপর ন্যস্ত হল উন্নয়ন কর্মসূচী রূপায়ণের লক্ষ্যে আরও বেশি বেশি দায়িত্ব। এই পরিকল্পনা চলা কালে ভারত-চীন সীমানা সংঘর্ষ ও তার পরবর্তী ঘটনাবলীতে প্রশাসনিক কাজকর্ম নানা অসুবিধার সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও অরুণাচলে পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণের কাজ পুরোদমে শুরু হল।

প্রথম তিনটি পরিকল্পনা কালে এতদঞ্চলে কাজের অগ্রগতি মোটের উপর ভালই, যদিও আরও অনেক বেশি কাজ করা যেত। অর্জিত আংশিক সাফল্য এবং আরও সাফল্যের সুস্পষ্ট সম্ভাবনার মুখোমুখী দাঁড়িয়ে পরিকল্পনা কমিশন চতুর্থ পরিকল্পনায় বিনিয়োগের মাত্রা যথেষ্ট বৃদ্ধি করলেন—১৭ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা। মাত্র ২০ বছরে ব্যয়ের পরিমাণ বাড়ল আটগুণেরও বেশি।

সংখ্যার দিকে তাকালে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রগতির হার বেশ চমকপ্রদ মনে হয়। শিক্ষার অগ্রগতির হার রীতিমত উল্লেখযোগ্য, আরও বিদ্যালয় খোলা হয়েছে, ছাত্রসংখ্যা প্রায় ২৮০০ থেকে বেড়ে হয়েছে প্রায় ৩৬,০০০। যোগাযোগ ব্যবস্থা ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের

ক্ষেত্রেও উন্নতি কম উল্লেখযোগ্য নয়। এখন অরুণাচলে সমস্ত ধরণের প্রায় ৩০০০ কিলোমিটার রাস্তা আছে, এর মধ্যে ১৩০০ কিলোমিটার বাঁধানো। বিদ্যুৎ উৎপাদন মাত্র ২৫০ কিলোওয়াট থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৪৮০০ কিলোওয়াটে। বনজ সম্পদ থেকে বেশ ভালভাবে উপার্জন হতে শুরু করেছে। সংখ্যা ও মানের দিক থেকে আরও বেশি চিকিৎসা কেন্দ্রও খোলা হয়েছে।

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিল্পোন্নয়নের উপর অনেক বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। শিল্পক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিকল্প রূপায়ণের উদ্দেশ্যে ২ কোটি ৮ লক্ষ টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব করা হয়েছে। তা ছাড়া অরণ্য উন্নয়নের জন্য বেশ কটি পরিকল্পে হাত দেওয়া হয়েছে। পঞ্চম পরিকল্পনায় কৃষি উন্নয়নের উপরও যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, কারণ অরুণাচলে কৃষি শুধু জনসাধারণের খাদ্যের উৎসই নয়, বরং আগামী দীর্ঘকাল ধরে এতদঞ্চলে আর্থ-নীতিক কাঠামোর প্রয়োজনীয় অঙ্গ হিসাবে, আর্থনীতিক সমৃদ্ধি ও উৎপাদনক্ষম কর্মসংস্থানের কার্যকরী পন্থা হিসাবে, কৃষিকে বিবেচনা করে যেতে হবে। সুতরাং পঞ্চম পরিকল্পনায় কৃষি ক্ষেত্রে মূল লক্ষ্য হল পরিকল্পনার শেষ নাগাদ খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা অর্জনের উদ্দেশ্যে উৎপাদন বৃদ্ধি। কৃষি যেহেতু অরুণাচলে অর্থনীতির মূল ভিত্তি, সে জন্য এই গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে নতুন নতুন চাকরি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কৃষি পরিকল্পনাতে নজর দিতে হয়। শিল্পোন্নয়ন পরিকল্পগুলির মধ্যে যন্ত্রচালিত কাঠের কল, পার্টিকল্ বোর্ড ফ্যাক্টরি, দেশলাই কাঠি, করাত কল সহ একটি ২০০ টন উৎপাদন ক্ষমতাবিশিষ্ট অরণ্যভিত্তিক পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত সুসংবদ্ধ শিল্প গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে। পঞ্চম পরিকল্পনায় বন ও কৃষি জাত সম্পদের ভিত্তিতে বেশ কয়েকটি মাঝারি ও ছোট শিল্প সম্পর্কে প্রকল্প প্রতিবেদন রচনার উদ্দেশ্যে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত সমীক্ষা চালানোর ব্যবস্থাও করা হয়েছে। তাছাড়া শিল্পায়নের

অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে একটি শিল্পোন্নয়ন কর্পোরেশন গঠন করা হবে এবং একটি শিল্প এস্টেটও স্থাপন করা হবে।

অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রগতির জন্য অরুণাচলে পঞ্চম পরিকল্পনার নিম্নলিখিত লক্ষ্যগুলি ধার্য করা হয়েছে: (১) কৃষি উৎপাদন ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদিতে স্বয়ম্ভরতা অর্জন; (২) বিশেষ করে যোগাযোগ ব্যবস্থা ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে এ অঞ্চলের মৌলিক সুযোগসুবিধার দ্রুত উন্নয়ন। বিভিন্ন জেলার মধ্যে রাজপথ নির্মাণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হবে; (৩) ডাক্তারখানা, স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও বিদ্যালয়ের মত কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপন। এ বিষয়ে সীমান্ত অঞ্চলগুলির উপর বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হবে; (৪) কর্মসংস্থান ভিত্তিক পরিকল্পগুলিতে লগ্নীর মাত্রা বাড়িয়ে উৎপাদনক্ষম কর্মসংস্থান সর্বাধিক পরিমাণ বৃদ্ধি এবং (৫) জীবনযাত্রার মান যাতে দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায় সে জন্য স্থানীয় শিল্পোদ্যোগীদের এবং বহিরাগত পুঁজিকে উৎসাহদান। আর্থনীতিক কার্যকলাপ পুনরুজ্জীবনার্থে উপরোক্ত ব্যবস্থাগুলি আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণের উদ্দেশ্যে সমভাবে প্রযুক্ত হবে।

বঙ্গানুবাদ—শক্তি রাহা

# আর্থনীতিক সংহতির মাধ্যমে পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যে সাংস্কৃতিক সংহতি সাধন

ডঃ ডি. এস. শর্মা

ভারতের পূর্বাঞ্চলের জনগণ রাজনৈতিক-ঐতিহাসিক ধারার মধ্যে দিয়ে একটি সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার লাভ করলেও সংহতির মধ্যে দিয়ে একটি সুসংবদ্ধ সংস্কৃতি গড়ে তোলার কাজ এখনও বাকী। এই রকম একটি এবং একটি মাত্র সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হলে আমাদের কাজের একটি সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট ধারাকে অনুসরণ করে চলতে হবে বিভিন্ন ধরনের ভাব ও সংস্কৃতি যাতে স্থান পায়, এক কথায় যাকে ভারতীয় সংস্কৃতি বলা যেতে পারে। এই ধরনের ঐক্য অনুভব করতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন আদর্শ ও ভাব বিনিময় এবং পুরোন সংযোগ পুনরুদ্ধার ইত্যাদির মাধ্যমে ভবিষ্যতের জন্য যাতে একটি সৃষ্টিশীল যোগসূত্র রচনার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া।

শ্রীঅরবিন্দের মতে একাত্মতাবোধ, একতাবোধ, সংহত ঐক্যবোধ জাতি, ভাষা, স্থানিক সম্পর্ক ও আর্থনীতিক সুযোগ সুবিধার ওপরে নির্ভরশীল। এগুলোর মধ্যে প্রথম দুটি সবচেয়ে বেশি গতিশীল এবং এর দ্বারা উন্নত স্থানিক সম্পর্ক ও সুসংহত আর্থনীতিক সুযোগ সুবিধার আকারে জাতিকে শক্তিশালী করে তোলা সম্ভব। যেখানে সামাজিক-রাজনৈতিক শক্তি পূর্বাঞ্চল পরিষদ অথবা উত্তর পূর্ব পরিষদের মাধ্যমে আঞ্চলিক প্রচেষ্টার পক্ষ সমর্থন করে থাকে, সেখানে তাই হতে দেওয়া উচিত, উত্তর পূর্ব ভারত পুনর্গঠন আইনের বিধিতে যেভাবে আঞ্চলিক স্তরে আর্থনীতিক উন্নয়নের জন্য রাজ্য পরিকল্পনার

মাধ্যমে সমন্বয় সাধন করা হয়েছে সেইভাবে আরও বেশি ঐক্য বোধকে সঞ্চারিত করা যেতে পারে।

এখানে যে বিষয়টি বিশেষ সমর্থনযোগ্য তা হল এই, সাংস্কৃতিক সংহতি কেবলমাত্র বৈষম্যহীন সমাজেই স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। বিশেষতঃ পূর্বভারতের মত অঞ্চলে, যেখানে সাংস্কৃতিক বৈষম্য লক্ষ্যণীয়ভাবে উপস্থিত, সেখানে আর্থনীতিক স্তরের ওপর সংহতিকে সার্থক রূপ দেবার যে প্রয়াস তারই ওপর ভিত্তি করে সাংস্কৃতিক সংহতিকে সুষ্ঠুভাবে প্রতিষ্ঠিত করা উচিত। যেখানে প্রতিটি ইউনিটই সামাজিক ও আর্থনীতিক ক্ষেত্রে নিজ নিজ বিবিধ সমস্যার সম্মুখীন সেখানে সাংস্কৃতিক ঐক্য সাধনের যে কোন কর্মসূচি শিক্ষিত জনসাধারণের কাছেও নিতান্ত অর্থহীন বোধ হবে। শুধুমাত্র সমাজের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সংহতি চাওয়ার অর্থ অনেকটা চিকিৎসা বিষয়ে সেই প্রবাদের মত দাঁড়ায়—রোগের কারণ অনুসন্ধান না করে শুধু লক্ষণ দেখে চিকিৎসা। এই প্রসঙ্গে আরো বলা যায়, অন্যান্য অঞ্চলে এমনিতর সংহতির জন্য বহু সমাজই হয়ত অপেক্ষা করে আছে কিন্তু এ দেশের অনুন্নত আর্থনীতিক প্রায় বন্ধ্যাবস্থা সাংস্কৃতিক সংহতির পক্ষে সকল বড় প্রয়াসকেই ব্যর্থ করে দিতে পারে।

সামাজিক আর্থনীতিক ক্ষেত্রে প্রায় পরিপূর্ণ সংহতির ব্যাখ্যা করা যেতে পারে এইভাবে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি—মনের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য প্রায় সকল স্তরে জীবনের সকল সুযোগ সুবিধাকে অব্যাহত রাখতে হবে। এক কথায় এই সংহতির অর্থ, দেশের প্রতিটি প্রত্যন্তে সর্বত্র সমান দক্ষতার জন্য সমান মজুরীর প্রচলন করতে হবে। বেতনের টাকা এবং প্রত্যর্পিত অর্থ ও অন্যান্য আয় হিসেবে দেখলে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অনুরূপ ক্ষেত্রে যে পার্থক্য তা জীবন যাত্রার ব্যয়ের ক্ষেত্রে বৈষম্যকে প্রকট করে তুলবে।

পশ্চিম ইউরোপের মত একটি সুসংহত রাষ্ট্রে একের মূল্য হবে শূণ্য অথবা নগন্য কিন্তু পূর্বভারতে এর মূল্য খুবই বেশি। এটা এই

ঘটনা থেকে আরো প্রত্যক্ষ করা যায় যখন দেখা যায় ই. ই. সি-তে জনৈক বেলজিয়াম কর্মী তাঁর নিজের সীমানা ছেড়ে ফ্রেঞ্চ কারখানায় রোজই সকালে কাজে যান এবং সন্ধ্যায় প্রতিদিন বাড়ী ফেরেন। অথচ এখানে যানবাহন পরিস্থিতি খারাপ হওয়ায় এবং স্থানান্তরকরণের সুযোগ না থাকায় এমন কথা স্বপ্নেও ভাবা যায় না। এখানে নীতি-নির্ধারণে ও বার্ষিক এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ব্যয় বিনিয়োগে এমনি ধরনের বৈষম্য কমিয়ে আনার জন্য সামান্য দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে মাত্র। শেষ অবধি সাংস্কৃতিক সংহতির পথ প্রশস্ত করার জন্য পরিবহণ জনিত বিঘ্ন অপসারণ করতে হবে ও অনতিবিলম্বে এই অঞ্চলের অনুন্নত অর্থনীতিতে সংহতি সাধনের উদ্দেশ্যে আরো বেশি সমন্বয়ের জন্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

## অসংহতির অবস্থা

নীচের দুটি শর্ত বজায় থাকলে সকল আর্থনীতিক ও আধা আর্থনীতিক অসুবিধার ক্ষেত্রে রাজ্য পর্যায়ে উন্নীত হওয়া নিঃসন্দেহে সকল ব্যাধির ক্ষেত্রে উপশম বিশেষ :

(১) রাজ্য পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার ফলে স্বতস্ফুর্তভাবে কাজ করার জন্য সঠিক মনোবৃত্তি প্রেরণা দান স্বরূপ আবশ্যিক ব্যাপারটির পুনরুজ্জীবন করা যাবে এবং এইরূপে সংহতির আবহাওয়ায় অনুপ্রেরণা দিয়ে এবং তার গতিবৃদ্ধি করে একটি স্বশাসিত শক্তিশালী কার্যক্রম সুরু করা যাবে : এবং

(২) সস্তাদরে যানবাহন, বিদ্যুৎ ও সংস্থাগত ঋণ পাওয়ার ব্যাপারে লগ্নীর জন্য বিশেষভাবে একটি মূলধনী তহবিল গঠনের প্রয়োজনীয় সম্পদ নবগঠিত রাজ্যের ক্ষমতাধীনে আছে।

এই দুটি শর্তের মধ্যে শেষোক্তটির দক্ষতা কেন্দ্রীয় শুভেচ্ছা কি পরিমাণে পাওয়া যাবে তার উপরে অত্যন্ত নির্ভর করে। এই উদ্দেশ্যে রাজ্যস্তরে উন্নয়ন নিশ্চয়ই একটি গণ্য বিষয় নয়।

এইরূপে আঞ্চলিক সমস্যার সমাধান এবং একটি অঞ্চলের শেষ পর্যন্ত সংহতি সাধন প্রথমোক্ত শর্তটির বৈধতার ওপর নির্ভরশীল। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই জনসাধারণ তাঁদের নতুন দায়িত্ব অনুধাবনে অসমর্থ নন এবং নেতৃবৃন্দ রাজ্যপর্যায়ে উন্নয়নের পরবর্তী উচ্চাকাঙ্ক্ষার সঙ্গে পরবর্তী কার্যক্রম অনুসরণ প্রভৃতি শক্তির খেলায় অত্যধিক ব্যস্ত থাকেন। এইভাবে যদিও জনগণের মনোবৃত্তিতে নতুন ভাবধারা গ্রহণের যে শক্তি তার সর্বাধিক সুষ্ঠু ব্যবহার করা উচিত এবং উদ্বোধন পরবর্তী প্রেরণাহীনতা জনিত শূণ্যতা কঠিনতর কাজের জন্য নতুন উৎসাহ ও উদ্দীপনায় ভরে দেওয়া উচিত তবু রাজ্য পর্যায়ে উন্নয়নের দাবী জনগণের কাজ করার অন্তর্নিহিত ইচ্ছার পুনরুজ্জীবন সম্পর্কে কোন নিশ্চয়তা দেয় না। জনগণের বিবেক উদ্বুদ্ধ করলে ও তারা তাদের নিজ ভাগ্যের বিধাতা এই উপলব্ধি এনে দিলে সংহতির আবহাওয়া উৎসাহজনকভাবে উদ্দীপিত হবে এবং তার ফলে নবগঠিত ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির সীমিত সম্ভাবনা সম্পর্কে অকপট অনুভূতির ভিত্তিতে আঞ্চলিক সংহতির পথ প্রশস্ত হবে।

আঞ্চলিক উন্নয়ন এবং সার্বিক আর্থনীতিক বৃদ্ধির মধ্যে নৈমিত্তিক সম্পর্কের ব্যাখ্যা কেবলমাত্র একটি স্থূল যন্ত্রবিশেষ হয়ে দাঁড়ায় এটা আর্থনীতিক উন্নয়নের বর্তমান মতবাদে পাওয়া যায়। উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য প্রথমত দুইটি: (১) মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি এবং (২) আয় বিভাজনে সমতা। বৃদ্ধির হারের ভিত্তিতে একই সময়ে ছেড়ে না দিয়ে একটি আর্থনীতিক শিক্ষা সম্পর্কিত নীতির মাধ্যমে আঞ্চলিক অসংহতি হ্রাসের পরিমাণ সর্বাধিক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। ভবিষ্যৎ যতদূর দেখা যায় তার মধ্যে ঈপ্সিত মাত্রায় যদি সংহতি আনা যায় তবে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বটি অবশ্য মোটেই কম নয়। ১৯৭২-এ মোটামুটিভাবে এর সূচনা হয়েছে। বর্তমানে উত্তরপূর্ব পরিষদে তত্ত্বাবধানে উত্তরপূর্ব ভারতের উন্নতির সূচনা হয়েছে—পূর্বাঞ্চল পরিষদ বাৎসরিক এক বা দুইটি সম্মেলন ছাড়া মোটামুটি কর্মহীনই

রয়েছে। এই অঞ্চলে সমস্যার বিরাটত্বের পরিপ্রেক্ষিতে যদি পূর্বাঞ্চল পরিষদকে কর্মহীন করে রাখা উদ্দেশ্য না হয় এবং একে আরো বেশি ক্ষমতা দিয়ে কর্মক্ষেত্র প্রসারিত করা হয় তবেই অনেক ও অধিকতর কার্যকর সংস্থাগত সুযোগ সুবিধার প্রয়োজন হবে।

মনে হয় উপরে বর্নিত যুক্তিগুলোর কিছু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। এই অঞ্চল যদি ঈপ্সিতভাবে সুসংবদ্ধ না হয়ে থাকে তবে তার কারণ আর্থনীতিক উন্নয়নে এর পশ্চাৎবর্তিতা। যদি এ পর্যন্ত যথোপযুক্ত ভাবে প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার না হয়ে থাকে তবে তার কারণ সে সম্পদ প্রচুর ভাবে পাওয়া সম্ভব হয়নি, হয়ে থাকলেও তার সদ্ব্যবহারের জন্য বাহ্যিক আর্থনীতিক অবস্থাগুলি কেবলমাত্র সীমিতাকারে পাওয়া গেছে অথবা উত্তর-পূর্ব ভারতের কতিপয় অংশে সচরাচর এই আর্থনীতিক অবস্থার প্রচলন দেখা যায় না। তা ছাড়া দেশের এই অংশে শিল্প সম্পর্কিত কর্মকাণ্ডের পক্ষে পরিবহন সম্ভাবনা যদি না থাকে তবে কতগুলি বাহ্য কারণে বিভিন্ন ক্ষেত্রে উপ-আঞ্চলিক অর্থনীতির প্রায় বন্ধ্যাবস্থাস্বরূপ দূষিত বৃত্তকে অগ্রসর করানো হয়ত সম্ভব হত। উক্ত বাহ্য বিষয় হল এই—সস্তায় এবং উপযুক্ত পরিমাণে পরিবহণ ব্যবস্থার জন্য বিরাট আকারে বিনিয়োগ এবং এই অঞ্চলের সচেতন বোধ সম্পন্ন জনগণের মধ্যে 'সম্পর্কগত বাধা' দূরীকরণের কর্মসূচির মাধ্যমে সংহতির উপকারিতা বিষয়ে জনগণের বোধকে জাগ্রত করা। যোগাযোগের সুযোগ সুবিধা (পরিবহন। স্থানান্তরকরণের সুলভ ও উপযুক্ত উপায়) আন্তঃ-আঞ্চলিক বিশেষত্ব অর্জন ও তা থেকে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করেছে। এর দরুণ এ অঞ্চলে আর্থনীতিক কর্মকাণ্ডের অসম স্থানিক অবস্থান বর্তমান রয়েছে। জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক সুযোগ সুবিধা সম্পর্কিত পরিকল্পনা পরিকল্পনার বিকল্প পথের মাধ্যমে এই বিভিন্ন

অংশের মধ্যে অন্য ও উৎপাদনগুলির আপেক্ষিক স্থাবরতার সর্বাধিক ভালভাবে মোকাবিলা করা যেতে পারে।

সাংস্কৃতিক ঐক্য বিধানের ওপরে আঞ্চলিক আর্থনীতিক সংহতির যে ফল থাকার সম্ভাবনা তার চেহারাটি অভিজ্ঞতার আলোকে অনুমান করা ব্যতীতও উচ্চ আঞ্চলিক সংস্থা দ্বারা আর্থনীতিক বৃদ্ধির আঞ্চলিক অসাম্য হ্রাসের ফল সংহতির মাধ্যমে স্থির করা যেতে পারে। সংহতিকে উৎসাহদানের অজুহাতে অনুরূপ অসাম্য হ্রাসের আনুকূল্য করা অথবা সংহতির জন্য ত্যাগের অজুহাতে অসম বৃদ্ধির বিরোধী যুক্তিকে নীতি নির্ধারণে কি রকম গুরুত্ব দেওয়া উচিত অনুরূপ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তা নির্ধারণের একটি বৈধ নির্ণায়ক উপস্থিত করা যেতে পারত। সংক্ষিপ্ত ও দীর্ঘকালের বিকল্প প্রায়োগিক নীতির উর্ধ্বে অবস্থিত সম্ভাব্য আপেক্ষিক কার্যকারিতা ও আর্থনীতিক দক্ষতা থেকে সাংস্কৃতিক সংহতির প্রক্রিয়াটি অনুমান করা যেতে পারে যাতে শ্রেষ্ঠ মিশ্র নীতি এবং যদি ক্রোড়পত্র থাকে তা হলে দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ মিশ্র নীতি বেছে নেওয়ার সুবিধা হয়।

বঙ্গানুবাদ—সুতপা চক্রবর্তী

# ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও অগ্রগতি

অধ্যাপক হরশঙ্কর ভট্টাচার্য

বিগত চারটি পরিকল্পনায় আমাদের অগ্রগতির চুলচেরা সালতামামি করার সময় হয়েছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। পূর্বভারতীয় রাজ্যসমূহের সংস্কৃতিসম্মেলনের কর্তৃপক্ষ তাই এই আলোচনা সভার আয়োজন করে খুব ভালই করেছেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে সোভিয়েট রাশিয়ার বিস্মকর অগ্রগতিতে ঔপনিবেশিক মুক্তিযোদ্ধাদের মনে স্বাধীনতার পরে দেশ গড়ে তোলার একটা রূপরেখা আঁকা হয়ে যায়। স্বাধীনতা লাভের বেশ কয়েক বছর আগে থেকেই পরিকল্পনার কথা হচ্ছিল বটে, কিন্তু ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতার পর প্রথম পরিকল্পনা রচনা ও কার্যকরী করার সম্ভাবনা দেখা দেয়। ভারতের সংবিধানে নির্দেশক নীতিসমূহে বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্র এমন সমাজ গড়ে তুলবে যেখানে সকলে সমান সুযোগ পায়, প্রত্যেকেরই কাজ খুঁজে পাওয়ার সুযোগ মেলে, অর্থনৈতিক শক্তিধরদের চাপে দুর্বলেরা যেন শোষিত না হয় এবং আয়-সম্পদের বৈষম্য কমে গিয়ে যেন নিম্নতম মাত্রায় পৌছে। এই সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করার উদ্দেশ্যে আমাদের দেশে সর্বমোট চারটি পরিকল্পনা রচিত হয়েছে। প্রথম পরিকল্পনা ১৯৫০-৫১ সাল থেকে ১৯৫৫-৫৬ সাল; দ্বিতীয় পরিকল্পনা ১৯৫৫-৫৬ সাল থেকে ১৯৬০-৬১; তৃতীয় পরিকল্পনা ১৯৬০-৬১ থেকে ১৯৬৫-৬৬ সাল; তারপরে তিন বছর ছিল পরিকল্পনার ছুটি ( ১৯৬৬-৬৭, ১৯৬৭-৬৮, ১৯৬৮-৬৯ সাল ); এবং ১৯৬৯-৭৪ পর্যন্ত চতুর্থ পরিকল্পনা।

চতুর্থ পরিকল্পনাকাল এখনও শেষ হয়নি, তাই আমরা পূর্ণ ও সামগ্রিক আলোচনার সুযোগ পাচ্ছি না। তিনটি পরিকল্পনাকে

পৃথক ভাবে ধরে নিয়ে এবং চতুর্থ পরিকল্পনার অন্তবর্তীকালীন বিবরণীর ভিত্তিতে অগ্রগতি আলোচনা করতে হবে। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা এত ব্যাপক বিষয় যে এর ফলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির সব দিক পর্যালোচনা করা এক বিশাল পরিধির ব্যাপার। তাই মাত্র কয়েকটি সূচীর সাহায্যে অগ্রগতির রূপ আমরা বিধৃত করতে পারি।

তিনটি পরিকল্পনাকালকে একত্র বিচার করে পনের বছরের পরিকল্পনাকালে এমন খুব কম দিকই আছে যাতে আমরা অগ্রসর হওয়ার স্বাক্ষর খুঁজে না পাই। কোনদিকে কম, কোনদিকে বেশি, কিন্তু প্রতিটি দিকেই অগ্রগতির চিহ্ন বর্তমান। ১৯৪৮-৪৯ সালের দামস্তরের হিসেবে ১৯৫০-৫১ সালে জাতীয় আয় ছিল ৮৮৫০ কোটি টাকা, ১৯৬৪-৬৫ সালে দাঁড়ায় ১৪,৯৩০ কোটি টাকা; মাথাপিছু আয় এই সময়ে বৎসরে ২৪৭.৫ টাকা থেকে বেড়ে হয় ৩১৪.৪ টাকা। জাতীয় আয়বৃদ্ধির হার হলো এই সময়ে ৬৮.৭%, অর্থাৎ বছরে চক্রবৃদ্ধি হারে ৩.৮%।

প্রথম তিনটি পরিকল্পনায় মোট নতুন বিনিয়োগ হয় ২১৬৯০ কোটি টাকা, তার মধ্যে ১৪,৭২৮ কোটি টাকা আসে কেন্দ্রীয় বাজেটের উৎস থেকে। নীট মূলধন গঠনের পরিমাণ, কেন্দ্রের অধীনে, দাঁড়ায় ৩৫২৪ কোটি টাকায়।

আয়-সঞ্চয়ের অনুপাত ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রথম পরিকল্পনা-কালে জাতীয় আয়ের ৬.৬% সঞ্চয় হতো, দ্বিতীয় পরিকল্পনাতে এই অনুপাত দাঁড়াল ৮.৫%; তৃতীয়তে ৯.৫%।

কৃষিজাত দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদনবৃদ্ধির হিসেব করলে দেখতে পাই (১৯৪৯-৫০কে ১০০ ধরে নিয়ে), ১৯৫০-৫১ সালে এই সূচক ছিল ৯৫ ৬, ১৯৬৩-৬৫ সালে দাঁড়ায় ১৫৭.৬, অর্থাৎ ১৪ বছরে ৬৫% বৃদ্ধি। পরিকল্পনা শুরু হওয়ার আগে পঞ্চাশ বছরে গড় বাৎসরিক বৃদ্ধির হার ছিল ½%, আর পরিকল্পনাকালে তা হলো বৎসরে চক্রবৃদ্ধি হারে প্রায় ৩%। খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় ১৯৫০-৫১ সালের ৫০.৮

মিলিয়ন টন থেকে ১৯৬৪-৬৫ সালের ৫০'৮ মিলিয়ন টনে, তুলোর উৎপাদন ২'৯ মিলিয়ন বেল ৫'৪ মিলিয়ন বেল হয়, কাঁচা পাট ৩'১ মিলিয়ন বেল থেকে হয় ৬'১ মিলিয়ন বেল, তৈলবীজ ৫'২ মিলিয়ন টন থেকে ৮'৬ মিলিয়ন টনে পৌঁছায়। নীট জলসিঞ্চিত এলাকা ৫১'৫ মিলিয়ন একর থেকে ৯০ মিলিয়ন একরে এসে যায়।

শিল্পজাত দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধির হিসেব করা যাক। শিল্পজাত উৎপাদনসূচী (১৯৫৬=১০০) ছিল ১৯৫১ সালে ৭৩'৫, ১৯৬৪-৬৫তে দাঁড়ায় ১৭৪'৮। কয়লার উৎপাদন বেড়ে ১৯৫০-৫১ সালের ৩২'৮ মিলিয়ন থেকে ১৯৬৪-৬৫ সালে হয় ৬৪'৪ মিলিয়ন টন, অর্থাৎ প্রায় দ্বিগুণ হয়ে পড়ে। লোহার উৎপাদন এই সময় বৃদ্ধি পায় ৫ গুণ, ৩ মিলিয়ন থেকে ১৫'১ মিলিয়ন টন। ইস্পাতের উৎপাদন বাড়ে ৪ গুণেরও বেশি, ১'০৪ মিলিয়ন টন থেকে ৪'৪৩ মিলিয়ন টন। তুলাজাত বস্ত্রোৎপাদন ৫৩৪ মিলিয়ন কে. জি. হয় ৯'৬৭ মিলিয়ন কে. জি., পাটজাত দ্রব্যোৎপাদন বাড়ে ৮'৩ লক্ষ টন থেকে ১২'৯ লক্ষ টন। ইস্পাত, এলুমিনিয়াম, এনজিনিয়ারিং, সার এবং পেট্রোলজাত দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, সারা দেশের শিল্পকাঠামোতে অনেক ফাঁক ভরাট হয়ে ওঠে, ভারসাম্যহীনতা অনেকটা কমে।

বিদ্যুতের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় প্রায় ৫ গুণ, ১৯৫০-৫১ সালের ২'৩ মিলিয়ন কিলোওয়াট থেকে ১০'৩ কিলোওয়াটে দাঁড়ায়। পাকা রাস্তা ছিল ১৫৬০০০ কিলোমিটার, বৃদ্ধি পেয়ে হয় ২৮৪০০০ কিলোমিটার। রেলের পরিবহন ক্ষমতা প্রায় ৩½ গুণ বাড়ে, ৯৩ মিলিয়ন টন থেকে হয় ২০৫ মিলিয়ন টন। জাহাজী পরিবহনের ক্ষমতা প্রায় ৪½ গুণ বৃদ্ধি পায়। শিক্ষা, চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য সব দিকেই লক্ষণীয় অগ্রগতি ঘটে।

চতুর্থ পরিকল্পনার অগ্রগতি সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য এখনও আমরা পাইনি। তবে রিজার্ভ ব্যাংকের বুলেটিন, চতুর্থ পরিকল্পনার

অন্তবর্তীকালীন রিপোর্ট এবং কেন্দ্রীয় সরকারের গত বছরের ইকনমিক সার্ভে থেকে আমরা অনেকটা জানতে পারি। এসব সূত্র থেকে পাওয়া তথ্যে জানা যায় যে প্রথম চার বছরে মোট ব্যয়ের পরিমাণ ১১৯৫৫ কোটি টাকা, এই টাকা হলো সমগ্র পরিকল্পনাকালের ১৭৯০২ কোটি টাকার ৭৫·৫% ১৯৬৯-৭০ সালে মোট ব্যয় ছিল ২১৮২ কোটি টাকা ( ১২·৭%), ১৯৭০-৭১ সালে ব্যয় হলো ২৬৩২ কোটি ( ১৬·৬% ), ১৯৭১-৭২ সালে ৩১৫৮ কোটি ( ১৯·৮% ) এবং ১৯৭২-৭৩ সালে ছিল ৩৯৭৩·৪ কোটি টাকা ( ২৫% )। অর্থাৎ চলতি বছরে, মার্চ মাস শেষ হওয়ার পূর্বেই বাকি ২৫% খরচ করতে হবে।

গত ৪ বছরের অগ্রগতি হিসেব করলে দেখা যায় যে, ১৯৬০-৬১ সালের দামস্তরের হিসেব করলে জাতীয় আয় বৃদ্ধির বাৎসরিক হার লক্ষ্য-নির্দিষ্ট হারের চেয়ে ( ৫·৫% ) অনেক কম হয়েছে। ১৯৬৯-৭০ সালে এই হার ছিল ৭·৩%, ১৯৭০-৭১ সালে ছিল ৪·৬%, ১৯৭১-৭২ সালে ছিল মাত্র ১·৫%, ১৯৭২-৭৩ সালেও ২%-এর বেশি ওঠেনি।

লক্ষ্য ছিল যে, কৃষিজাত উৎপাদন বৃদ্ধির হার হবে বছরে ৫%। ১৯৬৯-৭০ এবং ১৯৭০-৭১ সালে এই হার ছিল যথাক্রমে ৬·৭% এবং ৭·৩%, কিন্তু ১৯৭১-৭২ সালে হঠাৎ কমে হয় ১·৭%। ১৯৭২-৭৩ সালের হিসেব এখনও পাওয়া যায়নি, তবে ২%-এর বেশি হবে বলে মনে হয় না। এর মধ্যে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির হার লক্ষ্য-নির্দিষ্ট হারের চেয়ে ( ৫·৫% ) বেশি ছিল ১৯৬৯-৭০ এবং ১৯৭০-৭১ সালে, কিন্তু এই অগ্রগতির ধারা ১৯৭১-৭২ এবং ১৯৭০-৭১ সালে বজায় রাখা যায়নি। অন্তবর্তীকালীন রিপোর্ট কৃষিউৎপাদন বৃদ্ধির বিশ্লেষণ করেও কয়েকটি সাবধানতার দিক উল্লেখ করেছেন। প্রথমত, ১৯৬৮-৬৯ সালের ভিত্তিবৎসরে খাদ্যদ্রব্য, তামাক, তৈলবীজ এবং নানা জাতীয় আঁশের উৎপাদন হ্রাস পাওয়ায় পরের বছরগুলির হিসেব ওই ভিত্তি অনুযায়ী প্রকাশ করায় চিত্র ঠিক হবে না, যা বৃদ্ধির হার হবে তা থেকে একটু কম করেই ধরতে হবে। দ্বিতীয়ত,১৯৭০-৭১ সালের উচ্চ হার প্রধানত

অনুকূল মৌসুমী বায়ুপ্রবাহের দান। তৃতীয়ত, যদিবা আমরা গমের ক্ষেত্রে অনেকটা সাফল্য লাভ করেছি, তবুও উচ্চ ফলনশীল ধানের ক্ষেত্রে অগ্রগতি বিস্ময়কর পরিমাণে কম। পাট, তুলো এবং ডাল প্রভৃতির ক্ষেত্রে আমরা রুদ্ধ দ্বার এখনও খুলে উঠতে পারিনি।

অগ্রগতির চিত্র সর্বাপেক্ষা করুণ শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে। লক্ষ্য-নির্দিষ্ট বাৎসরিক ৮% হারে বৃদ্ধির নিরিখে বাস্তবিক অগ্রগতির হার খুবই নিচুতে। ১৯৭০-৭১ সালে শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির হার হয় ২.৫%, ১৯৭১-৭২ সালে হয় ৪.৫%, ১৯৭২-৭৩ সালেও তেমন অগ্রগতি হয়নি। এই অবস্থার জন্য কারণগুলিকে আমরা দুটি ধরনে বিভক্ত করতে পারি : (ক) যে কারণগুলির জন্য বর্তমান উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণতম ব্যবহার সম্ভব হয়নি এবং (খ) যে কারণগুলি উৎপাদনক্ষমতা গড়তে দেয়নি। উৎপাদন ক্ষমতার অপূর্ণ ব্যবহারের প্রধান কারণ হলো, (১) চাহিদার অভাব, (২) যন্ত্রাংশ ও কাঁচামালের দুষ্প্রাপ্যতা এবং অনিয়মিত যোগান, (৩) বিদ্যুতের যোগানের স্বল্পতা ও অস্থায়িত্ব, (৪) পরিবহনের অভাব, (৫) শিল্পসম্পর্কে অবনতি, এবং (৬) সরকারী শিল্প-পরিচালনার নানা সমস্যা। উৎপাদনক্ষমতা গড়ে না-ওঠার কারণগুলির মধ্যে প্রধান হলো (১) শিল্প-লাইসেন্স দানে নীতি, (২) ব্যয়বৃদ্ধির দরুণ আর্থিক অসুবিধা, (২) ইস্পাত, সিমেন্ট প্রভৃতি উপকরণের অভাব ও দামবৃদ্ধি, (৪) দেশী ও বিদেশী যন্ত্রপাতি পেতে অসুবিধা। অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্ট অবশ্য লাইসেন্স দানের নীতির উপর বেশি জোর দিয়েছে। রিপোর্টের ভাষায়···Unbalanced licensing as between established and new entrepreneurs, substantial and small entrepreneurs, expansion and new applicants, public and private agencies and developed and backward area locations have resulted in a high proportion infructuous licenses.” চতুর্থ পরিকল্পনার এই চার বছর শ্লথ অগ্রগতির জন্য মূল দায়িত্ব হলো তুলাবস্ত্রশিল্প, লোহা-

ইস্পাত ও অন্যান্য ধাতুশিল্প ধাতব দ্রব্যসামগ্রী, বিদ্যুতের সাহায্যে চলে না এমন যন্ত্রাদি, রেলপথ ও অন্যান্য পরিবহনশিল্প প্রভৃতির উপর।

পরিবহন ও সংযোগের ক্ষেত্রে লক্ষ্য-নির্দিষ্ট হার ছিল ৬'৪%, বাস্তবে ১৯৬৯-৭০ সালে এই হার ছিল ৫'৯% এবং ১৯৭১-৭১ সালে ছিল ৩'৮%।

চতুর্থ পরিকল্পনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রগতি পরিমাপ করার জন্য আর একটি পথ আমরা গ্রহণ করতে পারি। প্রতিটি ক্ষেত্রে লক্ষ্য-নির্দিষ্ট বা পরিকল্পিত উৎপাদনবৃদ্ধির তুলনায় বাস্তবে বৃদ্ধি কতটা—এইভাবে হিসাব করে আমরা পরিকল্পনার সাফল্যসূচক বা কার্যকরসূচক ( performance index ) তৈরি করতে পারি। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও তার অন্তবর্তীকালীন মূল্যায়ন, দুটি দলিল মিলিয়ে নিচে এ রকম একটি তালিকা করে দেওয়া হলো। উৎপাদনের পরিকল্পিত বা লক্ষ্য-নির্দিষ্ট বৃদ্ধি হিসাব করা হয়েছে ১৯৭৩-৭৪ সালের লক্ষ্য থেকে ১৯৬৮-৬৯ সালের ভিত্তি-বৎসরের উৎপাদন বিয়োগ করে। ঠিক সেইরকম বাস্তবে উৎপাদনবৃদ্ধি হিসাব করা হয়েছে অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্টের হিসাব থেকে ভিত্তি-বৎসরের উৎপাদন বিয়োগ করে। সাফল্যসূচক হিসাব করা হয়েছে প্রতিটি ক্ষেত্রেই, শতকরা হিসাবে পরিকল্পিত পরিমাণের সঙ্গে বাস্তব পরিমাণ তুলনা করে। নিচের তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, খাদ্যদ্রব্য, জলসেচ, তৈলবীজ, এলুমিনিয়াম ও পেট্রোলের সাফল্যসূচক শতকরা ৭৫-এর উপরে। কিন্তু এসব মৌলিক বিষয়েও শ্লথ অগ্রগতি লক্ষ্যণীয়। অপরপক্ষে ইস্পাতপিণ্ড, তৈরি ইস্পাত এবং কাঁচা লোহার ক্ষেত্রে ( যেগুলি পরিকল্পনার মূল ক্ষেত্র বা hard core ) সাফল্য-সূচক হলো যথাক্রমে ৪০'৬, ৪০'৫ এবং ৬০%। লৌহমাক্ষিক উৎপাদনের সাফল্য-সূচকও মাত্র ৪৭% এর কাছাকাছি। সারের উৎপাদন ও ব্যবহারের অগ্রগতিও দুঃখজনক। তামা, দস্তা ছাপার যন্ত্রপাতি, নিউজপ্রিন্ট

তুলো ও পাট প্রভৃতির ক্ষেত্রে লক্ষ্য-নির্দিষ্ট পরিমাণ অপেক্ষা উৎপাদন অনেক নিচে।

পরিকল্পনার মূল ক্ষেত্রের বাইরে (non-core sector) তুলাবস্ত্রশিল্পে কার্যত উৎপাদন স্থবির হয়েই রয়েছে। এর কারণ কাঁচা তুলোর অভাব এবং উত্তর ভারতের নানা অঞ্চলে বিদ্যুতের ঘাটতি। চিনি ও সিমেণ্ট তৈরির যন্ত্রপাতি, ইস্পাত কাস্টিং ও ফোর্জিং, বিদ্যুৎ চালিত পাম্প এবং ডিজেল ইঞ্জিন এবং রেল-পরিবহন—এই সব ক্ষেত্রে অবস্থা খুবই খারাপ।

**চতুর্থ পরিকল্পনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে উৎপাদনবৃদ্ধির অগ্রগতির সাফল্য-সূচক বা Performance Index.**

| বিষয় | ইউনিট | ভিত্তিস্তর | ১৯৭০-৭১ অনুমিত | ১৯৭৩-৭৪ সম্ভাব্য | পরিকল্পনার নির্ধারিত লক্ষ্য | সাফল্য সূচক |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| | | | | | | $৭ = \frac{৫ - ৩}{৬ - ৩} \times ১০০$ |
| **কৃষিক্ষেত্র** | | | | | | |
| খাদ্যদ্রব্য | মিলি. টন | ৯৮ | ১০৭.৮ | ১২২-১২৫ | ১২৯ | ৮০.৬ |
| তুলো | মিলি. বেল | ৬.০ | ৪.৬ | ৬.২-৬.৬ | ৮ | ২৫.০ |
| পাট | মিলি. বেল | ৬.২ | ৪.৯ | ৬.০-৬.২ | ৭.৪ | শূন্য |
| তৈলবীজ | মিলি. টন | ৮.৫ | ৯.২ | ৯.৮-১০.০ | ১০.৫ | ৮২.৩ |
| ইক্ষু | মিলি. টন | ১২.০ | ১৩.২ | ১৩.৫-১৪.০ | ১৫.০ | ৫৬.৬ |
| **সার ( ব্যবহার )** | | | | | | |
| নাইট্রোজেন | মিলি. টন | ১.১৪ | ১.৪৯ | ২.৬ | ৩.২ | ৭০.৩ |
| ফসফেট | মিলি. টন | ০.৩৯ | ০.৪৬ | ০.৮১ | ১.৪০ | ৪১.৫ |
| পটাস | মিলি. টন | ০.১৬ | ০.২৩ | ০.৫২ | ০.৯০ | ৪৮.৬ |
| জলসেচ | মিলি. হেক্টর | ১৬.৯ | ১৯.৭৫ | ২২.৫ | ২৩.৩ | ৮৭.৫ |
| **কোর শিল্পসমূহ** | | | | | | |
| ইস্পাতপিণ্ড | মিলি. টন | ৬.৫ | ৬.১১ | ৮.২৫ | ১০.৮০ | ৪০.৬ |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| তৈরি ইস্পাত | মিলি. | টন | ৪.৭ | ৪.৪৭ | ৬.২০ | ৮.১০ | ৪০.৫ |
| কাঁচা লোহা | মিলি. | টন | ১.৩ | ১.২৫ | ২.৮০ | ৩.৮০ | ৬০.০ |
| লৌহমাক্ষিক | মিলি. | টন | ২৮.১ | ২৮.০ | ৪২.০ | ৫১.৪ | ৪৬.৯ |
| এলুমিনিয়াম | ০০০ . | টন | ১২৫.৩ | ১৬৮.৭ | ২১০.০ | ২২০.০ | ৮৯.৪ |
| তামা | ০০০ . | টন | ৯.৪ | ৯.৩ | ১৪.০ | ৩১.০ | ১১.২ |
| দস্তা | ০০০ . | টন | ২৬.৩ | ২৩.৪ | ৩৮.০ | ৭০.০ | ২৬.৭ |
| ছাপার যন্ত্রাদি | মিলি. | টাকা | ১.০ | ৩.৬ | ২৫.০ | ৮.০ | ৩০.৩ |
| সার ( উৎপাদন ) | | | | | | | |
| নাইট্রোজেন | ০০০ . | টন | ৫৪১ | ৯৩০ | ১০৮০ | ২৫০০ | ৬৪.২ |
| ফসফেট | ০০০ . | টন | ২১০ | ২২৯ | ৪৫৮ | ৯০০ | ৩৫.৯ |
| নিউজ প্রিণ্ট | ০০০ . | টন | ৩১ | ৪০ | ৬৫ | ১৫০ | ২৮.৫ |
| পেট্রোল ( ক্রুড ) | মিলি. | টন | ৬.১ | ১৮.০ | ২১.৫ | ২৬.০ | ৭৭.৪ |
| নন-কোর শিল্পসমূহ | | | | | | | |
| তুলাবস্ত্র যন্ত্রাদি | মিলি. | টাকা | ১৩৮ | ৩১৫ | ৩০০ | ৪২০ | ৫৯.৯ |
| সিমেণ্ট যন্ত্রাদি | মিলি. | টাকা | ৮১.৮ | ৮৯.৩ | ১৫০ | ১৯০ | ৬৩.০ |
| চিনির যন্ত্রাদি | মিলি. | টাকা | ১১৮.০ | ১৫২.৮ | ১৯০ | ২১০ | ৭২.২ |
| ইস্পাত কাস্টিং | ০০০ . | টন | ৫০.৪ | ৫২.০ | ১৫৫ | ২২৫ | ৫৯.৯ |
| ইস্পাত ফোর্জিং | ০০০ . | টন | ৪৪.৫ | ৬৯.০ | ১০০.০ | ২২০.০ | ৩১.৭ |
| তুলাবস্ত্র ( মিল ) | মিলি. | মিটার | ৪২৯৭ | ৪২০০ | ৪৫০০ | ৫১০০ | ২৫.২ |
| রেলপথ | মিলি. | টন | ২০৪ | ২০৮ | ২৪০ | ২৬৫ | ৫৯.০ |

অগ্রগতির হার উচ্চ আরও হলো না কেন, সে বিষয়ে অর্থ-নীতিবিদদের ভেতর নানা মত রয়েছে। একটা মত আজকাল উপরে ভেসে বেড়াচ্ছে, তা হল Implementation Gap এই মতের প্রবক্তারা মনে করেন যে পরিকল্পনার দৃষ্টিভঙ্গি, ব্যালান্স-গঠন, অগ্রাধিকারতালিকা প্রভৃতির মধ্যে কোনো ত্রুটিবিচ্যুতি নেই, প্রধান অভাব হলো প্রজেক্টগুলি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত না-হওয়া। ফলে প্রতিটি প্রজেক্ট থেকে অনুমিত উপাদান বেরোচ্ছে না, কর্মসংস্থানে ঘাটতি থেকে যাচ্ছে, ব্যয়ভার বেড়ে চলেছে। অপর পক্ষের মত হলো যে, এই প্রজেক্টগুলি কার্যকরী হলেও ভারতের অর্থনৈতিক অগ্রগতি আকাংক্ষিত পথে ঘটত না। আকাংক্ষিত হারে অগ্রগতি হওয়া আর আকাংক্ষিত পথে অগ্রগতি হওয়া এক কথা নয়। তাই, এঁদের মতে, পরিকল্পনার দৃষ্টিভঙ্গি, ব্যালান্স-গঠন, অগ্রাধিকার-তালিকা ও কার্যকর করার যন্ত্র বা প্রশাসন সবকিছুই অনেকটা বদলে ফেলা দরকার। নইলে সঠিক অগ্রগতি সম্ভব নয়।

ইম্‌প্লিমেনটেশন গ্যাপ বা কার্যকর করার ফাঁক মতবাদের প্রধান সমর্থক গানার মিরডাল তাঁর 'এশিয়ান ড্রামা' বইতে প্রধানত এই অক্ষমতার জন্যই ভারতীয় রাষ্ট্রকে Soft বা কোমল-রাষ্ট্র বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। তাঁর ভাষায়: "Thus the combination of radicalism in principle and conservation in practice, the signs of which were already apparent in the Congress before independence, was quickly woven into the fabric of Indian politics. Social legislation pointed the direction in which society should travel, but left the pace indeterminate." আমাদের দেশের ফলিত অর্থনীতির গবেষণার জাতীয় কাউন্সিলও (এন্ সি এ ই আর) পরিকল্পনার শ্লথগতির জন্য প্রশাসনিক অক্ষমতাকেই দায়ী করেছেন। প্রশাসনিক অক্ষমতার অন্তর্নিহিত কারণ আলোচনা করলে সমস্যার গভীরতা

বোঝা যাবে। পরিকল্পনা-কমিশন পরিকল্পনা করে ছেড়ে দিলেন, পরিকল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন প্রজেক্ট রচনা করা ভার মন্ত্রিদফ্‌তর অর্থাৎ দফ্‌তরের আমলাদের হাতে। প্রজেক্ট-গুলি রচিত হওয়ার পর টেণ্ডার ডেকে কারখানা তৈরির ভার ছেড়ে দেওয়া হলো। কারখানা তৈরি হলে ও যন্ত্রপাতি এসে পড়লে ওই আমলাদের মধ্যে সম্প্রতি অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের নিয়ে পরিচালন বোর্ড গঠিত হলো। কণ্ট্রাক্টারদের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র গঠন বা আইনশৃংখলা রাখতে অভ্যস্ত আমলাদের দিয়ে শিল্প পরিচালনা কোনটিই সম্ভব নয়। মহলানবিশ কমিটির মতে দ্রুততম ধনী হয়েছে কনট্রাকটার শ্রেণী ওয়াঞ্চু-কমিটির মতে কালো টাকা অর্জনে এদের জুড়ি নেই। আর দাণ্ডেকারের মতে আমলা ও বেসরকারী ব্যবসায়ীদের গোপন সমঝোতা কোনো নীতিকে কার্যকরী করতে দেয়নি। উচ্চ মধ্যবিত্ত নিয়েই দেশের আমলা শ্রেণী বাহিনী দাণ্ডেকারের মতে দেশের রাজনৈতিক নেতাদের চরিত্র নষ্ট করেছে ব্যবসায়ীশ্রেণী। এই অবস্থায় পরিকল্পনাকে (অসফল করেও) নিজেদের স্বার্থে আমলারা ব্যবহার করার সাহস পেয়ে গেছে। আধাদুর্নীতিগ্রস্ত রাজনৈতিক নেতা, আমলা এবং বেসরকারী ব্যবসায়ের মালিকেরা মিলে যাওয়ায় পরিকল্পনার প্রতিটি কর্মসূচী বানচাল হয়ে যাচ্ছে।

দাণ্ডেকারের এই মত অনেকাংশে সত্য, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু বিকল্প পথ তিনি দেখাননি। প্রজেক্টগুলি কার্যকরী করার ভার কনট্রাকটার ও আমলাদের বাদ দিয়েই করতে হবে। সাধারণ শ্রমিকদের নির্বাচিত প্রতিনিধি, অমলা ছাড়া অন্যান্য জননেতা, এবং এন্‌জিনিয়ার-টেকনিশিয়ানদের গঠিত পরিচালনা-বোর্ডের হাতে প্রজেক্টগুলি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, অর্থাৎ বাড়িঘর তৈরি থেকে শুরু করে কলকব্জা আনার পরে নিয়মিত উৎপাদন ও বিক্রয় পর্যন্ত দিতে হবে। ভুল করতে করতেই শ্রমিক ও টেকনিশিয়ানরা

কাজকর্ম শিখে যাবেন। এই পথে ঝুঁকি থাকতে পারে, কিন্তু পরিকল্পনার কর্মযজ্ঞে সর্বসাধারণকে টেনে আনা এবং প্রত্যক্ষভাবে কর্মীদের হাতে ভার ও ঝুঁকি ছেড়ে দেওয়ার এই হলো একমাত্র পথ।

প্রজেক্টগুলির রূপায়ণ কার্যে আর একটি দায়িত্ব হলো সুপার-ভিশান ও চেকিং আপ। নিয়মিত লক্ষ্য রাখা এবং অগ্রগতির হার তীক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করার দায়িত্ব পরিকল্পনা কমিশনের অর্থনীতিবিদ, আইনসভার দু একজন সদস্য সরকারী-নির্দিষ্ট টেকনিশিয়ান এবং সেই দফ্‌তরের দু একজন প্রশাসনিক আমলা—এদের নিয়ে গঠিত কমিটির হাতে রাখতে হবে। অগ্রগতির হার প্রতিটি স্তরে পরিকল্পনা-কমিশন, মন্ত্রিদফ্‌তর, আইনসভা প্রত্যেকের কাছে পৌঁছোতে থাকবে। এই চেকিংটুকু না-থাকলে প্রজেক্টগুলি ঠিক সময়ে কার্যকর হচ্ছে কি হচ্ছে না সেটা দেশের বৃহত্তর অংশ জানতেই পারবে না।

অধ্যাপক কে এন রাজ পরিকল্পনাগুলিকে ভালভাবে কার্যকর করার উদ্দেশ্যে কয়েকটি সরকারী নীতির পরিবর্তন দাবি করেছেন। তাঁর মতে, দেশের কাঠামোগত পরিবর্তন না আনলে পরিকল্পনার কোনো অংশ কখনই কার্যকর করা সম্ভব হবে না। দেশে বড় বড় কৃষিজোতে ভাড়াকরা মজুরের সাহায্যে উৎপাদন, ভাগচাষ প্রথা বজায় থাকলে কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধির বা বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্ত রাষ্ট্রের হাতে আনার পরিকল্পনা কার্যকর করা চলে না। তাই সম্পত্তির এই কাঠামো বদলাতে হবে। জলসিঞ্চিত ৫ একর জমি চাষী-পরিবার পিছু দিয়ে দিলে আয়-ভোগের ধরনে বদল আসবে, বিলাসসামগ্রীর চাহিদা ও দাম হ্রাস পাবে। জাপানের মতো এই ছোট ছোট জমিখণ্ডে, রাষ্ট্রের সর্বাঙ্গীণ সহায়তায় শ্রমপ্রগাঢ়-পদ্ধতিতে উৎপাদন—এই কাঠামো গড়ে না-তুললে কৃষিক্ষেত্রে অগ্রগতি সম্ভব হবে না। দ্বিতীয়ত, শহরে অধিক সম্পত্তিবান অংশের হাতেই অধিক আয় ও অধিক আয় করার ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হতে থাকলে পরিকল্পনা বিফল হবে। এদের হাত থেকে সম্পত্তি সরিয়ে না-আনলে ক্রয়ক্ষমতাও

সরানো যাবে না। আর যদি সম্পত্তি সরিয়ে এনে ক্রয়ক্ষমতা সরিয়ে না-আনা যায়, তবে বিনিয়োগের জন্য উপকরণ পাওয়া সরকারের পক্ষে সম্ভব হবে না। এরা যদি উচ্চমূল্যে সিমেণ্ট, লোহা প্রভৃতি কিনতে পারে, তবে কারখানা তৈরির উপযোগী উপকরণ উপযুক্ত মূল্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে মিলবে কি করে?

পরিকল্পনার অগ্রগতির জন্য কেবল যে ইম্প্লিমেণ্টেশন গ্যাপই দায়ী একথা অপর পক্ষ মনে করেন না। তাঁদের মতে পরিকল্পনায় দৃষ্টিভঙ্গি, ব্যালান্স-গঠন ও অগ্রাধিকার তালিকা তিনটিতেই বদল আনা দরকার।

দৃষ্টিভঙ্গির বদল বললে প্রথমেই বলতে হয় মিশ্র অর্থনীতির ধারণা ছেড়ে দিয়ে পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক কাঠামো আনার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা। পরিকল্পনার অগ্রগতি বিচার করলে আমরা দেখি যে, বেসরকারী ক্ষেত্রের প্রসার প্রতিটি পরিকল্পনায় অনেক দ্রুততর হয়েছে, পরিকল্পিত হার বা আয়তন অপেক্ষা অনেক বেশি, সরকারী ক্ষেত্র তার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পরাজিত। প্রথম পরিকল্পনায় অনুমিত ১৬০০ কোটি টাকার জায়গায় বেসরকারী বিনিয়োগ হয়েছে ১৮০০ কোটি টাকা। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় অনুমিত ২৪০০ কোটি টাকার জায়গায় হয়েছে ৩১০০ কোটি টাকা। তৃতীয় পরিকল্পনায় অনুমিত ছিল ৪১০০ কোটি টাকা, বাস্তবে হয়েছে ৪৩০০ কোটি টাকা এবং চতুর্থ পরিকল্পনায় ৮৯৮০ কোটি টাকার স্থলে মনে হয় ১০০০০ কোটি টাকা পেরিয়ে যাবে। পরিকল্পনার কুরি বছরে ব্যক্তিক্ষেত্রে বিনিয়োগ চারগুণের বেশি বৃদ্ধি পেলে এবং প্রতিটি পরিকল্পনায় পূর্বের থেকে দ্বিগুণ হতে থাকলে নিশ্চয় আমরা সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলছি বলা চলে না। সরকারী ক্ষেত্রেরও আয়তন বাড়ছে বললে সমস্যা মেটে না, কারণ সরকারী ক্ষেত্রে যদি এমন ক্ষেত্র সমূহে প্রসারিত হয় যে তার ফলে ব্যক্তিক্ষেত্রে প্রসার ঘটানো সুবিধাজনক হয়ে ওঠে, তবে সে-ধরনের প্রসার সমাজতান্ত্রিক কাঠামো গড়ে তুলতে সাহায্য করে না। অধ্যাপক

কে. এন, রাজের ভাষায়: "A large part of recent public sector has been in industries and public utilities requiring more resources than the public sector could command, but which were, at the same time, very essential to the further development of the private sector. The size of public investment is, therefore no index of the progress made towards socialisation in the sense of replacement of private by public ownership. In other words, it is incorrect to equate nationalisation with Socialisation." যে সম্পত্তি বা মালিকানার ভিত্তিতে ব্যক্তিক্ষেত্রের প্রসার ঘটছে, সেই সম্পত্তি ব্যক্তির হাত থেকে সরিয়ে এনে সরকারের হাতে ন্যস্ত করতে হবে—এই রাজনৈতিক ইচ্ছাশক্তিই সমাজতন্ত্র আনতে পারে। নইলে প্রতিটি পরিকল্পনাই আমাদের সমাজতন্ত্র থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাবে।

সম্প্রতি সরকারী প্রতিনিধি ও ব্যক্তিক্ষেত্রের মালিকদের নিয়ে যে যৌথক্ষেত্র রচিত হতে চলেছে, তাতে পরিকল্পনার অগ্রগতি আরও শ্লথ হয়ে যাবে সন্দেহ নেই। ব্যক্তিক্ষেত্রের প্রেরণা ও লক্ষ্য সরকারের প্রেরণা ও লক্ষ্যের থেকে এত পৃথক যে বিপরীতমুখী দুটি অশ্বের একত্র সংযোজনে রথের চাকা অচল হয়ে পড়বে। ব্যক্তিক্ষেত্র মুনাফার হার বাড়াতে চাইবে, দামবৃদ্ধি, উৎপাদন সীমিত-রাখার মাধ্যমে। সরকার কর্মসংস্থান বাড়াতে চাইবে, দাম কমিয়ে ভোগ বাড়িয়ে উৎপাদন বাড়ানো তার প্রধান লক্ষ্য। বিপরীত লক্ষ্য-বিশিষ্ট এই দুই ক্ষেত্রের সংযোজন সমাজতন্ত্র গঠনে সহায়ক হতে পারে না।

গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির বদলও একান্ত প্রয়োজন। গণতান্ত্রিক পথে সমাজতন্ত্রে পৌঁছানো মানে হচ্ছে সংবিধান সম্মত পথে, বিধানসভার আইনের শাসন বজায় রেখে, সম্পত্তির মালিকানা

ব্যক্তিক্ষেত্র থেকে সরকারের হাতে নিয়ে আসাএবং তার পরবর্তী স্তরেও শিল্পপরিচালনায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা, অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণী ও টেকনি-শিয়ানদের মিলিত পরিচালনা। কিন্তু মুখে সমাজতন্ত্রের কথা বলে গণতন্ত্র রক্ষার নামে ধনতন্ত্র গড়ে তোলাকে কেউই গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র বলবেন না। ১৯৬৪ সালের জানুয়ারিতে ভুবনেশ্বরে কংগ্রেসের যে অধিবেশনে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র জাতীয় কংগ্রেসের লক্ষ্য বলে ঘোষিত হয় সেখানেই পণ্ডিত নেহেরু বলেছিলেন: "A socialistic pattern is socialism. Some people seem to make fine distinctions among socialistic-pattern, socialist pattern and socialism. They are all exactly the same thing without the slightest difference."

দৃষ্টিভঙ্গি অনেকটা না-বদলালে সরকারী বণ্টনব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হবে না। এতদিন ধারনা ছিল যে যোগান-চাহিদার অবাধ খেলায় দাম-নির্ধারণ চলতে থাকা পরিকল্পনা বা সমাজতন্ত্র কারো পক্ষেই ক্ষতিকর নয়। গত কয়েক বছরের অভিজ্ঞতায় আরও দেখা গেছে যে যোগান বাড়লেই দাম কমে না। বণ্টন-কাঠামোয় কালো টাকার ব্যবহারে মজুতদারি ফাটকাবাজি দামবৃদ্ধির প্রধান কারণ। এই অবস্থায় বেসরকারী শিল্পক্ষেত্রের উৎপন্নের উপর লেভি করে সমাজের দুর্বলতর অংশের কাছে নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য পৌঁছে দেওয়ার জন্য সরকারী বণ্টন-কাঠামো গড়ে তোলা দরকার। কালো টাকাকে অকেজো করে ফেলতে হলে, অন্তত দেশের দাম-মজুরির কাঠামোকে কালো টাকার হাত থেকে রক্ষা করতে হলে, এ ধরনের বণ্টন-ব্যবস্থা আজই দরকার। এ বিষয়ে এত দেরি হওয়ার কুফলে সমগ্র পরিকল্পনাই বিফল হতে চলেছে।

পরিকল্পনার ব্যালান্স সম্পর্কে নিশ্চয় একথা বলা চলে যে, (ক) প্রতিটি প্রজেক্টের ফলপ্রসূকাল কমানো হবে; (খ) টাকার হিসাবে পরিকল্পনা না করে উপকরণের ব্যবহার ও উৎপন্ন দ্রব্যের ভিত্তিতে

পরিকল্পনা রচনা করা; (গ) বিভিন্ন ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন ও বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বণ্টনে সঠিক ব্যালান্স আনা—এই সকল বিষয়ে মনোযোগের অভাব পরিকল্পনার অগ্রগতি ব্যাহত করেছে। আয়সৃষ্টি বা ব্যয়-স্রোতের সঙ্গে দ্রব্যউৎপাদন বৃদ্ধির স্রোত তুলনা করেই পরিকল্পনার কাজ শেষ হতে পারে না। খোলাবাজারের হাতে ছেড়ে দিলে চাহিদা-যোগান, দাম-মজুরি, সুদ-খাজনা-মজুরি কোনো ব্যালান্সই রক্ষা করা সম্ভব নয়। উপকরণের ব্যালান্স ও উৎপন্নের ব্যালান্স সব কিছু আসল অংকে গঠন করা এবং বণ্টনের দায়িত্ব সরকারের হাতে নেওয়া—আজ আর এর কোনো বিকল্প নেই।

পরিকল্পনার অগ্রাধিকার তালিকা সম্পর্কে নিশ্চয় বলা প্রয়োজন যে, যে-কাজে কর্মসংস্থান বাড়বে সেই ধরনের প্রজেক্টকে অগ্রাধিকার দিতে হবে – কমিশন এই ধরনের চিন্তা করলে ভারতের মত জনবহুল দেশের সমস্যা মেটে। পরিকল্পনার অগ্রগতির পরিমাণ এখন আমরা কর্মসংস্থান প্রসারের অংকে বুঝতে চাই, মোট উৎপাদনের অংকে নয়, কারণ কর্মসংস্থান কমিয়েও মোট উৎপাদন বাড়ান যায়।

আলোচনার শেষে আরও তিনটি বিষয় নিয়ে উল্লেখ করছি, মনে হয় এই তিনটি বিষয় নিয়ে আলোচনা আজই শুরু হওয়া প্রয়োজন। প্রথমত, পরিকল্পনা কমিশনের কাজকর্মের পরিধি দুটি দিক দিয়ে বাড়ানো দরকার। ফিনান্স কমিশন পাঁচ বছর অন্তর টাকার বণ্টন-ব্যবস্থা করবেন আর পরিকল্পনা কমিশন পরিকল্পনা করবেন – এই পার্থক্য দূর করা দরকার। দুটি কাজের সমন্বয় ঘটানোর জন্য পরিকল্পনা কমিশনই পাঁচ বছর অন্তর অন্তর সাময়িক ভাবে ফিনান্স-কমিশনে পরিণত হবেন এই রকম ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। পরিকল্পনা রচনা ও টাকার কথা চিন্তা করা একই চিন্তার অন্তর্ভুক্ত হওয়া দরকার। তাছাড়া এই চিন্তার একটা অবিচ্ছিন্নতা থাকাও প্রয়োজন। পরিকল্পনা কমিশনের দ্বিতীয় কাজ হওয়া উচিৎ প্রজেক্টগুলির রূপায়নের অগ্রগতি লক্ষ্য করা এবং এ বিষয়ে উৎপাদনবৃদ্ধি, দ্রব্য ও উপকরণের

বণ্টন প্রভৃতির ক্ষেত্রে প্রতিটি প্রজেক্টের সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে যুক্ত থাকা।

দ্বিতীয়ত, আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করার যে নীতি গৃহীত হয়েছে সেই নীতির পুনরালোচনা করা খুবই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এক একটি অঞ্চলের প্রকৃতিদত্ত উপকরণের সর্বাঙ্গীণ ব্যবহার যদি পরিকল্পনার লক্ষ্য হয়, তবে প্রতিটি অঞ্চল তার নিজস্ব উপকরণের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী শিল্পপ্রতিষ্ঠার সুযোগ পায়। দেশের এক অঞ্চলকে উন্নত করার জন্য অন্য অঞ্চলের উপকরণগুলিকে অতিরিক্ত ব্যয় করে টেনে আনার নীতি পালটে ফেলা দরকার। সর্বনিম্ন ব্যয়ে সর্বাধিক উৎপাদন—এই নীতিকে সামনে না রাখলে কখনই অর্থনৈতিক অগ্রগতি দ্রুততর সম্ভব হবে না। সেই উন্নতির ব্যয়ভারে বৃদ্ধিও অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বাধা দিতে থাকবে। এই প্রসঙ্গে মনে হয়, ভাষাভিত্তিক রাজ্যগুলির সীমানা বা প্রশাসনিক সীমানারেখার বাইরে তাকিয়ে পরিকল্পনা-কমিশনের কর্তব্য হলো বিভিন্ন অর্থনৈতিক অঞ্চল হিসাবে ভারতের মানচিত্র কল্পনা করা। জাতীয় সংহতির দিকে তাকিয়ে আমরা পরিকল্পনা-কমিশনের দৃষ্টিভঙ্গির এই পরিবর্তন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি। ভৌগোলিক বা উপকরণগত বিন্যাস অনুযায়ী অর্থনৈতিক রাজ্য বা প্রদেশ গটন করা, অন্তত পরিকল্পনা-কমিশনের সামনে এই চিন্তা থাকা আজ খুব প্রয়োজন।

তৃতীয়ত, পরিকল্পনার অগ্রগতি আরও দ্রুততর করতে গেলে—কথাটা শুনলে আশ্চর্য হবেন না—আমাদের শিক্ষাকাঠামো সম্পূর্ণ ভেঙ্গে নতুনভাবে তৈরি করা দরকার। উৎপাদনমুখী শিক্ষাব্যবস্থা রচনা না-করার কুফল আমরা বিগত ২৬ বছর ধরে ভোগ করছি। আমরা শিল্প প্রভৃতি অর্থনৈতিক কাজকর্মের সঙ্গে শিক্ষাকাঠামোকে যুক্ত করিনি, অপ্রয়োজনীয় সংখ্যক গ্র্যাজুয়েট তৈরি করে অর্ধশিক্ষিত এক কোরবাহিনী সৃষ্টি করেছি। এই অনুৎপাদকশ্রেণীর কর্মসংস্থানের জন্য এখন আবার পরিকল্পনাতে টাকা বরাদ্দের কথা শোনা যাচ্ছে। শিক্ষা কমিশন ও পরি-

কল্পনা কমিশন দুটি পৃথক প্রতিষ্ঠানরূপে নিজ নিজ চিন্তার ক্ষেত্রে আবদ্ধ রয়ে গেছেন। এই পার্থক্য ভেঙ্গে ফেলা দরকার। শিক্ষাব্যবস্থা রূপায়ণের জন্য পরিকল্পনা দরকার এই চিন্তা ছেড়ে দিয়ে আমাদের ভাবতে হইবে কেমন করে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার রূপায়ণের উপযোগী শিক্ষার পুনর্বিন্যাস করা যায়। ভারতের মত জনবহুল দেশে ব্রিটেন বা সোভিয়েতের মত শিক্ষাকাঠামোর প্রয়োজন, অদূর ভবিষ্যতে আমরা নাও কল্পনা করতে পারি। প্রতিটি অঞ্চলে জুনিয়ার কৃষিবিদ্যালয়, প্রতিটি ব্লকে সিনিয়ার কৃষিবিদ্যালয়, প্রতি জেলাতে কৃষিকলেজ, তিন চারটি জেলাপিছু এক একটি কৃষিবিশ্ববিদ্যালয়, পর্যাপ্তসংখ্যক ইনজিনিয়ারিং কলেজ এবং প্রতিটি জেলায় জুনিয়ার মেডিকেল স্কুল, পর্যাপ্ত সংখ্যক মেডিকেল কলেজ এবং মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়—এইভাবে শিক্ষা-কাঠামোর পুনর্বিন্যাস আশু প্রয়োজন। বর্তমানে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলির প্রসার স্থগিত রেখে সেই মূলধন ও শিক্ষকসমাজকে নতুনভাবে পুনর্বিনাশ করে উপরের কাঠামোতে গ্রথিত করা প্রয়োজন। প্রতি পরিকল্পনায় বরাদ্দ টাকা বাড়িয়ে বাড়িয়ে আমরা অবাঞ্ছিত, অনুৎপাদক এবং অস্বাভাবিক যে কাঠামোকে ক্রমাগত বাড়িয়ে চলেছি, পঞ্চম পরিকল্পনার প্রাক্‌কালে সে বিষয়ে যথাযথ চিন্তা করা প্রয়োজন।

আশাকরি আমাদের দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও চিন্তাশীল ব্যক্তিরা এই অসম্পূর্ণ আলোচনার মধ্য থেকেও নতুন কোনো কোনো বিষয়ে চিন্তা করবার খোরাক পাবেন এবং ভারতের অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার বাধাগুলি দূর করতে অগ্রসর হবেন। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের দায়িত্ব প্রধান, কারণ পরিচ্ছন্ন ও দৃঢ় রাজনৈতিক ইচ্ছা শক্তি ছাড়া এই বাধাগুলি দূর করা কোনমতেই সম্ভব নয়।

# ত্রিপুরায় পরিকল্পিত অর্থনীতি ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি

অরুণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

১

প্রাক্-পরিকল্পনা যুগে ত্রিপুরার অর্থনীতি ছিল গতিহীন, আধা-সামন্ততান্ত্রিক এবং মাত্র অস্তিত্ব বজায়ের ভিত্তিতে সংগঠিত। কিন্তু তখন ত্রিপুরা ছিল তীব্র অর্থনৈতিক সমস্যার চাপ থেকে মুক্ত। প্রাক্-পরিকল্পনা যুগে ত্রিপুরায় ভূমির উপর জনসংখ্যার চাপ অনুভূত হয় নাই। আর বেকার সমস্যাও সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে কোন বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে নাই। সেই সময়ে ত্রিপুরা খাদ্যে স্বয়ং নির্ভর ছিল এবং ত্রিপুরায় শিল্পের নিদারুণ অভাব তখন কোন সমস্যার ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায় নাই। যদিও প্রাক্-পরিকল্পনা যুগে ত্রিপুরার অর্থ-ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত অনগ্রসর, তথাপি সেই যুগে ত্রিপুরার জন-সাধারণ কোন তীব্র অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হয় নাই।

২

ভারতে পরিকল্পিত অর্থব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে ভারতের অন্যান্য রাজ্যের ন্যায় ত্রিপুরায়ও বিভিন্ন দিক থেকে অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটিয়াছে। কিন্তু, অর্থনৈতিক অগ্রগতির সাথে সাথে তীব্র অর্থনৈতিক সঙ্কটও দেখা দিয়াছে। পূর্ব পাকিস্তান হইতে শরণার্থীদের আগমনের দরুণ অতি দ্রুতহারে জনসংখ্যার বৃদ্ধি এবং উন্নততর জীবনযাত্রার মানের প্রতি জনসাধারণের ক্রমবর্দ্ধমান আকাঙ্খা ত্রিপুরায় অর্থনৈতিক সম্পদের নিদারুণ স্বল্পতাকে প্রকট করিয়া তুলিয়াছে। এই কথা সত্য যে,

অর্থনৈতিক পরিকল্পনার রূপায়ণের ফলে ত্রিপুরায় আয় ও নিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু আয় ও নিয়োগের বৃদ্ধির হার জনসংখ্যা-বৃদ্ধির হারের ও জনসাধারণের অর্থনৈতিক আকাঙ্খার বৃদ্ধির হারের সঙ্গে সমতা রক্ষা করিতে পারে নাই। অর্থনৈতিক সম্পদের প্রচণ্ড স্বল্পতার জন্য আয় ও নিয়োগ বৃদ্ধির হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করিবার সম্ভাবনা খুবই কম, ফলে জনসাধারণের অর্থনৈতিক চাহিদার বৃদ্ধির তুলনায় নিয়োগ ও আয়ের বৃদ্ধি অনেক পিছনে পড়িয়া রহিয়াছে। কাজেই ইহা মোটেই বিস্ময়ের ব্যাপার নয় যে, ত্রিপুরায় পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে জনসাধারণের অর্থনৈতিক অসন্তোষও বৃদ্ধি পাইয়াছে। আরও দুইটি ব্যাপার উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে। প্রথমতঃ, অর্থনৈতিক পরিকল্পনার রূপায়ণের দ্বারা ত্রিপুরায় যে অতিরিক্ত আয়ের সৃষ্টি করা হয়, তাহার একটা বড় অংশ ত্রিপুরায় বাহিরে জিনিসপত্র ক্রয় করিবার জন্য ব্যয় করা হয়। ইহার ফলে ত্রিপুরায় আয় ও নিয়োগের উপর বিনিয়োগের গুণিতক প্রক্রিয়ার প্রভাব অপেক্ষাকৃত কম, দ্বিতীয়তঃ, দ্রব্য ও সেবাকার্যের যোগানের বৃদ্ধির তুলনায় আর্থিক আয়ের বৃদ্ধির হার অনেক বেশী। ফলে দ্রব্য ও সেবাকার্যের যোগানের অপেক্ষা চাহিদা অনেক বেশী। যোগানের তুলনায় চাহিদা বেশী হওয়ার দরুণ ক্রমাগত দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে, কাজেই ইহা মোটেই অস্বাভাবিক নয় যে, ত্রিপুরায় আজ অর্থনৈতিক ও সামাজিক অস্বস্তির লক্ষণ অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

৩

ত্রিপুরা মুখ্যতঃ কৃষির উপর নির্ভরশীল, প্রাক্-পরিকল্পনা যুগে ত্রিপুরায় খাদ্যশস্যের কোন অভাব ছিল না। ইহার কারণ ছিল চাহিদার স্বল্পতা। তখন কৃষিকার্যের পদ্ধতি ছিল বিশেষ পুরাতন; প্রতি একরে উৎপাদনের পরিমাণ ছিল খুবই কম; কর্ষিত ভূমির পরিমাণও ছিল কম। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার রূপায়ণের ফলে

কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদনের পরিমাণ গত দুই দশকে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় উৎপাদন বৃদ্ধির হার যথেষ্ট নয়। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার শুরু হইতেই ত্রিপুরায় কৃষির সম্প্রসারণ ও প্রগাঢ় কৃষির উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষির সম্প্রসারণের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। পতিত জমির উদ্ধার এবং ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের দ্বারা কৃষির সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। তাহা ছাড়া উদ্যানপালনের উপরও বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ত্রিপুরায় প্রগাঢ় কৃষির মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি করা হয়। উন্নত ধরনের উৎপাদন-পদ্ধতির প্রবর্তন এবং উন্নত ধরণের বীজ ও সারের ব্যবহারের দ্বারা প্রগাঢ় কৃষির ব্যবস্থা করা হয়। এই সব ব্যবস্থার ফলে ধান, ডাল, ইক্ষু ও আলুর উৎপাদনে প্রশংসনীয় উন্নতি লক্ষ্য করা গিয়াছিল। তৃতীয় পরিকল্পনায় কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির উপর আরও বেশী জোর দেওয়া হয়। খাদ্যশস্যের পরিমাণ তৃতীয় পরিকল্পনাকালে ২৩১৫৫ টন বৃদ্ধি পায়। চতুর্থ পরিকল্পনাকালেও ত্রিপুরাতে কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত রহিয়াছে। বিশেষ করিয়া খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি উল্লেখ করিবার মত।

কৃষির অগ্রগতি হইলেও জনসংখ্যার অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি ও চাহিদার ক্রমবৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনের তুলনায় এই অগ্রগতি যথেষ্ট নয়। বরং আরও বর্দ্ধিত হারে কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রয়োজন। পরিকল্পিত অর্থ ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে ত্রিপুরায় কৃষির অগ্রগতি হইয়াছে সন্দেহ নাই; কিন্তু, এখনও কৃষিক্ষেত্রে অনেক ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। প্রথমতঃ, এখনও কিছু কিছু জমিতে কৃষির সম্প্রসারণ হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ, সেচব্যবস্থা আরও ব্যাপক করা প্রয়োজন। তৃতীয়তঃ, ত্রিপুরার কিছু সংখ্যক কৃষক এখনও উন্নত ধরনের সার ও বীজ পায় না। গ্রামে সমবায় সমিতিগুলির মাধ্যমে উন্নত ধরণের সার ও বীজের বণ্টন বৃদ্ধি করা উচিত। কিন্তু সমবায় সমিতিগুলি

প্রায়ই কৃষকদের সমস্যা সম্বন্ধে উদাসীন থাকে। এই সমিতিগুলিকে সজীব করিয়া তোলা দরকার। চতুর্থতঃ, অনেক কৃষক উন্নত ধরনের উৎপাদন পদ্ধতি অথবা উন্নত ধরনের সার ও বীজের ব্যবহার জানেন না। কৃষি সম্পর্কে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থার উন্নতি করিয়া কৃষকদের কৃষিসম্পর্কিত জ্ঞানের উন্নয়ন করা উচিত। পঞ্চমতঃ, জুমচাষীদের অবস্থার উন্নতি একান্তই আবশ্যক। যাহাতে জুমচাষীরা লাঙ্গলের সাহায্যে চাষ করিতে ইচ্ছুক ও সক্ষম হয় তাহার জন্য ঐ সমস্ত চাষীদের আর্থিক সাহায্য দেওয়া দরকার। ষষ্ঠতঃ, কৃষির উন্নতির জন্য কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ প্রয়োজন। কৃষির বাণিজ্যিকীকরণের জন্য আবার প্রয়োজন সুষ্ঠ ঋণদান ব্যবস্থা, সড়কপথের উন্নয়ন, উন্নত ধরণের সড়ক-পরিবহণ ব্যবস্থা, শক্তির সুষম যোগান ও কৃষিজ পণ্যের বিপনণের সুন্দর ব্যবস্থা। এই সহায়ক উপকরণগুলির যোগান যত বেশী হইবে কৃষির অগ্রগতিও ততই বেশী হইবে।

৪

দ্রুত শিল্পোন্নয়নই অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রধান সর্ত। ত্রিপুরায় শিল্পের উন্নতি না হইলে অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির প্রকৃত সমাধান সম্ভব হইবে না। প্রাক্-পরিকল্পনা যুগে ত্রিপুরায় শিল্প বলিতে কিছু ছিল না বলিলেই চলে। অবশ্য তখন শিল্পের অভাব খুব একটা সমস্যার সৃষ্টি করে নাই। কিন্তু জনসংখ্যাবৃদ্ধি ও জনসাধারণের চাহিদার ক্রমবৃদ্ধির দরুণ ক্রমাগত আয় ও নিয়োগ বৃদ্ধি অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। এই অবস্থায় দ্রুত শিল্পের প্রসার না ঘটিলে প্রয়োজনীয় হারে আয় ও নিয়োগের বৃদ্ধি সম্ভবপর নয়। ইহাই ত্রিপুরার সবচেয়ে বড় সমস্যা।

এই কথা সত্য যে, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ পরিকল্পনায় ত্রিপুরায় শিল্পের ভিত্তি গড়িবার জন্য চেষ্টা করা হইয়াছে। এই প্রচেষ্টা এতই সীমিত ছিল যে ত্রিপুরার অর্থনীতির উপর কোন উল্লেখ করিবার মত

প্রভাব প্রতিফলিত হয় নাই। প্রথম পরিকল্পনাকালে কিছু শিল্প-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছিল। এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। তাহা ছাড়া কিছুসংখ্যক ক্ষুদ্র শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়। স্পষ্টতই এই ধরনের প্রচেষ্টার দ্বারা ত্রিপুরার অর্থনীতিতে সাড়া জাগাইবার প্রত্যাশা করা হয় নাই এবং সাড়া জাগান যায়ও নাই। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পরিকল্পনায় ও শিল্প প্রশিক্ষণের উন্নতি এবং ক্ষদ্র ও কুটির শিল্পের প্রসারের উপরই জোর দেওয়া হয়। অবশ্য প্রথম পরিকল্পনার তুলনায় দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পরিকল্পনায় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নতির প্রতি অধিকতর দৃষ্টি দেওয়া হয়। বিশেষ করিয়া তাঁতশিল্প, খাদি ও গ্রাম্য শিল্প, রেশম শিল্প ও সুকুমার কলাশিল্পের উন্নতির জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। তৃতীয় পরিল্পকনাকালে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে আর্থিক সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয় এবং শিল্পপ্রশিক্ষণের সুযোগ ব্যাপকতর করা হয়। চতুর্থ পরিকল্পনাকালে ও ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্পের প্রসারের প্রতিই দৃষ্টি সীমাবদ্ধ আছে। শিল্পক্ষেত্রে এই ধরনের উন্নয়ন প্রচেষ্টার ফলাফল দ্রুতহারে আয় ও নিয়োগবৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তার তুলনায় একেবারেই নগণ্য।

পঞ্চম পরিকল্পনাকালে ত্রিপুরা সরকার বৃহৎ ও মাঝারি ধরনের শিল্প সংস্থাপনের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। একটি কাগজের কারখানা, একটি পাটকল, একটি চিনির কল, একটি প্লাইউড কারখানা এবং একটি স্পিনিং মিল আসন্ন পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কালে স্থাপন করিবেন বলিয়া সরকার মোটামুটি ভাবে স্থির করিয়াছেন। অবশ্য তাহার কতটা শেষ পর্যন্ত সম্ভবপর হইবে তাহা বস্তুতঃ নির্ভর করিতেছে দেশের সার্বিক পরিকল্পনাব্যয়ের কত অংশ ত্রিপুরার জন্য মঞ্জুর করা হইবে তাহার উপর।

ভীষণ বেকার-সমস্যা, জিনিসপত্রের অগ্নিমূল্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর অপ্রতুলতার জন্য ত্রিপুরায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক

অস্থিরতা প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। এমতাবস্থায় বৃহদায়তন শিল্পোন্নতির পরিকল্পনা জনমনে সাড়া জাগাইলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অস্থিরতা নিশ্চয়ই কতকাংশে হ্রাস পাইবে। তাহা ছাড়া, স্বল্প প্রবৃদ্ধিহারের জাল হইতে বাহির হইয়া আসিবার জন্য ত্রিপুরার অর্থনীতিতে একটি বড় রকমের উদ্দীপনা বা ধাক্কা দরকার। যদি ত্রিপুরা পিছনে পড়িয়া থাকিতে না চায়, তবে অবশ্যই তাহার প্রতিশ্রুতিময় প্রস্তাবগুলিকে বাস্তবায়িত করা উচিত। এই কথাও মনে রাখা দরকার যে ত্রিপুরা এখন প্রচণ্ড বেকার সমস্যা ও স্বল্প আয়জনিত সমস্যার সন্মুখীন। বেকারের সংখ্যা প্রায় চল্লিশ হাজার। গ্রামীণ অর্থনীতিতে অর্দ্ধবেকার এবং ছদ্মবেশী বেকারের সংখ্যা ইহাতে ধরা হয় নাই। সারা ভারতবর্ষে বর্তমান দামের ভিত্তিতে মাথাপিছু আয় যেখানে প্রায় ৫৮৯ টাকা, সেখানে ত্রিপুরায় মাথাপিছু আয় প্রায় ৪৯৪ টাকা। সুতরাং ত্রিপুরায় মাথাপিছু আয় সর্বভারতীয় মাথাপিছু আয়ের অনেক নীচে। অতি অবশ্যই ত্রিপুরায় কর্মসংস্থানের ও আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইবে। আয়স্তর কর্মসংস্থানের উপরই নির্ভর করে। অতএব কর্মসংস্থানের পরিধি বৃদ্ধি করিয়া বেকার সমস্যার সমাধান এবং আয়বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা নির্ভর করিতেছে সংগঠিত শিল্পায়নের জন্য পরিকল্পনার উপর। বৃহদায়তন ও মাঝারি আয়তনের শিল্পে বিনিয়োগের ফলে আয় ও কর্মসংস্থানের উপর গুণিতক প্রক্রিয়ার প্রভাব পড়িবে। কাজেই চূড়ান্ত আয় ও কর্মসংস্থানবৃদ্ধি প্রাথমিক আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির কয়েক গুণ হইবে। যদি কাগজ উৎপাদনের প্রকল্পটি সত্যই রূপায়িত হয়, তাহা হইলে ত্রিপুরায় রেলপথ সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাইবে। চটকল প্রকল্পটি রূপায়িত হইলে রেলপথের প্রয়োজনীয়তা আরও বৃদ্ধি পাইবে। আবার রেলপথ নির্মাণের জন্য অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের পথ খুলিয়া যাইবে। তাহা ছাড়া, বৃহদায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠার ফলে নানা ধরণের চাহিদার সৃষ্টি হইবে

এবং ইহার দরুণ অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাইবে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য কাগজের কারখানা স্থাপিত হইলে ত্রিপুরার উপজাতি অধ্যুষিত অর্থনীতিতে গভীর প্রভাব পড়িবে।

অবশ্য মনে রাখা দরকার বৃহদায়তন শিল্পের জন্য বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত এবং তাহার বাস্তবায়নের মধ্যে বেশ বড় রকমের সময়ের ব্যবধান থাকিয়া যায়। ত্রিপুরার মত অর্থনীতিতে এই ব্যবধান যথেষ্ট বড় না হইয়া পারে না। বৃহদায়তন শিল্পে বিনিয়োগের আগে কাঁচামালের সরবরাহ, দক্ষ শ্রমিক, বিদ্যুৎশক্তি এবং পরিবহণ ব্যবস্থার সহজলভ্যতার নিশ্চয়তা থাকা চাই। কাঁচামালের যোগানের অভাব, বিদ্যুৎশক্তির সরবরাহের অপ্রতুলতা, দক্ষ শ্রমিকের নিদারুণ স্বল্পতা এবং যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থার অনুন্নত অবস্থা ত্রিপুরায় শিল্প প্রসারে বিরাট রকমের বাধার সৃষ্টি করিয়াছে।

৫

ত্রিপুরার অর্থনৈতিক বুনিয়াদ বা Infrastructure-এর ত্রুটিগুলি সংশোধন না করিলে শিল্পায়ণের কোন প্রচেষ্টাই সফল হইবে না। এই ত্রুটিগুলির একটি হইতেছে অনুন্নত যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থা। দেশ বিভাগের পরে ত্রিপুরা ভারতের অন্যান্য অঞ্চল হইতে প্রায় সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। প্রাক্-পরিকল্পনা যুগে ত্রিপুরার আভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থাও ছিল অত্যন্ত অনুন্নত। সেই কারণেই প্রথম পরিকল্পনায় ত্রিপুরার আভ্যন্তরীণ যোগযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়ন অগ্রাধিকার পাইয়াছিল। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পরিকল্পনায় ও আভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ও পরিবহন উন্নয়ণের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। ফলে প্রথম তিনটি পরিকল্পনাকালে রাস্তা ঘাট নির্মানের দ্বারা ত্রিপুরার আভ্যন্তরীণ যোগযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতিসাধন করা হইয়াছিল। ত্রিপুরার জনবহুল অঞ্চলগুলিতে অনেক রাস্তা ঘাট নির্মিত হয়। চতুর্থ পরিকল্পনাকালে ত্রিপুরার অপেক্ষাকৃত

অনগ্রসর ও উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে অর্থনৈতিক কর্মতৎপরতার কেন্দ্রগুলির সহিত সংযুক্ত করিবার জন্য কতকগুলি নূতন রাস্তা নির্মাণ করা হইয়াছে। রাস্তাঘাট নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে সেতুনির্মাণের ব্যাপারেও উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। পঞ্চম পরিকল্পনাকালে ত্রিপুরায় রেলপথ সম্প্রসারণের সুস্পষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে। এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে নূতন রাস্তাঘাট ও সেতু নির্মাণের ফলে ত্রিপুরার অর্থনীতির চেহারা অনেকাংশে পাল্টাইয়া গিয়াছে। কিন্তু এখনও ত্রিপুরার অনেক জায়গা অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্মের কেন্দ্রস্থানগুলি হইতে বিচ্ছিন্ন রহিয়াছে। অপেক্ষাকৃত উন্নত অঞ্চলগুলিতেও জনসংখ্যাবৃদ্ধি ও ব্যবসায়বানিজ্যের বৃদ্ধির সহিত আনুপাতিক হারে যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি হয় নাই। আভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার উল্লেখ করিবার মত উন্নতি হইয়াছে, সত্য ; কিন্তু, ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সহিত ত্রিপুরার যোগাযোগ ব্যবস্থা এখনও খুবই শোচনীয় অবস্থায় রহিয়াছে।

৬

সামাজিক সেবাকার্যের উন্নয়নের হার অর্থনৈতিক উন্নতির একটি মাপকাঠি। যদি শিক্ষা ও চিকিৎসার সুযোগের এবং বাসগৃহাদির ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ না ঘটে তাহা হইলে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের সার্থকতা বহুলাংশে হ্রাস পায়, কাজেই আমাদের বিচার করা উচিত ত্রিপুরার পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার মাধ্যমে এই সমস্ত সুযোগের কি পরিমাণ সম্প্রসারণ ঘটিয়াছে। প্রথম তিনটি পরিকল্পনাকালে ত্রিপুরায় বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষার সুযোগের প্রশংসনীয় উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। বিদ্যালয় ও শিক্ষকের সংখ্যা প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। নূতন কলেজও স্থাপিত হয়। এই প্রসঙ্গে ত্রিপুরায় একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপনের ব্যাপারটি বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। বিদ্যালয় ও কলেজগুলিতে ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা অত্যন্ত দ্রুতহারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ত্রিপুরায় শারীরিক শিক্ষার সুযোগের

উন্নতিও লক্ষ্য করিবার মত। চতুর্থ পরিকল্পনায় ত্রিপুরায় সাধারণ শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা ও শারীরিক শিক্ষার উন্নতির জন্য প্রয়াস অব্যাহত রহিয়াছে। পরিকল্পনাকালে ত্রিপুরায় শিক্ষার সুযোগের প্রশংসনীয় উন্নতি সত্ত্বেও, শিক্ষার সুযোগ চাহিদার তুলনায় যথেষ্ট নয়। ইহার কারণ হইল প্রাক পরিকল্পনার যুগে শিক্ষার সুযোগের চূড়ান্ত অপ্রতুলতা এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও উন্নতমানের জীবন যাত্রার প্রতি আকাঙ্খা বৃদ্ধির দরুণ শিক্ষার সুযোগের চাহিদার দ্রুতহারে বৃদ্ধি। যেহেতু প্রাক্ পরিকল্পনা যুগে ত্রিপুরায় শিক্ষার সুযোগ অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল এবং পরিকল্পনাকালে শিক্ষার সুযোগের চাহিদা অত্যন্ত দ্রুতহারে বৃদ্ধি পাইয়াছে, সেই কারণে পরিকল্পনাকালে শিক্ষার সুযোগের সম্প্রসারণ উল্লেখযোগ্য হইলেও চাহিদার তুলনায় মোটেই পর্যাপ্ত নয়।

চিকিৎসার সুযোগের সম্প্রসারণ সম্বন্ধেও এই একই কথাই বলা যায়। ত্রিপুরা সরকার জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনার মাধ্যমে নানাবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু বর্তমানে ত্রিপুরার জনসাধারণের জন্য চিকিৎসার যে সমস্ত সুযোগ রহিয়াছে তাহা প্রয়োজনের তুলনায় সন্তোষজনক নয়। ইহার কারণ প্রাক্ পরিকল্পনা যুগে চিকিৎসার সুযোগের নগণ্যতা এবং পরিকল্পনাকালে চাহিদার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি।

৭

ভারতে পরিকল্পিত অর্থ ব্যবস্থায় দ্রবমূল্য বৃদ্ধির সমস্যা ও বেকার সমস্যা ভয়াবহ রূপ নিয়াছে। ত্রিপুরার পরিকল্পিত অর্থনীতিও এই দুইটি সমস্যার চাপে বিব্রত। ত্রিপুরার বেকার সমস্যা বর্তমানে তীব্র আকার ধারণ করিয়াছে এবং এই পরিস্থিতির সবচেয়ে বিপজ্জনক দিক হইল শিক্ষিত যুবসমাজের এক বিপুল অংশ বেকারত্বের অভিশাপ বহন করিতে বাধ্য হইতেছে। বর্তমানে ত্রিপুরার কর্ম নিয়োগ সংস্থায় প্রায় ৪০,০০০ জন বেকারের নাম নথিভুক্ত আছে, ১৯৬১ সালে কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা ছিল ১২৯৭৯ এবং ১৯৭০ সালে কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা ছিল ১৩৩২৫

জন বেশী, শতকরা হিসাবে এই বৃদ্ধির হার ১০৩। কর্মপ্রার্থীর এই সংখ্যাবৃদ্ধির পাশা পাশি সরকারী এবং বেসরকারী ক্ষেত্রে চাকুরীর পরিমান এই একই সময়ে ৩২৩৩৩ হইতে দাঁড়ায় ৩৮১৫৩ অর্থাৎ এই দিকে বৃদ্ধির হার মাত্র শতকরা ১৮ ভাগ, কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা এবং চাকুরীর সংখ্যাবৃদ্ধির মধ্যে এই বিরাট ব্যবধান থেকে আমরা সহজেই বুঝিতে পারি বেকার সমস্যা ত্রিপুরায় কি ভয়াবহ রূপ ধারণ করিয়াছে, কিন্তু এই সংখ্যাও বেকার সমস্যার ভয়াবহতার সঠিক প্রতিফলন নয়, তাহার কারণ এই সংখ্যা হইতে আমরা গ্রামাঞ্চলের বেকার সমস্যার বিস্তৃতি সম্পর্কে কোন ধারণাই করিতে পারি না।

এই তীব্র সমস্যার কারণ খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর নয়। ত্রিপুরার শিল্প এখনও শৈশব অবস্থায়। সুতরাং ত্রিপুরার শিক্ষিত যুবকদের কর্মসংস্থান একমাত্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বা সরকারী দপ্তর খানায়ই সম্ভব। কিন্তু কর্মসংস্থানের এই উৎসকে আনির্দ্দিষ্টকাল ধরিয়া প্রসারিত করিয়া যাওয়া সম্ভব নয় শিক্ষিত যুবকদের ক্রমাগত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং সরকারী অফিসে চাকুরী দেওয়ার ফলে এই দুই ক্ষেত্রে চাকুরী দেওয়ার ক্ষমতা চুড়ান্তভাবে সীমিত হইয়া গিয়াছে।

ত্রিপুরা সরকার এবং ত্রিপুরার জনগণের সামনে বেকার সমস্যা হলো একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ। সরকার কর্মসংস্থানের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার জন্য পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে কতকগুলি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন। প্রথমতঃ ত্রিপুরার অর্থনৈতিক বুনিয়াদের ত্রুটিগুলি সংশোধন করিবার জন্য উদ্যোগ গ্রহন করা হইয়াছে, অর্থনৈতিক বুনিয়াদ অর্থাৎ Infrastructure গড়িয়া তোলার প্রচেষ্টাগুলির মধ্যেই কর্মসংস্থানের সুযোগও গড়িয়া উঠিবে, কর্মসংস্থানের সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র হিসাবে সড়ক নির্মাণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে, দ্বিতীয়ত পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে কতকগুলি বৃহদায়তন ও মাঝারি আয়তনের শিল্প সংস্থাপনের সিদ্ধান্তের দ্রুত রূপায়ণে ত্রিপুরা সরকার বদ্ধ পরিকর। এই জাতীয় শিল্পের মধ্যে আছে কাগজ উৎপাদনের কারখানা। পাটকল

চিনিকল ও সার্জিক্যাল তুলা তৈয়ারীর কারখানা। তৃতীয়তঃ, পরিকল্পনায় এমন কতকগুলি ক্ষুদ্রয়াতন শিল্পের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে যে সমস্ত শিল্পের উন্নতিতেই প্রচুর সংখ্যক কর্মসংস্থানের চাবিকাঠি লুকানো রহিয়াছে। এই শিল্পগুলি হইতেছে হাঁস-মুরগী পালন, গো-পালন, কৃষিজপণ্য বিপনন জাত করিবার প্রক্রিয়া সংক্রান্ত শিল্প, বনজ সম্পদের উপর নির্ভরশীল শিল্প এবং ক্ষুদ্রকায় কুটির শিল্প, বিশেষত তাঁতশিল্প, চর্মজাতদ্রব্য শিল্প,কাঁচশিল্প ও ইটনির্মাণ শিল্প। চতুর্থতঃ কর্মসংস্থান পরিস্থিতির জটিলতা হ্রাসের জন্য পরিকল্পনায় বাণিজ্য, পরিবহন এবং মেরামত শিল্পের মাধ্যমে নিজ নিজ কারবার গড়িয়া তোলার ব্যাপার শিক্ষিত যুবকদের আগ্রহী করিবার ও উৎসাহ দেত্তয়ার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে।

কর্মসংস্থানের সম্ভাবনার প্রভৃতি উন্নতিসাধনের জন্য ত্রিপুরা সরকারের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা সঠিকভাবে রূপায়িত হইলে বেকার সমস্যার সমাধানে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সম্ভব হইবে। কিন্তু মনে রাখা দরকার কার্যক্রমের পরিকল্পনা গ্রহণ করা এক কথা এবং সেই পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণ অন্য কথা। ত্রিপুরার পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় যাহা অতি প্রয়োজনীয় তাহা হইতেছে গৃহীত কার্য্যক্রমের সঠিক এবং সার্থক রূপায়ণ।

# মনিপুরের পরিকল্পিত অর্থনীতি ও অগ্রগতি

ডঃ এইচ নবকিশোর সিং

ভারতের উত্তরপূর্ব প্রান্তে মনিপুর একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। মনিপুরের আয়তন ২২,৩১৬ বর্গ কিলোমিটার এবং জনসংখ্যা ১৯৭১এর আদম সুমারী অনুসারে ১০,৬৯,৫৫৫। মোট জনসংখ্যার প্রায় দুই তৃতীয়াংশ মধ্যাঞ্চলের উপত্যকায় বাস করেন। এই এলাকা মনিপুরের মোট ভৌগোলিক আয়তনের প্রায় এক দশমাংশ। জনসংখ্যার বাকি এক তৃতীয়াংশ বাস করেন অবশিষ্ট নয় দশমাংশ এলাকায়। জনবসতির ঘনত্ব এক এক জায়গায় এক এক রকম—কোন জায়গায় খুব বেশী আবার কোন জায়গায় খুব কম। এই রাজ্যের মোট ৮৫০ কিলোমিটার সীমানার অর্ধেকের একটু কম হল ব্রহ্মদেশের সংলগ্ন আন্তর্জাতিক সীমানা। আগে ইম্ফল-ডিমাপুর রোড (৩৯নং জাতীয় সড়ক)- ছিল অবশিষ্ট ভারতের সংগে একমাত্র যোগসূত্র। এক পর ইম্ফল থেকে শিলচর হয়ে নিউ কাছাড় রোড খোলা হয়েছে। এই রাজ্যের অর্থনীতি মূলতঃ কৃষিভিত্তিক এবং জনসংখ্যার প্রায় ৮৫ শতাংশ কৃষির উপর নির্ভরশীল। এই রাজ্যের মোট উৎপন্ন দ্রব্যের ৪৫ শতাংশ থেকে ৫০ শতাংশ কৃষিজাত দ্রব্য। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, এই রাজ্যের জনসংখ্যর ৮৫ শতাংশের জীবনধারণের মান দারিদ্র্য সীমার নীচে।

মনিপুরে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সংগে সংগে এই রাজ্যে পরিকল্পিত অর্থনীতি প্রবর্তিত হয়। মনিপুরে পরিকল্পনার একটি অদ্ভুত দিক হলো যে এখানে পরিকল্পনায় বিনিয়োগ যে কেবল অতিমাত্রায় স্বল্প তাই নয়, এখানে পরিকল্পনা খাতে প্রকৃত ব্যয় সব সময়ই বরাদ্দের চাইতেও কম হয়। নীচের সারণী থেকে এটা স্পষ্ট হবে :

| পরিকল্পনা | | বিনিয়োগ ( কোটি টাকার হিসাবে ) | ব্যয় (কোটি টাকার হিসাবে) |
|---|---|---|---|
| ১ম পরিকল্পনা | | ১'৫৫ | ১'০৩ |
| ২য় পরিকল্পনা | | ৬'২৫ | ৫'৯৭ |
| ৩য় পরিকল্পনা | | ১২'৮৮ | ১২'৮১ |
| বার্ষিক পরিকল্পনা | ১৯৬৬-৬৭ | ৩'৫০ | ২'০৯ |
| ” ” | ১৯৬৭-৬৮ | ২'৯০ | ২'৬৩ |
| ” ” | ১৯৬৮-৬৯ | ৩'৭২ | ২'৪৮ |
| চতুর্থ পরিকল্পনা | | ৩২'৭১ | ৩২'১৪ (সম্ভাব্য ব্যয়) |
| পঞ্চম পরিকল্পনা | | ৮৮'৪৪ ( শিক্ষাখাতে ও মেডিকেল কলেজের জন্য বরাদ্দ বাদে) | — |

এখন যখন চতুর্থ পরিকল্পনা শেষ হয়ে আসছে এবং পঞ্চম পরিকল্পনা শুরু হওয়ার মুখে, তখন আমাদের সবকিছু হিসাবনিকাশ দেখা দরকার—কেবল চতুর্থ পরিকল্পনার ফলশ্রুতি সম্পর্কেই নয়, উপরন্তু বিশেষভাবে এই রাজ্যে এবং সাধারণভাবে দেশে জনসাধারণ ও অর্থ-নীতির উপরে পঞ্চম পরিকল্পনার সম্ভাব্য প্রভাব সম্পর্কেও ভেবে দেখা দরকার। এই সম্পর্কে বলা যায় চতুর্থ পরিকল্পনার শেষে অবস্থাটা দাঁড়াবে অনেকটা নিম্নরূপ:

(১) যোগাযোগ, বিদ্যুৎশক্তি, ঋণদান সংস্থা, কারিগরিদক্ষতা এবং উদ্যোগ এ সবের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি ও ভিত্তিভুমিটি যথেষ্ট নয়।

(২) গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন সংক্রান্ত এজেন্সীগুলির জেলা অফিসের হয় অস্তিত্বই নেই, নতুবা থাকলেও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি যথেষ্ট নয়।

(৩) বর্তমানের অতিমাত্রায় কৃষি-তথা গ্রাম ভিত্তিক অর্থনীতি বজায় রয়েছে।

(৪) বেকার ও আধা বেকারের সংখ্যা বিপুল ( ৩১-৩-৭৩ তারিখে চাকুরী প্রার্থীর সংখ্যা ৫০,৮৬৫ )।

(৫) মাথা পিছু আয়ের কোন উন্নতি নেই এবং সেটা সর্বভারতীয় গড় থেকে অনেক কম ( ১৯৭০-৭১ আর্থিক বছরের শেষে এখানে মাথা-পিছু আয় ১৯৬০-৬১ সালের মূল্যমানের হিসাবের মাত্র ১৬৮ টাকা, অথচ সেই সময় সর্বভারতীয় গড় ৩৪৭ টাকা )।

(৬) শিক্ষাক্ষেত্রে দ্রুত কিন্তু অপরিকল্পিত উন্নয়ন, অথচ সেই অনুপাতে চাকুরীর সুযোগ যথেষ্ট নয়।

(৭) চাল, মাছ, ভোজ্য তেল, আলু প্রভৃতি জিনিসের জন্য অন্য রাজ্যের উপর নির্ভরতা—যদিও চেষ্টা করলে এই রাজ্য সব জিনিসে স্বয়ংভর হবার ক্ষমতা রাখে।

চতুর্থ পরিকল্পনায় বস্তুগত লক্ষ্যমাত্রাগুলির বেশীর ভাগই পুরোপুরি অর্জিত হবে আশা করা যায়—অবশ্য এই লক্ষ্যমাত্রাগুলি কিছুটা কম করে ধার্য করা হয়েছিল। যেমন কৃষিক্ষেত্রে উন্নত ধরনের বীজ থেকে শস্য চাষের এলাকা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে এবং সার ব্যবহারের ক্ষেত্রে নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। আবার, উচ্চ ফলনশীল জাতের শস্য চাষের এলাকা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা কিছুটা ছাড়িয়ে যাওয়া গেছে। বনসৃষ্টির ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সুবিধা সম্পন্ন বাগিচা সৃষ্টির লক্ষ্যমাত্রাও পূরণ হবে বলে আশা করা যায়। মৎস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে নিদিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা যদিও পূরণ হবে বলে আশা করা যায় কিন্তু তবুও মাছে স্বয়ংভর হওয়া সম্ভব হবে না। খাদ্য শস্যের প্রকৃত উৎপাদনের গতি অবশ্য ততটা আশাপ্রদ নয় এবং এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ধারার সংগে ততটা সংগতিপূর্ণও নয়। যেমন, ১৯৭১-৭২ সালে চাল, ডাল, তৈলবীজ, আলু, ইক্ষু, গম এবং ভুট্টার প্রকৃত উৎ-পাদনের অংক হল হাজার টনের হিসাবে যথাক্রমে ১৫৮.০ ( ১৬০.০ ), ১.৯ ( ২.১ ), ১.১ ( ০.২ ), ৮.১ ( ৯.৫ ), ৫.৩ ( ৫.৩ ), ০.২ ( ০.১ ) এবং ১৭.০ ( ১৭.০ )। বন্ধনীর মধ্যে পূর্ববর্তী বৎসরের উৎপাদনের অংক দেওয়া হয়েছে। এই পরিসংখ্যান থেকে এই রাজ্যের অর্থনৈতিক

বদ্ধদশা ফুটে ওঠে। এছাড়া বিদ্যুৎশক্তি, সমাজ সেবামূলক কাজকর্ম এবং শিল্পের ক্ষেত্রেও অগ্রগতি মোটেও উৎসাহব্যঞ্জক নয়।

এই রাজ্যের পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্থ বিনিয়োগ নিম্নরূপ:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (১) | কৃষি ও আনুষঙ্গিক ক্ষেত্রে...... | ১৪৭১.০০ | লক্ষ | টাকা। |
| (২) | সেচ ও বিদ্যুৎ.............. | ১৭৭৬.০০ | ,, | ,, |
| (৩) | শিল্প ও খনি.............. | ৮১০.০০ | ,, | ,, |
| (৪) | পরিবহণ ও যোগাযোগ...... | ২৩৩০.০০ | ,, | ,, |
| (৫) | সমাজসেবামূলক কাজকর্ম... | ২০৩৪.০০ | ,, | ,, |
| (৬) | বিবিধ ...... | ৩৮৭.০০ | ,, | ,, |
| | মোট: | ৮৮৪২.০০ | ,, | ,, |

(শিক্ষাখাতে এবং মেডিকেল কলেজের জন্য ব্যয় বরাদ্দ এখনও নির্দিষ্ট করা হয়নি)।

পাঁচ বৎসর পরে অবস্থা কি রকম দাঁড়াবে সেটা অনুমান করা এবং মনিপুরের পঞ্চম পরিকল্পনার সম্ভাব্য অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়া কিরূপ হতে পারে তা এখনই বিশ্লেষণ করা কঠিন। এই কাজ আরও বেশী কঠিন এই কারণে যে এই রাজ্যে ভবিষ্যৎ ছকের পরিকল্পনা হয় না। তবুও বিশেষ করে এই রাজ্যে এবং সাধারণভাবে সমগ্র দেশে জনগণ ও অর্থনীতির উপরে পঞ্চম পরিকল্পনার অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়া কি রকম হতে পারে তার একটা চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা এখানে করা হয়েছে।

এই রাজ্যের পঞ্চম পরিকল্পনার লক্ষ্য সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয় যে সেগুলি রচনা করা হয়েছে দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং অর্থনৈতিক স্বয়ংভরতা অর্জনের সামগ্রিক জাতীয় লক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এবং সেগুলি বেশ গ্রহণযোগ্য বলা যায়।

বস্তুগত লক্ষ্যমাত্রা সম্বন্ধে বলা যায় যে এর মধ্যে কতকগুলি লক্ষ্যমাত্রা হয়ত অর্জিত হবে না, কতকগুলি অর্জিত হবে, আবার কতকগুলি

ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রাকেও ছাড়িয়ে যাওয়া যাবে। এইরূপ ফলাফল বেশ ভালই বলা যায়। কিন্তু আসল কথা লক্ষ্যমাত্রাগুলি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কম করে ধার্য করা হয়েছে, এবং ফলে এই লক্ষ্যমাত্রাগুলি পূরণ হলেই যে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলিতে এই রাজ্য স্বয়ংভর হবে এমন নয়। নিম্ন-গ্রামের লক্ষ্যমাত্রার একটি প্রধান কারণ হল পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক এই রাজ্যের জন্য খুবই সীমিত পরিমাণের অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা। এই রাজ্যের পঞ্চম পরিকল্পনার আভাসপত্রে যদিও ২০০ থেকে ২৫০ কোটি টাকা বিনিয়োগের কথা বলা হয়েছিল, কিন্তু পরিকল্পনা কমিশন প্রকৃত-পক্ষে ১০০ কোটিরও কম টাকা অনুমোদন করেছেন। এটাই হল ন্যূনতম পরিমাণের অর্থ বিনিয়োগ যার থেকে আর কমানো যায় না এবং কর্মসূচির প্রধান বিষয়গুলি রূপায়িত করার জন্য যা একান্ত অপরিহার্য।

সমস্যাটা কেবল অর্থ-সংস্থানের স্বল্পতা নয়। পরিকল্পনায় অর্থ বরাদ্দের তুলনায় প্রকৃত ব্যয় যে সব সময়ই কম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এটা অতীত অভিজ্ঞতা থেকেই বোঝা যায়। এই ক্ষুদ্র রাজ্যটিতে প্রথম পরিকল্পনার সুরু থেকেই এই জিনিস চলছে। আসন্ন পঞ্চম পরিকল্পনায় এই ধারা পরিবর্তনের জন্য প্রবলভাবে চেষ্টা করা দরকার।

এই রাজ্যের পঞ্চম পরিকল্পনার ব্যাপারে মূল্যস্তরের বিষয়টি আরেকটি উদ্বেগের কারণ। যদিও মূল্যস্তর সর্ব ভারতীয় কতকগুলি কারণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তবুও মনিপুরের ক্ষেত্রে বলা যায় যে এখানে চাল ও অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদনে সাময়িক ঘাটতি মূল্যস্তরকে প্রভাবিত করে। ১৯৬২ র মার্চকে মূল বৎসর ধরে সমগ্র দেশের মূল্যস্তর (পাইকারি হিসাবে সর্ব পণ্যের গড় মূল্যের সূচক) ১৯৭৩ সালের ২২ জুলাই তারিখে ছিল ২৫০.২; আর ঐ তারিখে কেবলমাত্র খাদ্য সামগ্রীর মূল্যস্তর ছিল ২৯৪.৮। বস্তুতপক্ষে মনিপুরের মূল্যস্তর সর্বভারতীয় গড় মূল্যস্তরের তুলনায় প্রায় ২৫ শতাংশ বেশী। সুতরাং কৃষিক্ষেত্রে এক টানা বৃদ্ধি কেবল যে মূল্যস্তরে স্থিতিশীলতা বজায়

রাখতে ও সামাজিক অশান্তি কমাতেই সাহায্য করবে তাই নয় উপরন্তু এর ফলে মজুরী ও দ্রব্যমূল্যের সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অন্যান্য উন্নয়ন-মূলক কাজকর্মের সুফলও বৃদ্ধি পাবে।

রাজ্যের পঞ্চম পরিকল্পনায় সবচেয়ে দুর্বল দিক হল জনশক্তিকে কাজে লাগাবার কর্মসূচি। আগের পরিকল্পনাগুলিতেও তাই ছিল। এতদিন পর্যন্ত কর্মনিয়োগ বিষয়টিকে দেখা হত উন্নয়ন কর্মসূচিগুলিরই একটা ফল হিসাবে। উন্নয়ন কর্মসূচিগুলি রূপায়িত হলেই সেই সঙ্গে কর্মনিয়োগও হবে এটাই ধরে নেওয়া হত। কিন্তু এই কৌশল মোটেও সঠিক নয়। পঞ্চম পরিকল্পনার প্রথম আভাস পত্রে কর্মনিয়োগ ও স্ব-নিয়োগের কর্মসূচি সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছিল। কিন্তু রাজ্যের চূড়ান্ত পঞ্চম পরিকল্পনায় এই ধরনের কর্মসূচি অনুপস্থিত। বস্তুগত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে বা বিভিন্ন ক্ষেত্রভিত্তিক কর্মসূচি রচনায় কোনখানেই এই রাজ্যের ভয়ংকর বেকার সমস্যার মোকাবিলার উপায় সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি। একথা অবশ্য সত্য যে নিবিড় কৃষিকার্যের উপর যে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে তা কেবল কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যেই নয়, উপরন্তু এর মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের বেকারী ও আধাবেকারী দূর করাও এর উদ্দেশ্য। ভারত সরকারের পাঁচ লক্ষ চাকুরী সৃষ্টির বিশেষ কর্মসূচির জের হিসাবে এই রাজ্যেও শিক্ষিত বেকারের বিরাট সমস্যার কিছুটা সুরাহা করা সম্ভব হবে। ১৯৭৩ এর ৩১ মার্চ তারিখে এই রাজ্যের কর্ম নিয়োগ কেন্দ্রগুলির রেজিস্টারে যে ৫০, ৮৬৫ জন চাকুরী-প্রার্থীর নাম নিবন্ধভুক্ত ছিল তার মধ্যে ১৭,০০০ শিক্ষিত বেকার। পঞ্চম পরিকল্পনার শেষে শিক্ষিত বেকারের এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ত্রিশ হাজার হতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে। মনিপুরের মত ছোট রাজ্যের পক্ষে এটা সাংঘাতিক। এই সমস্যা অনেক গভীর ও ব্যাপক এবং একে লঘু ভাবে দেখলে চলবে না। ইতিমধ্যেই কর্ম নিয়োগের নয়টি বিশেষ কর্মসূচি রূপায়ন করতে গিয়ে দেখা গেছে যে ব্যাপারটা খুব সহজ নয়। এর কারণ হল রাজ্য-পর্যায়ে এর জন্য যথেষ্ট অর্থ

সংস্থানের অভাব। মোটামুটি নিয়মিত ধরনের এবং কর্মনিয়োগ ও স্বনিয়োগের নির্দিষ্ট বস্তুগত লক্ষ্যমাত্রা সমন্বিত কর্মনিয়োগ ভিত্তিক পরিকল্প যথেষ্ট সংখ্যক না থাকলে কেবল পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য হিসাবে এই সমস্যার শুধু উল্লেখ করলে সেটা কেবলমাত্র একটা মামুলি ইচ্ছা প্রকাশে পর্যবসিত হতে পারে।

আসল কথা হল দেখতে হবে যে এই রাজ্যের পঞ্চম পরিকল্পনা এই রাজ্যের অর্থনীতিকে চরম অনগ্রসরতা থেকে কতটা মুক্ত করতে পেরেছে এবং কতটা জাতীয় অর্থনীতির মূল ধারার সঙ্গে মিলিয়ে দিতে পেরেছে। এই রাজ্যের মাথাপিছু আয় বর্তমানে সর্বভারতীয় গড়ের অর্ধেকেরও কম। সুতরাং এখানকার মাথাপিছু আয়কে বর্ধিত করে অন্ততঃ সর্বভারতীয় গড়ের সমান করতে হবে।

বস্তুত, পঞ্চম পরিকল্পনা মনিপুরের পক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা হতে চলেছে। একে আগের পরিকল্পনার চাইতে একটু বড় আর একটি গতানুগতিক পরিকল্পনা হিসাবে দেখা চলে না। সেজন্য অতীতের সাফল্য ও ব্যর্থতার পর্যালোচনা করা দরকার। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে জ্ঞানলাভ করতে এর পঞ্চম পরিকল্পনার শুরুতেই নতুন ধারা প্রবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে যদি না প্রবল ভাবে চেষ্টা করা হয় তাহলে সাধারণ মানুষ অচিরেই সামঞ্জস্যহীন পরিকল্পনার কুফল উপলব্ধি করতে পারবে। এই ব্যাপারে "শিল্প ও খনি" বিষয়টির দৃষ্টান্ত উল্লেখযোগ্য।

কয়েকটি ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্প ইউনিট ছাড়া এই রাজ্যে সেরকম কোনো বড় বা মাঝারি আকারের শিল্প ইউনিট নেই বললেই চলে। অথচ এই রাজ্যে তৃতীয় পরিকল্পনায় সর্ব প্রথম বড় ও মাঝারি শিল্পের জন্য ১'৭৭ লক্ষ টাকার বিনিয়োগের ব্যবস্থা করা হয় এবং শেষপর্যন্ত প্রকৃত ব্যয় হয়েছিল ২'৬৫ লক্ষ টাকা। চতুর্থ পরিকল্পনায় এই খাতে বিনিয়োগের পরিমাণ প্রথমে ধার্য করা হয়েছিল ৪৫ লক্ষ টাকা এবং

পরে তা বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় ৯৪'২৫ লক্ষ টাকা। পঞ্চম পরিকল্পনায় এই খাতে বিনিয়োগের পরিমাণ ধরা হয়েছে ৩৮৫ লক্ষ টাকা—এর মধ্যে জিরিবামে বাঁশের মণ্ড থেকে কাগজ তৈরীর কল স্থাপনের জন্য নিদর্শন-সূচক ২৫ লক্ষ টাকা এবং অনুরূপ ভাবে কারং-এ ইন্‌সুলেটেড পেপার মিল স্থাপনের জন্য ১৪০ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে। প্রথম কাগজ কলটির জন্য ব্যয় হবে ৩৬ কোটি টাকা, যার মধ্যে বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ হল ৬'০২ কোটি টাকা। এটির জন্য বিদ্যুৎ লাগবে ২৫ মেগাওয়াট, এর মধ্যে ১০ মেগাওয়াট নিজস্ব বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে পাওয়া যাবে এবং ১৫ মেগাওয়াট লোকটক প্রকল্প থেকে পাওয়া যাবে। দ্বিতীয় কাগজ কলটির জন্য ব্যয় হবে ৮'৯৩ কোটি টাকা। দুইটি কাগজ কলেরই প্রকল্প রিপোর্ট তৈরী করা হয়েছে এবং এই দুইটি প্রকল্পই বাণিজ্যিক দিক থেকে লাভজনক হবে বলে মনে করা হচ্ছে। নির্মাণ কার্যের জন্য চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের দিন থেকে প্রায় পাঁচ বৎসর সময় লাগবে। যদি পঞ্চম পরিকল্পনার সুরুতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া না হয় তাহলে প্রস্তাবিত কারখানাগুলি পঞ্চম পরিকল্পনার শেষ অর্থাৎ ১৯৭৯-৮০ সাল নাগাদ ও উৎপাদনের অবস্থায় পৌঁছতে পারবে না।

এখন নিউ কাছাড় রোড যানবাহন চলাচলের জন্য খুলে যাওয়ায় পরিবহন ও যোগাযোগ সংক্রান্ত একটা বিরাট অসুবিধা দূর হয়েছে। তাছাড়া লোকটক প্রকল্প ১৯৭৫এর শেষ নাগাদ সম্পূর্ণ হয়ে যাবে বলে আশা করা হয়েছে। এই প্রকল্প থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে কিছুটা দেরী হলেও ১৯৭৯-৮০ সালের চাইতে বেশি দেরী হবে না। এই প্রকল্প সম্পূর্ণ হলে বিদ্যুতের সমস্যা দূর হবে। বিদ্যুৎ ও পরিবহনের অসুবিধার জন্যে ইতিপূর্বে বড় ধরনের কোন নতুন শিল্প প্রকল্প স্থাপন করা যায় নি। এখন শিল্পোন্নয়নের সুযোগ সুবিধা সংক্রান্ত সমস্যা মোটামুটি সমাধান হওয়ায় ঐ ধরনের সুযোগ সুবিধা ও ব্যবস্থাদি নির্মাণ কার্য সংক্রান্ত শিল্প ইউনিট আর খুব বেশী দরকার নাও হতে পারে। ফলে উপরের দিকের অপ্রয়োজনীয় কাজ কর্ম ও অলস

পদগুলির দরুণ সমস্যা আরও বৃদ্ধি পেতে পারে এবং অর্থনৈতিক বদ্ধদশা ও মুদ্রাস্ফীতি জনিত মূল্যবৃদ্ধির সমস্যাও আরও তীব্র হতে পারে।

সমগ্র উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের মধ্যে মনিপুরে খুব বেশী পরিমাণে বাঁশ উৎপন্ন হয়। জিরি-বরাক নিকাশি বনাঞ্চলে ৪২ লক্ষ মেট্রিক টন বাঁশ রয়েছে বলে জানা গেছে এবং এখান থেকে বৎসরে ৬·১৮ লক্ষ মেট্রিক টন বাঁশ পাওয়া যাবে। জিরিবামের চণ্ডীঘাটে যে আয়তনের কাগজ কলের কথা ভাবা হচ্ছে সেইরকম আয়তনের চারটি কাগজকল এই বাঁশ দিয়ে চালানো যেতে পারে। প্রস্তাবিত কলে মনিপুরের মোট বাঁশের মাত্র এক চতুর্থাংশ ব্যবহার করা হবে; বাকি তিন চতুর্থাংশ অন্যান্য কাজে লাগানো হবে এবং কাছাড় ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে চালান দেওয়া হবে। উল্লেখযোগ্য যে কাছাড়ের পাঁচগ্রামে একটি, নওগাঁর গাজিরোডে একটি এবং নাগাল্যাণ্ডের টুলিতে আর একটি কাগজকল তৈরী করা হচ্ছে। এ ছাড়া ত্রিপুরায় একটি এবং অরুণাচল প্রদেশে আর একটি কাগজকল হবে। সুতরাং মনিপুরে প্রস্তাবিত কাগিজকলগুলি স্থাপনের বিষয় আর দীর্ঘসূত্রতার কোনো অবকাশ নেই। কারণ মনিপুরের আশে-পাশের রাজ্যগুলির কাগজ কলগুলি আগে স্থাপিত হয়ে গেলে এই রাজ্যের প্রস্তাবিত কাগজ কলের সাফল্যের সম্ভাবনা ব্যাহত হতে পারে। ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা বিশেষ করে এই কারণে যে পঞ্চম পরিকল্পনার রূপরেখায় যুগ্মক্ষেত্রে কাগজ কল স্থাপনের ব্যাপারে এই কঠোর শর্ত আরোপিত আছে— "কাঁচা মালের বিশদ সমীক্ষা ও দেশে মোটের উপর কাগজের চাহিদা যদি এই প্রকল্পের প্রয়োজন সুচিত করে।" বস্তুত পক্ষে এই খাতে যে নিদর্শন স্বরূপ ২৫ লক্ষ টাকা ধরা রয়েছে তা দিয়ে বরং মন বাহাদুর রোড থেকে চণ্ডীগড় (যেখানে প্রস্তাবিত কাগজকলটি হবে) পর্যন্ত ৫ মাইল রাস্তাকে পাকা ও মোটর চলাচলের উপযোগী করা যেতে পারে। কারণ আর বেশী লেখালিখির কাজের প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়

না, যখন প্রকল্পের রিপোর্ট এবং অন্যান্য কয়েকটি সমীক্ষার রিপোর্ট চূড়ান্ত করা হয়েছে। যদি এ সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সরকার নিজেই প্রথমে গ্রহণ না করেন তাহলে এই যুগ্ম ক্ষেত্রের প্রকল্পটির প্রস্তাবিত মোট অর্থ বিনিয়োগের বাকি অংশ বেসরকারী উদ্যোক্তা ও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক সহ বিভিন্ন অর্থ-সংস্থানকারি প্রতিষ্ঠানগুলির কাছ থেকে সহজে পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না।

বঙ্গানুবাদ : প্রণবেন্দ্রনাথ রায়

# সাংস্কৃতিক উন্নয়নে নারীর ভূমিকা

শ্রীযুক্তা সরস্বতী সিং

সমগ্র মানবজাতির প্রায় অর্ধেক নারী। সুতরাং যে সভ্যতা বা সংস্কৃতিতে মানবজাতির এই রকম একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশকে অবহেলা করা হয় সেখানে অগ্রগতি পিছিয়ে পড়তে বাধ্য। এই ধরণের পশ্চাদগামী তথা নেতিবাচক সভ্যতার হয় সংস্কার সাধন করা প্রয়োজন অথবা তাকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করতে হয়। সেইজন্য সাংস্কৃতিক উন্নয়নে নারীদের ভূমিকা তুলে ধরার জন্য আলোচনাসভার গুরুত্ব অপরিসীম। আমি এখানে এই সমস্যাকে ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করতে চেষ্টা করব।

আমাদের সভ্যতার প্রথমদিকে সমাজে নারীর এক উচ্চ স্থান ছিল। তাঁরা সাংস্কৃতিক জীবনে পুরুষদের চেয়ে কোন অংশেই হীন ছিলেন না এবং পুরুষদের সঙ্গে সমান অধিকার ভোগ করতেন। বৈদিক যুগের 'দম্পতি' কথাটি স্বামী ও স্ত্রী উভয়কে মিলিতভাবে বুঝায় এবং তাঁরা যে যুক্তভাবে গৃহের মালিক ইহাই সূচিত করে। কোন ধর্মীয় বা সামাজিক বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান তখন স্বামী একা করতে পারতেন না। এই ছিল তখন ব্যবস্থা। আশ্চর্য নয় যে এই যুগই আমাদের সভ্যতার শ্রেষ্ঠ যুগ। এই যুগেই গার্গী ও মৈত্রেয়ীর মত বিদুষী নারীদের আবির্ভাব হয়। নারী জাতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং পুরুষদের সঙ্গে তাদের সমমর্যাদার স্বীকৃতি—এইগুলি ছিল বৈদিক সভ্যতার বৈশিষ্ট। যেখানে নারীর সম্মান সেখানেই আছে দেবতার অধিষ্ঠান—এই উক্তির মধ্যেই সে যুগের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ প্রকাশ পেয়েছে।

মনুস্মৃতিতে নারীদের সম্পর্কে কিছু কিছু তাচ্ছিল্যসূচক মন্তব্যের উল্লেখ দেখা যায়। মনে হয় সমাজে সাংস্কৃতিক জীবনে নারীদের ভূমিকার অধোগতি শুরু হয় মহাভারতের যুগ থেকেই।

অনুমান হয় যে মনুস্মৃতির যুগে নারীদের পরাধীন করে রাখা হয় এবং তারা সব রকম স্বাধীনতা হারায়। মনু তাঁর লেখায় বলেছেন "নারীদের কোন স্বাধীনতা থাকতে পারে না"।

পরবর্তী কালে ভারতে নারীদের অবস্থার আরও অবনতি দেখা যায়। ক্রমাগত বৈদেশিক আক্রমণের ফলে তারা ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে নিজেদের আবদ্ধ রাখতে বাধ্য হয় এবং তাদের সব রকমের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অক্ষমতাজনিত অসুবিধায় ভুগতে হয়।

যতদিন পর্যন্ত না পাশ্চাত্য উদারনৈতিকতা আমাদের দেশে সামাজিক মতবাদকে প্রভাবিত ও রূপায়িত করতে শুরু করে ততদিন পর্যন্ত আমাদের দেশের নারী সম্প্রদায় বৎসরের পর বৎসর এই হীন অবস্থার মধ্যে কাটায়। রাজা রামমোহন রায়, স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী, অ্যানি বেসান্ত প্রমুখ ধর্ম ও সমাজ সংস্কারকরা যুগ যুগের অন্ধ কু-সংস্কার ও অন্যায় অবিচারের হাত থেকে ভারতীয় নারীদের মুক্তির জন্য আন্দোলন সুরু করেন। তাঁরা দেশের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনে নারীদের সমানভাবে অংশ গ্রহণের বিষয়টি সমর্থন করেন এবং এইভাবে তাদের মুক্তি আন্দোলনের পথকে প্রশস্ত করেন।

এর পর ভারতের রাজনীতিতে আবির্ভূত হলেন মহাত্মা গান্ধী। তিনি ছিলেন নারীদের অধিকারের একজন দৃঢ় সমর্থক। তিনি বলেছিলেন "নারীদের অধিকার অর্জনের ব্যাপারে আমি আপোষ-হীন। কাজকর্ম করতে গিয়ে যে আইনগত অসুবিধা পুরুষকে ভুগতে হয় না সেই অসুবিধা নারীকেও যেন ভুগতে না হয়। আমি কন্যাকে ও পুত্রকে সম্পূর্ণ সমান ভিত্তিতে দেখতে চাই।" মহাত্মা গান্ধী মনুস্মৃতির সব কথাকেই অভ্রান্ত বলে মেনে নেন নি এবং মনুস্মৃতির

যেখানে নারীদের সম্পর্কে তাচ্ছিল্যসূচক মন্তব্য রয়েছে সেখানে তিনি সেই মন্তব্যগুলির নিন্দা করেছেন। তিনি মনুস্মৃতির বিতর্কিত অংশগুলি পরীক্ষা করে দেখবার জন্যে ও দরকার হলে সংশোধনের জন্যে একটি ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি চেয়েছিলেন, কারণ এই অংশগুলি আধুনিক যুগের মানুষের নীতিবোধের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ।

স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় নারীরা পুরুষদের সঙ্গে একযোগে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। এখন ভারতীয় সংবিধানে পুরুষ ও নারীদের সমান মর্যাদা দেওয়া হয়েছে এবং এই ব্যাপারে সকল পার্থক্য ও অবিচার দূর করা হয়েছে। বস্তুতপক্ষে, রাষ্ট্রসংঘের মানবজাতির অধিকার সংক্রান্ত ঘোষণা অপেক্ষাও ভারতীয় সংবিধান এই ব্যাপারে কিছুটা বেশী এগিয়ে গিয়েছে।

বর্তমানে ভারতীয় নারীরা সকল প্রকার আইনগত অক্ষমতা থেকে মুক্ত। কিন্তু সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের বাস্তব অবস্থায় তারা এখনও অনেক পিছিয়ে। বর্তমানে একজন নারী আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং সমগ্র নারী সম্প্রদায়ই এজন্য যথার্থভাবেই গর্ববোধ করতে পারেন। তাছাড়া বেশ কয়েকজন মহিলা আমাদের দেশে মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যপাল হয়েছেন। এসব সত্ত্বেও আমাদের দেশে এখনও নারী সমাজের বিরুদ্ধে কুসংস্কারের আবহাওয়া রয়েছে। এই অবস্থা আমাদের দেশে সাংস্কৃতিক উন্নয়নে নারীদের যোগ্য ভূমিকা গ্রহণের সঙ্গে অসঙ্গতি পূর্ণ। আমাদের দেশে ক্ষমতার শীর্ষে রয়েছেন একজন নারী। কিন্তু এটাই যথেষ্ট নয় এবং এজন্য আত্মসন্তুষ্টির মনোভাব নিয়ে থাকাও উচিত নয়। কারণ এর দ্বারা সাধারণ ভাবে নারী সম্প্রদায়ের অধিকার অর্জন সূচিত হয় না। নারীদের এগিয়ে আসতে হবে তাদের অধিকার অর্জনের দাবী নিয়ে। তাদের বিপুল সংখ্যার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তার উপযুক্ত শক্তি নিয়ে তাদের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনে অংশ গ্রহণ করতে হবে।

এর জন্যে দরকার পুরুষ ও নারী উভয়ের পক্ষেই এক মানসিক বিপ্লব। দেশের সাংস্কৃতিক ব্যাপারে নারীদের ক্রমবর্ধমান অংশ গ্রহণকে স্বাগত জানাতে হবে এবং উৎসাহ দিতে হবে। তাদেরকে অবলা বলে দূরে সরিয়ে রাখলে চলবে না। মহাত্মা গান্ধী বলেছেন, "নারীকে দুর্বল বললে তার নামে মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হয় ; এটা নারীর প্রতি পুরুষের অবিচার।" নারীদেরও এই ধরণের অপবাদ ভুলে গিয়ে খোলা মনে ও স্বাধীন ভাবে দেশের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নে অংশ গ্রহন করতে হবে। এই ব্যাপারে তাঁরা আমাদের প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর দৃষ্টান্ত থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করতে পারেন।

অনুবাদ : প্রণবেন্দ্রনাথ রায়

# সাংস্কৃতিক বিকাশে নারীসমাজের ভূমিকা

শ্রীযুক্তা প্রতিমা বসু

রামমোহন রায় স্বয়ং নারী সমাজের সাংস্কৃতিক বিকাশে যে ধরনের আমূল সংস্কার ও পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন বা তিনি নারীকল্যাণে যে উত্তরণের পথ দেখিয়ে গিয়েছেন, এ যুগে দাঁড়িয়ে তা আমরা তাঁর অনুসরণে ও অনুকরণে মাথা পেতে নিয়েছি,—এ বলতে আমাদের লজ্জা বা সংকোচ তো নেই-ই বরং আমরা নারীসমাজ গর্ববোধই করি।

পৃথিবীর ইতিহাসে সংস্কৃতির বিকাশে নারীসমাজের ভূমিকার মূল্যায়ন কম নয়। একবার ভাবলেই বোঝা যায় মাদার টেরেসা একজন নারী হয়ে সেবাসংস্কৃতির ইতিহাসে তিনি সারাবিশ্বে কেমন ভাবে নাড়া দিয়েছেন। তাঁর এই সেবামূলক কর্মধারা শুধুমাত্র ভারতেই নয় আজ পৃথিবীর সর্বত্র সুবিদিত। শুধু কি তাই, সুদূর ফ্রান্সের এক বালিকা আজ ভারতবর্ষের মমতাময়ী শ্রীমা। তাঁর সাধনা-সংস্কৃতির মাধ্যমে পণ্ডিচেরী আজ শান্তি-সাধনার তীর্থক্ষেত্র। তাঁরই মত কত না মহিলার ভূমিকায় পৃথিবীর ইতিহাসে এমন বৈপ্লবিক সাংস্কৃতিক বিকাশ-সাধন সম্ভব হয়েছে। তাই এঁরা সবাই নমস্যা, প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গচ্যুত, দেবী।

পৃথিবীর ইতিহাসের কথা না হয় বাদই থাক। ভারতবর্ষের ইতিহাসে নারীসমাজ সুদূর অতীত থেকে আজ পর্যন্ত যে বৈপ্লবিক চিন্তাধারা ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটিয়েছে তার মূল্যায়ন দেখলে বিস্ময়ে চেয়ে থাকতে হয়। ভারতবর্ষের ইতিহাসে নারীসমাজের ভূমিকা বিশ্বশ্রুত। ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ, সুলতানা রিজিয়া ও চাঁদ সুলতানা প্রমুখের নাম কে না জানে। ফ্রান্সের মুক্তি যুদ্ধের বীর সৈনিক জোয়ান অব্ আরক্, বাংলাদেশের রোশেনারা প্রমুখ বীরাঙ্গনা যাঁরা চিরস্মরণীয় তাঁরা এই

পৃথিবীরই নারীজগতের এক একজন। আপন বীরত্ব ও মাহাত্ম্যে তাঁদের বৈপ্লবিক চিন্তাধারায় দেশের সংস্কৃতির বিকাশ। মহারাণী ভিক্টোরিয়া ও রাণী এলিজাবেথ সংস্কৃতির বিকাশে যে ভূমিকা নিয়েছেন তা কি কম গুরুত্বের?

পৃথিবীর ইতিহাসে উপমহাদেশ ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনায়িকা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর ভূমিকা আজ রূপকথা নয়। তাঁর সক্রিয় ভূমিকায় আজ শুধুমাত্র দেশের সংস্কৃতি বিকাশে নয়, সমগ্র দেশের তথা এশিয়ার ভবিষ্যত নিয়ন্ত্রণে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। পৃথিবীর ইতিহাস আলোচনাকালে সংস্কৃতির বিকাশে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নামের সঙ্গে প্রধান মন্ত্রীদ্বয় শ্রীমতী গোণ্ডামেয়ার ও শ্রীমতী সিরিমাভো বন্দরনায়েকের নামও বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া শ্রীমতী পদ্মজা নাইডুও নারী-সমাজের সংস্কৃতির বিকাশে একটি উজ্জ্বল নাম। পৃথিবীর ইতিহাসে ঐতিহাসিক শ্রীমতী এ্যানী বাসান্ত্'র নাম সবিশেষ প্রসিদ্ধি রেখে গিয়েছেন। রাজনৈতিক সুদূরপ্রসারী চিন্তা ও ভাবধারা এবং সংস্কৃতির বিকাশে এমন শীর্ষ অধ্যায় সত্যিই বিরল।

আজ পৃবিথীর ইতিহাসে সংস্কৃতি বিকাশের আলোচনা করতে গেলে শুধুমাত্র বিপ্লব নয়, রাজনীতি নয়, সাহিত্যের অধ্যায়েও নারী-সমাজের ভূমিকার কাহিনী সোনালী অক্ষরে জ্বাজ্জল্যমান দেখা যায়। বাংলার কামিনী রায় ও প্রভাবতী দেবী সরস্বতী ছাড়াও সরোজিনী নাইডু প্রমুখ বরেণ্যা সাহিত্যিক ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক বিকাশে উল্লেখযোগ্য নাম। পৃথিবীর ইতিহাসে সমাজের দিকে দিকে সমাজ কল্যাণে সংস্কৃতির অগ্রগতিতে কত না নারীকুল কত না ভিন্ন পথে সাধনা করে চলেছেন। নোবেল প্রাইজ বিজয়িণী শ্রীমতী ম্যাদাম কুরী বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় নাম। শুধু কি তাই, সেবামূলক বিশ্ব-মাঙ্গলিকী সংস্কৃতির বিকাশে ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গল এবং ভগিনী নিবেদিতা ছাড়াও বাংলার শ্রীশ্রীসারদামাণ স্বর্গচ্যুতা দেবীর মত নমস্যা।

শিল্পকলার অধ্যায়ে চোখ রাখলে আমরা সে যুগের মুঘল আমলের বাদ্‌শাহী জলসাঘরে তথাকথিত বাঈজীর যে পরিচয় পাই তাতে হয়ত বাঁকা চোখের মন্তব্যে একঘরে করে রাখার মত, কিন্তু প্রকৃতই কী শিল্পচাতুরীর ভূমিকায় তাদের দাম কী নেহাৎই সামান্য। তাদের নাচ-গান-গীত-গজল, চোখের জলের কৃষ্টি, শিল্প সাধনা, প্রাণ আর মান বাঁচানো ভূমিকায় কী দেশ কোন সংস্কৃতির চিহ্ন পায়নি? ভারতবর্ষের সংস্কৃতির ইতিহাসে মনিপুর, ভরতনাট্যম্ নৃত্য, কথাকলি, কথক্ প্রভৃতিতে নারী সমাজের শীর্ষে অমলাশঙ্করের নাম বিশ্বের দিকে দিকে। নৃত্যশিল্পের সাংস্কৃতিক বিকাশে পুনরুজীবন ও অনুশীলন প্রাচীন ভারতীয় নৃত্যকলায় পরিলক্ষিত হয়। বিশ্বভারতী, ত্রিবাঙ্কুর বিশ্ববিদ্যালয়, কামরূপনৃত্যসংঘ, দক্ষিণ ভারতের ভরতনাট্যম্, কেরালার কলামণ্ডলের অবদান উল্লেখযোগ্য। সংস্কৃতি বিকাশে নারীসমাজের ভূমিকা এ ক্ষেত্রে অমূল্য সম্পদ। পৃথিবীর পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির বিকাশে ব্যালেট নৃত্যে মিস্ র‍্যাবেনকিনার নাম সমধিক প্রসিদ্ধ। শুধুমাত্র নৃত্যে নয় সংগীত জগতেও আঙ্গুরবালা, বেগম আখ্তার, লতামুঙ্গেশকর এবং শিশিরকণা ধরঁচৌধুরী ও কল্যাণী বসুর নাম জগৎজোড়া। এছাড়া মঞ্চ ও চলচিত্র বিশ্ব সংস্কৃতির বিকাশ ইতিহাসে এক বহুবিতর্কিত অধ্যায়। পৃথিবীর ইতিহাসে শিল্পবিকাশের ভূমিকায় প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্যের সুচিত্রা সেন ও এলিজাবেথ টেলর প্রমুখ শিল্পী রূপকথার সোনার কাঠি, রূপার কাঠি নয়? বিশ্বসংস্কৃতির বিকাশে ও সমন্বয়সাধনে এঁদের দান অপূরণীয়। আজ বিশ্বসংস্কৃতির বিকাশে নারীজাতির ভূমিকার মূল্যায়নের সময় এসেছে বলেই নারী হিসেবে আমি নারী জগতের অপূর্ব কীর্তিতে গর্ববোধ করি। নারীসমাজের সংস্কৃতির কথার কী আর শেষ আছে। তাহলে শুনুন একটা গল্প। সুর সাধক তানসেনের সংগীতপ্রিয়তার কথা কে না জানে। আকবরের সঙ্গীত সভায় তানসেন রত্নমণি। তাঁর খ্যাতিতে আর সব গায়কেরা তাঁকে মারার ষড়যন্ত্র করে। দীপকরাগের তেজ নাকি মর্ত্যের গায়কের পক্ষে সহ্য করা

অসম্ভব। তানসেন সেই রাগ জানতেন। গায়কেরা বাদশার সামনে তাঁকে সেই রাগ গাইতে অনুরোধ করলেন। তানসেন বুঝতে পারলেন সেই ষড়যন্ত্র। তিনি বাদশার কাছে কদিন সময় চাইলেন, তা মঞ্জুরও হল। ইতিমধ্যে তানসেন নিজের মেয়ে সরস্বতী ও হরিদাসের শিষ্যা রূপবতীকে মেঘরাগ শেখালেন। মেঘরাগে নামে বৃষ্টি। বুনো ওলের বাঘা তেঁতুলের ব্যবস্থা করে একদিন সভায় গাইতে গেলেন। দীপক-রাগ ধরায় ক্রমশ সূর্যানল তাঁর চোখ মুখ সারা শরীরে নেমে আসে, তিনি অসহ্য হবার আগেই রূপবতী মেঘরাগ ধরলেন। সূর্যের গর্বিত মুখ ঘন কালো মেঘের আড়ালে লুকিয়ে গেল। এরপর সরস্বতী মেঘরাগে আনলেন বারিধারা। সমস্ত উত্তাপ সরে গিয়ে শীতল আব-হাওয়ায় সকলকে স্নিগ্ধ করল। ধন্য হল সঙ্গীত জগৎ। ধন্য হল তানসেন, ধন্য হল নারী জগতের সংস্কৃতি বিকাশের এক বিশ্বজয়ী অধ্যায়ের দুটি নাম—রূপবতী আর সরস্বতী।

সংস্কৃতির বিকাশে নারীজগতের ভূমিকা কেবল মাত্র গৃহকোনেই নয়; পুরুষের সঙ্গে সমান তালে তারা বিশ্বের প্রতিযোগী অলিম্পিক ও এশিয়ান গেম্‌সেও দৌড় দেয়। বিশ্বসংস্কৃতির অঙ্গ খেলাধুলার আসরেও অগ্রণীর ভূমিকায় এমন সব মহিলা আছেন যাঁদের নাম আজ আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার মুখে মুখে। তাই গর্ব করে বলতে ইচ্ছে হয়, সংস্কৃতির ইতিহাসে নারীসমাজের ভূমিকা ও তার মূল্যায়ন এক বিশ্বের স্বর্ণাধ্যায়ে প্রতিফলিত।

কী বিপ্লববাদে, কী শান্তি ও প্রগতির ইতিহাসে, আবার সাহিত্যে, শিল্পে, বিজ্ঞানে, দর্শনে—বিশ্বসংস্কৃতি রেনেসাঁসে নারীজগত বিশেষ ভূমিকায় অবতীর্ণা। নবজাগরণের যুগে চিত্রশিল্পী র‍্যাফায়েল এক অনন্য নাম। নারীজগতের আমিও এক একক হিসেবে বলতে আরো গর্ববোধ করি যে, সে যুগে বাক্ যুদ্ধের ইতিহাসে ভারতীয় সাহিত্য ও সুদূর প্রসারী দর্শন ও চিন্তাধারায় "ক্ষণা" এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী যুক্তিবিদ। যাঁর প্রবাদ আজ বেদবাণীর মত আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার মুখে মুখে। শুধু

তাই নয়, মুঘল আমলে হারেমের অন্তরালে থেকেও জাহানারা যে অমর সাহিত্যের সৃষ্টি করে গেছেন, নূরজাঁহান পর্দার অন্তরালে থেকেও জাহাঙ্গীরের রাজ্য শাসনে যে গোপন পরিচালন কৌশল দেখিয়ে গেছেন, রাণী দূর্গাবতী যে বীরত্বের অমর কাহিনী রেখে গিয়েছেন তার মূল্যায়নের মাপকাঠি বিশ্বের ইতিহাসে বিরলদৃষ্ট। সুতরাং সংস্কৃতির বিকাশে বিশ্বের প্রতি স্তরে নারীসমাজের ভূমিকা এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে সংযোজিত।

সংস্কৃতির বিকাশে নারীজাতির ভূমিকার ব্যাখ্যা এইখানেই শেষ নয়। সংসারের আবর্তে থেকেও নারীসমাজ সমাজকল্যাণে যে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে তার স্বাক্ষর দেশের দিকে দিকে। একদিকে সংসার শিশু কল্যাণ, অপরদিকে সংস্কৃতির বিকাশে জনকল্যাণ-মূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপনা। দেশের দিকে দিকে যে দারিদ্র্য, অসহায় নারীকুলের যে চরম দুর্দশা ও অন্ধকার ভবিষ্যতের ইঙ্গিত তার মোকাবিলায় পরম যত্নে কতনা নারীমঙ্গল সমিতির প্রতিষ্ঠা। এই নারী সমাজই পৃথিবীর নারী সমাজের ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারণে দেশের সংস্কৃতির বিকাশে সকল প্রতিষ্ঠানের একত্রীকরণে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ACWW'র তত্ত্বাবধানে আনা সবই নারী জগতের ভূমিকায়। আজ শুধু পুরুষের সঙ্গে সমানাধিকার বলে VOTE দেবার স্বীকৃতি নয়, ঘরে বাইরের হাজার অশান্তির দাবদাহ, উচ্ছৃঙ্খলতা ও চোখের সামনের অন্ধকারের বিরাট আকাশটাকে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে ফেলার জন্যে সমাজ কল্যাণে বিভিন্ন নারী প্রগতি সমিতির প্রতিষ্ঠা করে এই পৃথিবীর নারী সমাজ অক্লান্তভাবে ভূমিকা নিয়ে চলেছেন। আর তাই এই শ্রমের অব্যর্থ ফল স্বরূপ UNESCO, UNICEF ও FAO প্রভৃতি বিশ্ব প্রতিষ্ঠান এঁদের সাহায্য ও সহানুভূতি দিয়ে চলেছে। শৃঙ্খলা বোধের প্রসার যেখানে সুস্থ সমাজের লক্ষণ, সবুজ বিপ্লব যেখানে দেশের স্বয়ংভরতার সহায়ক, নারী সমাজ সেখানে যথাযথ সময়োপযোগী ভূমিকা গ্রহণে পিছিয়ে নেই। ঘরে শান্তি, স্বচ্ছলতা, আর দেশের ডাকে যুদ্ধাবাক্তে

শরীর ও মনোবল হারানো জওয়ানদের সেবায় Hospital ও Air-raid Shelter-এ তাঁদের সেবার ভূমিকা কম নয়। গৃহাঙ্গন থেকে শুরু করে যুদ্ধাঙ্গনাবোধ – দেশের সংস্কৃতি বিকাশে ও সর্বকৃষ্টি সমন্বয়ে নারীসমাজ জানে তাঁদের ভূমিকা কতখানি।

বিশ্বইতিহাসের আলোচনা সময় সাপেক্ষ। যৎকিঞ্চিৎ উত্থাপনে এমন গুরুত্বপূর্ণ অবদান, এমন কল্যাণময়ী ভূমিকা যাঁদের অমর করে তাঁদের কথা রামায়ণ-মহাভারতের মত অমৃত সমান বৃহৎ গ্রন্থে সমধিক। তাই সংক্ষেপে বলতে গেলেও যা ফুরোয় না এমন ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক এই নারীসমাজকে আমি শুধু একটি কথাই বলবো, "ওগো পৃথিবীর নারীসমাজ, তোমরা বিশ্বইতিহাসে এক অমর শিল্পী, বিশ্বইতিহাসে তোমরা শক্তির উৎস, তোমরা প্রাণ সঞ্চারের এক সোনার কাঠি; দেখো তোমরা নারীজগতের সামগ্রিক সংস্কৃতির অগ্রগতিতে, উত্তরণে কখনো অর্জিত ঐতিহ্য খর্ব করো না। তোমরাই যথার্থ শিল্পী, সমাজের সর্বস্তরের অবিকাশিত সংস্কৃতির কুঁড়িকে ধীরে ধীরে রূপে, রসে, গন্ধে, বর্ণে, গুণে অমর ঐতিহ্যে ভরাও॥"

# সাংস্কৃতিক বিকাশে নারীসমাজের ভূমিকা

শ্রীযুক্তা ইলা মিত্র

প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে বাঙালী নারী দেশের সাংস্কৃতিক বিকাশে কি ভূমিকা, কতটা পালন করেছিলেন, তার বিচারের মধ্যে যাব না। প্রসঙ্গতঃ শুধু একথাটা বলে রাখি যে পরাধীন দেশের সামনে ইতিহাস সেদিন যে প্রধান ও কেন্দ্রীয় কৃত্যটি তুলে ধরেছিল তা হল সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণের অপসারণ। আর সেই মূল দায়িত্ব পালন সেদিন সমাজের প্রত্যেকটি অংশের নিজ নিজ বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণেরও পূর্বশর্ত ছিল বহুলাংশেই। ভিতর ও বাইরের পর্বত প্রমাণ বাধা সত্ত্বেও বাংলার নারী সমাজ সেদিন সেই দ্বৈত ভূমিকা গ্রহণের চেষ্টা করেছিলেন সাধ্যমতো।

স্বাধীনতা লাভের পর দেশের মেয়েদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যোগ্য ভূমিকা গ্রহণের পথে অতীতে যে দুস্তর বাধা ছিল একদিক থেকে তার অপসারণের প্রশংসনীয় চেষ্টা হয়েছে আইনের সাহায্যে। বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ, সম্পত্তির অধিকার প্রভৃতি জরুরী ব্যাপারে বেশ উন্নত ধরনের আইন প্রণয়নের ফলে তাঁরা আগের চাইতে কিছুটা মুক্ত হয়েছেন সামাজিক অনাচার আবিলতা থেকে। অন্যদিকে জীবন সংগ্রামের প্রবল তাগিদে তাঁদের অনেককে বেরোতে হয়েছে জীবিকার অন্বেষণে। আবার তারই চাপে তাদের আরও বেশী করে ঝুঁকতে হয়েছে শিক্ষালাভের দিকেও। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়— এমনকি গ্রামাঞ্চলের স্কুল কলেজেও মেয়েদের ভীড় এখন আগের চাইতে বেশী।

স্বভাবতই এ সব কিছুর ফলে মেয়েরা এখন আগের তুলনায় বেশী সংখ্যায় এগিয়ে এসেছেন সাংস্কৃতিক আসরেও। সাহিত্য, নৃত্যগীত,

রঙ্গমঞ্চ, চলচ্চিত্র, চারু ও কারুকলা, খেলাধুলা, পর্বতারোহণ—সব দিকেই তাঁদের নব উদ্যমের কথা এখন শোনা যায় কিছু কিছু। প্রাকৃতিক ও সামাজিক বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রেও তাঁদের প্রয়াস আর এখন অভিনব ঠেকেনা আমাদের কাছে।

এ সব দিকে যাঁরা কৃতিত্ব অর্জন করেছেন তাঁরা যে বিশেষ অভিনন্দনযোগ্য—তা বলাই বাহুল্য। একটা মস্ত প্রশ্ন তবু থেকে যাচ্ছে আমাদের সামাজিক বিবেকের কাছে—শিক্ষা সংস্কৃতি সমুজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিতা এই সৌভাগ্যবতীরা গোটা নারীসমাজের মধ্যে কজন? ১৯৭১ সালের আদমশুমার অনুসারে আমাদের সাক্ষরতার হার শতকরা ২৯.৩। এই হার সারা ভারতের নারী পুরুষ মিলিয়ে। আমরা জানি যে সাক্ষরতার বিচারে পশ্চিমবঙ্গের স্থান আগের চাইতে এখন বেশ কিছুটা নীচে। আর এও জানি যে ভারতের সব রাজ্যের তুলনায় নারী সাক্ষরতার হার বেশ কিছুটা কম। তাই মনে হয় এ রাজ্যে মেয়েদের মধ্যে নিছক সাক্ষরতার দৌড়ও প্রতি দশজনে বড় জোর দেড় দু জনের মতো। বাকী আট, সাড়ে আটজন এখনও যে তিমিরে সেই তিমিরেই। আর এখানকার মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্ভবত নারী সাক্ষরতার অবস্থা আরো সঙ্গীন।

তারপর অক্ষরজ্ঞান অর্জন করার পরেও একটা মস্ত বিপত্তি আছে। পাঠশালা বা স্কুলের দু এক ধাপ পেরোনোর পর পরিবারের জীবন সংগ্রামের চাপে অনেককেই বাধ্য হয়ে লেখাপড়া ছেড়ে দিতে হয়। আমরা জানি চর্চার অভাবে ও চারিদিকের বিপুল অশিক্ষার আবহাওয়ার চাপে তারা ধীরে ধীরে আবার ফিরে যায় নিরক্ষরতার অন্ধকারে। পুরুষের চাইতে এ ব্যাপারটা অনেক বেশী ঘটে মেয়েদের বেলায়। কারণ বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের মেয়েদের স্কুলের কয়েক ক্লাসে পড়ার পরই বিয়ে হয়ে যায়। আর তারপর রান্নাঘর আর আঁতুড় ঘর যা নিয়ে নাকি আমাদের সংসার তার পেছনে চলতে থাকে বৃহৎ জগতের বিচিত্র ঘটনা প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন সেই—

'রাঁধার পরে খাওয়া আর খাওয়ার পরে রাঁধা,
বাইশ বছর এক চাকাতেই বাঁধা'-র মর্মান্তিক একটানা প্রক্রিয়া।

ফলে অনতিবিলম্বে সেই মেয়েরা হয়ে দাঁড়ায় সমস্ত কিছু অনগ্রসর চিন্তা ভাবনা ও কুসংস্কারের পাকা আশ্রয়। আর তার ফলে গোটা সমাজের কাছে ফলতে থাকে কবির সেই 'পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে' র প্রচণ্ড অভিশাপ।

বলা বাহুল্য এ হেন অবস্থায় সাংস্কৃতিক বিকাশের ক্ষেত্রে নারী সমাজের যোগ্য ভূমিকা পালনের সমস্ত প্রশংসনীয় প্রয়াস গোড়াতেই বিড়ম্বিত হতে যাচ্ছে। কারণ দশজনে দেড়জনের ঐ সংকীর্ণ ভিত্তির উপর কোন মজবুত ও মহৎ সৌধ গড়া কোন ক্রমেই সম্ভব নয়।

আমার মতে ঐ ভিত্তির পরিসর বৃদ্ধির চেষ্টাই আজ সংস্কৃতি ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের মেয়েদের যোগ্য ভূমিকা পালনের পূর্বশর্ত। এ কথার অর্থ নিশ্চয়ই এই নয় যে এ ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে তাঁরা যা করেছেন বা এ ব্যাপারে যে সব ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে তা বন্ধ করতে হবে। বরং তা বহুগুণ বাড়ানোর আশু প্রয়োজন। কিন্তু সংস্কৃতি ক্ষেত্রে কোন বড় মাপের পরিবর্তন ঘটাতে হলে ঐ কাজটির উপরেই সব চাইতে জোর পড়া দরকার। সামাজিক পরিবেশ ও পারিবারিক পরিবেশের মধ্য থেকেই সাংস্কৃতিক রুচি ও বোধের সৃষ্টি হয়। এই পারিবারিক পরিবেশে মায়ের ভূমিকা তথা নারীর ভূমিকা সবচেয়ে বেশী শিশুদের রুচিবোধ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে। অশিক্ষা কুসংস্কার ও দারিদ্র্যের অন্ধকারে যাঁরা ডুবে থাকেন সেই নারীরা স্বাভাবিক ভাবেই এই ভূমিকা পালন করতে অক্ষম হন। এর ফলে গোটা সমাজের ও দেশের সাংস্কৃতিক বিকাশের পথ অবরুদ্ধ হয়ে থাকে। কথাটা লেনিন বলতেন, গান্ধীজীও বিশ্বাস করতেন, শরৎচন্দ্রের লেখাতেও আমরা পড়েছি। কোন দেশ কতটা স্বাধীন তা বোঝা যায় সে দেশের মেয়েদের স্বাধীনতা দেখে। অন্তরালের গোপনতায় মেয়েদের আড়াল করে রাখাটা

সমাজের অন্ধ আর বন্ধ্যা মানসিকতরাই পরিচায়ক। যে দেশে মেয়েরা এগোয় না, সে দেশটা এগোতে চায় না। এই অন্ধতা ও বন্ধ্যাত্ব শুধু প্রস্তাব পাশ করে, আইন পাশ করে, কিংবা মেয়েদের জন্য সংরক্ষিত আসন রেখে দূর করা যায় না। এ রোগের মূলটাই উপড়ে ফেলতে হলে যা যা করণীয় তা আমাদের করতে হবে।

এই প্রসঙ্গে সোভিয়েত সমাজে নারীর ভূমিকা সম্বন্ধে দু একটি কথা বলতে চাই। ১৯৩৯ সালে হাজার করা সোভিয়েত নারীর মধ্যে উচ্চ ও মাধ্যমিক শিক্ষা প্রাপ্তের সংখ্যা ছিল ৯০, আর ১৯৭০ সালে সেটা দাঁড়ায় ৪৫২। অথচ অক্টোবর বিপ্লবের আগে স্বাধীনভাবে নিজের বাসস্থল স্থির করার অধিকারও তাদের ছিল না সেখানে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব শুধু নারীর অবস্থার বদল ঘটায়নি, তার ভাগ্যকেও আমূল ঢেলে সাজিয়েছে। সোভিয়েত রাজ্যের প্রথম দিককার ডিক্রি-গুলিতেই সমস্ত জাতিসত্তার নারী পুরুষের সমানাধিকার ঘোষিত হয়। আর শীঘ্রই বাস্তবে সে নীতি কার্যকর করার বিশাল কর্মকাণ্ড সুরু হয়। মাতা ও শিশু রক্ষার জন্য দেখা দেয় বিশেষ সার্ভিস, মেয়েদের টেনে আনা হয় উৎপাদনে, এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্রিয়া কলাপে তাঁদের শিক্ষালাভের সুযোগ করে দেওয়া হয়।

খুবই জটিল কাজ ছিল সোভিয়েত, প্রাচ্যর নারী মুক্তি-যুগযুগের জীবনযাত্রার এতটুকু নতুনত্বেই ক্ষিপ্ত প্রতিরোধ জানত সেখানে। সাংসারিক কাঠামোয় সীমাবদ্ধ নারীদের মানসিকতার কথা ভেবে মধ্য এশিয় প্রজাতন্ত্রগুলিতে গড়া হয় বিশেষ ধরনের ক্লাব—সাংস্কৃতিক-জ্ঞান প্রচারণী প্রতিষ্ঠান। নিরক্ষরতা দূরীকরণের স্কুল ও কারু কর্মচক্র ছাড়াও ক্লাবে থাকতো উৎপাদন ভিত্তিক কর্মশালা। পরপুরুষের সাথে সাক্ষাৎ হয়ে যাবে এ ভয় না রেখেই প্রতিটি মেয়ে যেতে পারতো সেখানে, বোরখা ছেড়ে ঘোমটা খোলা মুখে নারী-ডাক্তার বা আইন-বিদদের পরামর্শ নিতে পারতো। কিণ্ডারগার্টেনের প্রতিপালিকাদের কাছে ছেলেমেয়ে রেখে ঢুকতে পারতো সেলাই কারখানার কাজে। নারী

ক্লাবগুলি হয়ে দাঁড়ায় সমাজের জন্য প্রয়োজনীয় মেহনতের এক ধরনের প্রস্তুতি স্কুল। সেখান থেকে মেয়েরা যায় শিল্পে সোভিয়েত প্রতিষ্ঠানে, শিক্ষায়তনে। জীবনের সমস্ত পথ খুলে যায় তাঁদের সামনে। তাঁদের দেশের সংবিধানের ১২২ ধারায় বলা আছে 'সোভিয়েত ইউনিয়নে অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রিক সাংস্কৃতিক ও সামাজিক রাজনৈতিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে নারীদের আছে পুরুষের সাথে সমানাধিকার।'

এ নীতি কার্যকর হয় মেহনত, সমান সমান পারিশ্রমিক, সামাজিক নিরাপত্তা, বেতনসহ ছুটি প্রসূতিসদন, লালনাগার ও কিণ্ডাগার্টেনের ব্যাপক জাল বিস্তারও এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।

সোভিয়েত ইউনিয়নে নারী সাম্যের প্রশ্নটাকে রাষ্ট্রিয় পলিসি স্তরে তোলায় শুধু আইনের ধারায় নয়, বাস্তব জীবনে নারী পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠিত হয় অতি অল্পদিনের মধ্যেই। সোভিয়েত ব্যবস্থায় এ একটা বৃহৎ কৃতিত্ব। স্মরণীয় যে সোভিয়েত ইউনিয়নের বর্তমান সর্বোচ্চ সোভিয়েতে নির্বাচিত হয়েছেন ৪৮৩ জন নারী অর্থাৎ মোট প্রতিনিধিদের এক তৃতীয়াংশ। আর স্থানীয় সংস্থাগুলিতে কাজ করছেন ৯,৯২, ২৪৭ জন নির্বাচিত নারী অর্থাৎ ৪৬ শতাংশ প্রতিনিধি।

বিরাট বদল ঘটেছে শিক্ষার ক্ষেত্রে—তাঁদের উচ্চ শিক্ষার্থীদের অর্দ্ধেকেই নারী। দেশের অর্থনীতিতে উচ্চ ও বিশেষ মাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষিত কর্মীদের ৫৯ শতাংশই যে নারী তা দৈবাৎ নয়। স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যবস্থা, শরীর চর্চা, সামাজিক নিরাপত্তায় নারীদের ভাগ ৮৫ শতাংশ, শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে ৭২, শিল্প কলায় ৪৪ শতাংশ। এ থেকে দেখা যাবে যে সোভিয়েত ইউনিয়নে পুরুষের সঙ্গে নারীর প্রকৃত সামাজিক সাম্য অর্জিত হয়েছে। এবং তার ফলে সেখানকার নারীরা সাংস্কৃতিক বিকাশেও যোগ্যতর ভূমিকা পালন করছেন।

আমাদের দেশেও সাংস্কৃতিক বিকাশে নারী সমাজের যোগ্য ভূমিকা পালন করতে হলে আমাদের যে নীতি গ্রহণ করা দরকার তার মূল

লক্ষ্য হওয়া উচিত অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা, জাতীয় সংহতি এবং মানবতাবোধ যা আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যের প্রাণবন্ত উপাদানগুলি এবং আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রয়োগবিদ্যার সমন্বয়ের ভিত্তিতে রচিত।

এই লক্ষ্য সামনে রেখে আমাদের কয়েকটি প্রধান প্রধান বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়া উচিত :—

১। মেয়েদের মধ্যে সাক্ষরতা প্রসারের জন্য সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির মিলিত উদ্যম।

২। দেশের সমস্ত শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বিশেষ করে এ ধরনের নারী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এ কাজকে আবশ্যিক কৃত্য গণ্য করা।

৩। রবীন্দ্রনাথ একদিন স্কুলের দু এক ক্লাশ পড়ার পর বিয়ে হয়ে যাওয়া মেয়েদের জন্য বাংলা ভাষায় ঘরে বসে নানা বিষয়ে শিক্ষা ও বৎসরান্তে পরীক্ষা গ্রহণের যে ব্যবস্থা দিয়েছিলেন, তার প্রতি সরকার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির নজর ঘোরানো। সেখানে পাঠ্য বিষয় নির্বাচন, এমন করা দরকার যাতে স্বল্প মাত্রায় হলেও বৈজ্ঞানিক মানসিকতা গড়ে উঠতে পারে।

৪। রেডিওর মহিলা মহলের প্রোগ্রাম এখনও মোটামুটি শহরের শিক্ষিত নারী সমাজকে লক্ষ্য করে করা হয়। সে প্রোগ্রাম খর্ব না করেও পল্লীমঙ্গলের আসরের মতো প্রোগ্রাম দরকার নিরক্ষর ও স্বল্প শিক্ষিতা মেয়েদের জন্য।

৫। যাত্রার দিকে সম্প্রতি কিছুটা আমাদের নজর গেছে। তার সবটাই নিশ্চয়ই লুব্ধতা বা স্বার্থান্বেষীদের কাজ নয়। চেষ্টা করতে হবে পালাগুলিকে উন্নত ও প্রগতিশীল ভাবনায় সমৃদ্ধ করার। থিয়েটারের প্রভাবও আজ সুদূর বিস্তৃত। সে মাধ্যমও ব্যবহার করা যেতে পারে শুধু আনন্দ নয়, শিক্ষার জন্যও।

৬। কথকতা ব্যাপারটি নতুন করে প্রাণসঞ্চার করতে পারলে হয়তো নারীসমাজ বিশেষ ভাবে উপকৃত হতে পারে।

দেশের এই সংকটময় পরিস্থিতিতে বিভেদের শক্তিরা সক্রিয় হয়ে উঠেছে। দেশী ও বিদেশী অপসংস্কৃতির প্রবক্তারা শুভ বিচার বুদ্ধি ও সুস্থ মানবতাবোধ অবলুপ্ত করার ঘৃণ্য প্রয়াসে প্রমত্ত হয়ে উঠেছে। এই অশুভ শক্তি মানবতাবিরোধী শক্তিকে স্তব্ধ করে দেওয়া, পরাস্ত করা একটি মহান জাতীয় কর্তব্য। এই উদ্দেশ্যে এই ধরনের পূর্বভারত সাংস্কৃতিক সম্মেলনের উদ্যোগ আয়োজন করে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সংস্কৃতি বিকাশের পথ সন্ধানের প্রয়াস অভিনন্দন যোগ্য।

# সাংস্কৃতিক আন্দোলনে যুবসমাজের ভূমিকা

অধ্যাপক সোয়াম লোকেন্দ্রজিৎ

সংস্কৃতির রূপ বলতে সব সময়ই রাষ্ট্রনীতি-অর্থনীতি-জাতিগত ভিত্তিভূমির উপরে গড়ে ওঠা অবয়বকে বুঝি। ভিত্তিভূমি মানে হল সেই সাধারণ কাঠামো যাকে ভর করেই বিশেষ কোনও সংস্কৃতি রচিত হয় এবং যার বাইরে তার অস্তিত্ব অকল্পনীয়। কোনও রাজনীতিক নেতৃত্বাধীনে সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী এবং রাজনীতিক গোষ্ঠী অভিন্ন হয় তখনই যখন সেই সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী তার অস্তিত্বরক্ষাকারী রাজনীতিক ছত্রচ্ছায়ায় বিকশিত হয়ে ওঠে। অপরপক্ষে, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ এবং আচরণগত পদ্ধতিও রাজনীতির সীমা অতিক্রম করতে পারে স্বীকৃতির দ্বারা কিংবা প্রভুত্বময় সম্প্রসারণের সাহায্যে অথবা সুশৃঙ্খলাভাবে আদান প্রদানের মাধ্যমে। কতকগুলি সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ সার্বজনীন হলেও সংশ্লেষণ পদ্ধতির দিক থেকে এক সাংস্কৃতির গোষ্ঠীর সঙ্গে অপর সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর ফারাক লক্ষ্য করা যায়। এক দিক থেকে প্রতিটি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীই স্বতন্ত্র—এদের যেমন সামান্যধর্ম আছে তেমনি আছে বিশিষ্টতা। যেকোনও সংস্কৃতির এই স্বাভাবিক অনন্যতাই তার প্রাণের লক্ষণ। এই অনন্যতাকে সযত্নে রক্ষা করতে হয় অন্য সংস্কৃতির পাশাপাশি এবং পারস্পরিক সংঘাতের মধ্যে।

সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে জৈবিক সঞ্চালন ক্রিয়ার সঙ্গে তুলনা করে বলতে পারা যায় সে প্রতিটি সংস্কৃতির নিজস্ব বিকাশের নিয়ম আছে। আর এই বিকাশের ব্যাপারে দুটি সার্বজনীন সূত্রের প্রভাব সহজেই লক্ষ্য করা যায়: বিরোধের সূত্র (Law of contradictions) এবং পারস্পারিক ক্রিয়ার সূত্র (Law of interactions)। একথা অবশ্য একটু ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে।

ব্যক্তিসত্তায় বিরোধ : কোনও ব্যক্তিসত্তার মানসক্ষেত্র যেন নির্জ্ঞান ও সংজ্ঞান, আনন্দানুভূতি ও বাস্তবানুভূতি, মুক্তি ও নিগ্রহ, জীবন ও মৃত্যু এইসব বিরোধী বিষয়ের এক গতিময় সমন্বয়। ফ্রয়েডের ভাষায় বলতে গেলে এ হল চূড়ান্ত পরিতৃপ্তির সঙ্গে বাস্তবধর্মের মারাত্মক সংঘাত যা তাকে সম্ভাব্যতার সুদূরে ঠেলে দেয়। এই প্রতিকূল সংগ্রামে জয় হয় বাস্তবেরই। মানুষ ক্রমে বিলম্বিত ও সংকুচিত কিন্তু নিশ্চিত আনন্দের স্বার্থে ক্ষণিক অনিশ্চিত ও ধ্বংসাত্মক আনন্দ বর্জন করতে অভ্যস্ত হয়। সমাজের পক্ষে উপকারী শ্রমের বেদীতে কামপ্রবৃত্তির ক্রমান্বয় বিলোপসাধনের ফলেই সংস্কৃতির উদ্ভব হয়। পরিতৃপ্তির সহজাত প্রেরণার অবদমনের উপরই সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা। আর তাই সকল সাংস্কৃতিক বিকাশের মূলে আছে স্বাধীনতার সঙ্গে সংস্কৃতির, প্রতিষ্ঠিত শক্তির সঙ্গে অন্তর্ঘাতের শক্তির এবং পূর্বতন প্রজন্মের সঙ্গে নব্য প্রজন্মের দ্বন্দ্ব।

সমাজের বিরোধ : ব্যক্তিসত্তার যে বিরোধ তা আসলে আদিম মানবগোষ্ঠী থেকে সর্বোত্তম সভ্যতা অবধি অবদমিত সংস্কৃতির বিকাশেরই এক স্থিতিশীল প্রতিফলন। মানুষের স্বাধীনতাকে যদি সকলের পক্ষেই বাস্তব করতে হয় তবে সংস্কৃতির দ্বন্দ্বকে অবশ্যই শুধুমাত্র অবদমিত সংস্কৃতির বহিঃক্ষেত্রে নির্দেশ করতে হবে। এই দিক থেকে সকল সাংস্কৃতিক আন্দোলন বা বিপ্লব স্বতঃই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। মুক্তি সুদূরপরাহত, মানবিক সুখ স্বপ্নমাত্র। তাই শক্তির প্রবল প্রাচুর্য নিয়েও আজ যুবসমাজের ভূমিকা হয়েছে নঞর্থক—প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃতির প্রতি তার ফরিয়াদ এবং মানব সম্ভাবনার শেষ কথা হিসাবে এই দমনমূলক সংস্কৃতিকে তার প্রত্যাখ্যান।

সাংস্কৃতিক আন্দোলন এবং যুবসমাজের অংশগ্রহণ বিষয়ে এই সাধারণ আলোচনার পর আমি আঞ্চলিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এর বিশ্লেষণে প্রয়াসী হব।

ভারতের উত্তরপূর্বাঞ্চল নিয়েই আমার বিশ্লেষণ শুরু করব। কারণ উত্তরপূর্বাঞ্চল হতেই বহুবিধ ধরণের আন্দোলন উদ্ভূত হয়ে যে শক্তির সঞ্চার করছে ভারতের জাতীয় ঐক্যে তার সুনিশ্চিত প্রতিক্রিয়া আছে। এখানে একপ্রকার "সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদ"-এর সৃষ্টি হচ্ছে। সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদ বলতে বোঝাতে চাচ্ছি বহুবিচিত্র সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর অস্তিত্ব যেগুলির প্রতিটিই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং এক মহান সাংস্কৃতিক ধারায় বিকশিত হয়ে ওঠার সম্ভাবনাময়। তবে লোকসংখ্যার কারণে কিংবা শিল্পভিত্তিক সভ্যতা সঞ্জাত শক্তি থেকে বঞ্চিত হওয়ার দরুন অথবা পরিবেশের জন্য এইসব সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর বিকাশ ব্যাহত হচ্ছে। এ ধরণের সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদ থাকাই ভাল এবং তাকে উৎসাহ জোগান উচিত উচ্চতর সংহত সাংস্কৃতিক ধারা গড়ে ওঠার তাগিদে। তবে আশঙ্কার কারণ ঘটে তখনই যখন এইসব সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী রাষ্ট্রনীতিক স্বাধীনতার জিগির তুলে স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত হতে প্রয়াসী হয়। তথাপি, এটা স্বীকার্য, কোনও সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর পক্ষে স্বাতন্ত্র্য বা আত্মপ্রক্ষেপণ একান্তই স্বাভাবিক। ট্র্যাজেডিটা হল এই যে, স্বাতন্ত্র্যবোধের এই সংকট কিন্তু স্বাধীন রাষ্ট্রচেতনা প্রত্যাখ্যানের কারণ হচ্ছে না। সংস্কৃতির সীমানা আর রাজনীতির সীমানা পরিণামে একই বিন্দুতে গিয়ে মিশবে কিনা তা বিচারের ভার অবশ্য ইতিহাসের। "বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য" এই নীতিসূত্র মেনে নিয়েও যদি দেখা যায় যে বিভিন্নতাই ব্যাপক অথচ ঐক্য প্রকৃতপক্ষে নাগালের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে না সেক্ষেত্রে সমাজবিজ্ঞানীর দায়িত্ব হবে এইসব আপাত বিরোধী বিষয়-সমূহের সঙ্গে সামগ্রিক কাঠামোর অসামঞ্জস্যের প্রকৃতি নির্ণয় করা। সমাজবিজ্ঞানীকে অন্বেষণ করতে হবে বিচ্ছিন্নতার স্বরূপ এবং প্রতিশ্রুত মুক্তির উৎস। নিরাময়ের পথনির্দেশ করতেও হবে।

এই প্রসঙ্গে আমি আর একটি বিষয়ের অবতারণা করার লোভ সামলাতে পারছি না। বিষয়টির নাম দেওয়া যেতে পারে "সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ'। সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের মূল ভিত্তি হল এই যে

সংস্কৃতির সীমানা প্রাকৃতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক সীমারেখাকে অতিক্রম করে যেতে পারে। কিন্তু শুধু এটুকুই সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ নয়—সংস্কৃতির সম্প্রসারিত সীমা আবার ঘোষিত রাষ্ট্রনৈতিক ও প্রশাসনিক সীমার দ্বারা সুদৃঢ় করা চাই। এরই সঙ্গে যুক্ত হতে পারে বৃহত্তর সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর নিজের সংস্কৃতিকেই সমগ্র হিসাবে চিহ্নিত করায় সদাজাগ্রত প্রবণতা। তারপর সৃষ্টিশীল সংশ্লেষণের নামে "এক"-কে চাপিয়ে দেওয়া হয়। এর পশ্চাতে যেসব সমাজতাত্ত্বিক প্রেরণা ক্রিয়াশীল সেগুলি হল: লোকসংখ্যাগত ঠাণ্ডা লড়াই, আদিবাসী উচ্ছেদ এবং দেশজ সংস্কৃতির উচ্ছেদ।

লোকসংখ্যাগত ঠাণ্ডা লড়াই বলতে আমি বোঝাতে চাইছি জনগণের নির্গমনের দ্বারা নতুন করে জনবিন্যাস এবং পরিবেশগত রূপান্তর সাধন। ডারউইনের স্বাভাবিক নির্বাচনের তত্ত্ব থেকে আধুনিক 'প্রভাবের পরিমণ্ডল' তত্ত্ব, এমনকি ভাষাগত ও রাষ্ট্রনীতিগত সীমানা—সবের ক্ষেত্রেই এটি প্রযোজ্য। এ ব্যাপারে ত্রিপুরার দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা চলে। শ্রীমতী নীরা চট্টোপাধ্যায় পরিষ্কার বিবরণ দিয়ে লিখেছেন: "এখানকার বৈশিষ্ট্য হল এই যে ত্রিপুরার আদিবাসী জনগণ বৃহত্তর জনমণ্ডলীর বিপুলতার মধ্যে লুপ্ত হতে চলেছে এবং এমনভাবে ও যে পরিমাণে নতুন সাংস্কৃতিতে অভ্যস্ত হতে শুরু করেছে দেশে যাঁর তুলনা পাওয়া ভার। জনসংখ্যার পুনর্বিন্যাস ও পরিবেশগত পরিবর্তন, পরপর কয়েকটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ব্যাপকহারে সড়ক ইত্যাদি নির্মাণ, আর্থনীতিক ও রাজনীতিক সম্প্রসারণ এবং সর্বোপরি আদিবাসীদের নিজেদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জটিলতা থেকে উদ্ভূত নানা চাপ—এসবের ফলে আদিবাসী জনগণের মধ্যে পরিবর্তনের বাতাস বইছে এবং সেই হাওয়ার চোটে তাদের পুরাতন জীবনযাত্রার ভগ্নাবশেষ বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যেতে বাধ্য।" (Tripura and her tribal people: North-Eastern Affairs-July-September '72 issue, Vol. 1/No. 2)। অপর একটি উদাহরণস্থল

হল কাছাড়। বাঙলাদেশ মুক্তি সংগ্রামের সময় এখানে ১, ৪৭, ৪৭৭ জন শরণার্থী আশ্রয় নেন। (Bangla Desh—documents: a Govt. of India Publication) তার মধ্যে প্রচুর লোক এখনও কাছাড়ে রয়ে গেছেন। বহিরাগত এই প্রচুর জনসংখ্যার দরুন কাছাড় জেলা কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়ের কাছেই সমস্যাসঙ্কুল হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাছাড়ের এই জনস্রোত মনিপুর কেন্দ্রীয় জেলার জিরি এলাকায় অনুপ্রবিষ্ট হয়ে নিউ কাছাড় রোড ধরে একেবারে মূল এলাকায় ঢুকে পড়েছে। এর ফলে খুব শীঘ্রই আর্থনীতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যবিধান সম্পর্কিত জটিল সমস্যা দেখা দেবে। জনসংখ্যার এই পুনর্বিন্যাস তথাকথিত সুসংবদ্ধ সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর উপরেও প্রভাব বিস্তার করতে চলেছে। ভাষাগত যে কোনও গোলযোগই নির্ভুল ভাবে নির্দেশ করে ভাষাগত স্বাতন্ত্র্যের জন্য সংগ্রাম এবং সেই সংক্রান্ত প্রতিক্রিয়া এবং তারও প্রতিক্রিয়ার দিকে। এদিকে লক্ষ্য রেখেই ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের নীতি গ্রহণ করা হয়েছে, যদিও সেই প্রয়াসে ঐতিহাসিক প্রামাণ্যতার অভাব এবং স্বদেশী সংস্কৃতির দাবি সোচ্চার।

আদিবাসী উচ্ছেদ হতে পারে দু রকম ভাবে – বিতাড়ন করে কিংবা সংস্কৃতির উপর আঘাত হেনে। জনবিন্যাসে হেরফের ঘটিয়ে ও আর্থনীতিক চাপ সৃষ্টি করে এবং জমি থেকে উচ্ছেদ করে বিতাড়নের কাজ হতে পারে। ত্রিপুরা এ ব্যাপারে একটি ভাল নিদর্শন। আর, বৃহত্তর সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর মূল্যবোধকে আদিবাসী সংস্কৃতির উপর চাপিয়ে দিয়ে সাংস্কৃতিকভাবে উচ্ছেদ চালানো হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা চলে খ্রীষ্টীয় মিশনারিদের দ্বারা ধর্মান্তরকরণের চেষ্টা এবং তার প্রতিক্রিয়া হিসেবে পরে হিন্দু মিশনারিদের অনুপ্রবেশের ঘটনা।

দেশজ সংস্কৃতির উচ্ছেদ হচ্ছে সেই পদ্ধতি যার দ্বারা জাতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির উপর নতুন করে পোঁচড়া বোলান হয়।

বহিরাগত মানুষ ও সংস্কৃতি যখন দেশীয় সংস্কৃতিকে আবৃত করতে চায় তখনই এরকম ঘটে।

কোনও সংস্কৃতির মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী একটি ক্ষুদে সংস্কৃতি গড়ে উঠলে মোটামুটি এই সব লক্ষণ ফুটে ওঠে—স্বপ্রযুক্ত বিচ্ছিন্নতা, শর্তসাপেক্ষ সাংস্কৃতিক আন্তঃ-প্রতিক্রিয়া, অসহায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে দেশীয়দের হাত থেকে রক্ষা করার 'মহান' ব্রত ঘোষণা, দেশী সংস্কৃতির মূল প্রবাহে অংশ গ্রহণের বদলে জনসংখ্যাগত পরিসংখ্যানের উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ, জনসংখ্যাগতভাবে এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে প্রভুত্ববিস্তারের গোপন বাসনা, দেশী ভাষা জানা সত্ত্বেও সেই ভাষায় মনোভাব প্রকাশে অনীহা। দেশজ সংস্কৃতি উচ্ছেদের এই উদগ্র প্রয়াস থেকেই বিভিন্ন স্থানের প্রাচীন নাম পর্যন্ত পরিবর্তন করতে চাওয়া হয়। অথচ ঐ ধরণের দেশীয় নাম থেকেই সেই জায়গার ইতিহাস সহজে খুঁজে পাওয়া সম্ভব। একই উদ্দেশ্যে দেশীয় ব্যক্তিদের সাম্প্রদায়িক, বিরুদ্ধবাদী এবং বিদেশীদের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ রূপে চিত্রিত করা হয়ে থাকে। সাংস্কৃতিক মিশ্রণের ক্ষেত্রে ব্যর্থতাকে এই ভাবেই ঢেকে দেওয়া হয়। আবার, এক সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর সঙ্গে অপর সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর বিরোধ এবং সকল সাংস্কৃতিক বিকাশের মধ্যে অন্তর্নিহিত স্ববিরোধকে রহস্যাবৃত করে তোলার অভিপ্রায়ে হীনমন্যতা বা উচ্চমন্যতার গালগল্প আমদানি করা হয়।

সংস্কৃতির উগ্র স্বদেশিয়ানা আসলে সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ থেকেই জন্ম নেয়। সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে বিরোধের ফলে এই সাংস্কৃতিক উগ্র স্বদেশিয়ানা আবার তত্ত্বগত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের অস্তিত্ব যেই লুপ্ত হয় তখনই সংস্কৃতির উগ্র স্বদেশিয়ানাও মিলিয়ে যায়।

পরিস্থিতি যদি এ রকম হয় তবে আজ এই অঞ্চলের যুব সমাজের কর্তব্যকর্ম কি?

বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে নিহিত নিজস্ব বিরোধ এবং এক সংস্কৃতির সঙ্গে অপর সংস্কৃতির বিরোধের পরিপ্রেক্ষিতে নতুন নতুন সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র ও ভিত্তিভূমি আবিষ্কার করাই হল প্রকৃতপক্ষে সেই কাজ।

তবে আমাদের যুবসমাজ কোনও বিশেষ সংস্কৃতির ভিত্তিভূমি চিহ্নিতকরণ বা সাংস্কৃতিক ধারার বিকাশ সন্ধান অথবা কোনও যুগের সাংস্কৃতিক তাৎপর্য অন্বেষণ করতে গিয়ে যেন আমাদের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার ব্যাপারটা গুলিয়ে ফেলে ভুল না করেন। বৃহত্তর সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত যুবসমাজের অবশ্যই উপলব্ধি করা চাই যে, কোনও জনগোষ্ঠীর মহত্ত্ব সাংস্কৃতিক বিস্তারসাধনের মধ্যে নয় বরং প্রগাঢ় সৃষ্টিশীলতার মধ্যেই নিহিত। যে সংস্কৃতি তার আপন সহজাত সৃষ্টিশীলতাকে প্রত্যাখ্যান ক'রে সম্প্রসারণ একীকরণ ও স্থিতাবস্থা দাবি করে তাকে চিরকালের মত বিদায় জানানো উচিত।

অপরপক্ষে, ক্ষুদ্রতর সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর তরুণ সম্প্রদায়ও যেন কেবল বিচ্ছিন্নতাকেই তাঁদের স্বতন্ত্র্যচিহ্ন বলে ধরে নেওয়ার ভুল সিদ্ধান্ত থেকে মুক্ত থাকেন। তাঁদের অনুভব করা চাই, সাহসিক আন্তঃ-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমেই তাঁরা নিজেদেরকে এবং আপন সাংস্কৃতিকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন। সবরকম ভাবধারার প্রতিই তাঁদের খোলা-মন থাকাউচিত। বিকাশকালের একেবারে সূচনায়, প্রধানত জনসংখ্যাগত কারণে, যেটুকু আশ্রয় তার প্রয়োজন সেখানে নিজস্ব দাবির প্রামাণি-কতা এবং ভারতের উদার জনমত জাগ্রত করার মত প্রাণশক্তির উপর ভরসা রাখতে হবে। প্রকৃত সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ যে সকল সংস্কৃতির পক্ষেই সুনিশ্চিত ভাবে সর্বজনীন এই মহান উপলব্ধির দ্বারদেশে আজকের তরুণসমাজ উপনীত। এটা কোনও আধ্যাত্মিক বা অতীন্দ্রিয় বা ধর্মীয় উপলব্ধি নয়, এটা পুরোপুরি বিজ্ঞানসম্মত মানবিক ও যুক্তিসিদ্ধ পথেই লব্ধ। অবমাননা বা অত্যাচারের অতীত স্মৃতি

থেকে আজ যুবসমাজের মুক্ত হওয়া চাই। শুধু ত তাঁরাই মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করতে পারেন যে তাঁদের নিজস্ব সংস্কৃতিতে এবং অন্য সংস্কৃতিতেও বিরোধ আছে। আর তাঁরাই ত সেই বিরোধকে সেই পরিণতির দিকে টেনে নিয়ে যেতে পারেন যেখানে সংস্কৃতি আর স্বাধীনতা সমার্থক হয়ে গেছে। পূর্বতন সংস্কৃতির বিলোপ ঘটিয়ে সম্পূর্ণ নতুন এক সংস্কৃতির উদ্‌ভব ঘটবে এই পদ্ধতির দ্বারা।

ভারতীয় সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত ঐক্য বজায় রাখতে হলে তার বৈচিত্র্যের ধর্মকে উপলব্ধি করা চাই। এই ধরণের এক সাংস্কৃতিক ধারার মধ্যেকার দ্বন্দ্বকে সামগ্রিক একীকরণের দ্বারা দূর করা সম্ভব নয়। বৃহত্তর সাংস্কৃতিক ধারার অঙ্গীভূত সকল সাংস্কৃতিক ধারার একযোগে বিকাশ সাধনের দ্বারাই তা সম্ভব। একথা বলা ভুল যে হিন্দুধর্মই ভারতীয় সংস্কৃতির সংহতিসূত্র। অন্তত আজকের ঐতিহাসিক বিকাশের পর্যায়ে হিন্দুধর্মের কোনও সাংস্কৃতিক ভিত্তিই আমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করছে না। সংখ্যাধিকের সংস্কৃতিই ভারতীয় সংস্কৃতি—এই কদর্য ভ্রমাত্মক তত্ত্ব সম্পর্কেও সতর্ক থাকা উচিত। সত্যিকারের মানবিক সমাজ গড়ার জন্যে নতুন সাংস্কৃতিক ভিত্তিভূমির সন্ধানে প্রাচীন ঐতিহ্যের উর্ণাজাল ছিন্ন করতে পারে বা ছিন্ন করছে আমাদের যুবসমাজ। 'অখণ্ডতার প্রয়োজন' সম্বন্ধে বললে যেন একটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করা হয় যে ভারতের কোনও ঐক্য নেই। এটা কিন্তু সাংঘাতিক ভুল। ইতিহাসের উত্থানপতন এবং রাষ্ট্রনীতিক ভাঙাগড়ার মধ্যে ভারতীয় সংস্কৃতি এবং তার সাংস্কৃতিক পরিসীমা যে রক্ষিত হয়ে আসছে সেজন্য আমরা গর্ববোধ করি। স্বভাবত বা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ভারত কোনও দিনই সমপ্রকৃতির নয় বলে এটা খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার। এখানেই নিহিত তার সংস্কৃতির গোপন সূত্র। তাই একে সাংস্কৃতিক অখণ্ডতা বলার চেয়ে সাংস্কৃতিক ঐক্য বলাই উচিত। ভারতের অখণ্ড সংস্কৃতির কথায় আমি যদিও শঙ্কিত হই, তবু ভারতের সাংস্কৃতিক ঐক্যের জন্য আমি সানন্দে প্রাণ দিতে

প্রস্তুত। এটা নিশ্চয় যুবসমাজের মনোভাবেরই প্রতিফলন। ভারতীয় সংস্কৃতি শৌর্যের দ্বারা লালিত হয়নি, লালিত হয়েছে সর্বজনীন মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টির দ্বারা। এটা তাৎপর্যময়। ভারতীয় সংস্কৃতি বা অন্য যে কোনও সংস্কৃতির কথাই বলুন না কেন, সবক্ষেত্রেই সংকট উপস্থিত হয় যখন পরম মূল্যবোধকে প্রত্যাখান করে তার জায়গায় নতুন কিছুকে ঠাঁই দেওয়া হয়। সমাজের শক্তির ভাণ্ডার যে যুবসমাজ তারা যেমন ধ্বংসাত্মক ভূমিকা নিতে পারে তেমনি সৃষ্টিশীল ভূমিকা গ্রহণেও সমর্থ।

আজকের যুগে গোটা পৃথিবীর যুব আন্দোলনে এক অভূতপূর্ব ঐক্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে। প্রভুত্বকামী এবং স্বাধীনতাবিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে আজ যুবসমাজ সর্বত্র একটি শিবিরে একতাবদ্ধ হয়েছে। আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী ভূমিকার বিরুদ্ধে মার্কিনী যুবসম্প্রদায়ের প্রতিবাদ, প্রথাগত মার্কসীয় তত্ত্বালোচনায় মোহমুক্তি, পার্থিব নরক সৃষ্টিকারী আথিক প্রাচুর্যময় সমাজ সম্বন্ধে স্বপ্নভঙ্গ—এ সবই বিশ্বময় ব্যাপক যুব-আন্দোলনের মূল প্রবাহের সঙ্গে যুক্ত। ঝোঁকটা সরে এসেছে উন্নতি থেকে মুক্তির দিকে, অধিকারবোধের জায়গায় সকলের জন্য সুখের প্রতি। উদ্দেশ্যের এই অভিন্নতা আজ সকল দেশের যুবসমাজকে একসূত্রে বেঁধেছে অনগ্রসর দেশ আর প্রাগ্রসর দেশের মধ্যেকার অসামঞ্জস্য দূর করার লড়াই-এ। সকল দেশের তরুণ সম্প্র ায় এক মিলনবিন্দু খুঁজে বের করার তাগিদে সব কৃত্রিম বেড়াজাল ভেঙে ফেলতে উদ্যোগী হয়েছে। মাও সেতুং বৈপ্লবিক আদর্শবাদকে জীইয়ে তোলার অভিপ্রায়ে দলীয় আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে যে যুবশক্তিকে প্রয়োগ করেছিলেন এতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

মানবমুক্তি এবং সর্বজনের সুখের সম্ভাবনাকে যাঁরা অবাস্তব বলে মনে করেন তাঁরা অবশ্য যুব আন্দোলনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সন্দিহান হবেন। যে সব ব্যক্তি দ্বান্দ্বিক তত্ত্ব মানেন না তাঁরা এর তাত্ত্বিক যৌক্তিকতাকে অস্বীকার করবেন। তবে এই সব অভিযোগ যাঁরা তোলেন তাঁদের নিজেদের শিবিরে অসাম্য ও অবিচারের কথা আজ আর অবিদিত নেই। তাই এই তারস্বরে অস্বীকারের ভেতরে যুবসমাজ যে এক উদ্‌গত শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে তারই আশঙ্কা প্রকাশ পাচ্ছে।

অনুবাদ ঃ অমিতাভ মুখোপাধ্যায়

# যুবসমাজ ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন

অধ্যাপক কমলেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়

সেই যে ছেলেটি, কলকাতার শহরতলি লেক টাউনের যে ছেলেটি রাজ কাপুরের 'ববি'র উদ্বোধনী প্রদর্শনী দেখতে গিয়ে ভিড়ের চাপে পিষ্ট হয়ে মারা গেছে, সে বেশ কিছুটা আলোকপাত করে ঠিক এই সময়টায় আমাদের দেশের যুবকদের সাংস্কৃতিক জীবনের উপর। লেকটাউনের বাসিন্দাদের কাছ থেকে যুবকটি সম্পর্কে বেশ একটা কৌতূহলোদ্দীপক রিপোর্ট পাওয়া যায়। ছেলেটি তার মৃত্যুর আগের সারারাত নাকি জেগে ছিল। সারারাত জেগে সে নাকি একটি আধুনিক গানের জলসা শুনে খালিপেটে ভোররাতে গিয়ে সিনেমার কিউতে দাঁড়ায়। একটু চোখকান-খোলা নাগরিক মাত্রেই জানেন কি অকল্পনীয় খেপামি আর ভিড় হচ্ছে কলকাতার ঐ হিন্দী ছবিটার হল-গুলোতে। সারারাত সারাদিন সংস্কৃতি সেবনে ব্যস্ত, অভুক্ত, দুর্বল ছেলেটা সেই দারুণ ভিড়ের চাপে ও ঠেলাঠেলির সঙ্গে লড়তে পারেনি, ঐ সিনেমা হলের উঠোনেই সে মারা যায়। স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে স্বাভাবিক কারণেই সিনেমার মত mass media সাংস্কৃতিক জীবনের বিরাটতম অংশকে দখল করে আছে—সেই ছেলেটিকে আমি না চিনলেও আমি নিশ্চিত জানি, যে সিনেমা সে দেখতে গেছল, তা দেখার অনেক আগেই বিবিধভারতী ও পুজোর মাইক মারফৎ তার সমস্ত গান তার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, দাঙ্গা, দেশভাগ, উদ্বাস্তু কলোনী, ত্রিশ লক্ষ বেকার যুবক, যুক্তফ্রন্ট সরকার, নকশাল বাড়ী থেকে শুরু করে বর্তমানের প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক মোর্চা ও অকল্পনীয় আক্রার বাজারের সাক্ষী কলকাতা ও তার শহরতলির এই ছেলেটিকে এখানের অনেকেই চেনেন। আমার শুধু মাঝে মধ্যে মনে হয় ওর এই অমানুষিক

সিনেমাপ্রেমকে ঠিক ভাবে চালাতে পারলে ওকে কি কলকাতার একটা বিরাট youth film Society র দায়িত্বশীল সংগঠনকে পরিণত করা যেত ? কিম্বা কোন সরকারী আধা সরকারী পয়সায় পুনায় পাঠিয়ে ওকে আর একটা ঋত্বিক ঘটক-মৃণাল সেন বা সত্যজিত রায় তৈরী করা যেত ? আমার এক বন্ধু, যার বয়স আমাদেরই মত, যে তিনটে ডকুমেণ্টারী ছবি করে এখন চুপচাপ হাত গুটিয়ে বসে আছে, সে কিন্তু চলচ্চিত্রের ঐ সব মহারথীদের নাম করলে চটে যায়। বলে, আর সব ক্ষেত্রের মত সিনেমায়ও তরুণ চলচ্চিত্রকারদের পূর্বসুরীরা তাদের ভবিষ্যৎ পতাকাবাহীদের জন্য বিন্দুমাত্র দায়িত্ব ও পালন করে যাননি। যার ফলে বছরের পর বছর ধরে এ রাজ্যের চলচ্চিত্র শিল্পে এমন এক অবৈজ্ঞানিক পরিবেশ, এমন এক জট পাকানো অবস্থা তৈরী হয়েছে যাকে কাটিয়ে উঠে আমাদের তরুণ চলচ্চিত্র কর্মীদের একটা মাত্র ছবি করার সামান্যতম উচ্চাশা পূরণ হওয়াই দুষ্কর—সিনেমার কায়েমী স্বার্থ বা রাজকাপুরের 'ববি'র জীবনদর্শনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা তো অনেক দূরের কথা। ১৯৫৭ তে ৫৭ টা বাংলা ছবি, ৬৭ তে ২৮ টা, '৭৭ এ ১৪ টায় নামবে কিনা তার বিরুদ্ধে যখন কোন নিশ্চয়তা নেই এবং বর্তমান সাংস্কৃতিক জগতে যে শিল্পটির প্রভাব প্রায় পরম ব্রহ্মের মতই—সে শিল্পের তরুণ কর্মীরা যদি সিনেমা হলের স্বল্পতা, টাকা বিনিয়োগের শূণ্যতা, সারা ভারতের বাজার মাত করা জঘন্য ব্যাবসাদারী ছবির আক্রমণ, 'স্টার-সিস্টেমে'র অন্তর্ঘাত—এ সবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সংস্কৃতি আন্দোলনে সরকার, আধা সরকারী প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক দল গুলোর প্রার্থিত পৃষ্ঠপোষকতা না পেয়ে যদি ক্ষোভ ও হতাশায় ভেংগে পড়ে বলেন যে : 'পথের পাঁচালী' ১৮ বছর আগে যে নতুন আলোর সন্ধান দিয়েছিল, সে আলো আজ ব্যবসায়ী পুঁজির কালো টাকার মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। তাহলে কি তাঁদের খুব একটা দোষ দেয়া যাবে ? এ হতাশা বা ক্ষোভ শুধু তরুণ চলচ্চিত্রকারদের মধ্যেই নেই, এ চিত্র সাহিত্য, চিত্রকর, ভাস্কর, নাট্যকর্মী, গাইয়ে বাজিয়ে—সব ক্ষেত্রের তরুণ কর্মীদের মধ্যেই পরিব্যাপ্ত।

আসলে আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে, তরুণদের পোশাকে-আশাকে, চুলে এবং জুলপিতে, স্কুল এবং কলেজ জীবনের আচার ব্যবহারে, মা-বাবা-ভাইবোন-আত্মীয় পরিজন-বন্ধু বান্ধব প্রেমিক-প্রেমিকা—প্রত্যেকের সঙ্গে সম্পর্কের pattern-এ রাজকাপুরদের যে প্রচণ্ড সর্বগ্রাসী প্রভাব এসেছে—তা আর কাউকে নতুন করে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে না। অথচ মজার কথা এই যে আমাদের দেশের ডাকসাইটে যুবনেতাদের বাড়ীর দেয়ালে টাঙ্গানো থাকে শ্রীঅরবিন্দ, লেনিন, সুভাষ-চন্দ্র কিম্বা গান্ধীর ছবি, হাতে থাকে মার্কস, জওহরলাল, মাও-সে তুং এর বই—আর হাজার হাজার চেলারা দিব্যি লম্বা চুল আর জুলপি রেখে, বেলবটম আর ফুলকাটা সার্ট পরে দল বেধে 'ডাবল-ক্রশ', 'জনি মেরা নাম' কিম্বা 'চৌরঙ্গী' নাটকের ক্যাবারে দেখতে যান। আসলে আমাদের সংগঠিত যুবআন্দোলন, আমাদের তরুণ ও যুবকদের সাংস্কৃতিক জীবনে কোন রকম নেতৃত্ব দিতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন। অবশ্য এ ব্যর্থতার পুরো দায়টা যুব-ছাত্র আন্দোলন বা যুব-ছাত্র নেতাদের ওপর চাপিয়ে দেয়াটা খুবই অন্যায় হবে।

আসলে ভারতবর্ষতো রাজনৈতিক গণতন্ত্রের দেশ। তাই প্রথম ও শেষ পর্যন্ত সব কিছুর দায়িত্বই গিয়ে বর্তাবে সরকার এবং রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর। সে দিক থেকে দেখতে গেলে আমাদের জাতীয় সাংস্কৃতিক জীবন গড়ে তোলার ব্যাপারে কি কংগ্রেস, কি মার্কসবাদে বিশ্বাসী বামপন্থী দলগুলো, কেউই বিশেষ কিছু করে উঠতে পারেননি। পার্টি হিসাবে কংগ্রেস যেমন আমাদের একটি জাতীয় সাংস্কৃতিক জীবন গড়ে তুলতে বিরাট ব্যর্থতা দেখিয়েছে ; তেমনি নেহেরুর মত প্রধানমন্ত্রী রাধাকৃষ্ণনের মত রাষ্ট্রপতি সত্বেও এ বিষয়ে সরকারী ব্যর্থতাও পর্বত প্রমাণ। কখনো বিভ্রান্তিকরভাবে, কখনো নিছকই আমলাতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে চিরাচরিত সরকারী কায়দায় পৃষ্ঠপোষকতা বিতরণ করে, কিম্বা বিভিন্ন সংস্থাকে আর্থিক আনুকূল্য দিয়ে সরকার আমাদের প্রার্থিত জাতীয় সংস্কৃতির চেহারাটাকে আরো ঘোলা করেই তুলেছেন

মাত্র। আমি বুঝিনা কি করে নাটকের ব্যাপারে একই সঙ্গে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, শোভা সেন এবং বারবধূর নির্মাতা রাষ্ট্রপুরস্কার পান। মন্ত্রীদের ডেকে নাটক দেখানোতে ভাল পাবলিক রিলেশনস্ অফিসারের গুণ থাকতে পারে, তাতে কি বিশেষ শিল্পগুণ আছে আমি জানিনা। একই সঙ্গে বলরাজ সাহানী ও রাজেন্দ্র কুমার কি করে 'পদ্মশ্রী' খেতাব পান এটাও আমার কাছে প্রহেলিকা। আর এটা আমার কাছে নিশ্চিতই বেদনাদায়ক যে কলকাতায় একটা অপেশাদার দলগুলোর জন্য নাটমঞ্চ করার জন্য উদয়শঙ্কর ও শম্ভু মিত্র জমি পান না এবং বিড়লার কলামন্দির ভাড়া করে নাটক দেখিয়ে তার জন্য ভিক্ষা করতে হয়। বামপন্থী দলগুলোর ব্যর্থতাও এ ব্যাপারে বিরাট আকারের। জাতীয় সংস্কৃতির চেহারা সম্পর্কে এরা কখনো দারুণ সংকীর্ণতাবাদী হয়ে অচলায়তন ও রক্তকরবীর লেখক রবীন্দ্রনাথকে পুরো 'বুর্জোয়া' বলে ঘোষণা করেন। কখনো সস্তায় বাজীমাত করার জন্য সমাজ এবং সাহিত্যে অশ্লীলতা নিবারণের জন্য একশ জন যুবকের মিছিল করে 'আনন্দবাজার' অফিসে ঢিল মারেন কিম্বা সুরেন ব্যানার্জী রোডের কিছু পরনোগ্রাফী বিক্রির দোকান তছনছ করেন। কখনো বা পার্টি সদস্যরা দলবেধে সংগঠিত ভাবে উৎপল দত্তের 'কল্লোল' দেখেন পরমুহূর্তেই উৎপল দত্তের 'তীর' দেখে পার্টির নামে অপর দলের উদ্দেশে দেয়ালে ছড়া লেখেন ঃ

'তীর এঁকেছ বন্ধু
কোথায় তোমার তীরন্দাজ
তোমার নেতা উৎপলদা
আমেরিকান গোলন্দাজ!'

সাংস্কৃতিক আন্দোলনে বামপন্থীদের অস্থিরচিত্ততারই প্রমাণ হয়। যাই হোক সব মিলিয়ে রাজনৈতিক দলগুলো এবং সরকারের সাংস্কৃতিক আন্দোলনে এই ভয়াবহ ব্যর্থতাই আমাদের যুবকদের সাংস্কৃতিক জীবনকে এত দ্রুত নীচে নামিয়ে নিয়ে গেছে।

সাংস্কৃতিক জীবন তথা আমাদের সিনেমা-থিয়েটার নাচ গানকে পণ্য দ্রব্য করে বাজারে বিক্রি করে যারা বাথরুমে কালো টাকা জমায় —এ সম্বন্ধে যেন কোন সন্দেহ না থাকে যে তারা ভালভাবে সংগঠিত এবং সমাজের ওপরতলা থেকে একেবারে নীচু তলা অবধি এদের প্রভাব অপরিসীম। কিছুটা লোকসঙ্গীত কিছুটা রাগসঙ্গীত আবার কিছুটা পশ্চিমী পপ্ মিউজিক মিশিয়ে, কিছুটা যৌন-আবেদন, কিছু দেশপ্রেম আবার এমন কি কিছুটা শ্রেণী সংগ্রাম পাঞ্চ করে যে ককটেল এরা তৈরী করেন তার গতিবিধি metro সিনেমা থেকে গণ্ডগ্রামের খোড়া চালার অস্থায়ী সিনেমা অবধি। কলামন্দির রবীন্দ্রসদন থেকে শুরু করে সুদূর মফঃস্বল শহরের রঙ্গমঞ্চ অবধি ব্যবসায়িক নাটকের ক্যাবারের পদভারে কাঁপে। এবং রাস্তায় যে দশ বছরের ছেলেটি কাগজ কুড়িয়ে বেড়ায় সে নিশ্চিত ভাবেই তার পকেটে সযত্নে রাজেশ খান্নার স্ত্রীর ফটো জমিয়ে রাখে। আর অন্যদিকে উচ্চবিত্তদের এক স্কুলের নীচু ক্লাসের পরীক্ষায় গান্ধীজীর স্ত্রীর নাম কি এই প্রশ্ন করা হলে উত্তর পাওয়া যায়ঃ গান্ধিজীর দুই পত্নী। একজনের নাম কস্তুরবা, অন্য জনের নাম বিনোবা। সুতরাং আমাদের সমাজে এবং অর্থনীতিতে-রাজনীতিতে কায়েমীস্বার্থ যেমন শক্তিশালী, প্রচণ্ড প্রভাবশালী, প্রতাপান্বিত তেমনি আমাদের সংস্কৃতি জীবনেও তারা তাই। অপর পক্ষে এদের বিরুদ্ধে সংস্কৃতিক্ষেত্রে যাঁরা লড়াই করতে চান, তাঁরা অত্যন্ত অসংগঠিত, বিচ্ছিন্ন, ব্যক্তিকেন্দ্রিক। ফলে দুচারটে তাৎপর্যপূর্ণ কাজ কোন মতে করে উঠতে পারলেও পরমুহূর্তেই এরা নিভে যান. অথবা প্রতিপক্ষর কাছে আত্মসমর্পণ করে বা প্রতিষ্ঠার খাতিরে নীতিহীন আপস করেন। সংস্কৃতি জগতের কায়েমী স্বার্থের আক্রমণের কাছে তাই এরা অধিকাংশ সময়েই ধুলোর মুখে উড়ে যাচ্ছেন। এদের বিরুদ্ধে তাই ঠিকমত লড়তে হলে চাই প্রচাণ্ড ঐক্য এবং সংগঠন। এবং তার সঙ্গে বিশাল সংগঠিত পৃষ্ঠপোষকতা। এবং তা সম্ভব করতে পারেন একমাত্র তরুণ বুদ্ধিজীবি ও সাংস্কৃতিক

কর্মীরা। সে কাজের পেছনে বিশাল পৃষ্ঠপোষকতা টেনে আনতে পারেন সংগঠিত ভাবে আমাদের যুব সমাজ। আমাদের সংগঠিত যুব-ছাত্র আন্দোলন। এবং একথা তো ঠিক যে একটু কিছু করতে পারলেই আমাদের দেশের সংস্কৃতিপিপাসু এবং বিরাট সংখ্যক মনোরঞ্জন-পিপাসু জনসাধারণ দারুণ পৃষ্টপোষকতা করেন। একটু Pseudo-progressivism একটু বিপ্লব-সমাজ পরিবর্তন বা সশস্ত্র সংগ্রামের মশলা থাকলেই পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়া যায় মৃণাল সেনের 'কলকাত ৭১', উৎপল দত্তের 'টিনের তলোয়ার', ব্যারিকেড বা টোটা তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

আমাদের সংস্কৃতিজীবনের এই যে বামন রূপ, এই যে অসঙ্গতি, কোনটা আমাদের জাতীয় সংস্কৃতি আর কোনটা নয়—তা নিয়েই যে প্রচন্ত বিভ্রান্তি এবং দিশেহারা ভাব—তার জন্য নিশ্চিতই বিরাট ভাবে দায়ী আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা। সংস্কৃতি শিক্ষার জন্য কোন ভিন্ন স্কুল-কলেজ থাকেনা, তার ভিত্তি তৈরী হয় সাধারণ ভাবে শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে। এত ইংরেজী নির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হয়েছে আমাদের দেশে যে তার উপর নির্ভর করে আমাদের তরুণদের মধ্যে জাতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে কোন বোধ গড়ে ওঠাটাই বোধহয় অসম্ভব। ইংরেজ চলে গেছে পঁচিশ বছর হল কিন্তু এই পঁচিশ বছরে Nursery-Kindergarten পর্যায় থেকে কলেজ অবধি কত যে অসংখ্য ইংরেজী ভাষা-মাধ্যমের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে তার আর ইয়ত্তা নেই। আমার খুব মজা লাগে যখন দেখি একটি মারোয়াড়ী একটি পাঞ্জাবী তরুণীকে দেখেই, 'tti' বলে সম্বোধন করে অনর্গল জয়পুরী আর ঠেঁট অমৃতসরী উচ্চারণে ইংরেজীতে কথা বলে যাচ্ছে। খুব মজা লাগে যখন দেখি বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত শ্রীযুক্ত মুখুয্যে কিম্বা শ্রীমতি বাড়ুয্যে তার ৮ বছরের বাচ্চাকে কথ্য ইংরেজীতে কথা বলানোর জন্য ট্রামে বাসে প্রাণান্তকর চেষ্টা করে যান। যত দিন যাচ্ছে এ সব ছেলেমেয়েরা তত কম কম যোগীন সরকারের হাসিখুশী, রবীন্দ্রনাথের কথা ও কাহিনী, উপেন্দ্রকিশোরের

টুনটুনির বই আর সুকুমার রায়ের ঝালাপালা পড়ছে। রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, তারাশঙ্কর, মানিক ও বিভূতিভূষণের সঙ্গে অপরিচয় ক্রমশঃই বাড়ছে আমাদের যুবকদের। আমি জানি বেলবটম প্যান্ট আর গোগো গগল্‌স্ পড়ুক আর নাই পড়ুক—আমাদের যুবকদের আর কোনদিনই তেমন করে কালিপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত ও রাজশেখর বসুর রামায়ণ পড়া হয়ে উঠবে না। তাদের মা ও ঠাকুরমারাও তাদের আর তেমন করে পড়িয়ে শোনাবেন না। ফলে আমাদের তরুণ ও যুবকদের এদেশের পুরোন যে সব জিনিষগুলো নিয়ে গর্ববোধ করা উচিত, তা তারা আদৌ বোধ করবেন না। বোধহয় সেগুলোর সঙ্গে তাদের আর পরিচয়ই হবে না। নিজেদের দেশজ, জাতীয় সংস্কৃতি জীবনকে এরা কিছুতেই ঠিকমত চিনে উঠতে পারবেন না। এই শিক্ষা-ব্যবস্থা থাকলে তা চেনার কোন আগ্রহ এদের মধ্যে গড়ে ওঠা সম্ভবও নয়। কেননা গোড়াতেই যে ইংরেজী নির্ভর শিক্ষা এরা পান—তা এত অদ্ভুত ও আধাখ্যাঁচড়া, তার সঙ্গে দেশের বাস্তব জীবনের, প্রাণের কোন যোগ নেই। এই শিক্ষাব্যবস্থা তাই আমাদের তরুণদের এবং দেশজ সংস্কৃতি ও জীবনের মাঝখানে এক প্রায় নিশ্ছিদ্র দেয়াল গড়ে তোলে। দেশের সঙ্গে প্রায় সংযোগবিহীন, ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির ধারক ও বাহক এই শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে না সাজালে সংস্কৃতি-আন্দোলনের এগোনও অসম্ভব। সংগঠিত যুব-ছাত্র আন্দোলনের দ্বারাই তা একমাত্র সম্ভব।

আমাদের দেশের তরুণ সংস্কৃতি কর্মীদের কাছে আমার অনুরোধ তারা যেন শুধু অপসংস্কৃতি ও কায়েমী স্বার্থকে গালাগাল দিয়ে, কিছু আপ্তবাক্য আউড়েই তাদের কাজ শেষ না করেন। তাদের নিজেদের কর্মক্ষেত্রেও তাদের যথেষ্ট উপযুক্ত হওয়া দরকার। নিজেদের শিল্প-কর্মকে তারা যদি যথেষ্ট জনপ্রিয় করে তুলতে না পারেন তা হলে সংস্কৃতি জগতের কায়েমী স্বার্থের একচেটিয়া কারবারের সঙ্গে

প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তারা বারবার হারবেন। সবসময়েই, সবদেশেই জন-সাধারণ সংস্কৃতি ও মনোরঞ্জন পিপাসু হয়ে থাকেন। কিন্তু জাতীয় সংস্কৃতির নামে যা কিছুই করা হোক না কেন, তা যদি বালির মত বিস্বাদ হয় তাহলে জনসাধারণ অপসংস্কৃতির তেলেভাজা খাবেনই— পরে যতই তা নিয়ে হজমের গোলমাল হোক না কেন। কিছুদিন আগে দেবানন্দ না রাজকাপুর কে যেন বলেছিলেন, যে আগে একটা বম্বের ছবি super hit করলে ২০ লাখ টাকা লাভ হত। আর আজকাল সে ছবি মাঝারী গোছের সাফল্য লাভ করলেই কয়েক কোটি টাকা মুনাফা হয়। মজার কথা এই যে এই কোটি কোটি টাকা আসে টাটা বা বিড়লার পকেট থেকে নয়, আসে এই নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত এবং প্রায় বিত্তহীন দুর্ভাগা জনসাধারণের পকেট থেকেই। ভাল অথচ স্বাস্থ্যকর সাংস্কৃতিক উৎপাদন তাই অক্লেশেই জনসাধারণের পৃষ্ঠপোষকতা অর্জন করতে পারে যদি তার জনসাধারণের মনোরঞ্জন করার ক্ষমতা থাকে। চ্যাপলিনের ছবিগুলো তার জ্বলন্ত উদাহরণ। কঠিন হলেও আমাদের তরুণ সংস্কৃতিকর্মীরা সে ক্ষমতা অর্জন করলে তবেই চ্যালেঞ্জটা জমে উঠবে। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় এটাই যে একটা শারদীয় আনন্দ বাজার কয়েকটা উপন্যাস, বেশকিছু ছোটগল্প, একটা গোয়েন্দা কাহিনী ও রসরচনা নিয়ে যতটা মনোরঞ্জক হয়, সে তুলনায় একটা শারদীয় কালান্তর, সত্যযুগ বা নতুন বাংলা ততটা হৃদয়গ্রাহী হয় কি? তা না হলে জনসাধারণ আট টাকা দিয়ে শারদীয় আনন্দবাজারই কিনবেন, শারদীয় পরিচয় বা এক্ষণ কিনবেন না —আমরা যতই না বিলাপ করি।

যাই হোক সব শেষে আমি বলি এই সব আলোচনা সভার সার্থকতা সেইখানেই তা যখন সর্বস্তরে আমাদের তরুণ সংস্কৃতি কর্মীদের আরো আত্মবিশ্বাসী আরো সংগঠিত, আরো দক্ষ ও আরো লড়‌্কু করে তুলতে পারবে। এবং তাদের তা করে তোলার পূর্ব শর্ত হচ্ছে তাদের জন্য ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতা জোগাড় করতে হবে। এবং তা

করতে হবে বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক, সরকারী, আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে। যে পৃষ্ঠপোষকতা সংগঠিত করা উচিত রাজনৈতিক আন্দোলন ও বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনের নেতাদের। তা আসা উচিত ব্যাপকভাবে রাজনৈতিক দলগুলোর তরফ থেকে। তাহলেই আমাদের তরুণরা সংস্কৃতির কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে ভাল করে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারবেন। তাহলেই আবার 'অযান্ত্রিকের' মত বিশুদ্ধ শিল্পকর্ম থেকে 'চলচ্চিত্র চঞ্চরীর' মত নির্মল আনন্দের সংস্কৃতি কর্মের জোয়ার লেগে যেতে পারে এ পোড়াদেশে।

আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনের ভয়াবহ চেহারা দেখে কিন্তু সবাই-ই চিন্তিত। সবাই আক্ষেপ করেন। কিন্তু সবাই এক হয়ে কি করে এর বিরুদ্ধে লড়াই করা যায়, কি করে সে লড়াইর মঞ্চ তৈরী করা যায় তা নিয়ে কোন নির্দিষ্ট নিদান তৈরী করে উঠতে পারছেন না। সে নির্দিষ্ট চিন্তা যখন বয়োজ্যেষ্ঠরা করে উঠতে পারছেন না, তাই সে দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে হবে আমাদের তরুণ বুদ্ধিজীবি ও সংস্কৃতি কর্মীদের। একাজে পৃষ্ঠপোষকতা করতে হবে আমাদের সংগঠিত যুব সমাজকে, সরকারকে এবং রাজনৈকি দলগুলোকে। এবং যত তাড়াতাড়ি তা হবে ততই আমাদের দেশের সংস্কৃতি জীবনের পক্ষে তা মঙ্গলের। দেরী হলে বড্ড বেশী ক্ষতি হবে। বহুরূপীর ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে বিষ্ণু দে স্টেটসম্যান-এর এক লেখায় বলেছিলেন, "Life in our area of the world is so full of hazards of struggle, of suffering — and of quite often early death. And the aesthetic efforts of an individual demand the assuring sense of probability of the present and the future. And that is true not merely of our sheer livelihood in the physical biological sense. It is true for our weak little world of the life of the mind too. As Basanta Mallik our legendary philosopher friend and elder before he left India

for the last time for his dear old Oxford once told a young man how difficult it is, how very hard for a young man of any talent to keep it up in this suck-out, dried up country, how the young man must be very careful and alert not to allow any waste of his gifts or allow his work to get diluted and deadened. Yes, it is somewhat like Gray's ELEGY but throughout life's own long graveyard."

তরুণ বহুরূপী ও তরুণ শম্ভু মিত্রকে পঁচিশ বছর ধরে অনেক লড়াই করেই আজকের শম্ভু মিত্র ও আজকের বহুরূপী হতে হয়েছে। লড়াইটা চালিয়ে যেতে হবে যাতে আমাদের তরুণ সংস্কৃতি কর্মীরা জীবনের এই 'own long graveyard'এ কারবার চাপা না পড়ে যান। এবং লড়াই হওয়া উচিত প্রচণ্ড ঐক্যবদ্ধ সংগঠিত লড়াই। অনেক কিছু নিয়ে তর্ক বিতর্ক থাকলেও, আমাদের সংস্কৃতিজীবন যে খুবই বিপন্ন তা নিয়ে কারো কোন তর্ক নেই। কাজেই দেশকে ভালবাসার সমস্ত আবেগকে এক করে সব দলমতের তরুণরা সংস্কৃতি জীবনের কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে এক যুক্ত মঞ্চে দাঁড়িয়ে আগামী দিন গুলোতে লড়ুন—তবেই দেশের সংস্কৃতি জীবনের সংকট থেকে মুক্তি পাবার একটা রাস্তা দেখা দেবে।

# সাংস্কৃতিক আন্দোলনে ছাত্রসমাজের দায়িত্ব

গৌতম ঘোষ

'সংস্কৃতি' কথাটি ব্যাপক এবং গভীর অর্থবহ। এককথায় সমাজকে যদি কাঠামো ( Structure ) ধরা হয় তবে সংস্কৃতিকে বলা চলে উপরি কাঠামো ( Super-structure )। কাজেই সমাজের সঙ্গে সংস্কৃতির যোগাযোগ এবং সম্পর্ক খুবই নিবিড়। সমাজের অর্থাৎ সমাজব্যবস্থার অগ্রগতির অথবা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই তাই সংস্কৃতির অগ্রগতি বা পরিবর্তন ঘটা স্বাভাবিক। যেহেতু সমাজ-ব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যায় উৎপাদনের উপকরণের মালিকানা কোন শ্রেণীর দখলে বা ক্ষমতায় আছে তার উপর। সংস্কৃতির পরিচয়ও তাই সেই সময়কার সমাজব্যবস্থার মধ্যেকার শ্রেণী-চরিত্র সম্পর্কিত হতে বাধ্য। সামাজিক রাজনৈতিক ক্ষমতা যদিও শাসক শ্রেণীর হাতেই থাকে তবুও একথা ঠিক যে, প্রত্যেকটি জাতীয় সংস্কৃতির ভেতরে শোষকদের সংস্কৃতির প্রকট উপাদানগুলির পাশাপাশি প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির উপাদানও থাকে হয়তো শুধু অঙ্কুরাকারেই, কারণ প্রত্যেকটি জাতির মধ্যে আছে মেহনতী ও শোষিত জনসাধারণ যাদের জীবনযাত্রার অবস্থাই অনিবার্য-ভাবে জন্ম দেয় গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের মতাদর্শ, সেই গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক উপাদানগুলিই ঐতিহ্যের অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে স্বীকৃতি পায় নবসংস্কৃতি রচনার কাজে।

এই নবসংস্কৃতি রচনার কাজে বা তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজে সমাজের অন্যান্য স্তরের মানুষের সাথে তাই ছাত্রসমাজও এক গৌরবজনক ভূমিকা পালন করে। ছাত্ররা সংস্কৃতির অন্যতম দিক শিক্ষার সঙ্গে জড়িত। 'ছাত্র' কথাটিও 'সংস্কৃতি'র মত গভীর এবং ব্যাপক অর্থবহ। লাতিন ভাষায় 'Student' বা 'ছাত্র' কথাটির আভিধানিক অর্থই হল 'পরিশ্রমী' হিংগুটে পড়ুয়া।' এই

'পরিশ্রমী হিংগুটে পড়ুয়ার দল'—ছাত্রসমাজ পৃথিবীর সবদেশেই সবকালে সংস্কৃতি রক্ষার এবং তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজে অবদান রেখেছে যথেষ্ট। অর্থাৎ সাংস্কৃতিক আন্দোলনে ছাত্রসমাজের ভূমিকা বরাবরই ছিল। অ্যারিস্টটলের যুগ থেকে সুরু করে অথবা আমাদের দেশের সুপ্রাচীন কালের গার্গী, মৈত্রেয়ী প্রমুখাদের যুগ থেকেই নিজ নিজ আমলের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন করতে তৎকালীন শিক্ষার্থীবৃন্দ নানা উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। তন্ত্রবাদের ধামিক বেড়াজাল মুক্ত হয়ে প্রগতিশীল চেতনাসম্পন্ন শ্রীবুদ্ধের শান্তি মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের বাণী শোনাতে পৃথিবীব্যাপী যাঁরা প্রচারাভিযানে বেড়িয়েছিলেন, তাঁরা ছিলেন বৌদ্ধ দর্শনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থীরা। পরবর্তীকালের মধ্যযুগের বাঙলায় গোঁড়া রক্ষণশীল মুসলিম ধর্মান্ধতার আগ্রাসী অভিযান যখন বাঙলার সাংস্কৃতিক জগতকে কালিমালিপ্ত করেছিল তখন তার বিরুদ্ধে শ্রীচৈতন্য তৎকালীন যুগের প্রগতিশীল সামাজিক পরিবর্তনের জন্য যে নতুন উদারপন্থী ধর্মভিত্তিক ভাববাদী সাংস্কৃতিক পালা বদলের পালার কাজ শুরু করেছিলেন তার অন্যতম প্রাণশক্তি ছিল নবদ্বীপের টোলগুলির শিক্ষার্থীবৃন্দ। সেদিনের সাংস্কৃতিক আন্দোলনে ছাত্রসমাজের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গৌরবজনক। সমাজের পিছিয়ে পড়া অংশের শোষিত মানুষকে সমাজ প্রগতির আন্দোলনে সামিল করাতে নবদ্বীপের টোলগুলির শিক্ষার্থীদের অবদান তাই তৎকালীন যুগের প্রগতির পথে, সংস্কৃতির রক্ষা ও তার বিকাশের পথে এক বিরাট অবদান সম্পন্ন।

আরও পরবর্তীকালে নব্যবঙ্গের দীক্ষাগুরু হেনরি-লুই-ডিভিয়ান ডিরোজিও নতুন যুগচেতনার দিকনির্দেশের দেশপ্রেমের বাণী শুনিয়েছিলেন তাঁর শিক্ষার্থীদের কাছে। বিদ্রোহী সত্তার মুক্তিপ্রয়াস সমন্বিত মানবপ্রেমের চেতনাদীপ্ত নতুন যুগের নতুন সংস্কৃতি গড়ে তোলার আকাঙ্খায় ডিরোজিওকে কেন্দ্র করে তাঁর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ

ছাত্রগোষ্ঠীই উত্তরকালের বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ, সংস্কৃতিবিদ ও কর্মবীর হিসাবে নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন।

আরও পূর্ববর্তী বা পরবর্তীকালের সাংস্কৃতিক জগতের প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করলে স্বভাবতই আরও অনেক তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। সমাজের তরুণ বুদ্ধিজীবী অংশের অন্যতম শরিক হিসাবে তাই ছাত্র সমাজ বরাবরই নিজ নিজ দেশের সংস্কৃতির আন্দোলনে তাদের অবদান রেখেছে অসামান্য। ইতালীয় রেনেসাঁ বা তৎকালীন ও তৎ পূর্ববর্তী বা পরবর্তীকালীন সময়ে মিকেলেঞ্জোলো, রাফায়েল, দা-ভিঞ্চি, রেপিন, রেমব্রান্ট, ভ্যানভাগ, ভাঁ-তুস প্রমুখদের শিল্প চেতনায় ইওরোপ যে নবযুগের নবচেতনার উন্মেষ ঘটছিল তার সমর্থনে সে আমলের শিক্ষার্থীসমাজ যে নতুন জোয়ার সৃষ্টি করেছিল পরবর্তীকালের ইতিহাসেও ছাত্রসমাজ সে ভূমিকা বজায় রেখেছে। লাতিন আমেরিকার মেক্সিকোতে সিকুয়েরাস যখন বিভিন্ন অঞ্চলের বাড়িগুলোর দেয়ালে ছবি এঁকে বেড়াতেন, যখন ফরাশী দেশের রাজপথে পাবলো পিকাসোর সুনিপুণ তুলির টান দুনিয়াজুড়ে তুলকালাম ফেলেছে, অথবা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর যখন সোভিয়েত ইউনিয়নে ভ্লাদিমির মায়াকভ্স্কি বা ম্যাক্সিম গোর্কী ঝোড়ো পাখীর গান শোনাচ্ছেন; ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে ব্রেটোল্ট ব্রেশ্টের কবিতা ও নাটক যখন আগুনের ফুল ফোটাচ্ছে; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিগ্রো মানুষেরা যখন পল্ রোবসনের গান শুনে আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়ে জয়ের আকাঙ্খায় সংগ্রামের পতাকার তলায় সামিল হচ্ছে; পাবলো নেরুদা, ইলিয়া এরেনবুর্গ, আর্নেস্ট হেমিংওয়ে প্রমুখেরা যখন ফ্যাসীবিরোধী ট্রেঞ্চের মধ্যে নবজীবনগাথা রচনার কাজে ব্যস্ত তখন তাঁদের জীবনমুখী শিল্পসৃষ্টির কাজে যারা মদত দিয়েছিলেন নিঃসন্দেহে তাঁরা হলেন বিশ্বের প্রগতি আন্দোলনের মূল পরিচালিকা শক্তি। সমাজের মেহনতী মানুষের পাশে সেদিন উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিল তৎকালীন বুদ্ধিজীবী সমাজের

প্রগতিশীল অংশ। এই বুদ্ধিজীবী সমাজের পাশে তাই সেদিনের অন্যতম শক্তি ছিল বিক্ষুব্ধ জোড়ো যৌবনের অংশীদার ছাত্রসমাজ। তাই সেদিন প্যারিসের লাতিন কোয়ার্টারে, মস্কোর বলগর থিয়েটারে, ড্রেসড্রেনের আর্ট গ্যালারীতে কিশোর পড়ুয়াদের জ্বলজ্বলে চোখগুলো গভীর নিমগ্নতায় নতুন প্রাণবন্যার গতিবেগে ভরপুর থাকত। আমাদের দেশেও সমসাময়িককালে এই প্রগতিবাদী ঐতিহ্যের পতাকা উড্ডীন রেখেছে এদেশের ছাত্রসমাজ। মাইকেল প্রমুখেরা সাহিত্যের জগতে প্রবেশ করেছিলেন হিন্দু কলেজকে ঘিরে তৈরী হওয়া 'ইয়ং বেঙ্গল'-কে কেন্দ্র করেই। বিদ্যাসাগর, রামমোহন প্রমুখেরা যখন কুসংস্কারাছন্ন সমাজের মধ্যে প্রগতিবাদী চিন্তাধারার সূত্রপাত ঘটালেন তখন শিক্ষিত তরুণ ছাত্রদের ভূমিকা গোঁড়ামী আর কুসংস্কারের বেড়াজাল ডিঙিয়ে নতুন উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল। ছোট বয়সে ইস্কুল পালানো ছেলে রবীন্দ্রনাথ যখন শান্তিনিকেতনকে ঘিরে নতুন স্বপ্ন দেখছেন তখন তাঁর সে স্বপ্নকে বাস্তবে রূপদান করতে যাঁরা অগ্রণী হয়েছিলেন তাঁরা হলেন শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতীর ছাত্রসমাজ। সাম্রাজ্যবাদ প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থাকে বয়কট করার আহ্বান জানিয়ে দেশপ্রেমের জোয়ারে যখন নতুন জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হল (—যা আজকের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়) তখন তাকে সার্থক করে তুলতে দেশপ্রেমিক ছাত্রসমাজ স্বজাতি ও স্বদেশী সংস্কৃতির প্রতি যে শ্রদ্ধার্থ নিবেদন করেছিলেন তা অবিস্মরণীয়।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতন এদেশেও তাই সমাজের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বহু পথিকৃৎ তাঁদের সৃষ্টিশীল জীবনের বিকাশ ঘটানোর কাজ সুরু করেছেন ছাত্রজীবন থেকেই। অপরদিকে তরুণ বুদ্ধিজীবী হিসাবে এদেশের ছাত্রসমাজ আমাদের স্বদেশীয় সংস্কৃতির বিকাশ ঘটানোর কাজে বরাবরই অগ্রণী ভূমিকা পালন করে এসেছে। অতি সম্প্রতিকালের সংস্কৃতিজগতের বিভিন্ন শাখায় আজ যাঁরা সুপ্রতিষ্ঠিত ও স্বনামধন্য তাঁদের অনেকেই নিজেদের কর্মশক্তির সৃষ্টিশীল

দিকগুলোকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন তাঁদের ছাত্রাবস্থা থেকেই। সাংস্কৃতিক আন্দোলন যেহেতু সমাজপ্রগতির আন্দোলনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত সে কারণে সংস্কৃতিবিদরাও পিছিয়ে পড়ে থাকেননি তাঁদের নিজেদের আমলের বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করতে। সে কারণেই নয়া দুনিয়ার দর্শনের ভাবধারায় এঁরা হয়েছেন অনুপ্রাণিত। মাটির কাছাকাছি এসে কামার-কুমোর-মজুর-কৃষক-কেরানি-বুদ্ধিজীবী প্রমুখ সকল স্তরের নিপীড়িত মানুষের সাথে তাই এঁরা হয়েছিল একাত্ম। আর সে কারণেই ভবিষ্যৎ জীবনে এঁরা নিজেদের স্থান করে নিয়েছেন। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, তরুণ সান্যাল, অমিতাভ দাশগুপ্ত; গল্পকার ও সাংবাদিক সোমেন চন্দ, ননী ভৌমিক, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেশ রায়; সংগীত শিল্পী সুচিত্রা মিত্র, সলিল চৌধুরী, নির্মলেন্দু চৌধুরী, স্বপন গুপ্ত; অভিনেতা অজিতেশ বন্দোপাধ্যায়, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, বিভাস চক্রবর্তী, চিন্ময় রায় প্রমুখ সকলেই সেদিন জীবনধর্মী সংগ্রামী মিছিলের সাথে নিকট আত্মীয়তা অর্জন করেছিলেন। কেউ বা ছিলেন কলেজের ছাত্র, কেউ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমনকি এঁদের অনেকেই ইস্কুল জীবন থেকেই নিজেদের যুক্ত করেছিলেন সমাজ-প্রগতির লড়াইতে। গোপাল হালদার, বিষ্ণু দে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, চিন্মোহন সেহানবীশ, দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন, সুশোভন সরকার, দেবব্রত বিশ্বাস, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ সেদিন সাংস্কৃতিক আন্দোলনে ছাত্র সমাজের গৌরবময় ভূমিকা পালনে আন্তরিক সহানুভূতির হস্ত প্রসারিত করেছিলেন সস্নেহ সহযোগিতার মাধ্যমে। যা তাঁরা আজও করেন অনেকে। আর সে কারণেই আজকের বহু প্রখ্যাত সংস্কৃতিবিদরা সেদিনের সাংস্কৃতিক আন্দোলনে ছাত্রসমাজের গৌরবময় ভূমিকার ফলশ্রুতি।

স্বভাবতই সাংস্কৃতিক আন্দোলনে ছাত্র সমাজের আজ যে দায়িত্ব পূর্বসূরীদের দায়িত্ব তার থেকে খানিকটা পৃথক ছিল। স্বাধীনতার ২৬ বছর পরে স্বভাবতই আমাদের ভূমিকা, কর্তব্য বা দায়িত্ব প্রকৃতিগত দিক থেকে কিছুটা পরিবর্তিত। যদিও মূল বা মৌলিক দায়িত্ব যা ছিল তাই-ই রয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ সংস্কৃতি যেহেতু সামাজিক কাঠামোর উপরি কাঠামো সেই হেতু সাংস্কৃতিক আন্দোলনে অংশ গ্রহণের অর্থ হল সামাজিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ। সংস্কৃতি যেহেতু কোনো নিরপেক্ষ বস্তু নয়, সেই কারণেই সাংস্কৃতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ কখনই নিরপেক্ষ হতে পারে না। জীবনমুখী বাস্তবজ্ঞান-সম্পন্ন সংস্কৃতিকে গড়ে তোলার আকাঙ্খা তাই আজকের ছাত্র-সমাজের প্রধান আকাঙ্খা হওয়া উচিৎ। সে কারণেই সমাজ প্রগতির স্বপক্ষে খোলাখুলি অঙ্গীকার ব্যতিরেকে আজ কোনো সাংস্কৃতিক আন্দোলন সম্ভব নয়। আমাদের দেশের অগ্রগতিকে ব্যাহত করতে চাইছে যে অশুভ শক্তি তা হল সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদ এবং সামন্ততন্ত্রের অবশেষ। কাজেই এই তিন মূল বা প্রধান শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামের খড়্গ শাণিত না করে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অগ্রগতি অসম্ভব। পুরানো সামন্ততান্ত্রিক কুসংস্কারাছন্ন ধ্যানধারণা এবং ক্ষয়িষ্ণু ধনতান্ত্রিক ও মুমূর্ষু সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করে আন্দোলনের অগ্রাভিযান অসম্ভব। যে সমাজব্যবস্থা হতাশগ্রস্ত নুয়েপড়া মুখোশধারী পলায়নী সংস্কৃতির জন্ম দেয় সে সমাজব্যবস্থা বর্জন করার মধ্য দিয়েই সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অগ্রগতি ঘটবে। কাজেই আমাদের দেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় যখন সামন্ততান্ত্রিক বা দাসপ্রথার যুগে ফিরে যাবার আহ্বান জানিয়ে আদি রসাত্মক রচনা প্রকাশিত হয় তখন বুঝতে হবে তা সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবার কথা বলে না বরং পিছন দিকে নিয়ে যেতে চায় আর সে কারণেই সে সংস্কৃতির বিরুদ্ধে লড়াই-এর ডাক অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত। অপরদিকে অবক্ষয়ের ছাপ

নিয়ে যখন সাম্রাজ্যবাদী দেশ থেকে আমদানী করা হিপি সংস্কৃতি পলায়নী মনোবৃত্তির জন্ম দেয় বা দেশের মধ্যকার ও বাইরের সাম্প্রদায়িকতাবোধ যখন দেশের সুকুমার মনোবৃত্তিকে যুদ্ধোম্মাদনা বা জাতি-ধর্ম বৈরিতার জন্ম দিয়ে দেশের অগ্রগতিকে খর্ব করতে চায় তখন স্বাভাবিকভাবেই ছাত্র সমাজের দায়িত্ব হচ্ছে তা প্রতিরোধ করা, সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বিকাশ ঘটিয়ে প্রগতিশীল চেতনাসম্পন্ন গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। আক্রমণ অন্য দিক থেকেও আসে— 'পুরনো যা কিছু সবই বুর্জোয়া' এই ধুয়া তুলে। সেখানেও সংগ্রাম থেমে থাকতে পারে না সংস্কৃতি সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার বিরুদ্ধে। সোভিয়েত ইউনিয়নের যুব কমিউনিস্ট লীগের ৩য় অধিবেশনে ১৯২০ সালে ভ্লাদিমির ইলিচ্ লেনিন তাঁর প্রদত্ত ভাষণকালে এ সম্পর্কে গভীর সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেছিলেন— 'ধনতন্ত্র যে সংস্কৃতি রেখে গেছে তার সবটাই আমাদের নিতে হবে এবং তাই দিয়ে গড়তে হবে সমাজতন্ত্র। তার সমস্ত বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা ও শিল্প আমাদের গ্রহণ করতে হবে। এগুলি ছাড়া আমরা সাম্যবাদী সমাজ গঠন করতে পারব না।' কাজেই সাংস্কৃতিক আন্দোলনে ছাত্র সমাজের ভূমিকা হল অতন্ত্র প্রহরীর মত। পুরনো সংস্কৃতির কতটা গ্রহণযোগ্য এবং কতটাই বা বর্জনযোগ্য এ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকা তাই একান্ত প্রয়োজনীয়। আধুনিকতার নামে পুরনো সংস্কৃতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা এবং খামখেয়ালীপনা বা অসার যুক্তিহীন ছেলেমানুষী যেমন একেবারেই সঠিক নয় তেমনি ঐতিহ্যের নামে কুসংস্কার প্রসারের চেষ্টাকেও একেবারে বরদাস্ত করা উচিৎ নয়। অর্থাৎ প্রকৃত সৎ সংস্কৃতির স্বপক্ষে যেমন ছাত্রসমাজের সোচ্চার হওয়া উচিত, তেমনি অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে মুখর হওয়া উচিত সামাজিক কর্তব্যপালন বোধে।

ছাত্রসমাজ যেহেতু সংস্কৃতির অন্যতম শাখা শিক্ষার সঙ্গে জড়িত সেহেতু শিক্ষাজগতে ছাত্রসমাজের ভূমিকা হল সর্বাধিক গুরুত্ব-সম্পন্ন। আমাদের দেশে স্বাধীনতার ২৬ বছর পরেও যখন মৌলিক

পরিবর্তন না করে কিছুমাত্র কাঠামোগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ প্রবর্তিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন জীবনবিমুখ শিক্ষা ব্যবস্থা বহাল তবিয়তে বিদ্যমান তখন জীবনমুখী, উৎপাদন ভিত্তিক, স্বচ্ছ বৈজ্ঞানিক পাঠ্যসূচীর দাবীতে ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য সংগ্রামই হল সাংস্কৃতিক আন্দোলনে ছাত্রসমাজের প্রধান ভূমিকা। মাতৃভাষার সর্বাঙ্গীন বিকাশ, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের দাবী করা তাই ছাত্র সমাজের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অন্যতম কর্তব্য। বাংলাদেশের ছাত্রসমাজের স্বর্ণোজ্জ্বল ভূমিকা এ প্রসঙ্গে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। অপরদিকে আমাদের মতন বিরাট জনবহুল দেশে শতকরা ৭০ জন এখনও নিরক্ষরতার অন্ধকারে দিন যাপনের গ্লানি ভোগ করছেন। এখনও দেশের উৎপাদনের মূল প্রাণশক্তি শ্রমিক-কৃষক-মেহনতী মানুষের ঘর থেকে আসা ছাত্রের সংখ্যা প্রায় নগণ্য বললেই চলে। স্বভাবতই ছাত্র সমাজের এক বিরাট দায়িত্ব রয়েছে নিরক্ষরতামুক্ত দেশ গড়ে সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে বেসরকারী একটি প্রতিষ্ঠান নিরক্ষরতা দূরীকরণে যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তারও প্রাণশক্তি হল ছাত্রসমাজ। সরকারী উদ্যোগ এদিকে আরও বেশী হওয়া বাঞ্ছনীয়, ছাত্রসমাজকে আরও অনুপ্রাণিত করে তোলার স্বার্থে দেশের মধ্যেকার সাংস্কৃতিক প্রগতির দ্বার উন্মুক্ত করার প্রেরণা দিয়ে।

সাংস্কৃতিক আন্দোলনে ছাত্রসমাজ আরও যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে তা হল দেশের প্রাচীন সংস্কৃতির সাথে আজকের মানুষের পরিচয় ঘটানো। হারিয়ে যাওয়া সঙ্গীত, শিল্প, সাহিত্য ইত্যাদির সাথে জনজীবনের পরিচয় ঘটানোর কাজেও ছাত্রসমাজ উল্লেখজনক ভূমিকা পালন করতে পারে। দেশের বিভিন্ন জাতি ও উপজাতির ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষা ও প্রসারের

কাজেও ছাত্রসমাজ তার নিজস্ব ভূমিকা পালন করতে পারে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে শুরু করে ভিয়েতনাম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র পর্যন্ত দুনিয়ার এক তৃতীয়াংশ জুড়ে প্রতিষ্ঠিত সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার ছাত্রসমাজের গৌরবময় ভূমিকা।

অপরদিকে অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা পালনরত ছাত্রসমাজকে সদা-সতর্ক থাকা উচিৎ ছাত্রসমাজ সম্পর্কে প্রচারিত বা প্রচলিত বিভিন্ন উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভ্রান্ত ধারণার বিরুদ্ধে। একদিকে যেমন সাম্রাজ্যবাদী বা পুঁজিবাদী অথবা সামন্ততান্ত্রিক শোষক শক্তিগুলির প্রচাব হল—ছাত্রসমাজের রাজনীতি করা উচিত নয়; অপরদিকে কিছু অতি বিপ্লবী অবৈজ্ঞানিক ঘোলাটে দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন চিন্তাবিদের বক্তব্য হল, আজকের যুগের বিপ্লবের মূল পরিচালিকা শক্তি বা নেতৃত্বদানকারী শক্তি হল ছাত্রসমাজ। কারণ কেবলমাত্র ছাত্রসমাজই নাকি বৈপ্লবিক শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন। ছাত্রসমাজকে সমাজের মধ্যকার এক বিশেষ 'শ্রেণী-হিসাবে চিহ্নিত করার প্রবণতাও অনেক তাত্ত্বিকের মধ্যে দেখা যায়। এই ধরনের বিভিন্ন ভ্রান্ত অপপ্রচারের বিরুদ্ধে তাই ছাত্রসমাজকে স্বচ্ছ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন বিপ্লবী চিন্তাধারায় সমৃদ্ধ বাস্তবিক বিচার-বুদ্ধির পরিচয় দিতে হবে। কোন আবেগের ভাবালুতা নয় পরন্তু খোলাখুলি স্বীকারোক্তিই ছাত্রসমাজের বৈপ্লবিক কর্তব্যপালনবোধ জাগ্রত করতে পারে। সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে যেহেতু শ্রমিকশ্রেণী সরাসরি এবং ওতপ্রোতভাবে জড়িত সেহেতু শ্রমিকশ্রেণীই উৎপাদন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনে বৈপ্লবিক ভূমিকা পালন করে। সমাজের মধ্যে তার বিশেষ অবস্থানের জন্যই শ্রমিকশ্রেণী তার নিজস্ব ভূমিকা পালন করে সামাজিক বিপ্লবে নেতৃত্বদানের মধ্য দিয়ে, কৃষক ও অন্যান্য সামাজিক স্তরের মানুষের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যারা বিপ্লবের পক্ষে নিজেদেরকে উৎসর্গ করে তাদের সকলকে নিয়ে। আজকের যুগে যেহেতু শ্রমিক শ্রেণীই সব চাইতে বেশী সঙ্ঘবদ্ধ, সব চাইতে বেশী বিপ্লবী শ্রেণী-চেতনাসম্পন্ন, এবং নিঃস্বার্থ ও শোষিত সে কারণে

উৎপাদনের উপকরণ দখলের কাজে, উৎপাদন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটানোর কাজে শ্রমিকশ্রেণীই বিপ্লবের বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন করতে অগ্রগামী ভূমিকা পালন করে। ছাত্রসমাজ কোন বিশেষ শ্রেণী নয়। বিভিন্ন শ্রেণী থেকে আসা বিভিন্ন শ্রেণী-দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন উৎপাদনের উপকরণ বা উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে সরাসরি যোগ না থাকা এক বিশেষ সময়কার বিশেষ সামাজিক স্তর। কিন্তু যেহেতু তারাও নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে সঙ্ঘবদ্ধ এবং অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন হওয়ার দৌলতে বুদ্ধিজীবী অংশের সাথে নিজেদের যুক্ত করে সেহেতু সমাজ পরিবর্তনের লড়াইতে প্রগতিশীল ভাবধারায় তারাও আকৃষ্ট হয় (যদিও অনেকেই ভ্রান্তভাবে প্রতিক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গীও গ্রহণ করে)। স্বভাবতই সমাজ-প্রগতির লড়াইতে সমাজের অন্যান্য স্তরের মানুষের সাথে তারাও সামিল হয়, তবে ছাত্রসমাজ হিসাবে বিপ্লবে নেতৃত্বদানের মধ্য দিয়ে নয়, বুদ্ধিজীবী সমাজের প্রগতিশীল অংশের তরুণ প্রাণোচ্ছল প্রতিনিধি হিসাবে গৌরবময় ভূমিকা পালন করতে।

নিজস্ব গৌরবময় ভূমিকা পালন করতে ছাত্রসমাজ তাই সাংস্কৃতিক আন্দোলনেও নিজেদের সৃষ্টিশীল চিন্তাধারার উল্লেখযোগ্য প্রচার ঘটায়। কিউবা, গণতান্ত্রিক জার্মানী, চেকোশ্লাভাকিয়া, ভিয়েতনামে সিনেমা শিল্পে ছাত্রসমাজের পরীক্ষামূলক প্রগতিশীল পদক্ষেপ; থিয়েটার জগতে পোল্যাণ্ড, রুমানিয়ার ছাত্রসমাজের নবীন মুন্সীয়ানা; সঙ্গীতের মূর্চ্ছনায় বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরীর ছাত্রসমাজের কলতান; নৃত্যের ছন্দ ও মুদ্রায় গণতান্ত্রিক কোরিয়া ও মঙ্গোলিয়ার ছাত্রসমাজের উচ্ছলতা এবং সাহিত্যের নন্দনকানন থেকে পুষ্পচয়ন করে ব্যালে নৃত্যের উচ্চাঙ্গ অঙ্গনমঞ্চ পর্যন্ত সৃষ্টিশীল সংস্কৃতির অঞ্জলিদানে সোভিয়েত ইউনিয়নের ছাত্রসমাজের সূর্যসম উজ্জ্বল ভূমিকা আমাদের বিস্ময়বিমুগ্ধ করে তোলে। একই সঙ্গে আমরা অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করি উন্নত পুঁজিবাদী দেশ যেমন, ফ্রান্স, পশ্চিমজার্মানী, ইতালী, গ্রেটবৃটেন, আমেরিকা, জাপান

ইত্যাদি দেশগুলিতে ছাত্রসমাজের নিজস্ব উদ্যোগে আয়োজিত চিত্র-প্রদর্শনী, থিয়েটার, সঙ্গীতানুষ্ঠান ইত্যাদির মাধ্যমে সমাজপ্রগতির লড়াইতে সামিল হওয়ার ডাক। অন্তরের গভীর আবেগে আমরা উপলব্ধি করি উচ্চ হৃদয়াবেগ সম্পন্ন চিলির ছাত্রসমাজের গানের স্কোয়াড খনি থেকে খামার পর্যন্ত ঘুরে বেড়ায় 'জয় আমাদের হবেই' এই আওয়াজ তুলে। আমরা মুগ্ধ হই বাংলাদেশ অথবা আঙ্গোলার বাহাদুর ছাত্রসমাজের; 'যায় যদি যাক প্রাণ তবু দেবোনা দেবোনা দেবোনা গোলার ধান' এই গান শুনে। আমরাও এদেশে তাই ঘোষণা করি আমাদের একাত্মতা, আমাদের আত্মীয়তা দেশের নিপীড়িত শোষিত মানবসমাজের সাথে সাংস্কৃতিক আন্দোলনে আমাদের ভূমিকা ও কর্তব্যবোধের প্রেরণায়।

আজকের ডাক তাই সংস্কৃতির আন্তর্জাতিকতায় প্রবেশের ডাক। আজকের কর্তব্য তাই সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলনে সামিল হয়ে সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজে তীব্র গতিবেগ সম্পন্ন করা। আজ থেকে বহুকাল আগে গ্যালিলিও বলেছিলেন, 'পৃথিবীই ঘুরছে—সূর্য নয়'। আজ আমরা যারা গ্যালিলিওর উত্তরসূরী আমরা ঘোষণা করি—পৃথিবীটাই ঘুরছে—সূর্য নয়, এবং ঘুরছে সমাজ-তন্ত্রের দিকে—যুদ্ধমুক্ত শোষণহীন, পৃথিবীর দিকে। আজকের ডাক তাই শোষণমুক্ত, শ্রেণীহীন, যুদ্ধহীন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ডাক। আমাদের দায়িত্ব আজকের এই ডাকে সামিল হওয়া; সাংস্কৃতিক আন্দোলনে ছাত্রসমাজের বৈপ্লবিক ভূমিকা পালন করে নিজেদের গৌরবান্বিত করা সমাজপ্রগতির পতাকা উচ্চে তুলে ধরে রাত্রির গভীর বৃন্ত থেকে ফুটন্ত সকাল ছিঁড়ে আনার জন্য পথ চলা।

# সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও ছাত্রসমাজ

রণেন মুখোপাধ্যায়

সংস্কৃতি শব্দটি মানবসভ্যতার নিরত উৎকর্ষের দিকে ইংগিত করে। সভ্যতার যেমন ক্রমিক বিবর্তন, সংস্কৃতিরও তেমনি নিরন্তর পথচলা। একটি জীবন্ত জাতির মানসিক এবং বাস্তব কর্মকাণ্ডের যোগফলকে সংস্কৃতি বলা চলে। রবীন্দ্রনাথ কমলহীরের দীপ্তিকে বলেছেন কলচার, পাথরটিকে বলেছেন বিদ্যে। কথাটি অমিত রে-র তাৎক্ষণিক বাকচাতুর্যের স্ফুরণ হলেও, সংস্কৃতি শব্দটির একটি চলনসই সংজ্ঞা এর থেকে পাওয়া যেতে পারে। যদি পাথর নেই, তো তার দীপ্তিও নেই। দীপ্তির অনিবার্য শর্ত এই বস্তুখণ্ডটি। তাই, বাস্তব এবং মানস—এই দুই কর্মকাণ্ডের পরিণামই সংস্কৃতি শব্দে বিধৃত।

প্রতিটি দেশের জিজীবিষার সংগ্রামের ইতিহাস স্বতন্ত্র। স্বতন্ত্র বলেই, দেশভেদে সংস্কৃতির ইতিহাস এবং তার প্রকৃতিও স্বতন্ত্র। ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে আলোচনার আগে একটি বিষয়ে সতর্ক থাকা বাঞ্ছনীয়। এমন একটি ধারণা বদ্ধমূল যে, ভারতীয় সংস্কৃতির মূল ঝোঁক হল অধ্যাত্মবাদের দিকে। অথর্ববেদ, পুরাণ, মনুসংহিতা বেদ এবং ঈশ্বর বিরোধী বৌদ্ধ দর্শন, যার শূণ্যবাদে মার্কসীয় দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের বীজ নিহিত—লোকায়ত দর্শন, অর্থশাস্ত্র, কামশাস্ত্র, চরকসংহিতা প্রভৃতি মুক্তিকামুখী ধ্যান-ধারণাগুলি যেন ভারতীয় সংস্কৃতিতে প্রক্ষিপ্ত। এই রকম একটি প্রচার দেশবিদেশে রয়েছে। মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক চন্দ্রকেতুগড় পর্যন্ত ভারতবর্ষ তার জঠর থেকে যে প্রাচীন সভ্যতার বিস্তৃত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন উদ্গীরণ করেছে, তা সাক্ষ্য বহণ করে না যে, ভারতীয় জীবন ছিল মূলত অধ্যাত্মবাদী এবং বস্তুসাফল্যে অনীহ। অজন্তা, ইলোরা,

খাজুরাহো, কোণারক মন্দিরাকীর্ণ দক্ষিণ ভারতে ভাস্কর্য এবং শিল্পের যে নিদর্শন সময়ের সাক্ষী হিসেবে আজো দাঁড়িয়ে রয়েছে, তা ভারতীয় মনের ভিন্ন ধাতুর পরিচয়বহ। একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, প্রকৃতির রহস্য উন্মোচনে পৃথিবীর আদি জিজ্ঞাসুদের ব্যর্থতাই কাল্পনিক ঐশী শক্তির জন্ম দিয়েছে। ধর্ম তাই প্রাগাধুনিক সভ্যতার প্রধান নিয়ামক শক্তি ছিল। কিন্তু ধর্ম কখনই মানুষের সমগ্র প্রচেষ্টাকে আচ্ছন্ন করে দিতে পারে নি। পারেনি বলেই, ঈশ্বরের লীলাক্ষেত্র এই ভারত-ভূমিতেও মানুষ স্বর্গসুখের আকাঙ্ক্ষায় কেবল 'ভজন-পূজন-সাধন-আরাধনাতে'ই তৃপ্তি পায়নি। তার শ্রম, তার কল্পনাসৃষ্টির বিচিত্র ধারায় নিজেকে মুক্ত করেছে। ভারতীয় সংস্কৃতি তাই নিছক অধ্যাত্মবাদেই নিঃশেষিত নয়।

সংস্কৃতি, অপরার্থে, অধীত বিদ্যার উৎকর্ষ বোঝায়। তাই ছাত্র-সমাজের কাছে আমরা প্রত্যাশা করি, আধুনিক ভারতীয় সংস্কৃতির যা কিছু মহৎ তা আত্মস্থ করে তাকে আরও উন্নত করতে পারেন মুখ্যত তারাই। ছাত্ররা কি পারেন, সে কথা আলোচনার আগে আমাদের স্পষ্ট বুঝে নেয়া দরকার, দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে তাদের কাছে আমরা সঠিক করে কি চাই।

হালে স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী উদযাপিত হল। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও, পূর্বাঞ্চলের দেশগুলোর শতকরা সত্তরজন লোক পড়ে রইল দারিদ্র্য-রেখার তলায়, সারা ভারতে চল্লিশ জন। সারা দেশে নিরক্ষর রইল ৩৮ কোটি ৬৪ লক্ষ নরনারী, রেজিস্টার্ড ভিখারী রইল ৩ কোটি, ভিক্ষে বাবদ এদের বাড়ানো পাত্রে পড়ে রোজ এক কোটি টাকা। পশ্চিমবঙ্গে অন্ধ রইল ৮ লক্ষ, বোবা তিন লক্ষ, উন্মাদ ৭ লক্ষ। অসাধু কত রইল তার সরকারী হিসেব আমাদের জানা নেই। তবে এ আক্ষেপ সব মুখেই প্রায় বাজে—ভেজাল আর ঘুষে দেশটার সর্বনাশ হল।

বিগত পঁচিশ বছরে আমাদের ছাত্রদের কি অভিজ্ঞতা হল? তারা দেখলেন, এ-এক মজার দেশ যেখানে অপরাধী সমাজের শীর্ষস্থানে

পৌঁছে যায়—বিদ্যা নয়, জ্ঞান নয়, প্রতিজ্ঞা নয়; সম্মান অর্থ দিয়ে কেনা হয়, কোথাও বা দাপটে। অসৎ উপার্জনের মানুষেরা সমাজে শুধু স্বীকৃত তাই নয়, ছাত্ররা দেখলেন, বোনের পাত্র খুঁজতে গিয়ে অভিবাবকেরা জানতে চাইছেন, উপরি কেমন? এবং যাদের যত উপরি, অর্থাৎ যারা যত বেশী চোর, তারাই বিস্তর বাদ্যভাণ্ড বাজিয়ে তাদের বোনেদের, হয়ত বা তাদের ভালোবাসার মেয়েদেরও দিব্য বিয়ে করে চলে গেল। অথচ, এইসব অভিবাবকদের কাছেই অসৎ উপার্জনের তীব্র সমালোচনা শুনেছেন তারা। ছাত্ররা দেখেছেন, পাড়ায় প্রাইমারী স্কুল প্রতিষ্ঠার সময় যারা বড় জোর এক টাকা চাঁদা দেয়, তারাই দুর্গাপূজা, কালীপূজায় দিব্যি শ' টাকা চাঁদা দিচ্ছে—ধর্মিষ্ঠ বলে নয়, কাপুরুষ বলে। হাতে চেম্বার, পুজোর উদ্যোক্তারা ঈশ্বরের চাইতেও শক্তিমান। সংবাদ কিংবা সংবাদপত্র, কোনটাই আজ আর তারা বিশ্বাস করতে চান না। প্রত্যক্ষ দেখলেন, নৈহাটী স্টেশনে একটি যুবককে সটান গুলি করে মেরে ফেললে পুলিশ, অথচ রেডিওর সান্ধ্য সংবাদ এবং পরদিনকার সংবাদপত্রে জানানো হল, নৈহাটী রেল স্টেশনে 'গান-ডুয়েলে' সেই যুবকটি নিহত হয়েছে। দল বেঁধে রেলগাড়ী আক্রমণ করতে এসেছিল তারা। এমতাবস্থায় নিজের চোখকেই চ্যালেঞ্জ করতে ইচ্ছে হয়। এর প্রতিক্রিয়া হল সুদূরপ্রসারী। কোন সংবাদের সত্যতাই আর তারা বিশ্বাস করেন না। পদস্থ সরকারী কর্মচারী এবং সাংবাদিকদের সম্বন্ধে প্রবল এক অশ্রদ্ধাই শুধু গড়ে উঠল! কোনটা সত্য, কোনটা অসত্য, তা আর আদৌ জানা সম্ভব নয়, সে-কথা বুঝে গেলেন তারা। শিক্ষা ক্ষেত্রেও একই অভিজ্ঞতা হল তাদের। যে নকল করলে না, আর যে করল, দুজনার উত্তরপত্রই একই নিরীখে বিচার করা হল। যে নকল করলে না, তাকে যেমন পুরস্কৃত করলে না কেউ, যে নকল করলে তাকেও তেমনি তিরস্কৃত করার জন্যে রইলে না কেউ। মাষ্টারমশাই অধ্যাপকরা পড়ান দায়সারা গোছের, প্রাইভেট ছাত্রদের কাছে প্রশ্ন

ফাঁস করেন, এমন কি অর্থের বিনিময়ে টোকার ব্যবস্থা পর্যন্ত করে দেন। মধ্যশিক্ষা পর্যদ বা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ট্যাক এবং তদ্বিরের জোরে ফেল করা ছাত্র পাশ হয়ে যায়, তৃতীয় ডিভিসন প্রথম হতে পারে—কণ্টোলার অব এগ্জামিনেশনস-এর ছাপানো নামের ঠিক ওপরের রোল নাম্বারটি এক লাফে রেজাল্ট শীটের মাথায় চলে যেতে পারে। এই সবকিছুর মারাত্মক পরিণাম হল এই যে, ছেলেরা কাউকে আর শ্রদ্ধা করতে শিখল না। শিক্ষান্তিক জীবনে জীবিকার প্রতিশ্রুতি নেই, শিক্ষার সামাজিক সম্মান নেই—এই অবস্থা ছেলেদের যে কোন সময়েই কালাপাহাড় করে তুলতে পারে। ছাত্রদের সংজাত ক্রোধকে ব্যবহার করবার লোকজন কাছেভিতেই ছিলেন।

রাজনীতির মঞ্চ থেকে সেই যে এক সময় বলা হয়েছিল "Education can wait, but not swaraj" ছাত্রদের জন্যে গাড্ডা তৈরী হল ঠিক তখনই। পরবর্তী অভিজ্ঞতায় দেখা গেল, স্বরাজ wait করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু ইতিমধ্যে স্কুল-কলেজ পালানো ছেলেরা জেল খেটে কোয়াটার-হাফ বা ফুল নেতা বনে গেছে, স্কুল কলেজে তাদের আর ফেরৎ যাওয়া হল না তাই। তার ফল যে কি রকম মারাত্মক হল, স্বাধীনতার পর দেশের চেহারা দেখলেই তা বোঝা যায়। দেশের গঠনে এই 'education can wait'-র শিকাররা কোন নেতৃত্বই দিতে পারলেন না। এদের পক্ষে দ্রুত অসৎ হয়ে যাওয়াই সহজ ছিল, এবং তা তারা হয়েওছেন।

ইদানীংকালে, চারু মজুমদার কৃষি বিপ্লবের 'ক্যাডার রিক্রুটিং সেণ্টার' হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন এই স্কুল কলেজগুলোকেই। শ্লোগানের চটক ছেলেদের টেনেছে। তারপর স্কুল-কলেজে হামলা হল, শহিদের মুণ্ডু গড়াগড়ি গেল, পরীক্ষা ভণ্ডুল হল। বলা হল, এ শিক্ষা বর্জনীয়। কারণ, তা আধা উপনিবেশিক বাঁচার শিক্ষা, তা কেবল প্রতি বিপ্লবী শক্তির হাতই পুষ্ট করতে পারে। কাজেই, আর একবার স্কুল-কলেজ বর্জন সুরু হল। চার বছর ঘুরতে না ঘুরতেই

আবার সেই যথাপূর্বংই অবিশ্যি। ছাত্র-নির্ভর কৃষি বিপ্লবের পরিণাম যা হবার ছিল, ঠিক তা-ই হয়েছে।

চারুবাবুর কথাটা বিশেষ করে এ জন্যেই যে, স্বাধীনতা পরবর্তী কালে একমাত্র তিনিই বামপন্থী আন্দোলনের অনশন-সি. ডি.-জেলের সেই পরিচিত পথে হাঁটেন নি। হাঁটেন নি বলে, তাঁর প্রভাবও হয়েছিল ব্যাপক। আমাদের ছাত্রদের কালাপাহাড় হয়ে ওঠার ক্ষেত্র তৈরীই ছিল, চারুবাবু সেখানে ফসলটি ফলালেন, এই যা। ছাত্রদের ব্যবহার করার জন্য অবশ্য তৈরী ছিল সব দলই, এবং এখনো রয়েছে।

আমাদের ছেলেদের আজ আর কিছুতেই আস্থা নেই, থাকার কথাও নয়। এক মিথ্যা অভিমান কখনো কখনো তাদের মাঝখানে কাজ করে। ছোটবেলা থেকে তারা শুনে আসছে, বাংলা সম্পর্কে গোখেলের সেই মন্তব্যের কথা : What Bengal thinks to-day... ইত্যাদি। গোখেল কবে, কোথায়, কাকে কথাটি বলেছিলেন, তা আমার জানা নেই—জানেন, এমন কারো সাথে এখনো আমার দেখা-সাক্ষাৎ ঘটেনি। কথাটি কিন্তু তার নিজের কাজ করেই যাচ্ছে। ফলে, এক ধরনের মেকি শ্রেষ্ঠতাবোধ বাঙালী ছেলেদের ভেতর দীর্ঘকাল যাবৎ কাজ করে যাচ্ছে।

এমতাবস্থায়, ভারতীয় সংস্কৃতি বলতে ছেলেরা নিজেরা কি বোঝেন? 'কলকি কালচার' যে বোঝেন, তা জানি। আমরা নিজেরাই কি সঠিক করে বলতে পারি যে, ভারতীয় সংস্কৃতির উৎকর্ষে ছেলেদের নির্দিষ্ট ভূমিকা কি হতে পারে? এ-প্রশ্নের জবাব নিশ্চয়ই চাই যে, ভারতীয় সংস্কৃতির অধ্যাত্মবাদী আদর্শ মাত্র ২৫ বছরেই ঘুষ-জোচ্চুরির মারে ধরাশায়ী হয়ে পড়ল কেন? ছেলেরা সে সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হবে কেন? অথবা কেনই বা আমরা তাদের মড়া পাহারা দিতে বলবো, জীবিতকালে সে-মড়ার যতই না কেন তেজ থাক।

আস্তাবলে অনেক নোংরা জমেছে, দুর্গন্ধে বাতাস ম-ম। ছাত্রদের প্রথম কাজ, সাফাই করা, বর্জন করা। বর্তমান জীবনের সাথে যোগ

নেই, এমন কিছুকে ভারতীয় সংস্কৃতি বলে চালাতে গেলে তার বিরোধীতা হওয়া উচিত। আজকাল যাকে অপসংস্কৃতি বলা হচ্ছে, তার সাথেও বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কোন যোগ নেই। সে-সংস্কৃতি দিয়ে আমি কি করবো যা দেশের নিরক্ষর বুভুক্ষু মানুষকে অদৃষ্টবাদের পঙ্কিলতায় আবহমান কাল থেকে ধরে রেখেছে? আমাদের মুক্ত মনের ছেলেরা এই ব্যাপক অদৃষ্টবাদী পাপের বিরুদ্ধে লড়াই করুন, তাদের কাছে এটা আমরা চাই। নিরক্ষরের ভগবান অক্ষর, বুভুক্ষুর ঈশ্বর খাদ্য ছাড়া আর কি হতে পারে জানি নে। প্রযুক্তি বিজ্ঞানের বিস্ময়কর সাফল্য দেশের নিম্নস্তরে যাতে পৌঁছতে পারে, আমাদের ছাত্ররা সে-লড়াইতে আমাদের ডেকে নিন। দেশের এই সার্বিক অধঃপতনের যুগে উহাদের মশাল হাতে নিয়ে ছেলেরাই আমাদের পথ দেখাতে পারেন। তাতে যদি ভাঙচুর কিছু হয়তো হোক। মুক্ত বায়ুর জন্যে দীর্ঘকালের বন্ধ দরজা-জানালাগুলো ভেঙ্গে যায় তো যাক।

আজ দেশে দেশে অস্থিরতা ও অসন্তোষের ঢেউ সবচেয়ে বেশি গ্রাস করেছে আমাদের ছেলেদের। পুরনো নীতি এবং মুল্যবোধকে ভেঙ্গে, অথবা, অস্বীকার করে, যৌবনের পতাকা ওড়াচ্ছেন এরা। পৃথিবীর সব থেকে সমৃদ্ধ দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে সুরু করে, সব চাইতে অনুন্নত দেশ আফ্রিকা এশিয়াতেও ছাত্র-যুবকরা আজ অস্থির। প্রাচুর্যের স্বর্গরাজ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ছাত্র-যুবদের এক বিরাট অংশ, পরিবারের বন্ধন অস্বীকার করে নোংরা কাপড় জামায় চুল-দাঁড়ি নিয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। চরম প্রাচুর্যে লালিত তারা নির্বিবাদে ক্ষুধা দুঃখ কষ্টকে বরণ করে নিচ্ছে, যেন প্রাচুর্যের প্রতি বিতৃষ্ণা। সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি আঘাত হানেনি তারা, কিন্তু তার নীতি-নিয়মকে করেছে অস্বীকার। অবাধ যৌন সংসর্গ, নেশার প্রতি আসক্তি, উৎপাদনের সাথে সম্পর্কহীন জীবন, নীতিমূলক পলায়নের দিকেই ঠেলে দিল তাদের। আমাদের দেশেও ছাত্রসমাজে সেই ঢেউ এসেছে। এরা আজ আর কাউকে মানছে না। অন্যান্য দেশের ছাত্র-যুব অসন্তোষের চরিত্র যদিও ভিন্ন তবু আমাদের দেশের অসন্তোষের সঙ্গে তার মৌল

চিন্তার অভিন্নতা লক্ষ্যণীয়। সমাজের অসংগতি এবং স্ববিরোধ থেকেই এই বিদ্রোহের জন্ম। একটা পরিবর্তনের জন্যে আজ তারা যেন উন্মাদ। নেতাদের সুবিধাবাদ, প্রতারণা ও নিপীড়ন জন্ম দিচ্ছে নতুন নতুন বিদ্রোহের। পৃথিবী উল্টে দেবার, পাহাড় উপড়ে ফেলবার, আকাশ টেনে নামাবার দুঃসাহস নিয়ে তারা এগিয়ে যায়। পথের ভুলের মাশুল দেয় রক্তের মূল্যে।

এই অবস্থা থেকে দেশকে মুক্তি দিতে পারত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়। কিন্তু তারা আজ আত্মরতির সম্মোহনে বুঁদ। দেশকে বৌদ্ধিক মুক্তি দেওয়ার সাহস এবং প্রজ্ঞা যাদের আছে, তাদেরই বুদ্ধিজীবী বলব। রবীন্দ্রনাথের গল্পের তোতায় মত পেটে পুঁথি-পত্তর ঠাসা মানুষ বুদ্ধিজীবী নন। অচলায়তন ভাঙার যোদ্ধাকেই বলি বুদ্ধিজীবী। ছাত্ররা হলেন আমাদের ভবিষ্যৎ বুদ্ধিজীবী। সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পুরোধা হিসাবে তাদেরকেই তাই এগিয়ে আসতে হবে। তাদের প্রতি নেতাজীর সেই বাণী আজো সমান সত্য: আজকাল স্কুল ও কলেজে "ভাল ছেলে" নামক এক শ্রেণীর জীব দেখিতে পাওয়া যায়; আমি তাহাদের কৃপার চক্ষে দেখিয়া থাকি। তাহারা গ্রন্থকীট পুঁথির বাহিরে তাহাদের অস্তিত্ব নাই···ইহাদের সহিত তুলনা করুন—"বকাটে" রবর্ট ক্লাইভকে। ···ইলংণ্ডের ভাল ছেলেরা যাহা পারে নাই, করিতে পারিত না, তাহা সম্পন্ন করিল বকাটে "রবার্ট ক্লাইভ···"

আমরাও সেই 'বকাটে' ছেলেদের আজ চাই, যাদের হাত ধরে দেশ তার প্রার্থিত লক্ষ্যে পৌছবে। মনের দীর্ঘকালীন জাড্যকে পরিত্যাগ করে আমাদের ছেলেরা ছিনিয়ে আনবেন সেই জ্ঞানসূর্যকে যা নাকি য়ুরোপের আকাশেই শুধু ভাস্বর। হীনমন্যতার দীর্ঘকাল লালিত সেই পাঁচিলটাকে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিতে হবে। ধ্বংস এবং সৃষ্টির তাল আমাদের ছেলেদের হাতে বেজে উঠবে, সেই প্রত্যাশাতেই বেঁচে থাকা।

সমাপ্ত

পরিশিষ্ট—১

# পূর্বভারত সাংস্কৃতিক সম্মেলন ১৯৭৩-৭৪

## কলিকাতা প্রথম অধিবেশন

### ২৩ ডিসেম্বর ১৯৭৩—১৪ জানুয়ারী ১৯৭৪

### সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন

ভারতবর্ষের ভৌগোলিক, আর্থনীতিক, রাজনীতিক এবং সাংস্কৃতিক অখণ্ডতার পটভূমিতেই পূর্বভারত সাংস্কৃতিক সম্মেলন কলকাতায় আহুত হয়। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ, উন্নত ও অনুন্নত সকল ভাষাভাষী সম মর্যদাসম্পন্ন জনগণের ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধকে শক্তিশালী করবার পবিত্র প্রয়াসেই পশ্চিবঙ্গ রাজ্য সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ এই সম্মেলনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সরকারী উদ্যোগে এ ধরনের প্রয়াস এই প্রথম। ভারতের ঐক্যবদ্ধ ও অখণ্ড সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের মধ্যেই পূর্ব ভারতের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের অবস্থান। "বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের" ভারতীয় আদর্শের মর্মবস্তু পূর্ব ভারতেও বিদ্যমান।

অরুণাচল, আসাম, ওড়িশা, নাগাভূমি, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, মনিপুর, মিজোরাম, ত্রিপুরা এবং মেঘালয় প্রভৃতি ভারতের অঙ্গরাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পূর্ব ভারতে অবস্থিত।

স্বাধীনতার পর সমগ্র ভারতে পুনর্জাগরণের কর্মযজ্ঞ চলছে। সর্বপ্রকার বৈষম্যের অবসান, সকলের সুগম বিকাশ, আর্থিক স্বয়ম্ভরতা, সমগ্রের অগ্রগতি, দীর্ঘস্থায়ী পরাধীনতার গ্লানিকর অবশেষ সম্পূর্ণভাবে মুছে ফেলবার জন্য দেশজোড়া অভিযান চলছে। এ সংগ্রাম সাফল্যের পূর্বশর্ত সকল ভাষাভাষী, সকল ধর্মাবলম্বী, সকল জাতি, উপজাতির ঐক্য ও সংহতি। এ ঐক্য ও সংহতির অতীব গুরুত্বের কথা সর্বদা স্মরণে রেখেই সমগ্র সম্মেলনের কর্মসূচী রচিত হয়। সম্মেলনের উদ্যোক্তাগণ সর্বদাই বর্ণাঢ্য বৈচিত্রের অপরূপ ঐক্যের চমকপ্রদ বিশালত্বকে সামনে রেখেই সমস্ত কাজ করেন।

২৩ ডিসেম্বর একই কেন্দ্রে দশটি ফোয়ারার সব কটি উৎসমুখের একই সঙ্গে উন্মোচন করে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায় সম্মেলনের

উদ্বোধন করেন। অন্যান্য অঙ্গ রাজ্যের সঙ্গে এই দশটি রাজ্যও সমান গতিতে সুখী ও সুন্দর ভবিষ্যতের দিকে ছুটে চলবে এই আশাই মুখ্যমন্ত্রী শ্রীরায় প্রকাশ করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, আসামের কৃষিমন্ত্রী শ্রীশরৎ দাস, ত্রিপুরার শিক্ষামন্ত্রী এবং পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রীসভার সদস্য শ্রীশংকর ঘোষ, জনাব আব্দুস সাত্তার, ডাঃ জয়নাল অবেদিন, শ্রীঅজিত পাঁজা, শ্রীপ্রদীপ ভট্টাচার্য এবং উদ্যোক্তা ও ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায় উপস্থিত থাকেন এবং ভাষণ দেন। আরও উপস্থিত থাকেন ওড়িশা, বিহার, মেঘালয়, আসাম, মিজোরাম, ত্রিপুরা, মনিপুর, পশ্চিমবঙ্গ, অরুনাচল প্রভৃতি রাজ্যের উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী এবং অতিথিবৃন্দ।

এই সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে ভারতের রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি, ভি, গিরি, প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, কেন্দ্রীয় তথ্যমন্ত্রী শ্রী ইন্দ্রকুমার গুজরাল, মনিপুরের রাজ্যপাল শ্রী এল, পি, সিং, ওড়িশার রাজ্যপাল শ্রী বি,ডি, জাত্তি, মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীডব্লু, এ, সাঙ্গমা, আসামের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীশরৎচন্দ্র সিংহ, মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীচুঙ্গী, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসুখরঞ্জন সেনগুপ্ত, অরুণাচলের মুখ্য কমিশনার শ্রীকে-এ-এ রাজা প্রমুখের পাঠান শুভেচ্ছাবাণী উদ্বোধনী অনুষ্ঠানেই পাঠ করা হয়।

সম্মেলনের সুদৃশ্য ও সুউচ্চ প্রধান তোরণটি অমর কবি বিদ্যাপতির নামে নামাংকিত হয়, আর তিনটি মঞ্চ—রবীন্দ্র-মঞ্চ, রামমোহন-মঞ্চ এবং প্রমথেশ-মঞ্চ ছিল। জাতীয় পাখী ময়ূর সম্মেলনের প্রতীকরূপে গৃহীত হয়।

প্রদর্শনী, দেশজ নৃত্য-গীত ও নাট্যাভিনয়, শিক্ষামূলক আলোচনা, চলচ্চিত্র প্রদর্শনী এই চারিটি ভাগে সম্মেলনের কাজ চলে।

নৃত্য গীত ও নাট্যাভিনয়ের অনুষ্ঠান রবীন্দ্রমঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দশটি দিন প্রধানতঃ দশটি রাজ্যের জন্য নির্দিষ্ট থাকে। ২৪ ডিসেম্বরে আসাম দিবসে আসাম রাজ্যের শিল্পীগণ তাঁদের বর্ণাঢ্য নাচ এবং গান পরিবেশন করেন। বিচিত্র সাজ পোষাকে সজ্জিত শিল্পীদের পরিবেশিত লোকনৃত্য, আর নানা সুরের ঝংকারে ভরা লোকগীত শ্রোতাদের মন ভরিয়ে দেয়। ২৫ ডিসেম্বর ত্রিপুরা দিবসে ত্রিপুরার লোকগীতে ও নৃত্যের পরিবেশনে দর্শকরা ত্রিপুরায় একটি সুন্দর পরিচয় পেয়ে তৃপ্তি লাভ করেন। ২৬ ডিসেম্বর বিহার দিবসে বিহারের শিল্পীদের দ্বারা মঞ্চস্থ নাটক 'বিদ্যাপতি' দর্শকদের মুগ্ধ করে, তাঁরা বিনম্রে চিত্তে মহাকবি বিদ্যাপতিকে স্মরণ করবার সুযোগ পান। ২৭ ডিসেম্বর অরুণাচল দিবসে ভারতের পূর্বপ্রান্তের পর্বত ঘেরা অরুণাচল রাজ্যটির বিচিত্র লোকনৃত্যের ছন্দোময় গতিভঙ্গী দর্শকদের আকৃষ্ট করে।

২৮ ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গ দিবসে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, অতুলপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত সেন প্রমুখের নির্বাচিত সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সাংস্কৃতিক ধারাটি তুলে ধরা হয়। ২৯ ডিসেম্বর ওড়িশা দিবসে ওড়িয়া নৃত্যের নৃত্যকলা দর্শকদের মন ভরিয়ে দেয়। ৩০ ডিসেম্বর মেঘালয় দিবসে মেঘালয়ের শিল্পীরা পার্বত্য এলাকার বার্ণাঢ্য লোকনৃত্য ও গীত পরিবেশন করেন। ৩১ ডিসেম্বর মিজোরাম দিবসে পূর্ব ভারতের অন্যতম রাজ্য মিজোরামের শিল্পীরা তাঁদের বিচিত্র লোকগীত ও লোকনৃত্য পরিবেশন করেন। ১ জানুয়ারি মনিপুর দিবসে মনিপুরের বিখ্যাত নৃত্যকলার এক সার্থক পরিচয় শিল্পীরা দেন। তাঁদের বৈষ্ণব প্রভাবিত রাসনৃত্য অপূর্ব হয়ে ওঠে। ২ জানুয়ারি নাগাভূমি দিবসে নাগানৃত্য পরিবেশিত হয়। নাগাভূমির শিল্পীবৃন্দ এসে পৌঁছাতে পারেনি বলেই কলকাতার শিল্পীদেরই দ্বারা তা অনুষ্ঠিত হয়।

রবীন্দ্র মঞ্চে ২৩ দিন ধরে আরও অনুষ্ঠান হয়—নাটক, নৃত্য নাট্য, যাত্রা, গীতিনাট্য, কবিগান, দেশাত্মবোধ সঙ্গীত. বাংলার বহু বিচিত্র লোকগীত, মার্গ সঙ্গীত, ইত্যাদি।

এই মঞ্চে ২৩টি দিন সঙ্গীত ও নৃত্য, অভিনয়ের ধারা ফুটিয়ে তোলা হয়। তা ছিল বৈচিত্র্যপূর্ণ, ভাবগত ঐক্যে সুসংহত

সংস্কৃতিকে অপসংস্কৃতির পংকিল আবর্তে ডুবিয়ে দেবার জন্য সচেতন ও সুসংগঠিত ভাবে সমগ্র দেশজুড়ে অপপ্রয়াস চলেছে। এ অনুষ্ঠান তাকে আঘাত দেয়। 'মেকি' সংস্কৃতির স্থলে পূর্ব ভারতের অঙ্গ রাজ্যগুলির প্রতিনিধি-স্থানীয় শিল্পীদের সমবেত করে বিভিন্ন রাজ্যের নৃত্য, গীত ও অভিনয়ের দেশীয় আঞ্চলিক রূপটি তুলে ধরা হয়। এ মঞ্চের আসন সংখ্যা ছিল ৫০০০। প্রতি সন্ধ্যায় তা পূর্ণ থাকে।

**প্রমথেশ বড়ুয়া মঞ্চ :** পূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্য কর্তৃক প্রেরিত তথ্য অথবা কাহিনী চিত্র 'প্রমথেশ বড়ুয়া' মঞ্চে প্রদর্শিত হয়। আসাম, বিহার, ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গে কাহিনীচিত্রের সঙ্গে তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। অরুণাচল, ত্রিপুরা, মেঘালয়, মিজোরাম, মনিপুর. নাগাভূমি প্রভৃতি রাজ্যের তথ্যচিত্র দেখান হয়। প্রদর্শিত কাহিনী চিত্রের মধ্যে 'পথের পাঁচালি', 'অপরাজিতা', 'ইন্দ্রনাথ-শ্রীকান্ত-অন্নদাদিদি', 'সুবর্ণ রেখা,' 'একদিন রাত্রে', 'মতিরা মুনিশ', 'কাবুলিওয়ালা', 'গঙ্গা', 'ক্ষুদিত পাষাণ', 'বাইশে শ্রাবণ', 'দাদাঠাকুর' প্রভৃতি থাকে। এখানকার আসন সংখ্যা ছিল, ১,৫০০ শত। প্রতি প্রদর্শনীতে তা পূর্ণ হয়ে ওঠে।

**রামমোহন মঞ্চ :** পূর্ব-ভারত সাংস্কৃতিক সম্মেলনের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল আলোচনাচক্র। আলোচনাচক্রের পনেরটি অধিবেশন রামমোহন মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়। বিষয় হিসাবে ছিল স্বাধীনতার পরবর্তীকালে পূর্ব-ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের সাংস্কৃতিক সংহতি, সাংস্কৃতিক অগ্রগতি, বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার বিকাশ, আধুনিক কবিতার গতিপ্রকৃতি, কথা-সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি, নাটকের অগ্রগতি, চলচ্চিত্রের সমস্যা ও অগ্রগতি, লোকসংস্কৃত, আধুনিক চিত্রের গতিপ্রকৃতি, অগ্রগতি ও পরিকল্পিত অর্থনীতি, আদিবাসী সংস্কৃতি সংস্করণ, শিশু সাহিত্যের অগ্রগতি, সাংস্কৃতিক আন্দোলনে যুবসমাজ ও ছাত্রসমাজের ভূমিকা, নারী সমাজের অবদান ইত্যাদি। পনের দিনের এই আলোচনায় প্রায় একশত সুধীজন অংশ গ্রহণ করেন। এঁরা বয়সের দিক দিয়ে প্রবীণ ও নবীন উভয়েই ছিলেন। একমাত্র নাগাভূমি ছাড়া সকল রাজ্যের প্রতিনিধি আলোচনায় যোগদান করেন। বিভিন্ন বিষয়ক আলোচনায় প্রবন্ধ পাঠ ও ভাষণদানের মধ্যে ছিলেন ডঃ মহেশ্বর নিয়োগ ( আসাম ), শ্রীঅমিত সরকার ( মিজোরাম ), ডঃ ডি, এম, শর্মা ( মনিপুর ), শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু, ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ, শ্রীগোপাল হালদার, শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক নীলকান্ত সিং ( মনিপুর ), অধ্যাপক টি, বি, ছেত্রী ( দার্জিলিং ), অধ্যাপক সুধাংশু মোহন বন্দোপাধ্যায়, ডঃ রমা চৌধুরী, শ্রীচিন্মোহন সেহানবীশ, ডঃ পূর্ণেন্দু নারায়ণ সিন্‌হা ( বিহার ), অধ্যাপক ইউ, চেতন সিং ( মনিপুর ), শ্রীসত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার, অধ্যাপক প্রণবেশ সিংহ রায়, ডঃ অনিমেষকান্তি পাল, অধ্যাপক কমলেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়, অধ্যাপক লোকেন্দ্র সিং ( মনিপুর ), শ্রীজীবনলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসুভাষ মুখোপাধ্যায়, ডঃ আই, আর, বাবু সিং ( মনিপুর ), শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্তা অপরাজিতা রায় ( ত্রিপুরা ), শ্রীনীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শ্রীমনীন্দ্র রায়, শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ, শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অধ্যাপক কার্তিক লাহিড়ী ( ত্রিপুরা ), শ্রীতরুণ রায়, শ্রীধীরেন্দ্র রায়, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ পট্টনায়ক ( ওড়িশা ), ডঃ বাবু সিংহ ( মনিপুর ), ডঃ রণেন্দ্রনাথ দেব ( ত্রিপুরা ), শ্রীদিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, শ্রী ভি, কে, দুগ্‌গল ( মিজোরাম ), অধ্যাপক এ, শ্যামশর্মা ( মনিপুর ), শ্রীনির্মলকুমার ঘোষ, শ্রীদেবব্রত গুপ্ত, ডঃ অরুণকুমার বসু, ডঃ কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীসুমঙ্গল সেন ( ত্রিপুরা ) শ্রীনীরোদ মজুমদার, শ্রীপান্নালাল দাশগুপ্ত, ডঃ নবকিশোর সিং ( মনিপুর ), শ্রী এ, কে, গাঙ্গুলী ( ত্রিপুরা ), অধ্যাপক কল্যাণ দত্ত, ডঃ প্রবোধকুমার ভৌমিক,

ডঃ পি, দত্ত গোস্বামী ( আসাম ), ডঃ সুহাস চট্টোপাধ্যায়, শ্রীআর-এস-লিডিং ( মেঘালয় ), ডঃ জলদবরণ গঙ্গোপাধ্যায় ( ত্রিপুরা). শ্রীঅমরজিৎ সিং (বিহার) শ্রীগৌতম চক্রবর্তী, শ্রীগৌতম ঘোষ, শ্রীকুমুদ ভট্টাচার্য, শ্রীবাজিউকুমার সিং শ্রীগজেন্দ্র কুমার ( বিহার ), শ্রীরণেন মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী গৌরী আইয়ুব, শ্রীমতী প্রতিমা বসু, শ্রীমতী ইলা মিত্র, শ্রীসরস্বতী সিং ( বিহার), শ্রীঅখিল নিয়োগী, শ্রীশিবরাম চক্রবর্তী, শ্রীমতী আশা দেবী, শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর, শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, শ্রীঅমিতাভ চৌধুরী প্রমুখ।

পনেরটি অধিবেশনের সভাপতিদের মধ্যে ছিলেন শ্রীঅন্নদাশংকর রায়, ডঃ নীহাররঞ্জন রায়, ডঃ সুকুমার সেন, শ্রীপ্রিয়রঞ্জন দাস মুন্সী, শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র, শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীমন্মথ রায়, শ্রীযুক্তা কানন দেবী, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, শ্রীচিন্তামণি কর, ডঃ বিশ্বনাথ সিং, শ্রীসুবোধ হাঁসদা, অধ্যাপক নিত্যানন্দ দে, ডঃ ফুলরেণু গুহ, শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রমুখ।

খোলাখুলি আলোচনা হয়েছে। সুস্থ মত প্রকাশে কোন বাধানিষেধ ছিল না। এই মত প্রকাশের মধ্য দিয়েই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, সাংস্কৃতিক সংহতি হচ্ছে সাংস্কৃতিক সংহারের ঠিক বিপরীত। ঐক্য বলতে কাউকে গিলে ফেলে এক হয়ে একাকার হয়ে যাওয়া নয়। সুধীজন সকল ভাষাভাষী, সকল জাতি, উপজাতি ও জনগোষ্ঠীর জনগণের সুষম বিকাশের জন্যই জাতীয় সংহতির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। দেশে যে প্রতিক্রিয়ার শক্তি আছে এবং তারা নানাভাবে সংকীর্ণ স্বার্থের দাবি তোলে, বিচ্ছিন্নতার কথা বলে, হীন স্বার্থের ভেদাভেদকে প্রশ্রয় দেয় তার প্রতিও এঁরা সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন। তাঁরা বলেন, বিচ্ছিন্নতা ও ভেদচিন্তা সর্বপ্রকার বিকাশেরই পরিপন্থী, সম্প্রদায়গত সংকীর্ণ স্বার্থ বৃহত্তর মানবিক আদর্শের কখনোই সহায়ক হতে পারে না।

প্রবন্ধ পাঠে এবং ভাষণের মধ্য দিয়ে মোটামুটিভাবে বেরিয়ে আসে— বিভিন্ন রাজ্যের সকল ভাষাভাষী জনগণের সংহতি ও ঐক্যকে শক্তিশালী করবার জন্য সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আশু প্রয়োজনীয় কাজ হিসাবে গ্রহণের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ উল্লেখযোগ্য :—

(ক) সকল রাজ্যের সকল ভাষাভাষী জনগণের মধ্য থেকে নিরক্ষরতার দ্রুত অবসান এবং সাক্ষরতার দ্রুত প্রসার। গণসাক্ষরতার জন্য পরিকল্পিত গণ-অভিযান সৃষ্টি করা দরকার।

(খ) প্রাচীন শোষণযুক্ত সমাজ-ব্যবস্থার বিলোপ ঘটিয়ে শোষণমুক্ত সমাজ

ব্যবস্থার জন্য যে প্রক্রিয়া দেশজুড়ে চলেছে তার পটভূমিতে জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রবর্তন ও প্রসার।

(গ) মাতৃভাষায় শিক্ষার প্রবর্তন এবং প্রতিটি আঞ্চলিক ভাষার সাহিত্য ও শিল্পের বিকাশ এবং দ্রুত উন্নয়ন।

(ঘ) নতুন নতুন চিন্তার আলোকে নতুন মানবিক মূল্যবোধে, মানুষের কল্যাণ কর্মে ও পবিত্র সেবায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার প্রসার।

(ঙ) দুর্গমতাই বিচ্ছিন্নতাকে লালন-পালন করে। বিচ্ছিন্ন মানসিকতার গ্লানিকে বিলোপ করবার জন্য সহজ এবং শক্তিশালী যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

(চ) সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্মের নিয়মিত বিনিময়। আন্তঃরাজ্য সাংস্কৃতিক বিনিময়ের জন্য সুদৃঢ় ব্যবস্থার প্রবর্তন।

(ছ) বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগণের সুদীর্ঘকালের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তথা লোক সংস্কৃতির পুনরুদ্ধার এবং তার যৌথ মূল্যায়ন ও বর্তমানের সঙ্গে সাযুজ্য বিধানের জন্য যৌথ গবেষণামূলক কাজের প্রবর্তন।

একের মধ্যে আমরা অপূর্ণ। বহুর মধ্যেই যথার্থ পূর্ণতা রয়েছে। তাই দেশের সর্বমুখীন বিকাশের জন্য সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা গঠনের জন্য এই পর্বে সকলকে সামনের দিকে নিয়ে চলার বলিষ্ঠ পদচারণে মিলিত হবার নামই হোক সাংস্কৃতিক সংহতি। এই সংহতিকে জীবনে রূপায়িত করবার প্রধানতম দায়িত্ব বুদ্ধিজীবীদের উপর রয়েছে।' এ ক্ষেত্রে তাঁরা নেতৃত্ব দিন, এই ঘোষণাই আলোচনাচক্রের শ্রোতারা করেছেন।

**প্রদর্শনী ঃ** অধিকাংশ রাজ্যই প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ করে। প্রদর্শনীগুলি স্ব স্ব রাজ্যের ভাব ও ভাবনাকে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছে। ত্রিপুরা প্রধানতঃ বাঁশ এবং কাঠের কাজের নিদর্শন আনে, আসাম আনে রেশম শিল্পের নমুনা, মনিপুর ফুটিয়ে তোলে তার রাজ্যের শিল্পমণ্ডিত নৃত্যধারা, মিজোরাম দেখাতে চায় তার আদিবাসী সংস্কৃতির ধারা। তার সঙ্গে বর্তমান ধারা কিভাবে মিলে মিশে চলেছে। বিহার পূর্বস্মৃতি ও ঐতিহাসিক জাগিয়ে তোলবার প্রয়াস পায়। পশ্চিমবঙ্গ তার অতীত ঐতিহ্যকেও বর্তমানকে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিল।

রাজ্য সরকারগুলির মণ্ডপ ছাড়াও ছিল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় মণ্ডপ, বন বিভাগ, মৎস বিভাগ, কলকাতা পুলিশ, খাদি গ্রামোদ্যোগ, ক্যালকাটা মেট্রোপলিটান ডেভোলপমেণ্ট অথরিটি, জীবন বীমা কর্পোরেশন প্রভৃতি মণ্ডপে তাঁদের কর্মধারা ফুটিয়ে তোলে। এর পাশা-

পাশি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের মণ্ডপ। মণ্ডপ ও ষ্টলের মোট সংখ্যা প্রায় ২১০টি ছিল।

সম্মেলন প্রাঙ্গণের ৪৩৭৯ চলতি ফুট পরিধি ছিল।

২৩ দিনের এই সম্মেলনে প্রায় ৬ লক্ষাধিক দর্শক ও শ্রোতা যোগদান করেছিলেন।

**সংগঠক :** সম্মেলনের উদ্যোক্তা বিভাগ হিসাবে রাজ্য সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ ছিল। ব্যাক্তি হিসাবে ছিলেন উক্তবিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায়। বিভাগের মন্ত্রী থেকে সাধারণ পিওন সকলেই কোন না কোন কাজের দায়িত্বে রাখা হয়েছিল। সমবেত ক জর একটা নতুন দৃষ্টান্ত সৃষ্টি হয়েছিল। অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমবেত কাজের মাধ্যমে তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের সর্বস্তরের কর্মীরা এক অসাধ্য সাধন করেছিলেন। তাঁরা সমগ্র রাজ্যের সুনামকে অক্ষুন্ন রেখেছিলেন। রাজ্য সরকারের ভূমিকাকে উজ্জল করেছেন।

নানা দৈন্যের মধ্যেও ভারত-চিন্তা ম্লান হয়ে যায়নি। পূর্ব ভারত সংস্কৃতিক সম্মেলন একথা সরবে ঘোষণা করেছে। দেশের সাংস্কৃতিক নবজাগরণের প্রশস্ত বাতায়নে এ সম্মেলন সাম্প্রতিককালের একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এ সম্মেলন হীন স্বার্থের ভেদচিন্তাকে আঘাত দিতে সক্ষম হয়েছে, ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ঐক্যের শক্ত ইমারতকে মজবুত করতে সহায়তা করেছে। এর ফল ইতিমধ্যেই আমরা পেতে আরম্ভ করেছি। ভারত-চিন্তা আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

জানা এবং জানানো, দেখা এবং দেখানো, চেনা এবং চেনানোর মধ্যে দিয়েই উভয়ের মধ্যে নৈকট্য বাড়ে। নৈকট্যই ক্রমে ক্রমে আত্মীয়তায় উন্নীত হয়। আত্মীয়তায় মধ্যেই অলঙ্ঘনীয় আত্মিক বন্ধন গড়ে ওঠে। সেই বন্ধনই যুগকে অতিক্রম করে। বিভিন্ন জাতি, উপজাতি ও ভাষাভাষী ভারতবাসীর মধ্যে এই বন্ধন আছে। পূর্ব-ভারত সাংস্কৃতিক সম্মেলন সেই বন্ধনকেই শক্ত করেছে।

স্বার্থান্বেষীদের বিষনিঃশ্বাসে আমাদের মনের আকাশকে মাঝে মাঝে দূষিত করবার চেষ্টা করে। সেই অপচেষ্টাকে প্রতিহত এবং পরাভূত করবার জন্য এ ধরনের সম্মেলন প্রয়োজন। আমাদের সাংস্কৃতির জগতে অপসংস্কৃতিক ঘন অন্ধকারের কালো ছায়া বিস্তার করতে চাইছে, হীন স্বার্থের হাত প্রসারিত

হচ্ছে। এরা শুধুমাত্র ব্যবসা করতে চাইছে না, তার সঙ্গে আমাদের মনকেও কলুষিত করবার চেষ্টা করছে। এদেরেই অর্থ বিভেদ ওবিচ্ছিন্নতার আগুন জ্বালায়, সেই অর্থ মনকে অপবিত্র করে। এরই বিকল্প—যা সুস্থ, সবল মানবিকতাই-এ সম্মেলন তুলে ধরেছে।

এ কথা ঠিক, একটি সম্মেলনে সমস্ত কিছুই হয়ে যায় না, সবটা পাওয়া যায় না, কিন্তু বহুজনের সমাবেশে একটি সার্থক সম্মেলনে যদি মহত্তের সূচনা হয়, তবে তাকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। এই এগিয়ে যাবার প্রেরণাই এ সম্মেলন দিয়েছে—এখানেই পূর্বভারত সাংস্কৃতিক সম্মেলনের সার্থকতা। পূর্বভারতের বঙ্গভূমিতে নবীন এই আলোকের শিখা এবার রাজ্যে রাজ্যে বিচ্ছুরিত হবার সুযোগ সৃষ্টি করেছে। সাংস্কৃতিক ঐক্য সংহতি ও বিকাশের জন্য প্রচলিত কর্মধারার মধ্যে থেকে আরও একটি পথের উন্মোচন হয়েছে। ভারত-পথিকদের চলার পথ এতে সুগম হয়েছে।

আর্থিক দৈন্যকে লঘু করবার উপায় নেই। কিন্তু ওটাই আমাদের একমাত্র দৈন্য নয়। চিন্তার দীনতা, বুদ্ধির ক্লীবত্ব কম ভয়াবহ নয়। তাই আর্থিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক নবজাগরনও অপরিহার্য। রথ যদি দেশ হয়, তবে তার দুরন্ত ও তেজদৃপ্ত দু'টি ঘোড়ার মধ্যে একটি অর্থনীতি, অপররিটি সংস্কৃতি। দুটি ঘোড়াকেই তার আটটি পায়ের ছন্দ তুলে সামনের দিকে ছুটতে হবে। শুধু চলা, সামনের দিকে চলা।

—মানিক সরকার

পরিশিষ্ট—২

# পূর্বভারত সাংস্কৃতিক সম্মেলন ১৯৭৩-১৯৭৪

## রামমোহন মঞ্চ

## ( আলোচনাচক্র )

### ২৪ ডিসেম্বর, ১৯৭৩ প্রথম অধিবেশন

আলোচনাচক্রের উদ্বোধন করেন—শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায়,
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার ।

বিষয় :— পূর্বভারতের বিভিন্ন রাজ্যের সাংস্কৃতিক সংহতি

সভাপতি : শ্রীঅন্নদাশংকর রায়

বক্তা : শ্রীগোপাল হালদার
শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু
ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ
শ্রী এস. কে. প্রিয়ব্রত সিং ( মনিপুর )
শ্রী অমিত সরকার ( মিজোরাম )
ডঃ মহেশ্বর নিয়োগ ( আসাম )

### ২৫ ডিসেম্বর, ১৯৭৩, দ্বিতীয় অধিবেশন

বিষয় : স্বাধীনতার পরবর্তীকালে পূর্বভারতের বিভিন্ন রাজ্যে
সাংস্কৃতিক অগ্রগতি

সভাপতি : ডঃ নীহাররঞ্জন রায়

বক্তা : ডঃ রমা চৌধুরী
শ্রীচিন্মোহন সেহানবীশ
শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
অধ্যাপক ই, নীলকান্ত সিং ( মনিপুর )

২৬ ডিসেম্বর, ১৯৭৩ তৃতীয় অধিবেশন

বিষয় : পূর্বভারতের বিভিন্ন ভাষার বিকাশ ও তার আন্তঃ সম্পর্ক,

সভাপতি : ডঃ সুকুমার সেন

বক্তা : শ্রীসত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার
ডঃ অনিমেষকান্তি পাল
অধ্যাপক ইউ, চেতন সিং ( মনিপুর )
অধ্যাপক প্রণবেশ সিংহরায়

২৭ ডিসেম্বর, ১৯৭৩ চতুর্থ অধিবেশন

বিষয় : সাংস্কৃতিক আন্দোলনে যুবসমাজের ভূমিকা

সভাপতি : শ্রীপ্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী

বক্তা : অধ্যাপক কমলেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীজীবনলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
অধ্যাপক এস, লোকেন্দ্র সিং ( মনিপুর )

২৮ ডিসেম্বর ১৯৭৩ পঞ্চম অধিবেশন

বিষয় : স্বাধীনতার পরবর্তীকালে পূর্বভারতে আধুনিক কবিতার গতি প্রকৃতি

সভাপতি : শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

বক্তা : শ্রীসুভাষ মুখোপাধ্যায়
শ্রীবিমল চন্দ্র ঘোষ
শ্রীমনীন্দ্র রায়
শ্রীনীরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী
ডঃ আই, আর, বাবু সিং (মনিপুর)
শ্রীমতী অপরাজিতা রায় ( ত্রিপুরা )

## ২৯ ডিসেম্বর ১৯৭৩ ষষ্ঠ অধিবেশন

বিষয়ঃ স্বাধীনতার পরবর্তীকালে পূর্বভারতের কথাসাহিত্যের গতি প্রকৃতি

সভাপতিঃ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় ( বনফুল )

বক্তাঃ শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ
শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
অধ্যাপক সি, মনিহর সিং ( মনিপুর )
ডঃ কার্তিক লাহিড়ী ( ত্রিপুরা )

## ৩০ ডিসেম্বর ১৯৭৩ সপ্তম অধিবেশন

বিষয়ঃ স্বাধীনতার পরবর্তীকালে পূর্বভারতে নাটকের অগ্রগতি

সভাপতিঃ শ্রীমন্মথ রায়

বক্তাঃ শ্রীতরুন রায়
শ্রীদিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
অধ্যাপক এ, লোকেন্দ্র সিং (মনিপুর)
ডঃ আর, এন. দেব ( ত্রিপুরা )

## ৩১ ডিসেম্বর ১৯৭৩ অষ্টম অধিবেশন

বিষয়ঃ পূর্বভারতের চলচ্চিত্রের সমস্যা ও অগ্রগতি

সভাপতিঃ শ্রীযুক্তা কানন দেবী

বক্তাঃ শ্রীনির্মলকুমার ঘোষ ( এন-কে-জি )
শ্রীঅসিত চৌধুরী
শ্রীসত্যব্রত গুহ
এন, কে, দুগ্‌গল ( মিজোরাম )
অধ্যাপক ডি, শ্যামশর্মা ( মনিপুর )

**২ জানুয়ারী, ১৯৭৪, নবম অধিবেশন**

বিষয় : পূর্বভারতের লোক সংস্কৃতি

সভাপতি : ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য

বক্তা : ডঃ কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
ডঃ অরুণকুমার বসু

**৩ জানুয়ারী, ১৯৭৪ দশম অধিবেশন**

বিষয় : পূর্বভারতের আধুনিক চিত্রের গতি প্রকৃতি

সভাপতি : শ্রীচিন্তামণি কর

বক্তা : শ্রীনীরদ মজুমদার
শ্রীসুমঙ্গল সেন (ত্রিপুরা)

**৪ জানুয়ারী, ১৯৭৪ একাদশ অধিবেশন**

বিষয় : ভারতের পরিকল্পিত অর্থনীতি ও অগ্রগতি

সভাপতি : ডঃ বিশ্বনাথ সিং (বিহার)

বক্তা : শ্রীপান্নালাল দাসগুপ্ত
অধ্যাপক হরশঙ্কর ভট্টাচার্য
অধ্যাপক কল্যাণ দত্ত
শ্রী এস, পি, হাজারিকা (অরুণাচল)
ডঃ নবকিশোর সিং (মনিপুর)
শ্রীঅরুণকুমার গঙ্গোপাধ্যায় (ত্রিপুরা)

**৫ জানুয়ারী, ১৯৭৪ দ্বাদশ অধিবেশন**

বিষয় : পূর্বভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের আদিবাসী সাংস্কৃতির সংরক্ষণ ও তাঁদের সামাজিক জীবন।

সভাপতি : শ্রীসুবোধ হাঁসদা

বক্তা : শ্রী আর, এস. লিংডো (মেঘালয়)
ডঃ প্রবোধকুমার ভৌমিক
ডঃ সুহাস চট্টোপাধ্যায়
ডঃ জে, বি, গঙ্গোপাধ্যায় (ত্রিপুরা)
ডঃ প্রফুল্ল দত্ত গোস্বামী (আসাম)

১০ জানুয়ারী, ১৯৭৪ ত্রয়োদশ অধিবেশন

বিষয় : সাংস্কৃতিক আন্দোলনে ছাত্রসমাজের ভূমিকা

সভাপতি : অধ্যাপক নিত্যানন্দ দে

বক্তা : শ্রীকুমুদ ভট্টাচার্য

শ্রীগৌতম ঘোষ

শ্রীগৌতম চক্রবর্তী

শ্রীগজেন্দ্রকুমার ( বিহার )

শ্রীঅমরজিত সিং ( বিহার )

শ্রীবাজিওকুমার সিং ( বিহার )

শ্রীরণেন মুখোপাধ্যায়

১২ জানুয়ারী, ১৯৭৪ চতুর্দ্দশ অধিবেশন

বিষয় : সাংস্কৃতিক আন্দোলনে নারী সমাজের ভূমিকা

সভানেত্রী : ডঃ ফুলরেণু গুহ

বক্তা : শ্রীযুক্তা গৌরী আইয়ুব

শ্রীযুক্তা ইলা মিত্র

শ্রীযুক্তা প্রতিমা বসু

শ্রীযুক্তা সরস্বতী সিং ( বিহার )

১৩ জানুয়ারী, ১৩৭৪ পঞ্চদশ অধিবেশন

বিষয় : স্বাধীনতার পরবর্তীকালে বাংলায় শিশু সাহিত্যের অগ্রগতি

সভাপতি : শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

বক্তা : শ্রীঅখিল নিয়োগী

শ্রীযুক্তা আশা দেবী

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

শ্রীশিবরাম চক্রবর্তী

শ্রীক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য

শ্রীঅমিতাভ চৌধুরী

প্রতিদিন পূর্বাপর অধিবেশনের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন পেশ করেন :

শ্রীমানিক সরকার, তথ্য আধিকারিক,

তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ।

আলোচনা চক্রের দায়িত্বে থাকেন

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত

শ্রীমানিক সরকার

শ্রীঅনিলকুমার মণ্ডল

শ্রীউমানাথ সিংহ

শ্রীসত্যরঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রীঅমিতাভ মুখোপাধ্যায়

শ্রীস্মৃতপা চক্রবর্তী প্রমুখ।

———